বাঙ্‌লা সাহিত্য পরিক্রমা

(মোদের চলার হবে না শেষ)

"এত অন্ধকার – তবু এত আলোয়,
জীবনের মাঝে আছে,
মোদের ক্ষুদ্র জীবন তরী ভরে,
বাঁচতে পারে না যে॥

মোরা ডুবিব না তবু অতল অন্ধকারে
হিম জলের নীচে,
মোরা বাঁচিবার তরে ফিরিব চেষ্টায়
ভাসিবো না মোরা কাঁদে॥

অতীতেরে মোরা স্মরিব না আর
ভবিষ্যতেরে ভাবিবে না
বর্তমানের কিচিমিচুল পাশে—
মোদের চলার অবসান নয়॥

সিন্ধুর লক্ষ লইয়া মোরা
চলিব সিন্ধুর মাঝে—
বর্তমানের ইঙ্গিতে মোরা
হস্তে পতাকা লয়ে॥

হয়তো একদিন মোদের এ চলার
হবে শেষ
সিন্ধুনেত্রে মোদের তখনি তোমার
চরিত্র নুতন বেশ॥

সেখানে বর্তমানে মধ্যে সদ্য শেষ
সেটারই মধ্যে আছে অতীত
আবার নূতন সৃষ্টি করে শেষ
ভবিষ্যতের ইঙ্গিত রয়েছে ।।"

— ০ —

৩১ / [illegible] / ১৯৫২.

বাঙ্‌লা সাহিত্য পরিক্রমা

ভোলানাথ ঘোষ

চট্টগ্রাম গভর্ণমেণ্ট কলেজের ভূতপুর্ব অধ্যাপক,

কলিকাতা মুরলীধর গার্লস্‌ কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ

ও

বাঙ্‌লা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক

পরিবেশক

বামা পুস্তকালয়

১১এ, কলেজ স্কোয়ার

এস, ব্যানার্জি এণ্ড কোং

৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট

প্রকাশক
শ্রীসুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়
৬নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

পাকিস্তান পরিবেশক
অরিয়েন্টাল বুক ডিপো,
সদর রোড, বরিশাল,
পূর্বপাকিস্তান

মুদ্রাকর
শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল বিশ্বাস,
ইণ্ডিয়ান ফোটো এনগ্রেভিং কোং
(প্রাইভেট) লিঃ,
২৮, বেনিয়াটোলা লেন,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট
শ্রীসিদ্ধেশ্বর মিত্র

পরিবর্ধিত সংস্করণ
মূল্য এগারো টাকা

"তোমাদের চোখে আমার মনে এঁকেছে অনেক ছবি
তাইতো আমি কবিতা লিখে হয়েছি মহাকবি"

— —

—মা ও বাবাকে—

নিবেদন

'বাঙ্‌লা সাহিত্য পরিক্রমা' সম্বন্ধে দু'চারটি কথা বলবার আছে, ১৯৫২ সালে আমার এক বন্ধু একখানি বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস লেখার জন্য অনুরোধ করেন, তিনি আরও বলেছিলেন যে, আর্থনীতিক, রাজনীতিক ও সামাজিক পটভূমিকায় কি ভাবে আমাদের সাহিত্য গ'ড়ে উঠেছিল, যথাসম্ভব তার একটা রূপ নির্ণয় করবে। তারপর দীর্ঘ চার বৎসর ধরে লিখেছি আর কাটাকুটি করেছি। অনেকের সঙ্গে এ বিষয়ে অনেক দিন আলোচনা করেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার অনেক মতও পরিবর্তন করতে হয়েছে।

আমার ইচ্ছা ছিল দু'টি পৃথক খণ্ডে প্রাচীন ও বাঙ্‌লা সাহিত্যধারার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব, কিন্তু অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শ্রীজগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতি শুভানুধ্যায়ীগণ আমাকে একটি খণ্ডেই আলোচনা শেষ করতে উপদেশ দেন। আমিও তাদের মত সমীচীন মনে করে যথাসম্ভব বাঙ্‌লা সাহিত্যের বর্তমান কাল পর্যন্ত আলোচনা করবার চেষ্টা করেছি। বর্তমানের কালের স্যাহিত্যের আলোচনা (বিংশ শতাব্দী) একটু সংক্ষিপ্তই হয়ে গেল। হাজার বছরের সাহিত্যের ক্ষুদ্র পরিসরে আলোচনা করাও সম্ভব নয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আলোচনা নাম মাত্রই করা হয়েছে। তাঁর কাব্যধারা সম্বন্ধে আমার একটি আলোচনা গ্রন্থ শীঘ্রই প্রকাশিত হচ্ছে রবীন্দ্র-পরবর্তীকালের লেখকদের রচিত গ্রন্থবিশেষ যোগাড় করতে না পারাতে আমার প্রয়াস হয়ত ততটা সার্থক হয়নি।

কাজেই পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ফলে, গ্রন্থেরও কলেবর কিছুটা বৃদ্ধি হয়েছে এবং সেই কারণে মূল্যও কিছুটা বাড়াতে হল।

বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস অনেকেই রচনা করেছেন। আমিও তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। শ্রদ্ধেয় ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বঙ্গভাষাও সাহিত্য গ্রন্থখানির আলোচনার আদর্শ প্রত্যেক বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতারই গ্রহণ করা উচিত। এ রকম রসগ্রাহী আলোচনা খুব কমই হয়েছে। তারপর উল্লেখ করা যায় কবিসমালোচক শশাঙ্কমোহন সেন মহাশয়ের 'বঙ্গবাণী' গ্রন্থখানির বাঙ্‌লা সাহিত্যের এমন বলিষ্ঠ ও দরদী সমালোচনা এযুগেও বিরল। দুঃখের বিষয় বইখানি এখন দুষ্প্রাপ্য। 'বঙ্গবাণী'র প্রথম প্রকাশকেরা এ ব্যাপারে একেবারে নিশ্চেষ্ট।

তাঁদের দিয়ে বইখানি দ্বিতীয়বার এখনও ছাপানো সম্ভব হয়নি। আমি নিজেও এই ব্যাপারে অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু প্রকাশকরা দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে চুপ করে আছেন। তারপর ডাঃ স্বকুমার সেনের বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাসের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। ডাঃ সেনের বিপুল অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফল তাঁর বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস। ভবিষ্যতে যাঁরা বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করতে যাবেন অথবা বাঙ্‌লা সাহিত্যের কোনো বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে যাবেন ডাঃ সেনের বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাসের নানা খণ্ডগুলিতে তার প্রচুর উপকরণ পাবেন। মঙ্গলকাব্য ও তার যুগ সম্বন্ধে জানতে হলে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের 'বাঙ্‌লা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস' অপরিহার্য গ্রন্থ। প্রাচীন দিনের বাঙ্‌লা ও বাঙালীর পরিচয় বিশদভাবে রয়েছে ডাঃ শ্রীনীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্বে', আমি এঁদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী। এছাড়াও আরও অনেকের লেখা থেকে আমি সাহায্য পেয়েছি। যে যে গ্রন্থ বা পুস্তিকা থেকে সাহায্য পেয়েছি গ্রন্থের শেষে তাদের উল্লেখ করেছি। বিশেষ করে ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, কবি সমালোচক ও মোহিতলাল মজুমদার, অধ্যাপক শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী, অধ্যাপক শ্রীআশুতাষ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি আচার্যদের কাছে ছাত্র হিসাবে যা লাভ করেছি—তাই আমার বর্তমান প্রচেষ্টার মূলধন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, অধ্যাপক শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী, অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী, অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, শ্রীগোপাল হালদার, শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীজগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীসাধনকুমার ভট্টাচার্য, অধ্যাপক শ্রীস্থবোধচন্দ্র চৌধুরী, অধ্যাপক শ্রীস্থশীল জানা, বন্ধুবর শ্রীঅশোক গুহ, বন্ধুবর শ্রীগিরীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এই গ্রন্থ রচনায় আমাকে নানা উপদেশ ও তথ্য প্রভৃতি যোগাড় করে দিয়ে উৎসাহিত করেছেন। তাঁদের কাছে আমার ঋণ রয়ে গেল। ও থাকাই ভালো—কারণ স্নেহের ঋণ কখনও পরিশোধ করা যায় না।

বন্ধুবর স্থবোধচন্দ্র চৌধুরী এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আদ্যোপান্ত পড়ে ছাপাখানার প্রুফ দেখে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। একমাত্র তাঁর চেষ্টা ও সহানুভূতির জন্যই এই গ্রন্থখানি এত তাড়াতাড়ি ছাপিয়ে বের করা সম্ভব হয়েছে। বাল্যবন্ধুর কাছে কৃতজ্ঞতা জানানো বাহুল্যমাত্র।

প্রকাশক শ্রীসুধীরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অতি সজ্জন বন্ধু এবং বাঙ্‌লা সাহিত্যের নিষ্ঠাবান উৎসাহী প্রকাশক। নইলে এত বড়ো সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থ প্রকাশ করতে কেউ সাহস করতেন না। এই গ্রন্থ প্রকাশের সময় থেকে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। কিন্তু এরই মধ্যে তাঁর উদার ও সহানুভূতিশীল মনের যথেষ্ট পরিচয় পেয়েছি।

ছাপাখানার শ্রীদ্বিজেন বিশ্বাস মহাশয়ের অমায়িক ব্যবহার আমাকে বড়ই কুণ্ঠিত করেছে। প্রুফের ওপর নানা কাটাকুটি ও অদলবদল করে তাঁকে আমি ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছি। কিন্তু তিনি অটুট ধৈর্য নিয়ে যেভাবে গ্রন্থখানি ছাপানো শেষ করেছেন তার জন্যে তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ।

শ্রদ্ধেয় বন্ধুবর শ্রীব্রজবিহারী বর্মণ মহাশয় গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত ছাপার ভুলত্রুটি সংশোধনে তৎপর ছিলেন—তাঁর কাছেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

অনুজপ্রতিম শ্রীমান শিবনাথ চক্রবর্তী অল্পদিনের মধ্যে যে পরিশ্রম সহকারে অনুক্রমণিকা প্রস্তুত করেছেন তা সত্যই বিস্ময়ের ব্যাপার। স্নেহের সম্পর্ক কৃতজ্ঞা জানাবার অবকাশ রাখে না; তবুও সকৃতজ্ঞ অন্তরে তাঁর পরিশ্রমের কথা স্মরণ করি।

অনেক চেষ্টা করেও এই গ্রন্থখানিকে একেবারে নির্ভুলভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হল না। যা কিছু ত্রুটি সব আমার দোষেই ঘটেছে। কয়েকটি সন তারিখ প্রভৃতির ভুল আমার নিজের চোখেও পড়েছে। মুদ্রণ-প্রমাদ ছাড়া অন্যান্য ত্রুটি সম্বন্ধে যদি আমাকে কেউ দয়া করে জানান ত পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নেব। বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে ফলকথা বলবার অহংকার আমার নেই। গতিশীল সাহিত্যধারা সম্বন্ধে শেষকথা বলাও যায় না। পূর্বসূরীদের প্রচেষ্টা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে সাহিত্য ও সমাজের রূপনির্ণয়ের চেষ্টা করেছি মাত্র।

ভালোমন্দ বিচারের কথা উঠলে বলব—ভালো কি আছে তা হয়ত কিছুটা জানি—কিন্তু মন্দটা ধরিয়ে দিলে, আর কিছু না হ'ক অন্তত আমার অশেষ উপকার হবে।

কলকাতা, শ্রীভোলানাথ ঘোষ

২২শে শ্রাবণ, ১৩৬৪

সূচীপত্র

১
গোড়ার কথা

সাহিত্য ও সমাজ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সাহিত্যের মাঝে রয়েছে সমাজ তথা জাতির পরিচয়। কোনো সাহিত্যেরই যথার্থ মূল্য নিরূপিত হতে পারে না, যে পর্যন্ত না জাতির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। ঠিক তেমনই সাহিত্য ছাড়াও কোনো জাতির সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া অসম্ভব।

বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা শুরু করতে গেলে বাঙালী জাতির ইতিহাসেরও আলোচনা প্রয়োজন। আজ আমরা যে বাঙ্‌লা সাহিত্যের নিদর্শন ও স্বরূপ দেখতে পাচ্ছি তা যে কতো পরিবর্তন, কতো বাধা অতিক্রম করে এসেছে তার সংবাদ সবটুকু রাখা সম্ভব নয়। বাঙ্‌লা দেশ,—তার জাতি, তার সমাজ, তার মানুষ কতো ঐতিহাসিক পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে, জীবন-সংগ্রামের বর্তমান কালে এসে পৌঁছেচে তার সাক্ষ্য দেবে বাঙ্‌লার ইতিহাস, আর তার সাহিত্য। জাতির জীবনের সুখদুঃখানুভূতি, ব্যর্থতা ও সার্থকতা রূপ পায় তার সাহিত্যে। সেখানে তার জীবন-দর্শন, তার ধর্মমত, রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি, ব্যর্থ ও সার্থক জীবনের করুণ ও কঠোর প্রকাশ—সবই যথাযথভাবে মূর্তি লাভ করে।

মানুষ যতোই সামনের পথে এগিয়ে যায় ততই সে পায় নতুন পথের সংবাদ—নতুন জীবনের আভাস, নতুন ঘরের ঠিকানা। ইতিহাসের সরণি বেয়ে প্রত্যেক জাতিকে বর্তমানের সম্মুখীন হতে হয়েছে। ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশ তার ভবিষ্যৎ পরিণামের ইঙ্গিতও দিয়েছে।

বাঙালীর ও বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাসেও তার কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি—কেবলমাত্র পলাশীর প্রাঙ্গণে জাতীয় জীবনের পটভূমিকার আকস্মিক পরিবর্তন ছাড়া। বাঙালীর পরিচয় আমরা সাহিত্যে যেমন পাই, তেমনই পুরানো ইতিহাসের পথে-প্রান্তরেও সে পরিচয়ের কিছুটা আভাস মিলে। এই জাতির আবির্ভাব আকস্মিক কোনো একটা ঘটনা নয়। ভারতবর্ষের নানা সভ্য, অর্ধসভ্য বা অসভ্য জাতির সঙ্গে নবাগত আর্যদের বিরোধ-মিলনের ফলে

যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধীরে ধীরে গ'ড়ে উঠেছিল—বাঙ্‌লা সেই ভারতেরই অন্তর্গত শ্যামল ভূমিখণ্ড। বহুদিনের অনাদৃত, অবহেলিত কোম-প্রধান এই বাঙ্‌লাদেশ শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর নানা জাতিকেই আকৃষ্ট করেছিল। আর্য ও অন্-আর্য বিরোধ এবং পরে মিলন যে নতুন ভারতীয় জাতি সৃষ্টি করেছিল সে জাতির মাঝে আর্য ও অন্-আর্য এই দুই ধারার সংস্কৃতিগত কল্যাণময় মিশ্রণই ভারতের পরবর্তী কালের ইতিহাস রচনা করেছে! আর্যরা অন্-আর্যদের ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক রীতিনীতি, দেবদেবী সবই গ্রহণ করেছিল। বৈদিক সংস্কৃতি বিরাট ভারতীয় সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছিল।

বিখ্যাত জাতিতত্ত্ববিদ্ হোরন্‌লে মনে করেন যে, আর্যরা ভারতে দু'বারে প্রবেশ করেছিল। প্রথম দল এসেই ভারতের পশ্চিম সীমান্ত বা আরও একটু এগিয়ে এসে জায়গা দখল করে বসে। পরের আর্য-দল যখন এল তখন আগের দল বিপর্যস্ত হয়ে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাদেরই এক শাখা ভারতের পূর্বদিকে সরে আসে। প্রথম দল বৈদিক ও ব্রাহ্মণ সংস্কৃতির বহির্ভূত দল। এদের নাম দেওয়া হয়েছে 'আউটার আরিয়ান' (Outer Aryan)। পরের দল থেকেই বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। এদের নাম দেওয়া হয়েছে 'ইনার আরিয়ান' (Inner Aryan)। এই সভ্যতা ও সংস্কৃতি নানা পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে বর্তমান কাল অবধি এসে পৌঁছেচে। পূর্ব ভারতে যে অ-বৈদিক ও অ-ব্রাহ্মণ ধারা প্রবাহিত ছিল তার উপর উক্ত আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব এসে পড়ে, এবং ধীরে ধীরে আর্যেতর সভ্যতার ধারা ক্ষীণ হয়ে আসে।

এদেশে আর্য-সভ্যতার পত্তনের পূর্বে যারা বাস করত তারা দ্রাবিড়, কোল, মুণ্ডা, শবর, মোঙ্গলীয় প্রভৃতির গোষ্ঠীভুক্ত। শিকার করা, মৎস্য ধরা এদের জীবনধারণের প্রধান উপায় ছিল। তবে কৃষিকার্যও কিছু কিছু জানত, এদের মধ্যে দ্রাবিড় ও কোলরাই বেশী সভ্য ছিল। সমগ্র ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দ্রাবিড় জাতির দান অপরিমেয়। ভাষা, ধর্ম, আহার-বিহার, আচার-ব্যবহার, কৃষি, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দ্রাবিড় জাতির ছাপ রয়েছে। মহেন্ জো দারো, হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ দ্রাবিড় সভ্যতার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। আর্যরা ত যাযাবরের মতোই ছিল। তারা স্থিতিস্থাপনার বৈশিষ্ট্য পেল দ্রাবিড়দের কাছ থেকে। দ্রাবিড়দের

কাছ থেকে মূর্তিপূজা এলো—অনেক দ্রাবিড় দেবদেবীও আর্যসমাজে স্থান পেয়েছিল। দুর্গা, মনসা প্রভৃতি অন্‌-আর্য মাতৃকা শক্তিরই প্রতীক। সর্পপূজা দ্রাবিড়দের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। লিঙ্গপূজাও অনেকের মতে ভারতের আদি কোনো কোমের প্রচলিত রীতি বা ধর্মবোধ থেকেই দেখা দিয়েছিল।

এইভাবে আমরা দেখতে পাই যে, প্রাচীন ভারতীয় কোম বা জাতিগুলির সঙ্গে আর্যদের সংঘর্ষ ও ক্রমে মিলন সংঘটিত হয়। এই মিশ্রণের ফ[illegible] নতুন জাতি দেখা দেয়। বিশুদ্ধ বৈদিক ধর্ম থেকে ব্রাহ্মণ্য আসে। আবার পরিবর্তনের রাস্তা পেরিয়ে নানা জাতির রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, সংস্কার প্রভৃতি নিয়ে এক বিরাট ভারতীয় তথা জাতীয় সভ্যতা গড়ে ওঠে। এই স[illegible]তার মাঝেই আবার নতুন ভাব, নতুন মত, নতুন মানব ধর্মের [illegible] ঘটে। কোনো একটি বিশেষ জায়গায় এসে সভ্যতার ধারা থামে না। [illegible]কোনো সভ্যতাই থামতে পারে না।

বাঙ্‌লা ভাষার জন্ম প্রায় হাজার বছর আগে। ভারতবর্ষের প্রায় ভাষাগুলিই বাঙ্‌লা ভাষার কিছু আগে পরে উদ্ভূত হয়। আদি-ভারতীয়-আর্য ভাষা থেকে (Old Indo Aryan) মধ্যযুগের-ভারতীয়-আর্য ভাষার ধারা পেরিয়ে যে [illegible]রতীয়-আর্য ভাষা দেখা দেয়—তারই এক শাখা হচ্ছে বাঙ্‌লা ভাষা। [illegible]লা ভাষা যে একেবারে বিশুদ্ধ ধারা থেকে দেখা দিয়েছে তা নয়; [illegible]আর্যদের পূর্বে অধিষ্ঠিত দ্রাবিড় প্রভৃতি নানা গোষ্ঠীর ভাষাস[illegible]

বৈদিক যুগে [illegible] কথ্যভাষা সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ করে, সেই ‘প্রাকৃত[illegible]না জায়গায় নানাভাবে ব্যবহৃত হ’ত। শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী, মা[illegible] নানা প্রাকৃতের নিদর্শন আমরা সংস্কৃত নাটকে পেয়েছি। এই প্রা[illegible]রে পরিবর্তিত হ’য়ে অপভ্রংশ বা অবহট্‌ঠ নাম ধারণ করে। পরে তারও পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিক কালের ভাষা-রূপে দেখা দেয়। অনেকের মতে মাগধী প্রাকৃত থেকে যে মাগধী অপভ্রংশ দেখা দেয় সেই মাগধী অপভ্রংশ থেকেই বাঙ্‌লা, মৈথিলী প্রভৃতি ভাষার সৃষ্টি।

সংস্কৃত নাটকে ও কাব্যসাহিত্যে প্রাকৃতের প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্য লক্ষিত

হয়। রাজা, সেনাপতি প্রভৃতি সংস্কৃতে কথা বলেন, রাণী এবং উঁচু বংশের মেয়েরা শৌরসেনীতে কথা বলেন, গান গাওয়া হয় মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে আর নিম্নশ্রেণীর লোকেরা মাগধী ভাষা ব্যবহার করেন। বাঙ্‌লা ভাষা যে মাগধী প্রাকৃত থেকে এসেছে তা ছিল প্রাকৃতজনের ভাষা। কাজেই বাঙ্‌লা ভাষার কৌলীন্য তেমন নেই। দণ্ডীর কাব্যাদর্শে 'গৌড়ী-প্রাকৃত' বলে এক-শ্রেণীর প্রাকৃতের উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রদ্ধেয় ডাঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ সাহেবের মতে বাঙ্‌লা ভাষার সঙ্গে এর সম্পর্ক থাকাও অস্বাভাবিক নয়।

বর্তমান বাঙ্‌লার যে সংস্কৃতির রূপ আমরা দেখতে পাই তা থেকে তার প্রাচীন ইতিহাসের ধারা নির্ণয় করা একটু কষ্টকর হলেও অন্ততঃ বাঙ্‌লার জনসমাজের প্রকৃতিস্থ রূপের সঙ্গে পরিচিত হ'তে হ'তে প্রায় সপ্তম অষ্টম শতাব্দীর দিকে অর্থাৎ বৌদ্ধধর্ম অধ্যুষিত যুগে এসে দাঁড়াতে হয়। তার পূর্বে এই বাঙ্‌লা দেশের নাম বাঙ্‌লাই ছিল না। এমন কি পাল রাজাদের সময়েও সমগ্র দেশটি আজকের মতো 'বাঙ্‌লা' নামটিই পায়নি। তখন রাঢ়, সুহ্ম, গৌড়, বঙ্গ, সমতট, হরিকেল প্রভৃতি নামেই আজকের বাঙ্‌লা দেশকে বোঝাত। মুসলমানদের আমল থেকে 'বাঙ্‌লা' বলতে সমগ্র বাঙ্‌লা দেশকেই বোঝাত।

তবুও প্রাচীন দিন থেকে জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি প্রচারকদের আবির্ভাবে বাঙ্‌লার কোমগত গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ধীরে ধীরে একটা সমাজ গ'ড়ে উঠছিল। দ্রাবিড়, কোল, মুণ্ডা, হো প্রভৃতি অধ্যুষিত এইদেশে—আর্য-সংস্কৃতির প্রভাব অনেক পরে এসেছে। গুপ্ত রাজাদের পূর্বে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতি এদেশে প্রতিষ্ঠাই লাভ করতে পারেনি।

ঐতরেয় আরণ্যকে বাঙ্‌লার লোকদের 'বয়াংসি' বা পাখীর মতো কিচির-মিচির করে এমন ধরণের মানুষ বলেছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও এই দেশের বা ভূমিখণ্ডের লোকদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণে 'দস্যু' যে বলা হয়েছে তা নিয়ে কোনো সন্দেহই নেই। মহাভারত একবার বলছে 'ম্লেচ্ছ' আবার এই দেশের অধিবাসীদের ক্ষত্রিয়ও বলছে। মোটকথা, এই পূর্ব দেশের অধিবাসীদের ওপর ভারতের আর্য-দর্পী জাতির ততটা শ্রদ্ধা বা সহানুভূতি ছিল না। তার একটি কারণও আছে। বাঙ্‌লার সাধারণ সমাজ বাইরে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির চাপে পড়লেও ব্রাহ্মণ্য সংস্কারকে ব্যবহারিক জীবনে ততটা

মেনে নেয়নি। অথচ আর্য-সংস্কৃতি বাঙ্‌লাদেশে জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণদের ভেতর দিয়েই এসেছে। বাঙ্‌লার সমাজে এই আর্য-সমাজ-ব্যবস্থা প্রভৃতির প্রচলন হলেও—বাঙালী তার দৈনন্দিন জীবনে তাকে সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করেনি—আজও করে না বললে অযৌক্তিক হবে না। বাঙ্‌লাদেশের তখনকার অধিবাসীদের এই মনোভাবকে জয় করতে না পেরেই তখনকার ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রন্থে উল্লিখিত মনোভাবের প্রকাশ দেখতে পাই।

ব্রাহ্মণেরা গুপ্তরাজাদের সময় থেকে বাঙ্‌লাদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ ছাড়া ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি ত ছিলই। আর ছিল সমাজের নিম্নস্তরের শবর, ধীবর, ক্ষুদ্র শূদ্র প্রভৃতি। এই নিম্নস্তরের লোকগুলির অনেকেই স্বধর্ম পরিত্যাগ করে দিনমজুরী করে জীবিকা নির্বাহ করত। সমাজে একদল পূজা-পার্বণ নিয়ে ব্যস্ত—তাঁরা ব্রাহ্মণ। তাঁরা ধর্মের মানদণ্ড ধরে বসে আছেন। রাজা ক্ষত্রিয়—দেশ রক্ষা করছেন। একদল ব্যবসা-বাণিজ্য করে দেশের ধন-সম্বল বাড়াচ্ছেন—তাঁরা বৈশ্য। আর একশ্রেণী রইল যারা পরের জমি চাষ করে, দিনমজুরী করে কালাতিপাত করছে—তাঁরা শূদ্র। এই যে আপন আপন স্বার্থে বিভেদ দেখা দিল—তা অনেকটা রাষ্ট্রেরই খাতিরে। তবে রাষ্ট্রে ব্যবসায়ীদের আদর আজও যেমন আছে, তখনও তেমনই ছিল।

ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গার মতো বাঙ্‌লাদেশে গ্রাম-সভ্যতা ও নগর-সভ্যতা গড়ে উঠেছে। কৃষি ও অন্যান্য ক্ষুদ্র শিল্পের পীঠস্থান আমাদের গ্রামগুলি—আর নগর হচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্যের পীঠস্থান। গ্রামগুলিকে গ্রাস করল নগরগুলি। নগর-সভ্যতা যে ঐশ্বর্যপিপাসু, দরিদ্র-শ্রমভোগী নাগরিক সৃষ্টি করেছিল তারাই গ্রামগুলিকে ক্রমশঃ দুর্বল করে ফেলে। তবে রাজধানীর ও রাজসভার পরিবেশে সাহিত্য সৃষ্টির সুযোগও পাওয়া গেছে। কিন্তু বাঙ্‌লা-দেশের একটা লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এখানে কবি এসেছেন গ্রাম থেকে। প্রাচীন যুগ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বেশীর ভাগ লেখকই গ্রামের অধিবাসী। গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থাও নগরের চাইতে অনেকাংশে শোচনীয়। একদিকে ধান্যক্ষেত্রের শ্যামলিমা, অন্যদিকে একমুষ্টি অন্নের অভাবে বিপর্যস্ত গ্রামবাসী। এ তারতম্য শুধু আজকের নয়—খ্রীষ্টীয় তৃতীয়, চতুর্থ শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছে। এখন শুধু তার উদ্ধত ও স্পষ্ট প্রকাশ।

রাজা ও পুরোহিত এযুগে প্রাধান্য পেলেও সামন্ততন্ত্রই এযুগের প্রধান তন্ত্র।

এই সামন্তরাই শেষ পর্যন্ত বহুধা বিভক্ত বাঙ্‌লার প্রায় স্বাধীন রাজা হয়েছিলেন। গুপ্তরাজাদের পর পালরাজাদের যুগেও এই সামন্ত-প্রভাব আমরা দেখেছি। গুপ্তযুগের রাজা শশাঙ্কও যেমন সামন্তরাজ ছিলেন পালরাজাদের সময়েও নারায়ণ বর্মা প্রভৃতি সামন্তরাজদের খবরও পাওয়া যায়। এই সামন্ততন্ত্র প্রাধান্য লাভ করলেও এবং সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জ বা প্রজাপুঞ্জকে উপেক্ষা করলেও তাদের সম্মিলিত শক্তির কাছে বাঙ্‌লার রাজশক্তি যে হার মেনেছিল তার পরিচয় আমরা শশাঙ্কের রাজত্বের অবসানের পর মাৎস্যন্যায়ের বছরগুলিতে পাই। তখন দেখি রাজা শশাঙ্ক প্রজাপুঞ্জের মধ্যে যে অসন্তোষ সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছিলেন তার স্পষ্ট প্রকাশ ঘটে প্রকৃতিপুঞ্জের দ্বারা 'গোপাল' নামক এক সাধারণ ব্যক্তিকে রাজা বলে নির্বাচন করে নেওয়ায়। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পের মতে পালরাজারা 'দাসজীবিনঃ'। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'সাহিত্যে প্রগতি' গ্রন্থে গোপালের পূর্বে প্রকৃতিপুঞ্জের দ্বারা নির্বাচিত 'ভদ্র' নামক এক শূদ্রেরও উল্লেখ করেছেন। অবশ্যি এর পর আবার ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অভ্যুত্থান ঘটেছে এবং তারপর থেকে বিদেশাগত শক্তির বারংবার আক্রমণে বাঙ্‌লার সমাজ যে আঘাত-সংঘাত-পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে নূতনতর রূপ লাভ করেছিল তা বাঙালীর সাহিত্য ও ইতিহাস আলোচনা করে জানতে পারি।

প্রাচীন বাঙ্‌লা সাহিত্যে তৎকালীন সামাজিক চিত্র কিছু কিছু প্রকটিত হয়েছে বটে কিন্তু বেশী প্রকটিত হয়েছে তৎকালীন ধর্মমত ও ধর্মবিশ্বাস। বাঙ্‌লার সমাজে যে সব দেবদেবী পূজা পাচ্ছিলেন তাঁদের অনেকের মূর্তিপূজা গুপ্তযুগে প্রচলিত ছিল। এ ছাড়া অনেক গ্রাম্য-দেবতাও ছিলেন। সর্পপূজা, বৃক্ষপূজা, বৌদ্ধ জাঙ্গুলীদেবী, পর্ণশবরী, ষষ্ঠী প্রভৃতির পূজার প্রচলন ছিল। অনার্য দেবদেবীরা বাঙ্‌লার সমাজে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। শিব-ঠাকুরও আছেন। বিষ্ণুপূজারও উল্লেখ পাচ্ছি। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের অনুষ্ঠানও প্রচলিত ছিল। আর ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম তার আচার অনুষ্ঠান নিয়ে ত আছেই। সব দেবদেবী সর্বজনীনত্ব লাভ না করলেও জনসাধারণের মধ্যে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেতর নিম্নসমাজে তাদের প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টাও চলছিল। এই সব ধর্ম-কর্মের শাস্ত্রও তখন রচিত হচ্ছে। দেবদেবীমাহাত্ম্য নিয়ে এযুগে বাঙ্‌লাভাষা ও বাঙ্‌লা হরফে কোনো গ্রন্থ রচিত না হলেও সংস্কৃত বা প্রাচ্য প্রাকৃতে

অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এখানে যে আদিবাসী কোমরা ছিল তারাও নিজেদের দেবদেবীকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করছে। চেষ্টা শুধু এ যুগের নয়, এর পরের যুগেও চলেছে।

গুপ্তযুগে বা তার আগে বাঙ্‌লা দেশে কোন্ ভাষা ব্যবহৃত হ'ত এবং কি কি সাহিত্য রচিত হয়েছিল তার সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা দুষ্কর। বিশেষ করে এখনকার সাধারণ লোক যে ভাষায় কথা কইত তারও স্বরূপ নির্ণয় করাও দুষ্কর, তবে কথ্য ভাষা যে গৌড়-মাগধী প্রাকৃত ও অন্যান্য প্রাকৃতের মিশ্রণ-লক্ষণাক্রান্ত ছিল এরকম অনুমান অযৌক্তিক হবে না। অন্-আর্যভাষা তখন আর্য-ভাষার প্রভাবে স্বাজাত্য হারিয়েছে। কিন্তু আর্য-ভাষার ভেতর দ্রাবিড়, কোল প্রভৃতি ভাষার শব্দসম্ভার কিছু কিছু এসে গেছে। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত, গৌড়পাদ কারিকা, রোমপাদপালকাপ্য-সংলাপ বা হস্ত্যায়ুর্বেদ, বা তার পূর্বে চন্দ্রগোমী ব্যাকরণ প্রভৃতির উল্লেখ পাই। এর সবই সংস্কৃতে রচনা এবং সবগুলিই প্রায় সপ্তম শতকের মধ্যে রচিত। তবে ভামহ, দণ্ডী প্রভৃতি আলংকারিকদের উক্তি থেকে অষ্টম শতকের পূর্বে যে বাঙ্‌লাদেশে কাব্য-সাহিত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। দণ্ডী গৌড়ী-প্রাকৃতের উল্লেখ করেছেন। গুপ্তযুগের ভিতরেই গৌড়ী-রীতিতে বাঙ্‌লাদেশে কাব্য রচনা শুরু হয়েছে। কিন্তু সে কাব্য কোথায়—যার কথা বাণভট্ট তাঁর হর্ষচরিতেও ইঙ্গিত করেছেন?

বাঙ্‌লাদেশে রচিত হ'লেও বর্তমানে আমরা বাঙ্‌লা সাহিত্য বলতে যা বুঝি এগুলি তা নয়। তবে এযুগে নিশ্চয়ই সংস্কৃত ও মিশ্র প্রাকৃতজাতীয় একটি কথ্যভাষা বাঙ্‌লাদেশে চলিত ছিল—একথা মেনে নেওয়া অযৌক্তিক হবে না। গুপ্তযুগের অবসানে মাৎস্যন্যায়ের বছরগুলিতেও বাঙালীর ধ্যান-ধারণা-ভাবনার প্রকাশগত কোনো বাঙ্‌লা সাহিত্য আমরা পাচ্ছি না। তবে আর্যেতর সমাজের ধর্মকর্ম, পাল-পার্বণ এবং বিষ্ণু, শিব, মনসা প্রভৃতির পূজা এ সময়েও ঠিক একভাবে চলেছে। জৈন ও বৌদ্ধধর্ম ত আছেই। কিন্তু দেবদেবীর মাহাত্ম্য নিয়ে কোনো বাঙ্‌লা রচনা নেই। এই অরাজকতার যুগে যখন দেশের জনসাধারণ অত্যাচার থেকে মুক্তি ও শান্তির পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে তখন ধীরস্থিরভাবে বসে সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা সম্ভবও নয়। বাঙালী পালরাজারা যখন গৌড়ের সিংহাসন লাভ করেন তখন সাহিত্য-চর্চা একটা সঠিক পথ

খুঁজছিল। পালরাজাদের পূর্বে শশাঙ্কের সময় বাঙ্‌লায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাবল্য দেখা দিয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম তখন শশাঙ্কের প্রতাপে অনেকটা নির্জীব হয়ে পড়েছে। আর্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পের মতে শশাঙ্কও ব্রাহ্মণ ছিলেন। এবং তিনি যে বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন এরূপ জনশ্রুতিও আছে। হিউয়েন্‌ৎ সাং এই মত প্রকাশ করেছেন। শশাঙ্কের সময় বৌদ্ধদের অবস্থা যে বেশ শোচনীয় হয়েছিল তাও তিনি উল্লেখ করেছেন। এসময়ে ধর্মসংঘর্ষ বাঙ্‌লাদেশে দেখা দিয়েছে, আর রাজশক্তি যখন ব্রাহ্মণ্যবাদী এবং সেখানে যদি ধর্ম-সহিষ্ণুতার অভাব ঘটে তাহলে অন্যান্য ধর্ম যে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হবে তা বিচিত্র নয়।

বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্যধর্মের চাপে পড়ে একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। এই বৌদ্ধধর্ম পালরাজাদের সময় আবার মাথা তুলে দাঁড়ায়। গোপালদেব বৈষ্ণব হলেও পরের দিকের পালরাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। তারা বহু বৌদ্ধ-বিহার নির্মাণ করেন। অবশ্য পালরাজাদের ক্রিয়াকলাপে মনে হয় তারা ব্রাহ্মণ্য-বিদ্বেষী ছিলেন না। ব্রাহ্মণরাও তাদের কাছে যথেষ্ট সমাদর পেয়েছেন। তাদের সময় যে বৌদ্ধধর্ম বাঙ্‌লার সমাজে আপন গৌরব প্রতিষ্ঠিত করেছিল তার জের শুধু পঞ্চদশ শতাব্দী কেন সপ্তদশ শতাব্দী অবধি চলেছে। এমন গল্পও শুনতে পাই যে, ভগবান বিষ্ণু বুদ্ধরূপে বেদ নিন্দা করাতে কুলার্ণবতন্ত্ররচয়িতা বিষ্ণুপূজা নিষেধ করেন। দশ অবতারের মধ্যে ভগবান বুদ্ধও একজন অবতার। শ্রীচৈতন্যদেবকে বৌদ্ধদের সঙ্গে তর্ক করতে হয়। বৃন্দাবন দাস বৌদ্ধধর্মকে স্পষ্টতঃ কটাক্ষ করেছেন। আবার সপ্তদশ শতাব্দীর রামানন্দ ঘোষ নিজেকে বুদ্ধের অবতার বলে জাহির করেছেন। শশাঙ্কের সময়ের গতি-মন্থর বৌদ্ধধর্ম পালরাজাদের সময় গতিবেগ লাভ করেছিল। কিন্তু পালবংশ, চন্দ্রবংশ প্রভৃতির রাজত্বের পর আবার বৌদ্ধধর্ম দুর্বল হয়ে পড়ে। যাই হোক, এরপর থেকে ব্রাহ্মণ্য ধারা এবং বৌদ্ধ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণেতর ধারার মিশ্রণ বাঙালীর ভাবজীবন ও সমাজজীবনকে কেন্দ্র করে বাঙ্‌লার সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে নানা পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

ভারতবর্ষের প্রাচীনকাল থেকে সনাতন হিন্দুধর্ম বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম যে তার সনাতনী বৈশিষ্ট্য নিয়েই একটানা চলে এসেছে একথা ইতিহাস স্বীকার করে না। প্রাচীন পুরোহিততন্ত্রের অবসানে যে ক্ষত্রিয় যুগ দেখা দিয়েছিল সে সময়

প্রাচীন তন্ত্রের অনেক তন্ত্রধারই এই ক্ষত্রিয়তন্ত্রকে হয় স্বীকার করে তাতে মিশে গেছেন, নয়ত তার সঙ্গেই লড়াই করে তার গতিকে প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করেছেন। আবার অন্যদিকে ক্ষত্রিয়তন্ত্রের মধ্যেও এমন অনেক প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন যাঁরা প্রাচীন পথ বেয়েই চলবার চেষ্টা করেছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ পরশুরাম বা বিশ্বামিত্র প্রভৃতির গল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে। এও যেমন ঘটেছে, অন্যদিকে সমাজের নিম্নস্তরে যারা ছিল, যাদের কথা পুরানো দিনের সাহিত্যে বিশেষ ভাবে বলা হয়নি, তাদের ভেতরেও যে একটা আন্দোলন চলেছিল মহাভারতের শবরশক্তি, গোপশক্তি প্রভৃতির উল্লেখে তার আভাস পাই। আমরা রাজা শশাঙ্কের সময়ে যেমন ব্রাহ্মণ্যধারার এবং প্রাচীন ভারতীয় আর্যধারার পুনরুত্থানের চেষ্টা দেখতে পাই, তেমনি শশাঙ্কের পর মাৎস্যন্যায় শত বৎসরে প্রকৃতি-পুঞ্জের বিদ্রোহাত্মক মনোভাবেও আর্যেতর বা সমাজের নিম্নবিত্ত-সাধারণের পরিচয় পেয়েছি। পালরাজাদের সময় ব্রাহ্মণেতর ধারা সমাজে স্থান পাচ্ছে, আবার ব্রাহ্মণ্যধারাও একেবারে বিলুপ্ত নয়। বরং আপন মর্যাদা নিয়ে সেও সমাজে পূর্ব প্রতিষ্ঠা বজায় রেখেছে। কর্ণাটাগত অবাঙালী সেন-রাজাদের সময়ে ব্রাহ্মণ্যধর্ম সমাজে আবার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা পায়। সেনরাজারা ব্রাহ্মণ্যবাদী ছিলেন। কিন্তু ততদিনে বুদ্ধদেব সমাজে অবতার হিসাবে শ্রদ্ধা পাচ্ছেন। জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দে তার উল্লেখ আছে। সমাজে প্রাক্-আর্য ও অন্-আর্য কালের আচার-ব্যবহার, দেবদেবী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বিশেষ করে বাঙ্‌লাদেশে আর্যসংস্কৃতি পুরোপুরি গৃহীত হয়নি। বাঙ্‌লার সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব দেখা দিলেও ব্রাহ্মণেতর ধারাকে কখনও অস্বীকার করা হয়নি। সমাজের চূড়ায় ব্রাহ্মণেরা ছিলেন বটে, কিন্তু বৃহত্তর সমাজ বর্ণ-সংকরের দ্বারাই পরিপূর্ণ ছিল। এ ছাড়া প্রাচীন কোম-ধারার হাড়ি, ডোম, কপালী প্রভৃতি ত ছিলই। কিন্তু ব্রাহ্মণকুল রাষ্ট্রের পোষকতায় সমাজের নেতৃত্ব লাভ করেছিলেন। তখন কে জাতে বড়ো, কে ছোটো তা নির্ধারণ করবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ব্রাহ্মণসমাজের উপরই ন্যস্ত ছিল। এক সময় ব্রাহ্মণ ছাড়া আর সবাইকে 'শূদ্র' আখ্যাও দেওয়া হয়েছিল। গুপ্তযুগ থেকে 'আর্যামি'র ধারা আর অন্-আর্য ধারা—এই দুই ধারার বিরোধ খুবই স্পষ্ট ও তীব্র হয়ে ওঠে। ব্রাহ্মণ্যধারার বৌদ্ধবিদ্বেষ শশাঙ্কের সময়

তীব্র হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে লৌকিক ধারার একটা বিপ্লবী মনোভাব 'গোপালের' নির্বাচনে যে প্রকাশ পেয়েছিল তার উল্লেখ পূর্বেই আমরা করেছি। এবং পরের দিকে কৈবর্ত নায়ক দিব্য ও ক্ষৌণী নায়ক ভীম প্রভৃতির বিদ্রোহও প্রজাসাধারণের, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ্যধারা-পিষ্ট জনসাধারণের মনোভাবের প্রতীক বলেই মেনে নেওয়া যায়।

পালরাজাদের সময় যে বৌদ্ধধর্ম রাষ্ট্র-পোষকতা লাভ করেছিল। ভারতবর্ষে সেই বৌদ্ধধর্ম দেখা দিয়েছিল তখনই যখন বৈদিকধর্ম আর সাধারণের তেমন মনঃপূত হচ্ছে না। পালি ও প্রাকৃত ভাষায় জৈন ও বৌদ্ধ শাস্ত্র লেখা হচ্ছিল—সংস্কৃত ভাষায় নয়। বৌদ্ধজাতক প্রভৃতিতে সমাজের বৈদিক আভিজাত্যের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের লোকদের কথাও বলা হয়েছে। বাঙ্‌লা দেশে যে সহজিয়া বৌদ্ধমত দেখা দিয়েছিল তা বুদ্ধদেবের প্রাচীন মত বা মহাযান লক্ষণ থেকে নয়, পরবর্তীকালের বৌদ্ধমত থেকে। তাও বেশীর ভাগ আবার তান্ত্রিক প্রথা থেকে। এই বৌদ্ধমতের সঙ্গে শৈব বা শাক্ত তান্ত্রিকতার যথেষ্ট মিল আছে। বাঙ্‌লার বৌদ্ধধর্ম, শৈব ও শাক্তমতের সঙ্গে সুর মিলিয়েছিল। বৈষ্ণব সহজিয়া মতের সঙ্গেও পরবর্তীকালে এরকম মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এই বৌদ্ধমত ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবে এবং তুর্কী বিজয়ের পর বিলুপ্তপ্রায় হলেও হিন্দুধর্মের ভিতর দেবদেবী নিয়ে কিছুটা গোপনভাবে থেকে যায়। বৌদ্ধ তারা দেবী বা জাঙ্গুলী দেবী তার প্রমাণ। আবার স্ব-কৌলীন্য নিয়ে বাঙ্‌লার উত্তর ও পূর্ব এবং পূর্ব-দক্ষিণ সীমান্তেও বৌদ্ধমত আত্মরক্ষা করেছিল। বৌদ্ধধর্ম গুপ্তরাজাদের আমলে এবং তার পূর্বেও বাঙ্‌লার কোম সমাজকে আকৃষ্ট করবার জন্য তাদের নানা রকম দেবদেবী ও অলৌকিক বিশ্বাসকে গ্রহণ করেছিল। বৌদ্ধমত তন্ত্রমতের সঙ্গে যুক্ত হয়—পরে আবার অন্যান্য মতের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে নতুন রূপে দেখা দেয়। বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান প্রভৃতিতে এবং বৈষ্ণব সাধনাতেও কিছুকিছু বৌদ্ধপ্রভাব রয়েছে।

পালরাজাদের সময় বৌদ্ধলক্ষণাক্রান্ত সাহিত্যের পূর্বে বা সমসাময়িক-কালে সংস্কৃতে রচিত সাহিত্যের নিদর্শনই বেশী মেলে। এর মধ্যে অভিনন্দের রামচরিত, সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত (একই শ্লোকে শ্রীরামচন্দ্র ও রামপালের কাহিনী বর্ণিত আছে), নীতিবর্মার কীচক বধ, এবং আদি বাঙ্‌লা অক্ষরে লেখা বৌদ্ধ সংকলয়িতার কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কবীন্দ্র-

বচনসমুচ্চয় গ্রন্থে কালিদাস থেকে তখনকার বাঙালী বৌদ্ধ লেখক যথা, বুদ্ধাকর গুপ্ত, বন্দ্য তথাগত প্রভৃতি অনেকের রচনা আছে। কবীন্দ্রবচন-সমুচ্চয়কে প্রাচীন যুগের সাহিত্য-সংকলন বলা যেতে পারে। এই যুগে যে বৌদ্ধতন্ত্র ছাড়াও আর্য-সংস্কৃতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যধারাও যে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল তার প্রমাণ রামায়ণ মহাভারতের উল্লিখিত আখ্যায়িকাগুলির প্রচলন থেকে বুঝতে পারি।

পালরাজাদের সময় নাথপন্থী সিদ্ধাচার্যদের রচনা থেকে বাঙ্‌লা ভাষায় রচিত বাঙ্‌লা সাহিত্যের আদিপর্ব সূচিত হয়। এঁদেরই রাজত্বকালে নানা বৌদ্ধ পণ্ডিত ও মহাচার্যদের আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁদের মধ্যে গোপালের সময়ে শান্তি রক্ষিত এবং আনুমানিক ৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শান্তি রক্ষিতের নাম নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। পাল পর্বের বহুপূর্বে নালন্দাকে কেন্দ্র করে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির অনুশীলন চলছিল। পালরাজাদের সময় এই অনুশীলনের আরো ব্যাপক সুযোগ ঘটে। এই সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধারার গতিও অব্যাহত ছিল। এবং এই সময় থেকে শুরু করে তুর্কী আক্রমণ ও মুসলমান রাজত্বের কালের ভিতর দিয়ে, সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ জাতির উপনিবেশ স্থাপন ও সাম্রাজ্যবিস্তার এবং প্রজাশোষণের কাল বেয়ে আজ অবধি যে বাঙালী সমাজ ও বাঙ্‌লা সাহিত্য নিজ পরিচয় বহন করে চলেছে তার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলে দেখতে পাবো, ভারত ও পৃথিবীর অন্যান্য সমাজ ও সাহিত্যে যে পরিবর্তন যুগে যুগে দেখা দিয়েছে এখানেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। একদিকে ব্রাহ্মণ্য শাখা অপর দিকে বৌদ্ধ ও লৌকিক বা ব্রাহ্মণেতর শাখা—যা ব্রাহ্মণেতর এবং ভারতের আদিম অধিবাসীদের দ্বারা প্রভাবিত, এবং সমাজের নিত্য-নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিয়ত সংঘর্ষে, বার বার সাহিত্য ও সমাজ কোনো নির্দিষ্ট একটি ধারার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে নতুন নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। কখনও দেখি, দুটো বিপরীত ধারা স্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছে। আবার কখনও যখন নূতন চিন্তাধারা দেখা দিল তখন হয়ত পূর্বের চিন্তার প্রবাহবেগ হয়ে এল মন্থর, নয়ত একেবারে থেমে গেল। বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনায় আমরা তা লক্ষ্য করব। পালরাজাদের সময়কার সাহিত্য ও সমাজের বিশদ আলোচনার পূর্বে বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাসকে যদি এইভাবে

মোটামুটি ভাগ করে নিই, আমাদের আলোচনার সুবিধে হবে। যুগগুলি এই রকম দাঁড়ায়, যেমন—

১। আদিযুগ—(ক) প্রাক্-তুর্কী আক্রমণ যুগ—১২০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।
(খ) প্রাক্-চৈতন্য যুগ—১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

২। মধ্যযুগ—চৈতন্য ও চৈতন্য প্রভাবিত যুগ—১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

৩। নবাবী আমল—১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

৪। আধুনিক যুগ—(ক) ঊনবিংশ শতাব্দী (পুরানোর জের কিছু কিছু আছে)।
(খ) বিংশ শতাব্দী (যার এখনো মাঝামাঝিতে আমরা আছি)।

পাল বংশের প্রতিষ্ঠার পূর্বের সমাজ ও সেই সমাজের ধ্যানধারণা ভাবনা প্রভৃতির কিছুটা পরিচয় পেয়েছি। পূর্বেই বলেছি যে, গুপ্তযুগে বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম এবং লৌকিক ধারার অস্তিত্ব থাকলেও ব্রাহ্মণ্য ধারাই প্রবল ছিল। পাল বংশের পূর্বে বৌদ্ধদের অবস্থা যে খুবই শোচনীয় হয়ে পড়েছিল এবং বৌদ্ধ বিহারগুলি যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল তা হিউয়েন্‌ৎ সাংএর বিবরণী ও আর্যমঞ্জুশ্রী মূলকল্পতে পেয়েছি। মাৎস্যন্যায়ের বছরগুলি পেরিয়ে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পালরাজাদের সময়ে বাঙ্‌লার সমাজ ক্ষেত্রে নবযুগ সূচিত হয়। প্রকৃতিপুঞ্জ গোপালকে রাজা বলে নির্বাচিত করলেও রাজা ও সামন্তবর্গই রাষ্ট্রের প্রধানস্বরূপ ছিলেন। আর যে আমলাতন্ত্র গুপ্তআমলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল পালরাজাদের সময়ে তার আরও বিস্তৃতি ঘটে। পাল রাজাদের রাষ্ট্রগঠনপদ্ধতি সেনরাজাদের সময়েও পরিবর্তিত হয় নি।

আমরা আদিযুগের প্রথম পর্যায়ে বাঙ্‌লা সাহিত্যের যে প্রাক্-তুর্কী আক্রমণযুগের উল্লেখ করেছি তা এই পালপর্বকে কেন্দ্র করেই গ'ড়ে উঠেছিল। পালরাজাদের সময় রাষ্ট্র-ব্যবস্থা যখন সুস্থির রূপ লাভ করছে তখন সমাজও একটা স্থিরতার ভেতর গ'ড়ে উঠছে এটা অনায়াসে কল্পনা করা যায়। বাঙালীর মধ্যে এমনিতেই একটা দ্বিধা-সংশয়ের আলোড়ন আন্দোলন পূর্ব থেকেই শুরু হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি, জৈন ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি এবং লৌকিক ধারার 'টানা পোড়েনে' জাতি কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌছাতে না পেরে নানা ধর্মমতের পরীক্ষা করছে আবার নানা মতের মিশ্রণে ও

নতুন মতের প্রয়োগে নতুন মতবাদও গ'ড়ে তুলছে। বিশেষ কোনো একটি মতবাদ একান্তভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না। বরং পাল রাজাদের সময় নানা মতবাদের পরীক্ষানিরীক্ষার সুযোগ যেন আরও বেশী ঘটল। অন্ততঃ প্রথম বিগ্রহপালের রাজত্বের সময় বাঙ্‌লার জনসাধারণ আপন চিন্তাধারার, আপন মননশীলতার প্রকাশ ঘটাবার সুযোগ পেয়েছিল। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ধারার আচারব্যবহার সংস্কার প্রভৃতির আদান-প্রদান এযুগেই বেশী ঘটেছিল। এই সময় থেকেই বাঙ্‌লার বৃহত্তর সমাজের সূচনা। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধারার পরস্পর মিলনের শুভপ্রচেষ্টায় পালরাজাদের সময় একটি সুস্থ মনোভাব বাঙ্‌লার সমাজে দেখা দেয়। পালরাজারা বৌদ্ধ হলেও তাঁদের ধর্ম-সহিষ্ণুতা রাষ্ট্রকে বলিষ্ঠ রূপ দান করে। নানা ধারার মধ্যে আত্মীয়তাও স্থাপিত হয়।

আবার প্রথম বিগ্রহপালের পর থেকে পালবংশে যে ফাটল ধরে, সেই দুর্বলতার ভিতর দিয়ে—এই পালদের সময়েই কৈবর্ত বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। জনসাধারণ সেই সময় আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। তখনকার রাজশক্তিকে সামন্ত ও আমলাদের হাতে ছেড়ে-দেওয়া দেশের গণশক্তির কাছে নতি স্বীকার করতেও হচ্ছে। কৈবর্ত বিদ্রোহ তখন নিম্নতর সমাজেরই বিক্ষোভ-বহ্নির দীপ্ত প্রকাশ। সমাজের এই বৃহত্তর অংশের প্রতিনিধি হচ্ছেন কৈবর্ত-নায়ক দিব্য, ক্ষৌণী-নায়ক ভীম প্রভৃতি। যদিও বা পরের দিকে পালরাজারা আবার হৃত-রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন এবং দেব বংশ, বর্মণ বংশ প্রভৃতির কাছে অনেকটা খুইয়ে কিছুটা পেয়েও ছিলেন, তবুও প্রথম বিগ্রহপালের সময়ের ফাটল ধরার দুর্বলতা থেকে আর তাঁরা মুক্ত হতে পারেন নি। মহীপাল রামপালের মতো বিখ্যাত পালরাজাদের আবির্ভাব ঘটলেও শেষ পর্যন্ত কর্ণাটাগত সেনরাজাদের হাতে বাঙ্‌লার শাসনভার চলে আসে। সে যুগের আলোচনা পরে আসছে।

বাঙ্‌লা সাহিত্যের আদি নিদর্শন

বাঙ্‌লা সাহিত্যের আদি নিদর্শন যা কিছু পাওয়া যায় সেও এই পাল-রাজাদের সময়ে। এ যুগের বাঙ্‌লা রচনার প্রকৃষ্ট নিদর্শন মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নেপাল দরবার থেকে ১৩২৩ সালে উদ্ধার

করে আনা চর্যাপদের পুঁথিখানি। তিনি পুঁথিখানির 'হাজার বছরের পুরানো বৌদ্ধ গান ও দোহা' এই নামে নামকরণ করেন। এই পুঁথিখানিতে ছেচল্লিশটি পুরো পদ ও একটি অর্ধেক পদ পাওয়া গেছে। পদগুলি ধর্মাচার্যদের ধর্মমতের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যান। পদ রচয়িতাদের সিদ্ধাচার্য বলা হয়। এঁরা নাথপন্থী যোগী ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মমতের সঙ্গে তান্ত্রিক ও অন্যান্য মতের মিশ্রণেই এই মতের উৎপত্তি। নাথধর্ম ও কৌল ধর্ম প্রভৃতির ব্যবধান আর যাই থাক—সিদ্ধাচার্যরা সব ধর্মের দ্বারাই গুরু বলে স্বীকৃত হয়েছেন। সিদ্ধাচার্যদের মধ্যে অনেকে বৌদ্ধ মহাযান, বজ্রযান প্রভৃতি বিষয়েও পুঁথি রচনা করেছেন। সিদ্ধাচার্যদের প্রায় চুড়াশী জনের নাম জানা গেছে। তাঁদের মধ্যে মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথ বা মীনপা, কৃষ্ণাচার্যপাদ বা কানুপা, গোরক্ষনাথ, ভুসুকুপা, শবরপা, জালন্ধরীপা বা হাড়িপা, কুক্কুরীপা, বিরূ পা প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের অনেকেই সপ্তম শতকের শেষে এবং অষ্টম শতকের দিকে জীবিত ছিলেন। চর্যাপদের রচনাকাল অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ধরে নেওয়া যেতে পারে। ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বলেই ধার্য করেছেন। কিন্তু মৎস্যেন্দ্রনাথ প্রভৃতি দশম শতাব্দীর অনেক পুর্বের লোক। পুঁথিখানি হয়ত পরের দিকে সংকলিত হতে পারে। এসময়কার সরহপাদের দোহাকোষ, ডাকার্ণব প্রভৃতিতে আদি বাঙ্‌লা রচনার সামান্য কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। চর্যাপদের পুঁথিখানির আসল নাম—'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। সিদ্ধাচার্যরা যতোই পুরানো হন না কেন, পারম্পর্যের যুক্তি বিচার করে দেখলে দেখা যাবে যে চুড়াশী সিদ্ধার কেউ কেউ হয়ত চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্তও বর্তমান ছিলেন। পালরাজাদের সময় থেকে আরম্ভ করে ব্রাহ্মণ্যবাদী সেনরাজাদের সময়, এমন কি, বিদেশাগত মুসলমান রাজাদের সময়েও এঁরা হয়ত বর্তমান ছিলেন।

চর্যাপদগুলো বাঙ্‌লায় রচিত হলেও প্রাকৃত বা অপ্রভ্রংশের প্রভাব যথেষ্ট। শৌরসেনী অপভ্রংশের প্রয়োগই বেশী। শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে চর্যাপদের ভাষা প্রাচীনতম বাঙ্‌লা ভাষার আদিরূপ। চর্যাপদে এমন কতগুলি প্রবাদ প্রবচন আছে যা আজও বাঙ্‌লা সমাজে প্রচলিত। প্রত্যেক পদে অন্ত্যানুপ্রাস আছে এবং পদগুলি মাত্রাবৃত্ত পাদাকুলক ছন্দে রচিত।

পাদাকুলক ছন্দ ষোল মাত্রাবিশিষ্ট চরণের দ্বারা গঠিত। চর্যার প্রতিটি চরণ সাধারণতঃ চারটে পর্বে বিভক্ত। এই ষোল মাত্রার ছন্দ থেকেই পরে চোদ্দ অক্ষরের পয়ার ছন্দ গড়ে উঠেছিল। পদগুলি বিশেষ রাগ-রাগিণীতে গাওয়া হ'ত। অনেক রাগ-রাগিণীর নাম বর্তমানে অপ্রচলিত। চর্যার ভাষাকে বাঙ্‌লা ভাষার ভ্রূণাবস্থা বলা যেতে পারে। কয়েকটি পদাংশ উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করছি।

কাআ তরুবর পঞ্চবি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল॥
দিঢ় করিব মহাসুহ পরিমাণ।
লুই ভণই গুরু পুচ্ছিঅ জান॥

[কায়া তরুবর পাঁচটি তার ডাল ; চঞ্চল চিত্তে প্রবিষ্টে (প্রবেশ করে) কাল। দৃঢ় করে মহাসুখ পরিমাণ (পরিমাণ কর) ; লুই ভণে (বলে) গুরুকে পুছে (জিজ্ঞাসা ক'রে) জান।]

দুলি দুহি পিঠা ধরণ ন জাই।
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাই॥
আঙ্গন ঘর-পণ সুন ভো বিআতী।
কানেট চোরেঁ নিল অধরাতী॥

[দুলি (কচ্ছপ) দু'য়ে (দুইয়ে) পেটা (পাত্র) ধরানো না যায় ; বৃক্ষের তেঁতুল কুমীরে খায়। আঙন (আঙিনা) ঘর-পানে, শুন গো নারী ; আধা রাতে কানেট (কানের গয়না) চোরে নিল হরি (হরণ ক'রল)।]

তিন না চ্ছুপই হরিণা পিবই ন পাণী।
হরিণা হরিণীর ণিলয় ণ জাণী॥
হরিণী বোলঅ সুণ হরিণা তো।
এ বন চ্ছাড়ি হোহু ভান্তো॥

[তৃণ না ছোঁয় হরিণ, পিয়ে না (পান করে না) জল ; হরিণ হরিণীর নিলয় (ঘর) জানেনা। হরিণী বলে শোনো গো হরিণ ; এ বন ছেড়ে ভ্রান্ত হয়ে চ'লে যাও।]

ভব নির্বাণে পড়হ মাদলা।
মন পবন বেণি করণ্ডকশালা॥

জঅ জঅ দুন্দুহি সাদ উছলিআঁ।
কাহ্ন ডোম্বী বিবাহে চলিআ।
ডোম্বী বিবাহিআ অহারিউ জাম।
জউতুকে কিঅ আণুতু ধাম।

[ভব ও নির্বাণে হল পটহ মাদল, মন পবন দুই করণ্ডকশালা। জয় জয় দুন্দুভি শব্দে উচ্ছলিত ক'রে কাহ্ন ডোম্বীকে (ডুমনী) বিবাহ করতে চলল। ডোম্বী বিবাহ ক'রে জন্ম খোয়ায়, যৌতুকে কিন্তু করলায় (লাভ করলায়) অনুত্তর ধাম (তার থেকেই যৌতুকে তা পূরণ হয়েছে)]

চর্যার শব্দগুলির প্রকৃত অর্থ বের করা দুরূহ ব্যাপার। এগুলি হেঁয়ালির ভাবে রচিত। তাই এর ভাষাকে সন্ধ্যা বা সন্ধি ভাষাও বলে। সিদ্ধাচার্যরা সাহিত্য সৃষ্টির জন্য নিশ্চয়ই পদগুলি রচনা করেন নি। তাঁদের বা তাঁদের শিষ্যদের তত্ত্ব সাধনার ইঙ্গিত এখানে নিহিত আছে। ধর্মসাধনার তত্ত্ব বোঝাবার জন্যই এই পদগুলির রচনা। তন্ত্রকার বৌদ্ধধর্মমতের সাধনার ইঙ্গিত রয়েছে এদের মধ্যে। বাইরের অর্থে এবং অন্তর্নিহিত অর্থে পার্থক্য অনেক। চর্যাপদ রচয়িতারা নিজেদের পুরোহিতী বলে পরিচয় দিয়েছেন—কিন্তু তাঁদের আত্মিক রূপ সব-কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে। এঁরা দেহকে জগৎ বা ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিরূপ বলে মনে করতেন। চরম চিত্ত এ দেহকে আশ্রয় ক'রে স্বভাবশুদ্ধির অবস্থায় দুঃখময় পথ থেকে উত্তীর্ণ নির্বাণের পথে নিয়ে যেতে পারলেই সাধনায় সার্থকতা। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রকৃত অর্থ ছাড়াও চর্যাপদের আর একটি সাধারণ অর্থও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শবরপাদ বলেছেন—

উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী
মোরঙ্গি-পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী। ধ্রু।
উমত সবরো পাগল সবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহৌরি।
ণিঅ ঘরিণী ণামে সহজ সুন্দারী। ধ্রু।
ণানা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী সবরী এ বণ হিণ্ডই কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী। ধ্রু।
তিঅ-ধাউ খাট পড়িলা সবরো মহাসুহে সেজি ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ ণৈরামণি দারী পেহ্ম রাতি পোহাইলী। ধ্রু।

এই বৌদ্ধ সহজিয়া তন্ত্রমতের সঙ্গে শৈব নাথধর্মের একটা সম্পর্ক ছিল বলে ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মনে করেন। বজ্রযান, সহজযান কৌলধর্ম প্রভৃতির সামাজিক স্বীকৃতির সময়ে নাথধর্মও বাঙ্‌লা দেশে আপন প্রভাব কিছুদিনের জন্য বিস্তার করে। নানা কিংবদন্তীতে জড়ানো নাথ ধর্মের সময় ষষ্ঠ বা সপ্তম শতক বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই ধর্ম-মতের আদিগুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ—তাঁর শিষ্য গোরক্ষনাথ এবং গোরক্ষনাথের শিষ্য জালন্ধরীপা বা হাড়িপার সঙ্গে জড়িয়ে ময়নামতী-গোপীচন্দ্রের উপাখ্যান গড়ে উঠেছিল। পরের দিকে ময়নামতী, গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস, গোরক্ষবিজয় প্রভৃতি যে সব কাহিনীকাব্য পাচ্ছি—তার সূত্রপাতও এই দশম, একাদশ শতাব্দীর মধ্যেই। তবে প্রচলিত কাহিনী নিয়ে পূর্ণাঙ্গ রচনা আমরা পাচ্ছি অনেক পরে। ধর্মমঙ্গলের পালরাজাদের (ধর্মপাল ইত্যাদি) কাহিনীঅংশও প্রাক্-তুর্কী যুগেই হয়ত প্রচলিত ছিল।

চর্যার রচনা শুধু পালরাজাদের সময় নয়,—সেন, বর্মণরাজাদের সময়েও চলেছিল। চর্যাপদগুলি এবং সরহ ও কাহ্নুর দোহাগুলো পড়লে তখনকার নৌকাচালনা, বিবাহে যৌতুকদান, জাতবিচার প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। তখন ব্রাহ্মণ্যবাদও বেশ প্রবল হয়ে উঠেছে। আমরা জানতে পাই, যে পালবংশের শেষ রাজারা ব্রাহ্মণ্যধর্মের আশ্রয় নেন। সেন, বর্মণরা ত ব্রাহ্মণ্যবাদীই ছিলেন। চন্দ্র-বংশীয়েরা ছিলেন বৌদ্ধ। পালরাজাদের সময় থেকেই ব্রাহ্মণ্যবাদ নতুন শক্তি নিয়ে জেগে উঠেছে, তবে বৌদ্ধরাও তাঁদের ধর্মমত নিয়ে শৈবরাজাদের সময়েও বর্তমান ছিলেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে যাঁরা গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যবাদী ছিলেন না তাঁরাও পালরাজাদের রাজত্বের শেষের দিকে ও সেনরাজাদের সময় রীতিমতো ব্রাহ্মণ্যপন্থী হয়ে পড়েন। সমাজে তখন প্রধানত বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য এই দুই মতাবলম্বী লোক ছিল। এছাড়া সমাজের নিম্নস্তরে যারা ছিল তারা সম্পূর্ণভাবে আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির ছায়ার মধ্যে এসে পড়েনি। আর্যেতর ভাবধারাই এদের মধ্যে প্রবাহিত ছিল। এদিকে তান্ত্রিকরাও সমাজে অনাচরণীয় হয়ে রইলেন। যারা জাতে ছোটো তারা কখনো সমাজের ভিতরে থাকতে পারতনা। এমন কি যেখানে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় কি মাঝামাঝি রকমের জাতের লোকেরা বাস করত সেখানেও তারা থাকতে পেতনা। চর্যাপদে দেখতে পাই হাড়ি, ডোম প্রভৃতি নগরের

বাইরে বাস করত। ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করাও নিষেধ ছিল। কানুপার নিম্নোদ্ধৃত পদাংশ থেকে তার কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়—

নগর বাহিরিরে ডোম্বী তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো ব্রাহ্মণ নাড়িআ॥

[নগরের বাইরে রে ডোমনী তোর কুড়ে ঘর, ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাস তুই ব্রাহ্মণ নেড়ে।]

সমাজে তখন নানা মতের ধারা উপধারা ব'য়ে চলেছে। সবাই একটা বিশেষ কোনো ধারাকে অনুসরণ করছেন না। সমাজের অভিজাতশ্রেণী আর্য সংস্কৃতির অনুসরণ করছেন—আবার কেউ হয়ত বৈদিক আচারই অনুসরণ করছেন না—কেউবা তান্ত্রিক, কেউ সহজযান, বজ্রযান, নাথধর্ম প্রভৃতির পথ ধরে চলছেন। যে দলের জোর বেশী তারা অপরের উপর নিজের প্রভুত্ব খাটাতে চাইছে। যেখানে তা পারেনি সেখানে কল্যাণ-সমন্বয় ঘটেছে—আর যেখানে ঘটেনি সেখানে দুর্বল সবলের চাপে পড়ে ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তৎকালীন সমাজ-দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ—পরবর্তী কালের মনসা, চণ্ডী, ধর্ম প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যে প্রকাশ পেয়েছে। লৌকিক ও আর্য ধারার দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও মিলনাভাস তখনকার সমাজ ও সাহিত্যের একটা বৈশিষ্ট্যই বলা যায়।

সমাজে তখন ব্রাহ্মণ্য আদর্শের ধর্ম-কর্মের যেমন প্রচার ছিল তেমনই তার প্রতি কটাক্ষও ছিল। সরহপাদ তাঁর দোহাকোষে বলছেন,

বহ্মণো হি ম জানন্ত হি ভেউ।
এবই পড়িঅউ এ চ্চউ বেউ॥
মট্টী [পাণী] কুস লই পড়ন্ত।
ঘরহিঁ [বইসী] অগ্‌গি হুণন্তঁ॥
কজ্জে বিরহিঅ হুঅবহু হোমেঁ।
অকৃখি উহাবিঅ কুড়এঁ ধুমেঁ॥

[ব্রাহ্মণেরা ত ভেদ [পার্থক্য] জানেনা; চারিটি বেদ পড়া হয় এই ভাবেই। মাটি, জল, কুশ নিয়ে পড়ে (মন্ত্র পড়ে); ঘরে ব'সে আগুনে আহুতি দেয়। কার্য-বিরহিত (নিষ্ফল) হোমের আগুনে; চোখ দুটি কেবল ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়]

পুরানো দিনে দেশের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল বলেই আমরা একটা

ধারণা করে নিই। আমরা বলি, বাঙ্‌লার আদিপর্বে আজকের দিনের মতো এত করুণ দারিদ্র্যাবস্থা সমাজে দেখা দেয়নি। কিন্তু সেই সময়ও সমাজের নিম্নবিত্ত বা বিত্তহীনদের আর্থিক অবস্থাও যে অতি করুণ ছিল তার প্রমাণ চর্যাপদে ও সমসাময়িক অনেক সংস্কৃত রচনায় পাওয়া যায়। ঢেণঢণ পা বলছেন—

টালিতে মোর ঘর নাহি পড়িবেশী।
হাঁড়িতে ভাত নাহি নিতি আবেশী॥
বেঙ্গ সংসার বড়হিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেণ্টে সমাঅ॥

[টিলাতে মোর ঘর, নাহি প্রতিবেশী ; হাড়িতে ভাত নাই, নিত্য আবেশী (ক্ষুধার্ত)। ব্যাঙের মতো সংসার আমার বেড়েই কেবল যায় (ব্যাঙাচি বা সন্তানে বেড়ে যায়) ; দোহা দুধ আবার বাঁটে ঢুকে যায় (হাতের খাবারও হাত থেকে পালায়)]

সদুক্তিকর্ণামৃতের কবি 'বারে'র দুটি সংকলিত শ্লোকাংশ এখানে উদ্ধৃত করলে পাল-সেন পর্বের দরিদ্র জনসাধারণের দুরবস্থা যে বর্তমান দিনের চাইতে কোনো অংশে বিশেষ ভালো ছিলনা তা বেশ স্পষ্টই বোঝা যায়। এই শ্লোক দুটি ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় তাঁর বিখ্যাত 'বাঙালীর ইতিহাস' (আদিপর্ব) গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। কবি বলছেন—

বৈরাগ্যক সমুন্নতা তনুতনুঃ শীর্ণাম্বরং বিভ্রতী
ক্ষুৎক্ষামেক্ষণ কুক্ষিভিশ্চ শিশুভির্ভোক্তুং সমভ্যর্থিতা।
দীনা দুস্থকুটুম্বিনী পরিগলদ্বাষ্পাম্বুধৌতাননা—
প্যেকং তণ্ডুলমানকং দিনশতকং নেতুং সমাকাঙ্ক্ষতি॥

[বৈরাগ্যে (অভাবে) সমুন্নত দেহ তার শীর্ণ, পরিধানে জীর্ণ কাপড়, ক্ষুধায় শিশুদের চোখ কোটরে বসে গেছে, পেটও বসে গেছে, আকুল হয়ে তারা খাবার কিছু চায়, দীনা দুঃস্থা গৃহিণী চোখের জলে মুখ ভাসিয়ে প্রার্থনা করেন, এক মান তণ্ডুলে (একমুঠো অন্নে) যেন তাদের একশ' দিন কেটে যায়।]

দ্বিতীয় শ্লোকে কবি বলছেন—

চলৎকাষ্ঠং গলৎকুড্যমুত্তানতৃণসঞ্চয়ম্।
গণ্ডুপদার্থিমণ্ডুকাকীর্ণং জীর্ণং গৃহং মম॥

[কাঠের খুঁটি নড়ছে, মাটির দেয়াল গ'লে খসে পড়ছে, চালের খড় উড়ে যাচ্ছে ; কেঁচোর সন্ধানে নিরত ব্যাঙের দ্বারা আমার জীর্ণ গৃহ আকীর্ণ (ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়ের অনুবাদের সামান্য পরিবর্তনে)।]

তখনকার সমাজেও যে দারিদ্র্যের নির্মম আঘাতে এক শ্রেণীর মানুষকে কঠোর দুঃখ সহ্য করতে হ'ত, এসব উদ্ধৃতিই তার প্রমাণ।

'প্রাকৃত পৈঙ্গলে' (আনুমানিক চতুর্দশ শতক) কয়েকটি অপভ্রংশে লেখা পদ পাওয়া যায়। তার অনেকখানিই বাঙ্‌লা ঘেঁষা এবং কিছু কিছু কবিতা বাঙালীর রচনা বলেই মনে হয়। ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় 'বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস' পুস্তকে কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করেছেন। তা থেকে যুগপৎ কবির রসবোধের ও তৎকালীন সমাজ জীবনের আভাস পাওয়া যায়। যেমন—

'সো মহ কন্তা
দূর দিগন্তা।
পাউস আএ
চেউ চলাএ।'

[ডাঃ সুকুমার সেনের অনুবাদ : সেই মোর কান্ত (এখন) দূর দিগন্তে ; প্রাবৃষ আসে, চিত্ত হয় চঞ্চলিত।]

ণবি মঞ্জরি লিজ্জিঅ চুঅই গাচ্ছে
পরিফুল্লিঅ কেসু-লআ বণ আচ্ছে,
জই ইত্থি দিগন্তর জাইহ কন্তা
কিণু বম্মহ ণত্থি কি ণত্থি বসন্তা।

[নবমঞ্জরী আশ্রয় নিয়েছে চুত গাছে, কিংশুক-লতাবন হয়েছে প্রফুল্ল ; যদি এতেও, হে কান্ত, তুমি দিগন্তর যাও, তবে কি মন্মথ নেই, বসন্ত নেই ?]

সের এক্ক জই পাঅই ঘিত্তা
মণ্ডা বীস পকাইল ণিত্তা।
টক্ক এক্ক জই সিন্ধব পাআ
জো হউ রঙ্ক—সো হউ রাআ।

[ডাঃ সুকুমার সেনের অনুবাদ : একসের ঘী যদি পাওয়া যায় তবে নিত্য বিশটা মণ্ডা পাকানো যায় ; যদি একটুকু সৈন্ধব পাওয়া যায় তবে হোক সে নিঃস্ব তবুও সে রাজা।]

ওগ্‌গর ভত্তা
রম্ভঅ পত্তা।
গাইক ঘিত্তা
দুদ্ধ সজুক্তা।
মোইলি মচ্ছা
নালিচ গচ্ছা।
দিজ্জই কন্তা
খাই পুণবন্তা।

[ওগরা ভাত, কলাপাতা, গাওয়া ঘী, জুতসই দুধ, মৌরলা মাছ, নালিতা (পাট) শাক,—কান্তা দেয় আর পুণ্যবান খায়।]

উল্লিখিত পদগুলির ছন্দ লক্ষ্য করবার বিষয়। এই পদাংশগুলিতে বাঙালী মনের সুকোমলতা ও অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার সুন্দর প্রকাশ দেখতে পাই।

ইতিহাসের কথা

গোপাল থেকে যে পালবংশের প্রতিষ্ঠা সে বংশের মেয়াদ প্রায় চারশ বছর। আমরা পুর্বেই বলেছি যে প্রথম বিগ্রহপাল থেকে পালবংশের একটু একটু করে ভাঙন ধরে। তার পর থেকে অর্থাৎ নারায়ণ পাল, রাজ্যপাল প্রভৃতির সময় পালবংশ বেশ দুর্বল হয়ে পড়ে। যশোবর্মার আক্রমণ, কম্বোজ বংশের আধিপত্য, হরিকেল অঞ্চলে (চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চল) বৌদ্ধ দেব রাজ-বংশের আবির্ভাবে পালরাজ্যের অনেকাংশই এদের হাতে চলে যায়। প্রথম মহীপালের সময় আবার কিছুটা হৃতগৌরব উদ্ধার হয়। কিন্তু তার পর থেকেই আবার পতন শুরু হয়। সেন ও বর্মণ রাজবংশের আবির্ভাব ঘটে। এবং পালবংশের অধীন সামন্তরা এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র রাজারাও নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। এদিকে নিজেদের মধ্যেও তখন নানা গণ্ডগোল শুরু হয়। পালবংশের শেষ দিকে যে অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়, সেই সুযোগে দ্বিতীয় মহীপালের সময় দিব্যের অধিনায়কত্বে কৈবর্ত বিদ্রোহ সূচিত হয়। রামপালের হাতে দিব্য এবং রুদোক পরাজিত না হলেও ক্ষৌণীনায়ক ভীম পরাজিত হন। কিন্তু তারপর থেকে পালবংশ প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এবং পালবংশের পতনের পর সেনবংশের রাজত্ব শুরু হয়। বর্মণবংশ আগেই

পূর্ব বঙ্গে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পালরাজাদের সময় এই রাষ্ট্রবিশৃঙ্খলার ভেতর ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণেতর ধারার গতিবেগ একেবারে মন্থর হয়ে যায়নি। কিন্তু লৌকিক ভাষায় সাহিত্য রচনার নিদর্শন বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। চর্যাপদের রচনা পালরাজাদের সময় থেকে আরম্ভ ক'রে সেনরাজাদের সময় অবধি চলেছে। তবে নাথধর্ম তাড়াতাড়ি বিলুপ্ত হওয়াতে এবং সিদ্ধাচার্যদের ধ্যানধারণার গতি বন্ধ হয়ে যাওয়াতে চর্যারও কোন রূপান্তর ঘটেনি। পরের যুগে এ সাধনার প্রচলন না থাকায় চর্যাচর্যবিনিশ্চয় ও দোহাকোষেই এর ভাব ও ভাষা প্রথম ও শেষ রূপ লাভ করেছে। তবে একথা ঠিক যে, পালরাজাদের সময়েই সর্বপ্রথম বাঙালী জাতি ও তার সমাজের গোড়া পত্তন শুরু হয়েছে। তার পূর্বে গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগে বাঙালী ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে আপন অধিকার, আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারেনি, যদিও শশাঙ্কের সময় তার একটা চেষ্টা লক্ষিত হয়। পালরাজাদের সময় যে রাষ্ট্র গঠিত হ'ল—যে সমাজ ব্যবস্থা গ'ড়ে উঠল পরবর্তী সেনরাজাদের সময়ও তার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি। পালরাজাদের সময় ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর সংস্কৃতির একটা সমন্বয় ঘটেছিল। উভয় ধারার সংস্কার, আদর্শ ও দেব দেবী মিলে ভবিষ্যত বাঙ্‌লা সমাজ ও সাহিত্যের পথ সুগম করে তুলেছিল। সেন-আমলে যদিও বা তার স্পষ্ট কোনো আভাস পাইনে তবুও চতুর্দশ শতাব্দী থেকে সাহিত্যের ভেতর দিয়ে তখনকার সমাজের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। সেন-আমলে জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দে স্পষ্টত 'বুদ্ধদেবের' অবতার হিসাবে স্তুতি বন্দনা আছে। এদিকে সমাজের ব্রাহ্মণেতর ধারায় যে একটা বিক্ষোভ জেগে উঠেছিল তা যেমন কৈবর্ত বিদ্রোহে কিছুটা দেখা দিয়েছে আবার ধর্মমঙ্গলে ঢেকুরের ইছাই ঘোষ প্রভৃতির বিদ্রোহেও তখনকার আর্যেতর ধারার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।

পালরাজাদের পর সেনরাজারা বাঙ্‌লার সিংহাসন অধিকার করেন। সেনবংশের রাজত্বকাল একাদশ শতাব্দী থেকে প্রায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত। অবশ্যি এর মধ্যেই তুর্কী আক্রমণ ঘটেছে। কিন্তু তার পূর্বে প্রাক্-তুর্কী আক্রমণ যুগের বাঙ্‌লার সমাজের আরও কিছুটা পরিচয় জানা প্রয়োজন।

তুর্কী আক্রমণের পূর্বে বাঙ্‌লায় যে সব দেব-দেবীর পুজা এবং যে সব আচার সংস্কার প্রভৃতি ছিল বলে জানি তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে চণ্ডী, কালী,

শিব, মনসা প্রভৃতির পূজা। ধর্মমঙ্গলে যে ধর্মঠাকুরকে পাই তিনিও এসময় পূজিত হতেন। এঁরা সম্ভবত বাঙ্‌লার আদিবাসীদের দেবতা। চড়ক পূজাও তাই। ধর্মঠাকুরের পূজা উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত ছিলনা। পরের দিকে অন্যান্য দেব-দেবীর মতো তাঁকেও জাতে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছে। বৌদ্ধ জাঙ্গুলী, তারা প্রভৃতির কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বর্তমানে আমরা যে সব বারব্রত প্রভৃতি দেখতে পাই তার অধিকাংশই ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির বহির্ভূত এবং প্রাচীন সময়েই প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণরা এসব ব্রত হয়ত পছন্দ করতেন না। তবুও এসময় নানা ধারার বিরোধ-মিলনে এসব অনুষ্ঠান বাঙালী সমাজে ধীরে ধীরে স্বীকৃত হচ্ছিল। এবং এসব অনুষ্ঠান-মাহাত্ম্যও হয়ত তৎকালীন বাঙ্‌লা ভাষায় রচিত ছিল। সংস্কৃত ভাষায় ত আগে থেকেই রচিত ছিলই। এ ছাড়া বাঙ্‌লায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের পাশাপাশি শাক্ত, শৈব, সৌর ধর্মমতও দেখা দিয়েছিল। ধর্ম আর সূর্য পরের দিকে যেন এক হয়ে গেছেন। বাঙ্‌লায় আর একটি যে প্রধান ধারা বর্তমান ছিল তা হচ্ছে বৌদ্ধধর্মের ধারা। বৌদ্ধধর্ম গুপ্তআমলের পূর্বে বাঙ্‌লা দেশে কিছু কিছু ছড়িয়ে ছিল। এসব বিভিন্ন ধর্মবোধের সংঘর্ষ ও মিলনে পরের দিকে বাঙালীর ব্যাপকতর ধর্মবোধ জেগে ওঠে—যা পরের দিকে নানাভাবে নানা মঙ্গলকাব্যে দেখা দিয়েছে। ধর্মমতের সংঘর্ষের পাশাপাশি বড়ো-ছোটোর সংঘর্ষও ছিল। বড়োর ধর্মমত আর ছোটোর ধর্মবিশ্বাসের দ্বন্দ্বের মধ্যেও, ব্রাহ্মণ্যভাবপুষ্ট অভিজাত সম্প্রদায়ের সমাজের দরিদ্র বিত্তহীন নিম্নস্তরের সাধারণ মানুষের সংস্কার আচার বিচারকে একেবারে মুছে দেবার চেষ্টাও যে ছিলনা তা নয়। হয়ত একেবারে অস্বীকার করতে না পেরে তাদের কিছু কিছু স্বীকার করতে হয়েছিল। পাল রাজারা ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ উভয়কেই সমানভাবে দেখতেন। এবং তাঁদের সময় প্রথমদিকে দেশে যখন কিছুটা শান্তি বিরাজ করছিল, তখন সংস্কৃতিরও কিছুটা উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। নানা ধর্মমত, নানা চিন্তা ধারণা তখন প্রকাশ পাচ্ছিল। সাহিত্যেও যা কিছু দেখা দিয়েছিল তার বেশীর ভাগই সংস্কৃতে রচনা। বাঙ্‌লা ভাষায় কি কিছুই রচিত হয়নি? ইতিহাস এখানে নীরব। সেনরাজাদের সময় যখন ব্রাহ্মণ্যবাদীরা মাথা নাড়া দিয়ে ওঠে তখন পালদের সময়কার লৌকিক সংস্কার-সংস্কৃতির বা লৌকিক ধর্মপ্রকাশের বাহন সাহিত্যকে তারা সহানুভূতির চোখে

দেখেনি বলেই কি তখনকার বহু সাহিত্যসৃষ্টিই অবলুপ্ত হয়ে যায়? অথবা তুর্কী আক্রমণের সময় যে সব মন্দির, সংঘ, বিহার প্রভৃতি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয় তাতেই কি সে সময়ের বাঙ্‌লা সাহিত্য বিনষ্ট হয়ে যায়? এমনও শুনেছি যে, ভারতবর্ষে যখন রাজায় রাজায় যুদ্ধ চলছে তখন গ্রামবাসী আপন শান্তি নিয়ে দিন যাপন করেছে। রাষ্ট্রনৈতিক আলোড়ন গ্রামকে স্পর্শও করেনি। কিন্তু বখ্‌ৎ-ইয়ারের আক্রমণ বা তারপরের মুসলমান শক্তির বাঙ্‌লা অভিযান গ্রামের শান্তিও অটুট থাকতে দেয়নি। তখন যেমন অনেক দেব-দেবীর মূর্তি হয় ভূমিগর্ভে নয়ত জলের নীচে লুকিয়ে রেখেছিল তেমনই করে সাহিত্যসম্ভারও কি বাঁচাবার চেষ্টা চলেছিল? চেষ্টা যে চলেছিল তার একটা প্রমাণ—চর্যাচর্যবিনিশ্চয় প্রভৃতির নেপাল থেকে আবিষ্কার। কিন্তু অন্যান্য নিদর্শন আর হয়ত পাওয়া যাবেনা—কিংবা এখনও হয়ত অনুসন্ধানী মনের প্রতীক্ষায় কোন্ বিস্মৃতির অন্ধকারে ঘুমিয়ে আছে!

ডাঃ সুকুমার সেন চর্যার সমসাময়িক মানসোল্লাস বা অভিলাষার্থচিন্তামণির 'গীত বিনোদ' নামক একটি অংশে কিছুটা বাঙ্‌লা রচনার নিদর্শন পাওয়া যায় বলে উল্লেখ করেছেন। এই রচনার কাল প্রায় ১১২৯-৩০ খ্রীষ্টাব্দ (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস—১ম খণ্ড, ডাঃ সুকুমার সেন)। তবে মহারাষ্ট্র দেশে এই বাঙ্‌লা রচনার বেশ কিছুটা বিকৃতি ঘটেছে বলেও তিনি মত প্রকাশ করেছেন।

পালরাজত্বের অবসানের সময় অর্থাৎ প্রায় দ্বিতীয় মহীপালের সময় কর্ণাটাগত সেনরাজারা বাঙ্‌লার কিছু অংশ দখল করেন। তার পর দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি (১১৫০ থেকে—) বিজয় সেন সেনরাজত্বের ভিত্তি পাকাপোক্ত ক'রে তোলেন। রাঢ়ের সামন্তদের পরাজিত ক'রে বর্মণদের হাত থেকে পূর্ববঙ্গ দখল ক'রে নেন। পালরাজাদের হাত থেকে উত্তরবঙ্গও চ'লে আসে। বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেনের সময় বঙ্গ, রাঢ়, বরেন্দ্র, মিথিলা প্রভৃতি সেনরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গৌড় প্রভৃতি লক্ষ্মণ সেনের সময় সেনরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু পালরাজত্বের মতো তাঁর রাজত্বের সময়েও সামন্ততন্ত্র মাথা নাড়া দিয়ে ওঠে। আর নানা দিকে সামন্ত নৃপতিরা স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এবং তার ফলে রাজ্যের ভিতরেও দুর্বলতা দেখা দেয়। এমনিতে বার বার মুসলমান আক্রমণ তখন ভারতের বিভিন্ন রাজশক্তিকে

দুর্বল করে তুলেছিল। দিল্লীর মসনদে তখন কুতুব-উদ্-দীন্ বিরাজমান। ভারতের বিচ্ছিন্ন রাজতন্ত্র এই প্রচণ্ড মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেনি। বাঙ্‌লা দেশেও যখন ঐক্যাভাব ঘটল, তখন বহিঃআক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি আর কারও রইল না।

এদিকে সেনরাজাদের সময়ে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি প্রবল ভাব ধারণ করায় বাঙ্‌লা ভাষায় লেখার প্রচলন অন্তত অভিজাত সমাজে বন্ধ হ'ল। সংস্কৃত এসে সংস্কৃতির স্থান জুড়ে বসল। একটা অভিজাত্য এসে যেন সংস্কৃতির ব্যাপকতর ক্ষেত্রের ওপর সীমারেখা টেনে দিল। কিন্তু লৌকিক সুর একেবারে মিলিয়ে যায়নি। শরণ, জয়দেব প্রভৃতি সাহিত্যে নতুন সুর জুড়ে দিলেন। সংস্কৃত ভাষায় লেখা তখনকার 'ফ্যাসান' ছিল। প্রাকৃত জনের ভাষায় লেখা অশিষ্ট বলেই গণ্য করা হ'ত। ব্রাহ্মণরা প্রত্যক্ষভাবে লৌকিক ধারার বিরোধিতা করতেন। বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্যবাদীদের কাছে কোনো সহানুভূতি পেত না। ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য আদর্শে তখন সমাজও সহজ গতিবেগ লাভ করতে পারছে না। আবার লক্ষ্মণসেনের আমল থেকে জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ ও জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাস সমাজের উচ্চস্তরের লোকদের একটা পেশা হয়ে দাঁড়াল। রাষ্ট্রের ওপরও জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রাধান্য প্রবল ছিল। সেন রাজাদের সময় সামন্ততন্ত্র ত ছিলই, উপরন্তু পৌরোহিত্য প্রভাবও প্রবলভাবে দেখা দিয়েছিল। ব্রাহ্মণের এই নিরঙ্কুশ ক্ষমতা এবং কৌলীন্যের প্রবর্তনে সংকীর্ণ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির ভেতর দিয়ে শুধু ধনী দরিদ্রের ব্যবধান নয়, উঁচু জাত নীচু জাতের পার্থক্যও স্পষ্টভাবে দেখা দিল। ফলে পূর্বের শিল্পী ব্যবসায়ীরা সমাজের নিম্নস্তরে নেমে গেলেন। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব রইল রাজা ও ব্রাহ্মণের হাতে।

অন্যদিকে রাষ্ট্র ও সামাজিক ক্ষেত্রে যে সংকীর্ণতা দেখা দিয়েছিল, তার ভেতর দিয়ে সমাজের উচ্চস্তরের লোকেরা পাচ্ছিল প্রচুর সুযোগ-সুবিধা আর অন্যেরা প্রচুর অসুবিধা ভোগ করছিল। উচ্চ বর্ণ ও শ্রেণীর সুখসন্ধান ক্রমশ বিকৃতির পথ বেয়ে চলেছিল। তখন নৈতিক আদর্শও বিশেষ উন্নত ছিল না। অন্তত সেই সময় যেসব সংস্কৃত কাব্য রচিত হয়েছে তাতে এই সাক্ষ্যই দেয়। এই বিকৃতিও সমাজের শৈথিল্যের এবং অধোগতির একটি প্রধান কারণ।

এই যে আমাদের সমাজের বিকৃতি, বর্ণ ও শ্রেণীগত সংকীর্ণতা, ধর্ম-

অসহিষ্ণুতা, নানা রকম আচার কুসংস্কার প্রভৃতির ভারে পঙ্গুসমাজ, আত্ম-বিশ্বাস-হারানো বাঙালী, এবং প্রবল মুসলমান শক্তি ও ভেদবুদ্ধি দ্বারা আচ্ছন্ন দ্বিধা-বিভক্ত বাঙ্‌লার রাষ্ট্র—তাতে বখ্‌ৎ-ইয়ারের বাঙ্‌লা জয় এবং সেন-রাজত্বের পতন এমন কিছু বিচিত্র নয় এবং পৃথিবীর প্রায় সব জাতিরই অধোগতির এগুলি অনিবার্য কারণ। এর সঙ্গে অর্থনৈতিক কারণ ত আছেই।

২

তুর্কী আক্রমণ

এইসব দুর্বলতার ভেতর দিয়েই বখ্‌ৎ-ইয়ারের বাঙ্‌লা আক্রমণ সূচিত হল ১২০০-১২০১ খ্রীষ্টাব্দের দিকে। অষ্টাদশ অশ্বারোহীর কথা আত্মমর্যাদায় আঘাত করলেও সামান্য কয়েকজন ঘোড়সওয়ার নিয়েই তিনি নবদ্বীপে প্রবেশ করেছিলেন। অবশ্যি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বখ্‌ৎ-ইয়ারের অনুগত আরও একদল তুর্কীসেনা নবদ্বীপে এসে উপস্থিত হয়। তখন দুপুর বেলা। মহারাজ লক্ষ্মণ সেন খেতে বসেছিলেন। বখ্‌ৎ-ইয়ারকে প্রতিরোধ করার কোনো উপায় না দেখে তিনি নগ্নপদে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যান। এবং এই সময় থেকেই বাঙ্‌লার সমাজ ও ইতিহাসের মোড় ঘুরে গেল। এর পর থেকে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ অবধি ভালো মন্দ মাঝারি মুসলমান রাজার রাজত্বের ভেতর দিয়ে বাঙ্‌লার সমাজ ও সাহিত্য সুখেদুঃখে এগিয়ে গেছে।

তুর্কীরা শুধু দেশ জয় আর লোকহত্যা করেই ক্ষান্ত ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে বহু বাঙালীকে নিজের ধর্মে ধর্মান্তরিত করে নিয়েছিল, আবার অনেক মন্দির ও বৌদ্ধ বিহারও ধ্বংস করেছিল। হিন্দুদের চাইতে বৌদ্ধদের ক্ষতিই বেশী হয়েছিল। ঐতিহাসিক মিনহাজ বলেছেন, বৌদ্ধদের হত্যা করা হয় সত্য, কিন্তু তাদের সৈন্য বলে ভুল করে। (দ্রঃ শূন্যপুরাণের ভূমিকা—ডাঃ শহীদুল্লাহ্‌)। একদিকে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অত্যাচার অন্যদিকে তুর্কী আক্রমণের প্রচণ্ড ঢেউ বৌদ্ধদের বিলুপ্তপ্রায় করে ফেলল। অন্যদিকে বাঙ্‌লাদেশে এমনিতে আর্য ও আর্যেতর ধারার যে বিরোধিতা ছিল—যা বহু মিলনের ভেতর দিয়েও

আর্য মনোধর্ম ও আর্যেতর প্রাণধর্মের স্বাতন্ত্র্য ঘোচাতে পারেনি—এবং ফলে যে ব্যবধান সৃষ্ট হয় সেই ব্যবধানও তুর্কীদের অতর্কিত আক্রমণের সাফল্যের ইন্ধন জোগায়। এই বড়ো ছোটো দুধারার পার্থক্য যে রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় প্রভৃতি নানা উপপ্লবের সৃষ্টি করেছিল, তার জন্য তুর্কী আক্রমণ পর্যন্ত বাঙালী কোনো সংহতি লাভ করতে পারেনি—সংশয়ও তাদের ঘোচেনি। গোড়া থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত এবং তারপর তুর্কী আক্রমণে বিধ্বস্ত বাঙ্‌লার চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত কেবল নিষ্ফলতা ব্যর্থতাই বাঙালীর একমাত্র মূলধন। তবে তুর্কী আক্রমণ এবং পরের দিকের মুসলমান রাজত্বকাল বাঙালীকে ঐক্যবদ্ধ হবার সুযোগ দিয়েছিল, তাকে সচেতন করে তুলেছিল। অবশ্যি তখন বিজেতা সম্বন্ধে ভীতি ও কৌতূহলজনিত অসম্ভব কল্পনাপ্রয়োগ তখনকার রচনার রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। নিজেদের দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনাপ্রসঙ্গে বিজেতা বা তার ধর্মকে বড়ো করে দেখবার প্রচেষ্টাও দেখতে পাই। কোথাও বা আবার বিজেতা ও বিজিতের ধর্মের শক্তিসাম্য প্রমাণ করার চেষ্টাও দেখতে পেয়েছি। রায়মঙ্গল প্রভৃতি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

তুর্কী আক্রমণে যে সেনবংশ বিপর্যস্ত হ'ল তার আগেপরে বাঙ্‌লার সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ ও তার ক্রমঅধোগতির রূপ পূর্বেই নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছি। এ সময় পৌরাণিক আচার সংস্কার ও বৈদিক সংস্কৃতির বিস্তারের চেষ্টা চলছিল। লৌকিক ধারার বিরুদ্ধতা এ যুগের একটি বিশেষ লক্ষণ। বৌদ্ধধর্মের প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধতা থাকলেও তখন বুদ্ধদেব সমাজে অবতার হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন।

এ যুগের সাহিত্য

সাহিত্য যা রচিত বা সংকলিত হয়েছে তার বেশীর ভাগই সংস্কৃতে। প্রাকৃত বা অপভ্রংশে কিছু কিছু কবিতাও পাওয়া যায়। যাঁরা সংস্কৃতে দর্শন প্রভৃতি নানা শাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করছিলেন তাঁদের মধ্যে হলায়ুধ, পুরষোত্তমদেব প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। বন্দ্যঘটীয় সর্বানন্দের অমর কোষের টীকা-সর্বস্বও এসময়কার একখানি উল্লেখযোগ্য রচনা। এই পুস্তকে অনেক বাঙ্‌লা শব্দও পাওয়া যায়। পুস্তকখানির পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে দক্ষিণ ভারতে।

নৈষধচরিত রচয়িতা শ্রীহর্ষকেও অনেকে বাঙালী বলে মনে করেন। কবিদের মধ্যে শরণ, পবনদূত রচয়িতা ধোয়ী, উমাপতি ধর, আর্যাসপ্তশতী রচয়িতা গোবর্ধন আচার্য, কবি জয়দেব বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। জয়দেবের কাব্য সংস্কৃতে রচিত হলেও তার মধ্যে যে ছন্দ ও ভাবগতি লক্ষ্য করি তা একান্তভাবে বাঙ্‌লার লৌকিক প্রাণধর্মের অনুকূল। জয়দেবের শ্রীগীত-গোবিন্দ রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কাব্য। রাধাকৃষ্ণের প্রেম কাহিনী সেন-যুগেও বহুল প্রচলিত ছিল। সেন-আমলের ভাঙনের যুগধর্মানুযায়ী কামনা-বাসনা-বহুল রচনা হলেও শ্রীগীতগোবিন্দে যে স্বতঃস্ফূর্ত কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাই তাতে জয়দেবের কবি-প্রতিভা নিঃসন্দেহে উচ্চ আসন লাভ করে। আবার পরবর্তী-কালে বৈষ্ণব সাহিত্য ও ধর্মকে এই কাব্য যখন অনুপ্রাণিত করে তখন বৈষ্ণব মহাজনরা এই কাব্যের ভেতর থেকে নূতন তত্ত্বরস লাভ করেন। এবং তখন থেকে বৈষ্ণব সমাজে জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ ধর্মগ্রন্থ হিসাবে গৃহীত হয়। সারা ভারতে জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ যেভাবে জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছিল আর কোনো কাব্যের পক্ষে ততখানি সৌভাগ্য ঘটেনি।

জয়দেবের কাব্যে আমরা যে বুদ্ধ-ভক্তি ও প্রীতির নিদর্শন পাই তা নিশ্চয়ই সে যুগের উদারদৃষ্টিসম্পন্ন এক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনোভাব বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। দশাবতার স্তোত্রে জয়দেব বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্যে পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে বলেছেন—

নিন্দসি যজ্ঞ বিধেরহহ শ্রুতিজাতম্‌
সদয় হৃদয় দর্শিত পশুঘাতম্‌
কেশব ধৃত বুদ্ধ শরীর
জয় জগদীশ হরে!

আবার তখনকার অভিজাত সমাজে রুচিবোধ কি রকম ছিল এই কাব্যে এবং ধোয়ীর পবনদূত কাব্যেও তার দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। তাতে সমাজের ঘনিয়ে-আসা ক্লান্ত দিনের ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। কিন্তু রাজা ও রাজসভা যখন এই রুচিবোধের অনুকূলে তখন জাতির এই অনিবার্য অধোগতির সন্ধিক্ষণে কোনো প্রতিরোধ গ'ড়ে তোলা তখনকার সমাজের অন্য কোনো সচেতন মতবাদীদের পক্ষে হয়ত সম্ভব হয়নি।

জয়দেবের পর আর তেমন কোনো কবির উল্লেখ আমরা এযুগে পাইনে।

বিরুদ্ধে একদিকে বাঙালী অন্যদিকে আহোমরা দাঁড়িয়েছিল। এই থেকে ইলিয়াশ শাহী আমলের পূর্ব পর্যন্ত মুসলমান সুলতানদের গৃহদ্বন্দ্ব এবং ঘন ঘন যুদ্ধ প্রভৃতিতে বাঙ্‌লার বুকে একটানা নিরবচ্ছিন্ন শান্তি দেখা দিতে পারেনি। তখন বাঙ্‌লার সমাজে ছোটো বড়ো সবাই একটা অজানা আশংকার মধ্যে প্রতিটি দিন কাটাচ্ছিল। বিশেষ করে এসময় এদেশের হিন্দুরা ইস্‌লাম রাষ্ট্রের অধীনে থেকে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছিল। বাঙ্‌লা দেশের অধিবাসীদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের দুটি কাল সাধারণত নির্ণয় করা হয়। প্রথমটি যখন জোর ক'রে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করানো হচ্ছে—আর দ্বিতীয়টি যখন সুফিবাদী দরবেশ বাউল আউলিয়ারা বৈষ্ণব প্রেমধর্মের মতো হৃদয়স্পর্শী করে ইস্‌লামধর্ম গ্রহণ করাচ্ছেন। শেষের কালটি ইলিয়াশ শাহী আমলের অব্যবহিতপূর্ব থেকেই শুরু হয়েছে বলে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে।

কিন্তু সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াশ শাহ্‌ থেকে হোসেন শাহের পূর্ব পর্যন্ত মুসলমান রাজত্বকালে অর্থাৎ চতুর্দশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বাঙ্‌লার সমাজ ও সাহিত্য একদিকে নতুন রূপ গ্রহণ করছিল অন্যদিকে বাঙ্‌লার বুকে আপন প্রতিষ্ঠাও পাকা করে নিচ্ছিল। শামসুদ্দিন ইলিয়াশ শাহের সময় সারা উত্তর ভারতে মুহম্মদ বিন্‌ তুঘলকের খেয়াল খুসির রাজত্ব চলেছে। তার ধাক্কা বাঙ্‌লা দেশেও এসে পড়েছিল। ইলিয়াশ শাহী ধারার প্রথম দিকে নানা যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটেছিল। এসময় বাঙ্‌লার ধর্ম ও সংস্কৃতির ওপরও আঘাত করা হয়েছে। শামসুদ্দিনের পুত্র সিকান্দার শাহের সময় অনেক বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দির প্রভৃতি মসজিদ নির্মাণের জন্য ভাঙা হয়। সে সময় বাঙ্‌লার হিন্দু, বৌদ্ধ ও নিম্নবর্ণের সমাজের মানুষ আপন সংস্কৃতির স্বাক্ষর রাখার উদ্বেগ-আশংকাহীন কোনো মুহূর্ত পায়নি।

তুর্কী আক্রমণের প্রচণ্ডতা তখনকার যুগের মানুষের মনে কি ভীতি ও বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল, তার একটি প্রমাণ পাই শূণ্যপুরাণের 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' নামক কাব্যাংশে। তা'তে দেখানো হচ্ছে যে বৌদ্ধদের প্রতি ব্রাহ্মণেরা অত্যাচার করাতে দেবতারা মুসলমান রূপে এসে হিন্দুদের মন্দির প্রভৃতি ধ্বংস করছেন। লেখক বলছেন—

বেদ করি উচ্চারণ বের‍্যায় অগ্নি ঘনে ঘন
দেখিয়া সভাই কম্পমান,

মনেতে পাইয়া মর্ম সভে বোলে রাখ ধর্ম
তোমা বিনে কে করে পরিত্রাণ।
এইরূপে দ্বিজগণ করে সৃষ্টি সংহরণ
এ বড় হইল অবিচার,
অন্তরে জানিয়া মর্ম কৈলাস তেজিয়া ধর্ম
মায়ারূপী হৈল খোন্দকার।

....

নিরঞ্জন নিরাকার হৈল ভেস্ত অবতার
মুখেতে বলয়ে দম্বদার,
যতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন
আনন্দেতে পরিল ইজার।

....

দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়্যা ফিড়্যা খায় রঙ্গে
পাখড় পাখড় বোলে বোল,
সেবিয়া ধর্মের পায় পণ্ডিত রামাঞি গায়
এ বড় বিষম গণ্ডগোল॥

এই কাব্যাংশে তুর্কী-আক্রমণ ও ধ্বংসলীলারই ইঙ্গিত করা হয়েছে। ধর্মের 'দেউল দেহারা' তাদের হাতে বিধ্বস্ত হচ্ছে। এই দুর্যোগের ক্ষণে নিজেদের ঘর সামলানও দায় হয়ে উঠেছে। অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধরা তখন বাঙ্‌লা দেশ ছেড়ে নেপালে আশ্রয় নিয়েছিলেন—এমনকি, কামরূপ প্রভৃতি অঞ্চলেও আশ্রয় নিয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গে সেন, বর্মণ প্রভৃতি রাজারা তুর্কী-আক্রমণ ও বিজয়ের পরও সেখানে নিজেদের রাজত্ব বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু সর্বদা সশঙ্কিত জাতির জীবনে সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকাশের পথ তখন রুদ্ধ বললেই চলে।

বিদ্যাপতি তাঁর "কীর্তিলতা"য় হিন্দু-মুসলমানের মিলনকে যেমন কামনা করেছেন, তেমনই হিন্দুদের উপর তুর্কদের অত্যাচারের কাহিনীও বর্ণনা করেছেন। তিনি বলছেন—

হিন্দু তুরুকে মিলল বাস,
একক ধম্মে অওকো উপহাস।

কতহুঁ দাস কতহুঁ বেদ,
কতহুঁ মিলিমিস, কতহুঁ ছেদ।

....

কতহুঁ তুরক বরকর,
বাট জাইতেঁ বেগার ধর।
ধরি আনএ বাভন-বড়ুআ,
মথা চড়াবএ গাইক চুড়ুআ।
ফোট চাট জনউ তোড়,
উপর চড়াবএ চাহ ঘোড়।
ধোআ উড়িধানে মদিরা সাঁধ,
দেউল ভাঁগি মসীদ বাঁধ।

....

হিন্দু বোলি দূরহি নিকার,
ছোটেও তুরকা ভভকী মার।

[ডাঃ সুকুমার সেনের অনুবাদ : 'হিন্দু ও তুরকের বাস কাছাকাছি, কিন্তু একের ধর্মে অপরের উপহাস। একের বাঙ্ (আজান), অপরের বেদ। কারো সমাজে মেলামেশা, কারো সমাজে ভেদ।............কত তুরক রাস্তায় যেতে বেগার ধরে। ব্রাহ্মণ-বটুকে ধরে এনে তার মাথায় চড়িয়ে দেয় গোরুর হাড়, ফোঁটা চাটে, পৈতা ছেঁড়ে, ঘোড়ার উপর চায় চড়াতে। ধোয়া উড়ি ধানে মদ তোলাই করে, দেউল ভেঙে মসজিদ বানায়।............হিন্দুকে বলে, দূরে নিকালো। তুরক ছোট হলেও বড়োকে মারতে যায়।']

ইলিয়াস শাহী আমলের প্রথম পর্যায়ের শেষে এবং শেষ পর্যায়ের মাঝে আমরা বাঙ্লার হিন্দু রাজা গণেশ ও তৎপুত্র যদু বা জলালুদ্দিনের রাজত্বকালের সংবাদ পাই। কৃত্তিবাস যে গৌড়েশ্বরের বর্ণনা করেছেন তিনি কি এই রাজা গণেশ? আইন-ই-আকবরী প্রভৃতিতে গণেশকে রাজা কংশ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। গণেশ নিশ্চয়ই হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই খুব প্রিয় ছিলেন। তারিখ্-ই-ফিরিস্তা বলে যে, গণেশের মৃত্যুর পর তাঁকে পোড়ানো হবে না কবর দেওয়া হবে এ নিয়ে গণ্ডগোল দেখা দেয়। গণেশের পুত্র যদু বা জলালুদ্দিন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেও হিন্দু মনোভাব সম্পূর্ণ

কাটিয়ে উঠতে পারেননি। বৃহস্পতি নামক পণ্ডিতের প্রতি তাঁর সম্মানজনক ব্যবহারে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় চণ্ডীদাসকেও এসময়ে অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষের দিকে এনে ফেলেছেন।

একদিন যে রাষ্ট্রনৈতিক অরাজকতা বিরাজ করছিল এসময় থেকে তা কিছুটা প্রশমিত হয়ে আসে। জনসাধারণও নিজেদের জাগিয়ে একতাবদ্ধ হ'তে চেষ্টা করছে। বাঙ্‌লা দেশে নবউত্থানের একটি ক্ষীণ সম্ভাবনাও দেখা দিয়েছে। রাজশক্তি কিছুটা সহানুভূতিশীল হয়েছে। গণেশের সময় থেকে বাঙ্‌লা সাহিত্যের সম্মান কিছুটা বেড়েছে। সাহিত্য নিশ্চয় রাজানুগ্রহ বা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করছে। আমরা কৃত্তিবাসের গৌড়েশ্বর বর্ণনা থেকে যদি রাজা গণেশকেই মেনে নিই তাহলে বলা যেতে পারে বাঙ্‌লা দেশের যে জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধ হবার চেষ্টা করছিল সেই বাঙ্‌লারই বিদ্বজ্জন-সমাজ আবার অনেক দুর্যোগের অবসানে রাজার সহানুভূতি লাভ ক'রে এসময় বাঙ্‌লার সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সুযোগ পেল।

এদেশের আদিবাসীরা প্রধানত কোমগোষ্ঠে বাঁধা ছিল। তারা তাদের কোমগত ধর্ম-অনুষ্ঠান প্রভৃতিই মেনে চলত। কাজেই বহিরাগত শাসকবর্গ বা বিজেতৃবর্গ যে ধারা বহন করে এনেছিল তা অধিকাংশ সমাজ-স্তরেই আবদ্ধ ছিল। তারা এই আদিবাসী কোমদের মধ্যে নিজেদের সংস্কৃতির ধারাকে প্রবাহিত করবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে কিন্তু তাদের নিজস্ব সংস্কার-বাঁধা জীবনের অস্তিত্বকে একেবারে বিলুপ্ত করে দিতে পারেনি। কিন্তু তারা আচারে ব্যবহারে হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি গ্রহণ না করলেও অপেক্ষাকৃত উদার বৌদ্ধসংস্কৃতির কিছু কিছু গ্রহণ করেছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে বৌদ্ধরা দুর্বল হ'য়ে পড়েছে—ব্রাহ্মণরা আবার আপন আভিজাত্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। আর একদিকে নিম্নস্তরের ধ্যানধারণার মধ্যে নতুনত্ব কিছু কিছু এসে পড়েছে। বৌদ্ধ তান্ত্রিক নিজের কথা স্পষ্ট বলতে না পেরে প্রহেলিকার সৃষ্টি করেছে চর্যার ভেতর দিয়ে। নিম্নস্তরে লৌকিক ধর্মবোধ তখনও অপরিবর্তিত। একদিন হ'তে বহুধাবিভক্ত বাঙ্‌লার বিভিন্নভাবাপন্ন জনসাধারণ যে একটা বিশেষ লক্ষ্যের দিকে যাবার পথে মিলিত হবার চেষ্টা করছিল তার পরিচয় যদিও চতুর্দশ শতকের পরের সাহিত্য রচনা থেকে পাচ্ছি তবুও তার মিলিত হবার আশু প্রয়োজনবোধ

জাগিয়ে তুলল তুর্কী-আক্রমণের পর থেকেই। আর্যেতর ধারা ও ব্রাহ্মণ্য ধারা এবং প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ধারার ত্রিবেণী প্রায় একবেণী হয়ে এসেছে। নানা মতবাদের দেব-দেবীদের নিয়ে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা চলছে। তুর্কী-আক্রমণের পর সাম্রাজ্য বিস্তার ও ইসলাম ধর্মের ব্যাপক প্রচার বিদেশাগত মুসলমান শক্তির প্রধান লক্ষ্য হ'ল। ইসলামের 'এক ধর্ম' ও তার সংস্কৃতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আর তখন রাষ্ট্রের কর্ণধারও মুসলমান শক্তি। কাজেই তাকে ঠেকাবার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তখনকার বাঙালী সমাজ অনুভব করছিল তাই ধীরে ধীরে রূপ নিচ্ছিল তুর্কী-আক্রমণের ধাক্কা খেয়ে। তখন থেকে সবাই মিলে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে বাধার প্রাচীর গ'ড়ে তোলবার চেষ্টা করছে। কিন্তু সম্মিলিত শক্তিপুঞ্জের যুদ্ধবিগ্রহাদির ভেতর দিয়ে বাধা দেবার যে প্রয়াস ও ব্যর্থতা লক্ষ্য করেছি তার চাইতেও বড়ো প্রয়াস হ'ল সংস্কৃতি দিয়ে সংস্কৃতির পথরোধ করা। সংস্কৃতিকে বিজিত হতে না দেবার চেষ্টা আমরা পঞ্চদশ শতাব্দীর সাহিত্য রচনা থেকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করব।

কিন্তু ইলিয়াশ শাহী আমলের দ্বিতীয় পর্যায় থেকে অর্থাৎ ১ম নাসির উদ্দিন মাহ্‌মুদ শাহ্‌ (১৪৪২—১৪৫৯) থেকে বাঙ্‌লা ও তার আশে পাশে বিহার, আসাম প্রভৃতি জায়গায় অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হলেও মুসলমান শাসন-কর্তাদের মনোভাব সমাজ ও সাহিত্য গঠনের বেশ কিছুটা অনুকূল হয়েছিল। রুকনুদ্দিন বারবক শাহের সময়ে (১৪৫৯—১৪৭৪) বাঙ্‌লা সাহিত্য রাজানুগ্রহ লাভ করেছে। মালাধর বসু বারবক শাহের অনুগৃহীত ছিলেন বলে নিজে উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর কাছ থেকে গুণরাজ খান উপাধি লাভ করেন। তাঁর পুত্রও সত্যরাজ খান উপাধি পেয়েছিলেন। অবশ্য তারপর সামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ (১৪৭৪—১৪৮১) ও জলালুদ্দিন ফথ্‌ এর (১৪৮১—১৪৮৭) রাজত্বের পর হুসেন শাহের রাজত্বের পূর্বে অন্তত ১৪৯৩ সাল পর্যন্ত আবার বাঙ্‌লা দেশে অন্যায় শাসনের সূত্রপাত হয়। এই ছয় বছরের মধ্যে হাবসী শাসনকর্তাদের আমলে যে অরাজকতা দেখা দিয়েছিল তাতে বাঙ্‌লার সাহিত্য ও সমাজের অগ্রগতির প্রভূত ক্ষতি হয়। অনেক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোককে এই হাবসী শাসন-কর্তাদের খেয়াল-খুসিতে প্রাণ হারাতে হয়।

মুসলমান শক্তির সহানুভূতিশীলতার কারণ দেখাতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় শ্রীগোপাল হালদার মহাশয় ১৩৫৮ সালের শারদীয়া 'পরিচয়' পত্রিকায়

বলেছেন যে, মুসলমানরা বাঙ্‌লা দেশে যখন স্থায়িভাবে বসবাস করতে লাগলেন তখন বিবাহ প্রভৃতি নানা বন্ধনের ভেতর দিয়ে তাঁরা প্রায় বাঙালী হয়ে উঠেছেন। ধর্মান্তরিত বাঙালী মুসলমানরা বাঙ্‌লা ভাষা ব্যবহার করতেন। বাঙ্‌লার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যে বিদেশী মুসলমানরাও তাঁদের দুর্ধর্ষতা হারালেন। পরে দেখা গেল যে যদিও তাঁরা আরবী, ফার্সী প্রভৃতি ভাষা ব্যবহার করছেন, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁরা বাঙ্‌লা ভাষাকেই উৎসাহিত করছেন। অথচ এই সাহিত্য সৃষ্টির মূলে বাঙালীর ভাব-ধর্ম প্রকাশের আকুলতা দেখা দিলেও সেখানে একটা সংস্কৃতি রক্ষার প্রতিরোধী সাহিত্য-সৃষ্টির আভাসও রয়েছে। আদিযুগের দ্বিতীয় পর্যায় থেকে প্রায় সমগ্র মধ্যযুগেই এব্যাপার দেখতে পাই। প্রাক্-চৈতন্যযুগ বা আদি মধ্যযুগে যে সব রচনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটে তাতে কোথাও মুসলমান রাজশক্তির সহানুভূতির স্পষ্ট স্বাক্ষর রয়েছে, কোথাও বা ধর্মসহিষ্ণুতার স্পষ্ট আভাস আছে। মুসলমান প্রভাবের ভিতর বাঙ্‌লার সমাজে যে সাহিত্য গড়ে উঠতে পেরেছে এটাই সব চাইতে বড়ো কথা। আরও বড়ো কথা এই যে, এই সময় থেকে একটা হিন্দু জাতীয় সেন্‌টিমেণ্ট বা ভাববিভোরতা যে গ'ড়ে উঠছে এবং এই ভাববিভোরতা যে সমাজকে সংঘবদ্ধ হবার সুযোগ দিয়েছে তাও এযুগে লক্ষিত হয়।

এই সময়ে বহিঃ ও আভ্যন্তরীণ বিপর্যয়ের ধাক্কা সামলে নিয়ে বাঙালী কতকটা আত্মস্থ বা ধাতস্থ হয়ে উঠছিল। সঙ্গে সঙ্গে অনুভূতিশীল মনের প্রকাশ দেখা দিচ্ছে সাহিত্যসৃষ্টির প্রচেষ্টায়। এ যুগের পূর্ব থেকেই যেমন বিভিন্ন ধর্মমতের আচার নিয়ম সংস্কারের মধ্যে একটা বোঝাপড়া চলছিল, তেমনই তখন আবার ব্রাহ্মণ্যবাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যেতরের যে দ্বন্দ্ব চলছিল তার কিছু কিছু নিদর্শন পরের দিকের চৈতন্যজীবনী (বিশেষ করে চৈতন্য ভাগবত), ধর্মমঙ্গল প্রভৃতিতেও পাওয়া যায়। আবার এই সময়ের রচনায় মুসলমান সূফী বাউল প্রভৃতির ভাবাদর্শ এবং আরবী ফার্সী শব্দসম্ভার বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলছে, এমন কি কাহিনী অংশে বিজেতাকেও সংযুক্ত করা হচ্ছে। এসময় বাঙালী মুসলমান সাহিত্যিকের দান না থাকলেও মুসলমানশক্তির এই দান অনস্বীকার্য।

আবার বাঙ্‌লার সমাজ স্তরে ধর্মদ্বন্দ্ব এত স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল

যে একমতের লোক অন্যমতাবলম্বীর নিগ্রহে যারপর নাই আনন্দ প্রকাশ করছিল। এক সম্প্রদায়ের দেবদেবী নিয়ে অন্য সম্প্রদায় যে বেশ বিদ্রূপ করছে, এটা তখনকার শিব চণ্ডী প্রভৃতির দুর্গতি দেখলে বোঝা যায়। বিশেষ ক'রে প্রধান ও মুখ্য ধর্মমতগুলির বোঝাপড়ার দিক দেখা দিলেও ছোটখাটো দেবদেবীদের মানুষের নানা প্রয়োজনের গণ্ডীতে টেনে এনে তাদের নিয়ে সমাজে এক একটা উপদলও গড়ে উঠছিল। এবং তাঁদের সাহিত্য ও সমাজে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য নানা লেখক লিখতে শুরু করলেন। কোনো কাব্যে দেখি শিব বিষ্ণুর চেয়ে বড়ো দেবতা, কোথাও বিষ্ণুর চেয়ে চণ্ডী বড়ো, আবার কোথাও সর্পদেবী মনসা প্রাচীন শিব ও চণ্ডীর চেয়েও বড়ো হচ্ছেন। সমাজে যে সব বাধা-বিপত্তি ভয় নিয়ে মানুষের বাস করতে হয় তারই একটা প্রতীক কল্পনা ক'রে নিয়ে তাতে তাঁরা ঐশী রূপ দিতে শুরু করলেন। কিন্তু এতসব করেও তাঁরা বৃহত্তরের আনন্দকে ভোলেননি, নিজেদের একেবারে হারিয়ে ফেলেননি। যে সংস্কৃতির প্রতিরোধ রচিত হচ্ছিল, তারই ছায়ায় বসে তাঁরা বৈচিত্র্য স্থষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। এই সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল বাঙ্‌লার সুলতানদের দেশে শৃংখলা আনবার ও বজায় রাখবার সযত্ন প্রচেষ্টায়। এবং এই প্রচেষ্টা বাঙালীর সংস্কৃতিকে গ'ড়ে তোলবার পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। বাঙালীর সংস্কৃতির আরও ব্যাপক প্রসার ঘটেছে হুসেনশাহী আমলে। তাই সে যুগে সম্ভব হয়েছে সমাজের ঐক্যবন্ধন প্রচেষ্টার এবং চৈতন্য রূপ বিরাট ব্যক্তি-প্রতিভার আবির্ভাবের। সে আলোচনা আরও পরে আসবে।

তুর্কী-আক্রমণের পূর্বের বাঙ্‌লা সাহিত্যে অর্থাৎ চর্যাচর্যবিনিশ্চয় ও অন্যান্য দোহা প্রভৃতিতে এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত পুস্তকে আর লোকমুখে প্রচলিত বা কোনো বিলুপ্ত লোকসাহিত্যে তখনকার বাঙালী সমাজের একটি চেহারা আংশিকভাবে ধরা পড়েছে। কিন্তু তুর্কী-আক্রমণের পরে এবং প্রাক্‌চৈতন্য পর্বে বাঙ্‌লার তৎকালীন ও তৎপূর্বের সমাজেরও বেশ কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়।

আমরা অনেক সময় নানারকম যৌনপ্রবৃত্তি ও বিকৃতিকে একটা ধ্বংসোন্মুখ সমাজের বা যুদ্ধোত্তর কালের সমাজের ভেঙে পড়ার লক্ষণ ব'লে অভিহিত করি। কিন্তু এই প্রাচীন কালেও এই প্রবৃত্তি অন্যভাবে

প্রকাশ পেয়েছে। তত্ত্বের দিক থেকে বৌদ্ধ শৈব (নাথ) পন্থীদের এবং তান্ত্রিকতার ধারক শূন্যবাদীদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন দেহসীমার সাধনা ছিল। প্রজ্ঞা ও উপায়ের যে মিলনে মহাসুখের ইঙ্গিত রয়েছে তারই হিন্দুচিহ্নও এ যুগের সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সহজিয়া মত ও তার নিদর্শন পাওয়া যায়। বৈষ্ণব-সহজিয়া মত যে চৈতন্যোত্তর যুগে রূপ লাভ করেছিল তা নয়, বরং শ্রীচৈতন্যের পূর্বে প্রায় সেনরাজাদের আমল থেকেই যে এই মত দেখা দিয়েছিল তা জোর করে বলা যেতে পারে। এই সময় থেকে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা বাঙালীর চিত্ত হরণ করেছে। এবং রাধাকৃষ্ণ নিয়ে নানারকম কবিকল্পনাও চলেছে। মহাপ্রভুর প্রেমভক্তির পূর্বাভাস জয়দেবের কাব্যে পাই। তবে বৈষ্ণব ধর্মমত আরও আগেই দেখা দিয়েছিল। জয়দেবের পর মিথিলার বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস প্রভৃতির পদে সহজিয়া মতের প্রভাব রয়েছে। তুর্কী-বিজয়ের আগে থেকেই রাধাকৃষ্ণ প্রেম-আখ্যান বাঙ্‌লা দেশে যে প্রচলিত ছিল এটা মনে করা অসঙ্গত হবেনা। জয়দেবের সময় এ কাহিনী ত বেশ প্রচলিত ছিল। তবে এ প্রেম-আখ্যানের সঙ্গে যে মানবীয় প্রেম বা লৌকিক প্রেমের মিশ্রণ ঘটেনি এ কথা অন্তত জয়দেবের গীতগোবিন্দ প'ড়ে অস্বীকার করা দুষ্কর।

এই সহজিয়া মত বাঙালী বৈষ্ণবদের মধ্যে এসে পড়ার মূলে বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত এবং তন্ত্রমতও রয়েছে। এই সহজ সাধনার প্রজ্ঞা ও উপায় যেমন নর-নারীজীবনে প্রকাশ পেল এবং নর-নারীর মিলনের ভিতর দিয়েই প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি সাধনাও যেমন দেখা দিল, ঠিক তেমনই এই সাধনার নামে উচ্ছৃঙ্খল মিলনও যে দেখা দেয়নি তা নয়। অনেকে এই সহজ সাধনাকে ধর্মের আবরণে ব্যভিচার বলে মনে করেন। তবে এ কথা বলা যেতে পারে যে, বুদ্ধদেবের নির্দিষ্ট ধর্মমতের কঠোরতা থেকে রেহাই পাবার জন্য পরবর্তীকালে এই রকম একটি অপেক্ষাকৃত সহজ পথের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বৌদ্ধযুগেও তার শেষ রক্ষা হয়নি। এবং বৈষ্ণব ধারাতেও একই ব্যাপার ঘটেছে।

তা ব'লে ধর্মমতগুলোকে একেবারে তুচ্ছ ব'লে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। নানা ধর্মমতের আচার-ব্যবহার সংস্কারপদ্ধতি প্রভৃতি নিয়ে তখন সমাজ গড়ে উঠছে। কাজেই শুধু ভালো পাওয়াও ভার। তবে এটা সত্যিকথা যে, ধর্মের নামে সমাজে বেশ কিছুটা বাড়াবাড়িও দেখা দিয়েছিল। মুসলমান নবাবদের শেষ

পর্যায়ে দরবারের বিলাসব্যসন ও শৈথিল্য এবং এই সাধনার আঙ্গিক-প্রাধান্য শেষপর্যন্ত জাতিকে এতটা আত্মবিস্মৃত করে তোলে যে তারই ফাঁক দিয়ে বিপর্যয়ের চরম রূপ দেখা দিয়েছিল ইংরেজ জাতির আবির্ভাবে। ইসলাম-সংস্কৃতি ও ধর্ম থেকে নিজেদের মুক্ত রাখবার জন্য সেদিনের বাঙালীর মধ্যে যেমন বিভিন্ন ধর্মমত ও তার বাহন সাহিত্যও গড়ে উঠেছিল, তেমনই নিজ নিজ ধর্মের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার চেষ্টার মাঝে দলাদলিও দেখা দিয়েছিল। এই দলাদলির মনোভাব, ছোটো বড়োর বিভেদকে ভিত্তি করে আচার-সংস্কারের বিভেদ ও ধর্ম-অনুষ্ঠানের বিভেদের ভেতর দিয়ে, প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে।

প্রাক্-চৈতন্য যুগের সাহিত্যে যে সমাজের পরিচয় পাই তা প্রধানত বাঙ্‌লার প্রথম সমাজবন্ধনের যুগের এবং তুর্কী-আক্রমণের যুগের। মনসামঙ্গল এবং আরও পরের চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তবে তার পুর্বের যুগের কিছু কিছু চিত্রও আমরা পেয়েছি। তুর্কী-আক্রমণের একটি ইতিকথা স্মৃতিবিজড়িত হলেও তখনকার বাঙালী মনের আতঙ্কিত দিক তখনকার সাহিত্যে প্রকাশ পেয়েছে। এই কাব্যগুলিতে যেসব কাহিনীবস্তু রয়েছে তা একই যুগের নয়। কিছু অকৃত্রিম লৌকিক অংশ, এবং কিছু পরের দিকে সমাজের উচ্চস্তরে দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য নূতন আখ্যান অংশ—আবার কোথাও মুসলমান শক্তির মহিমা স্বীকৃতির প্রকাশ অংশ— এই নিয়েই কাব্যগুলি রচিত হয়েছিল। প্রথম সমাজ-বন্ধনের যুগে রাজশক্তির সঙ্গে সঙ্গে বৈশ্যশক্তিও স্বীকৃত হয়েছিল; চাঁদবেনে এবং পরের দিকের ধনপতি সদাগর প্রভৃতি তার উদাহরণ। পরে অবশ্য সেন আমলে এঁরা সমাজে অনেকখানি নেমে যান। তবে ব্যবসাদার ও টাকাপয়সাওয়ালা লোকের প্রতিপত্তি পরের দিকে সমাজে জাতবিচারের ততটা অবকাশ রাখেনি। সাহিত্যে সমাজের নিম্নস্তরে ধনা মোনা, লক্ষ্যা প্রভৃতি নগণ্য সাধারণ লোকেরও পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। অবশ্যি এটা ভুল্‌লে চলবেনা যে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙ্‌লার সাহিত্যে প্রধানত দৈবীমহিমা কীর্তনের যুগ চলেছিল এবং তার দ্বারা জনসাধারণকে অভিভূত রাখা তখন রাজশক্তির রাজ্যশাসন করার পক্ষে বড়ো রকমের অস্ত্র ছিল। এই মনোভাব প্রাচীন কাল থেকে সবদেশেই দেখা দিয়েছে। দৈবীশক্তির

দোহাই দিয়ে সাধারণ মানুষকে বশীভূত রাখার ব্যাপারে প্রাচীনকালে পুরোহিততন্ত্র বড়ো রকমের সহায় ছিল।

তখনকার রচয়িতারা সাধারণত অসচ্ছল পরিবারের লোক ছিলেন। তাই তাঁদের রচনায় বড়ো রকমের ঐশ্বর্যের পরিচয় দিতে গিয়েও দরিদ্র স্বল্পবিত্ত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়ই বেশী পাওয়া যায়। যাঁরা তখনকার ভূস্বামীদের আশ্রিত ছিলেন তাঁদেরই বরাত ভালো।

সমাজের নিচতলায় যেসব দেবদেবীরা পূজা পাচ্ছিলেন, তাঁরা যে ভদ্রাসনে পাকাপোক্ত হয়ে বসছেন তার প্রমাণ এইযুগের সাহিত্যে পাই। এঁরা যে চিরকালই নিচতলার বাসিন্দা ছিলেন তা নয়। তবে নানা মতবাদের খেলায় তাঁদের স্থান বদল করতে হয়েছে। অবশ্য ব্রাহ্মণেতর সমাজে কিছু কিছু দেবদেবী নিজেদের স্থান করে নিয়েছিলেন। পরে যখন তাঁদের প্রচণ্ড শক্তি উঁচুনীচু সমাজের সর্বত্র ভীতির কারণ হয়ে উঠছিল তখন থেকে উচ্চস্তরের ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা তাঁদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছিল। অন্যদিকে পারিবারিক ও সামাজিক প্রয়োজনে যাঁদের পূজা প্রচলন একান্ত দরকার হয়ে পড়েছিল তাঁরা নারী-অধ্যুষিত অন্দরমহলে নিয়মিত পূজা পাচ্ছিলেন। কিন্তু তাঁরা খুব মুখ্য বা important হয়ে উঠতে পারেন নি। তাই তাঁদের নিয়ে কোন স্থায়িসাহিত্যও রচিত হয়নি। অথচ সমাজে এইসব দেবদেবীর প্রতিপত্তিও কম ছিল না। লৌকিক দেবতা ও লৌকিক ধর্মাচরণও তখন একটি বিশেষ লক্ষণীয় ব্যাপার। অনেক সময় একই দেবতা শাস্ত্রে এক ভাবে বর্ণিত আবার লৌকিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অন্যরকম। যেমন মেয়েদের ব্রতকথার সূর্য। সূর্যব্রত এবং ছড়াকাহিনী প্রাক্-আর্য ভারতীয়দের মধ্যেও নিশ্চয় ছিল। এর সঙ্গে আবার আর্যদের নানা রকম ক্রিয়া কলাপ অনুষ্ঠান বা ব্রত প্রভৃতি মিশে প্রাচীন লৌকিক ব্রতগুলির চেহারাও বেশ বদল করেছে। তবে এই লৌকিক ব্রত এবং সেই সঙ্গে উক্ত দেব-মাহাত্ম্য বিষয়ক ছড়া ও কাহিনীগুলির কালের পরিবর্তনের সঙ্গে বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। কারণ, বাঙ্‌লার সমাজের বহিরঙ্গে যতটা পরিবর্তন ঘটেছে, অন্দর মহলে ততটা ঘটেনি। ব্রতগুলি নারীদের মধ্যে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। কুমারী ব্রত, পুণিপুকুর ব্রত, বৃষ্টি কামনা ক'রে ব্রত, আবার বর্ষার দিনে আত্মীয় পরিজন যাতে নির্বিঘ্নে ঘরে ফিরে আসতে

পারে তার জন্য ব্রত—যাকে ভাদুলি ব্রত বলা হয়—এইসব এবং আরও অনেক ব্রত অনুষ্ঠানে বাঙ্‌লার নারীসমাজের অন্তরের আকুল কামনা ফুটে উঠেছে। ভাদুলি ব্রতে নারী প্রার্থনা জানায় 'নদী! নদী! কোথা যাও। বাপ ভায়ের বার্তা দাও'। এই আকুলতা নারীহৃদয়েরই আকুলতা। বংশপরম্পরা নারী-সমাজ এই ব্রতগুলি নিয়েই কাটিয়েছেন। তার বিশেষ কোনো পরিবর্তনও ঘটেনি। বুড়ো ঠাকুরুণ, সুবচনী, নিত্যষষ্ঠী, ঘেঁটু, কুলুই, ইতু প্রভৃতি আমাদের কোমধারার দেবদেবীর গ্রাম্যসংস্করণ! আর সবই এক সংস্কারের আবেষ্টনীর মধ্যেই রয়েছে। সব দেবদেবীরাই যে প্রাচীন দিন থেকেই ছিলেন তাও নয়। পরেও অনেক নতুন নতুন দেবদেবীরা আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের প্রয়োজনে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এই গ্রাম্য ব্রত-কথার দেবদেবীসম্পর্কিত সাহিত্য আমরা অনেক পরে পেয়েছি। বোধ হয় ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে এইগুলি রচিত বা সংকলিত হয়েছে। অনেকগুলি ত আজও মুখে মুখে প্রচলিত রয়েছে। এবং ভাষাও যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে আসছে। সাহিত্যের অভাবে তাদের ভাষার প্রাচীনত্ব ও সাহিত্যগত রূপের কোনো পরিচয় পাই না। প্রাক্-চৈতন্য যুগেও এইসব লৌকিক গ্রাম্য দেবদেবীর পূজা নিশ্চয়ই প্রচলিত ছিল। কিন্তু নিয়ম রক্ষার মতো থাকাতে হয়ত সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে উঠতে পারেনি।

এই যুগে বাঙালীসমাজের প্রভূত পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। তুর্কী-আক্রমণের পূর্বে যে সমাজের সুনির্দিষ্ট ঐক্যরূপ পাইনি তুর্কী-আক্রমণের পর মুসলমান রাজত্বকাল থেকে তার একটা কাঠামো গড়ে উঠেছে। এর আগে যে সমাজ ছিল তা উঁচুনিচু নানাভাবে বিভক্ত হয়ে থাকাতে তার সামগ্রিক রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠেনি। কিন্তু এ সময় থেকে নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করার চেতনা বাঙালী সমাজে দেখা দেয়।

ব্রাহ্মণ্যবাদের ক্লাসিকাল ধারার পুনঃপ্রতিষ্ঠার সময় যে ব্রাহ্মণ্য শক্তি নারী-সমাজকে নানা শাসননির্দেশের ভেতর দিয়ে অন্দর মহলে কোনঠাসা করে রেখেছিল, এযুগে তার কিছু কিছু ব্যতিক্রমও দেখতে পেয়েছি। বাঙ্‌লায় মেয়েদের অবাধ-স্বাধীনতা কোনো দিনও ছিল বলে প্রমাণ পাইনা। প্রাচীন কালেও বাঙ্‌লা দেশে অবরোধ প্রথা ছিল। তবে সম্ভবত আর্য ও অন্-

আর্য সংমিশ্রণের ভেতর দিয়ে বড়ো ঘরের মেয়েদের কিছুটা স্বাধীনতা ছিল। মনসামঙ্গলের বেহুলা চরিত্রে তার কিছুটা আভাস আছে। কিন্তু সমাজের নিম্নশ্রেণীর নারীদের বাইরে কাজ ক'রে জীবিকা নির্বাহ করতে হ'ত।

সাহিত্যে দেবদেবীর মহিমা কীর্তিত হলেও অভিজাত এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণীর সংবাদও কিছু কিছু পাওয়া যায়। রাজরাজড়া, বণিক শ্রেণী এবং সঙ্গে সঙ্গে বিত্তহীন দরিদ্র শ্রেণীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরিচয় পেয়েছি। এই দরিদ্র ও বড়োর ভেদাভেদে কোনো আন্দোলন গড়ার মতো যুগ ত নয়, কারণ যুগধর্মই তখন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। আর বাঙ্‌লার রাষ্ট্র ও সমাজে পুরোহিত, রাজা, বৈশ্য শূদ্রপরম্পরা বিবর্তন ঘটার সুযোগ হয়নি। নানা রকম রদবদলের ভেতর দিয়ে বাঙালী কেবল আপনার স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে চেষ্টা করেছে। নিজের এবং পরের অনেক চিন্তাধারা থেকে মালমশলা যোগাড় করে নিজের একটা বৈশিষ্ট্য স্থির করে নিচ্ছে।

ঐতরেয় আরণ্যকের 'বয়াংসি বঙ্গাবগধশ্চেরপাদা' উক্তির এবং ঐতয়ের ব্রাহ্মণের 'দস্যু' আখ্যায় বাঙ্‌লা দেশের প্রাচীন অধিবাসীদের প্রতি আর্য সংস্কৃতির যে একটা অবহেলার ভাব ছিল তা স্পষ্টই বোঝা যায়। তখন বাঙ্‌লা দেশে দুচার দিনের জন্য এলেও প্রায়শ্চিত্ত করতে হ'ত। এদেশের অন্‌-আর্যদের দ্রাবিড়, শক, চীন প্রভৃতি জাতির সঙ্গে এক করে দেখা হত। এদেশে যে সব ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণরা দীর্ঘ দিন বাস করছিল তাদেরও শূদ্র বলে গণ্য করা হ'ত। নানা বর্ণাশ্রমের আবির্ভাব প্রায় গুপ্তরাজাদের সময় থেকে দেখা দেয়। পালরাজাদের পর সেনরাজাদের সময় থেকে এ বর্ণভেদ আরও তীব্রভাবে দেখা দেয়। নিম্ন জাতির কিছু কিছু অর্থাৎ যারা বর্ণের বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত হয়নি বা হ'তে পারেনি তারা ধীরে ধীরে সমাজে নিজেদের একটা জায়গা করে নিচ্ছিল। পুরানো কৈবর্ত শ্রেণী তার একটি উদাহরণ। চাষাভুষো, চণ্ডাল, ডোম, শবর, কপালী, প্রভৃতির উল্লেখ আমরা চর্যাপদে পেয়েছি। হয়ত অনাচরণীয় ছিল বলেই অন্যত্র খুব বেশী উল্লেখ নেই।

পরের দিকে বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ সংঘাত এবং মহাযানী বৌদ্ধধর্ম (পালদের সময় থেকে) তন্ত্রের প্রভাবে পড়ে পরিবর্তিত হচ্ছে এবং শেষের দিকে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ দুই ধারাই বদলে যাচ্ছে। কিন্তু বদলে গেলেও সমাজের

মধ্যে নানা শ্রেণীর যে উদ্ভব হয়েছিল এবং নানা কর্মভেদে ও আচারভেদে যারা এক স্তরেই ছিল তাদের মধ্যে নির্বিবাদে আপন সন্তুষ্টি বজায় রেখে থাকাও সম্ভব ছিল বলে মনে হয়না। হাড়ি, ডোম, কৈবর্ত প্রভৃতির মধ্যে যে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল তার অনেকখানিই ব্রাহ্মণ্যচালের বিরুদ্ধে বলেই মনে হয়। সেকালে সমাজে অনেক ব্যবসায়ী শিল্পী ও শ্রমিকরা ভালো জায়গা পায়নি। রজক শ্রেণী, বণিক, চর্মকার প্রভৃতি পূর্বেও পতিত ছিল এখনও তার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। এই যে ব্যবধানের সৃষ্টি—যা সমাজের পক্ষে বিরাট ফাটলের মতো—তারই ভেতর দিয়ে আগামী দিনের ভেঙে পড়ার আভাস পাওয়া গেছে।

প্রাক্‌-চৈতন্য যুগের সাহিত্যের নিদর্শন

তুর্কী-আক্রমণের পর থেকে আমরা দেখতে পাই বাঙ্‌লার সমাজে একটা সংহতি গ'ড়ে তোলবার চেষ্টা চলছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের আচার সংস্কারগত পার্থক্যের দলাদলিও যে ছিলনা তা নয়। কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরু থেকে যে সব সাহিত্য পাচ্ছি তার মধ্যে সমগ্র বাঙালী সমাজেরই আকৃতি ও প্রকৃতি ধরা পড়েছে। নিজেদের ধর্মকলহ দেবদেবীর পারস্পরিক কলহে যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনই নিজেদের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা, অভাব অনটন, সমাজের উচ্চস্তরের মানুষের সুখসুবিধা এবং সর্বোপরি নতুন বিজয়ী মুসলমান রাজশক্তির স্তুতিগান এবং হিন্দু মুসলমান বিরোধ-মিলনের কাহিনী প্রভৃতিও সাহিত্যে স্থান লাভ করেছে।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত সাহিত্যধারায় আমরা দেখতে পাবো যে শুধু মঙ্গলকাব্য বা কৃষ্ণকীর্তন নয়, এ সময় অনুবাদও হয়েছে। কৃত্তিবাস ও মালাধর বসু তার প্রমাণ। প্রাচীন যুগের সংস্কৃতির উপকরণের সঙ্গে তৎকালীন দেশীয় উপাদানও সাহিত্যে মিশ্রিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্যি এ সংস্কৃতির অর্থ—ধর্মসংস্কৃতি। যে হিন্দু ধর্ম সারা ভারতে নানা বাধা বিঘ্নের ভেতর দিয়ে আপন অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছিল বাঙ্‌লা দেশেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে বাঙ্‌লার ধর্ম ও সংস্কৃতি পাঁচ-মিশালী সংস্কৃতি। এতে অন্‌-আর্য মনসা, চণ্ডী, ধর্মঠাকুরও আছেন, সত্যনারায়ণ

মাণিকপীরও আছেন, ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণও আছেন, বৈদিক রুদ্র ও চাষার শিব মিলে একজন রুদ্রশিবও আছেন—আবার বহু প্রাচীন কালের phallic দেবতাও (লিঙ্গদেব) আছেন। অবশ্যি কয়েকজন ছাড়া অন্য দেবতাদের সারা ভারতেই প্রতিপত্তি ছিল।

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর বাঙ্‌লা রচনার নিদর্শন পাওয়া যায়নি। বড়ু চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাসকে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগের লোক বলে অনেক সময় বলা হয়েছে। কিন্তু জোর করে কেউ বলেননি। বেশীর ভাগ সমালোচকের মতে এঁরা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের কবি। সেন আমলের ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবেই হোক আর মুসলমান আক্রমণ হেতুই হোক, এই যুগে রচনার সামান্য যা নিদর্শন পেয়েছি তার বেশীর ভাগ সংস্কৃত রচনা। জয়দেবের রচনা সংস্কৃতে হলেও তাতে তখনকার লৌকিক ভাবাদর্শের ও প্রাণধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। উমাপতিধরের বৈষ্ণবভাব ও মানবীয় প্রণয়-উচ্ছ্বাসের মিশ্রণে কতগুলি উৎকৃষ্ট মৈথিলী পদও পাওয়া গেছে। তাতে বাঙ্‌লার মানুষের মনের ছাপ রয়েছে। পূর্বে আমরা বলেছি যে, গোপীচন্দ্রের গান, ডাক ও খনার বচন, মনসার কাহিনী প্রভৃতি এ যুগের পূর্বেও হয়ত প্রচলিত ছিল। পরের দিকের কবিদের দ্বারা উল্লিখিত কানা হরিদত্ত, ময়ূরভট্ট (!) প্রভৃতির আবির্ভাব কাল চতুর্দশ শতাব্দীর শেষাশেষি বলে মনে হয়। হরিদত্তের গীত প্রচলিত হয়ে বিজয়গুপ্তের সময় লুপ্ত হয়ে যাবার মধ্যে বেশ কিছুটা কালের ব্যবধান থাকা স্বাভাবিক। মনসা, চণ্ডী প্রভৃতির গান এ সময় একেবারে ছিলনা একথা বলতে পারিনা। মনসাগান বিজয়গুপ্ত বা বিপ্রদাস চক্রবর্তী আবিষ্কৃত কোনো আখ্যায়িকা নয়। তাঁদের আগেও এ কাহিনী বাঙ্‌লার সমাজে প্রচলিত ছিল। চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। রাধাকৃষ্ণ প্রেমকাহিনী নিয়ে বাঙ্‌লায় পূর্বেই সংস্কৃতে রচনা শুরু হয়েছে। বাঙ্‌লা ভাষাতেও কোনো কোনো রচনা থাকতে পারে। বড়াই বুড়ীকে মধ্যে রেখে গ্রাম্য গোপ-গোপিনীর প্রণয়লীলা—যা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পাই তাও হঠাৎ বড়ু চণ্ডীদাস নিশ্চয় আবিষ্কার করেননি। বাঙ্‌লার গ্রাম্যজীবন থেকেই হয়ত এই সাহিত্যরস পেয়েছিলেন।

নানা মতবাদের ভিড়ে পঞ্চদশ শতাব্দীর সাহিত্যের পারম্পর্য ঠিক করাও দুষ্কর। আর সন তারিখ নিয়ে গণ্ডগোল ত আছেই। তার ওপর রাঢ় না

পূর্ববঙ্গ মনোভাব নিয়ে অনেক সময় সাহিত্যের মূল্য যাচাই করতে ব'সে সাহিত্যকে যথোচিত সম্মান দেওয়াও হয়নি। নানা সুধীবৃন্দের আলোচিত ও সমর্থিত প্রাক্-চৈতন্য যুগের যে কয়খানি রচনা আছে বলে ধরে নেওয়া হয় আমরা তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবার চেষ্টা করব।

বড়ু চণ্ডীদাস

প্রাচীন কবিদের মধ্যে বড়ুচণ্ডীদাস শুধু শ্রেষ্ঠতম নন—নমস্য কবি। ১৩১৬ সালে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বাঁকুড়া থেকে একখানি পুঁথি আবিষ্কার ক'রে ১৩২৩ সালে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামকরণ ক'রে প্রকাশ করতেই বাঙ্‌লা সাহিত্যক্ষেত্রে সাড়া পড়ে গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে নতুন সমস্যাও দেখা দিল। এতদিন যে চণ্ডীদাসকে নিয়ে আমরা ভাবোন্মত্ত হয়ে ছিলুম এই পুঁথিখানি প্রকাশিত হতেই সেই চণ্ডীদাসের এককত্ব সম্বন্ধে সমস্যা দেখা দিল। তখন চণ্ডীদাস একজন, না দুজন, না অনেকজন ছিলেন—তাঁরা কোন্ সময়ের লোক, কোথায় বাস করতেন এসব নানা প্রশ্নও দেখা দিল। নানা পণ্ডিত ব্যক্তি নানা মতও প্রকাশ করলেন। কেউ বললেন দু'জন চণ্ডীদাস ছিলেন—কেউ বলেন দু'য়ের বেশী ছিলেন—আবার কেউ একজন চণ্ডীদাসের অস্তিত্বেই মত দিলেন। কেউ বললেন, একজন প্রাক্-চৈতন্য যুগের আর একজন চৈতন্যোত্তর যুগের। চণ্ডীদাসের নিবাস সম্বন্ধে কেউ বলেন, তিনি নান্নুরের লোক--কেউ বলেন ছাতনার। চণ্ডীদাস একজন, কি দুইজন, কি বহু—অথবা 'চণ্ডীদাস' উপাধিধারী অনেক কবি ছিলেন কিনা এ নিয়ে বিশদ আলোচনা না করেও, অন্তত এটুকু বলা যেতে পারে যে চণ্ডীদাস একজনের বেশী ছিলেন। অন্যদিকে 'চণ্ডীদাস' উপাধিধারী অনেক কবির অস্তিত্বও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। নান্নুর এবং ছাতনা দু'জায়গাতেই বাশুলীর পূজা প্রচলিত ছিল এবং এই উভয় স্থানের সেবকরাও 'চণ্ডীদাস' উপাধি ধারণ করতে পারেন। বড়ু, অনন্তবড়ু, দ্বিজ, দীন ইত্যাদি অনেক চণ্ডীদাসের অস্তিত্বও অসম্ভব নয়। মহাপ্রভুর আগেপরে হয়ত অনেক চণ্ডীদাসের আবির্ভাব ঘটেছে। শুধু যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বা পদাবলী রচয়িতা চণ্ডীদাসের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে তা নয়, 'ভাবচন্দ্রিকা' কাব্যের রচয়িতা চণ্ডীদাস, কাব্যপ্রকাশের ধ্বনি-প্রকরণের টীকা 'দীপিকা' রচয়িতা চণ্ডীদাসেরও সন্ধান পাওয়া যায়।

ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় 'বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাসে' চণ্ডীদাসের পুঁথির লিপিকালকে ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে বা আনুমানিক ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ধরে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আলোচনা চৈতন্যোত্তর যুগেই করেছেন। তিনি যে কয়টি মত প্রকাশ করেছেন তা সংক্ষেপে উদ্ধৃত করছি। প্রথমত, চণ্ডীদাসের প্রাচীনতম উল্লেখ—সনাতন গোস্বামীর বৈষ্ণবতোষণীতে (বা শ্রীজীব গোস্বামীর লঘুতোষণীতে) আছে। এগুলো ষোড়শ শতাব্দীর রচনা। এই সঙ্গে জয়দেবেরও উল্লেখ থাকায় সুকুমার বাবু মনে করেন এই চণ্ডীদাস হয়ত (যাঁর দানখণ্ড-লীলাখণ্ডাদির উল্লেখ আছে) সংস্কৃতে লিখেছিলেন। শ্রীজীব গোস্বামী হয়ত এঁর রচনার কথাই বলেছেন। অবশ্যি একথা তিনি নিশ্চিতভাবে বলছেন না। বড়ু চণ্ডীদাসও যে এই উল্লিখিত চণ্ডীদাস হতে পারেন তাও তিনি মনে করেন। বাঙ্‌লা সাহিত্যের কথায় সুকুমার বাবু বলেছেন—"কাব্যটি পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হইয়াছিল।" শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর চৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভু একজন চণ্ডীদাসের পদের রস আস্বাদন করতেন বলে উল্লেখ করেছেন। এমনিতেই বলা হয়েছে—

'চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গায় শুনে পরমানন্দ'॥

চরিতামৃত ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকের ১৫৮০র কাছাকাছি রচনা। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলেও (ষোড়শ শতাব্দী) চণ্ডীদাসের উল্লেখ রয়েছে। প্রায় ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের রচনা নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাসে বলা হয়েছে যে খেতরীর উৎসবে চণ্ডীদাসের পদ গাওয়া হয়েছিল। আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত পদ-সংকলন রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃতসমুদ্রে চণ্ডীদাসের অনেক পদ রয়েছে। কিন্তু বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে চণ্ডীদাসের কোনো পদ নেই।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকের তান্ত্রিক বৈষ্ণবদের দ্বারা চণ্ডীদাসের নাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীদাসের নামের সঙ্গে জড়িত অনেক গল্পও প্রচলিত হয়। এর মধ্যে তারা বা রামতারা বা রামীর গল্প

একটি। এর উল্লেখ আনুমানিক ১৭শ-১৮শ শতকের 'সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়' গ্রন্থে আছে।

তারপর এমনও হয়েছে যে অনেক বিখ্যাত লেখকের ভালো ভালো পদ চণ্ডীদাসের নামে চলে গেছে। তাতে চণ্ডীদাসের পদসংখ্যাও বেড়েছে। সবগুলোই যে চণ্ডীদাসের রচনা নয় তার প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে। চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত 'সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু আনলে পুড়িয়া গেল' পদটি কবি জ্ঞানদাসের পদ ব'লে প্রমাণিত হয়েছে। অনেকে হয়ত বৈষ্ণব-বিনয়-বশত নিজের রচনা বিখ্যাত লেখকদের নামেই প্রচার করতেন।

কবির বাসস্থান হিসাবে নান্নুর-ছাতনার প্রবাদও উড়িয়ে দেওয়া চলে না। তবে কোন্ চণ্ডীদাস কোথায় বাস করতেন তা এখনও প্রমাণসাপেক্ষ।

চণ্ডীদাস-সমস্যা নিয়ে প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান কাল অবধি ৺নীলরতন মুখোপাধ্যায়, ৺অক্ষয়কুমার সরকার, ৺সতীশচন্দ্র রায়, ৺জগবন্ধু ভদ্র, ৺দীনেশচন্দ্র সেন, ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাগোবিন্দ বসাক, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, যোগেশচন্দ্র রায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ডাঃ শহীদুল্লাহ্, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৺মনীন্দ্রমোহন বসু, ডাঃ সুকুমার সেন প্রভৃতি অনেকেই নানা আলোচনা করছেন। কিন্তু একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব ছাড়া সমস্যার কোন সমাধান হয়নি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যে পুঁথি পাওয়া গেছে তা এক হাতের লেখা নয় বলেই প্রায় সবাই স্বীকার করেছেন। এবং সম্ভবত এ পুঁথির লেখা বড়ু চণ্ডীদাসের হাতেরও নয়। পুঁথিতে তিন রকম অক্ষর রয়েছে। লিপিকাল সম্বন্ধেও কিছু জানা যায় না। ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুঁথির লিপি বিচার করে বলেছিলেন যে এই কাব্যের রচনাকাল ১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দের আগে, এমন কি চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমদিকেও হতে পারে। রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় ১৪৫০-১৫০০খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এর লিপিকাল হলে মনে করেন। তবে এটা ঠিক যে বৌদ্ধচর্যাপদের পরে এমন প্রাচীন ভাষা আর পাওয়া যায়নি।

ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় মনে করেন যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন হয়ত একজন কবির রচনা নয়। নানা রকম প্রক্ষেপও হয়ত ঘটেছে। কারণ ভাষাও সব জায়গায় একরকম নয়। বিভিন্ন অংশে যে সব কাহিনী পাই তা কোনো পুরাণ বা বৈষ্ণব গ্রন্থে পাওয়া যায় না। তিনি মনে করেন যে বাঙ্‌লা দেশের লৌকিক

পুরাণ জাতীয় কাব্য থেকে হয়ত এই কাহিনী অংশ গ্রহণ করা হয়েছিল। আমাদের মনে হয় তখনকার গ্রাম্য নরনারীর গোপন প্রণয়লীলাও এই পুঁথির উপকরণ জুগিয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আর একটি ব্যাপার লক্ষণীয়। শ্রীরাধার আর এক নাম এখানে চন্দ্রাবলী এবং তিনি বৃষভানু নন্দিনী নন—সাগর গোয়ালার মেয়ে। জয়ানন্দের রচনায় এবং শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গল প্রভৃতিতেও চন্দ্রাবলী নামান্তরটি পাওয়া যায়।

এ সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি প্রশ্ন আছে। মনে হয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি চণ্ডীদাস নিশ্চয়ই মহাপ্রভুর পূর্ববর্তী। কিন্তু মহাপ্রভু যে চণ্ডীদাসের পদের রস আস্বাদন করতেন তিনিই কি এই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি? বৈষ্ণব আলঙ্কারিক ও শাস্ত্রকারেরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কথা উল্লেখ করেননি। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ত তাঁর ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে চণ্ডীদাসের পদই উদ্ধৃত করেননি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আরম্ভে যে 'সভাপতি' শব্দ আছে সংস্কৃতে তার ব্যবহার থাকলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে? বৈষ্ণব অলঙ্কার শাস্ত্রের বিধিনিষেধও কি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনার পরে গড়ে উঠেছিল? বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের নিয়মে পূর্বরাগ আগে থাকবে। রাসলীলার আগে কালীয় দমন থাকবে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তা নেই। মহাপ্রভু যে চণ্ডীদাসের পদের রস আস্বাদন করতেন তাঁর নামের কোথাও 'বড়ু' কথাটি নেই, শুধু চণ্ডীদাস উল্লেখ রয়েছে। আমরা কি ধরে নিতে পারি যে মহাপ্রভু যাঁর পদের রস আস্বাদন করতেন তিনিও তাঁর পূর্বে আবির্ভূত এক চণ্ডীদাস—হয়ত তাঁর কোনো রচনা আজও পাওয়া যায় নি? অথবা যে দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতায় দুয়েকটি গৌরচন্দ্রিকার পদ ছাড়া (তাও একেবারে সংশয়াতীত নয়) আর কোনো গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ পাওয়া যায় না তাঁরও হয়ত দান লীলা প্রভৃতি রচনা থাকতে পারে। অথবা পরের দিকের প্রসিদ্ধ চণ্ডীদাস—যাঁর জনপ্রিয়তা হেতু পদের রূপটি বদলেছে—তাঁর পদই কি মহাপ্রভু আস্বাদন করতেন? বংশীখণ্ডে আমরা যে ঐশ্বর্য ভাব দেখতে পাই তাও বৈষ্ণব ভাবের প্রতিকূল নয় কি? বাঁশী হারিয়ে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মণিমাণিক্যখচিত বহুমূল্য বাঁশীর জন্য কাঁদছেন এবং ফিরে পাবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন। শ্রীকৃষ্ণের এই মণিমুক্তার আকর্ষণ একটু Convention-বিরোধী নয় কি?

ডাঃ শহীদুল্লাহ্ সাহেব শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'পিরীতি' শব্দের উল্লেখ সম্বন্ধে মন্তব্য

করেছিলেন। সারা পুঁথিতে চারবার 'পিরীতি' শব্দের উল্লেখ আছে—সেও স্নেহ প্রীতি অর্থে—বৈষ্ণব ভালোবাসা অর্থে নয়। এ রকম নানা প্রশ্ন উঠেছে। এ সমস্যার এখনও শেষ হয়নি। যে দ্বিজচণ্ডীদাসকে মহাপ্রভুর পরবর্তী বলে বলা হয় তিনিও হয়ত মহাপ্রভুর পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক চণ্ডীদাস হবেন। তবে ভাব ও ভাষা আলোচনা করলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি যে প্রাক্‌চৈতন্য যুগের এবং প্রায় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে বা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আবির্ভূত হয়েছিলেন তা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গল্পাংশে দেখি, শ্রীকৃষ্ণ কংস প্রভৃতি পাপীকে দলন করবার জন্য ধরায় এসেছেন। আর লক্ষ্মী—পদ্মা ও সাগর গোয়ালার ঘরে জন্ম নিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ আপন আহ্লাদ রস বা আনন্দকে উপভোগ করতে ধরায় অবতীর্ণ হয়েছেন—শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এ কথা বলে না। বরং শ্রীরাধার রূপের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে মিলন কামনা করছেন। বড়াই বুড়িকে দিয়ে তিনি পান পাঠাচ্ছেন—

তাম্বুল লইআঁ যাহা পরাণের দূতী।
বকুল তলাত আছে সে সুন্দরী সতী॥
চাম্পা নাগেশ্বর আর নেআলী মাহলী।
ফুলে তাম্বুলে ভরি লআঁ যাহা ডালী॥
ফুল পিন্ধিলে সে খাইবে তাম্বুল।
তবেঁসি কহিহ সব কথা আদিমূল॥

বৈষ্ণব প্রথায় এখানে পূর্বরাগ নেই, ললিতা বিশাখা প্রভৃতি নেই—আছে বড়ায়ি বুড়ি। রাধা দই নিয়ে মথুরায় যাবার পথে কৃষ্ণ তাঁকে আটকালেন। রাধা তখন বলেন,

লাজ না বাসসি তোএঁ গোকুল কাহ্ন।
সোদর মাউলানীত সাধ মাহাদান॥
জীবার উপায় নাহিঁ বোল মাহাদানী
বাছিআঁ পাইলি সোদর মাউলানী॥

তবু কৃষ্ণ মানেন না। রাধা ধর্মের দোহাই দেন। কিন্তু কৃষ্ণ শেষ পর্যন্ত বল-প্রয়োগ করেন। নৌকার মাঝি হয়ে তিনি রাধাকে বিপদে ফেলেন। আবার

দেখি, কখনও কৃষ্ণ রাধার পসরা বইছেন—নয়ত মাথায় ছাতা ধরছেন। আবার যখন রাধার সঙ্গে তর্কে পেরে উঠছেন না তখন নিজের দেবত্ব এবং তদ্‌জনিত শক্তি প্রমাণ করবার চেষ্টা করছেন। তখন তিনি মুখে 'আমিই হরি' বললেও যেন মনে হয় অহমিকাপূর্ণ সাধারণ মানুষ ছাড়া আর কেউ নয়। এসব শুধু রাধাকে পাবার জন্যই। তারপর ভাগবত ও গীতগোবিন্দের (আংশিক) অনুকরণে বৃন্দাবনখণ্ড আছে। কালীয়দমনের জন্য কৃষ্ণ কালীয়দহে যখন ঝাঁপ দেন তখন রাধাও কৃষ্ণের বিপদ মনে করে ভয় পেয়ে বিচলিত হন। এইখানে রাধার অনুরাগ একটু দেখা দিয়েছে। পরেই আবার হার চুরির জন্য রাধা যশোদার কাছে কৃষ্ণের বিরুদ্ধে নালিশ করেছেন। কৃষ্ণ রাধাকে প্রেমবাণে জর্জরিত করছেন। রাধাও কৃষ্ণের বাঁশী শুনে আকুল হয়ে বলেন—'কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ী কালিনী নই কুলে'?

রাধার বিরহাবস্থা। উপস্থিত কিন্তু আগে দেখছি কৃষ্ণের বাঁশী চুরি করে রাধা কৃষ্ণকে কাঁদিয়েছেন। কৃষ্ণ কেঁদেছেন রাধার জন্যে নয়, বহুমূল্য বাঁশীটির জন্যে। রাধাবিরহ খণ্ডে কৃষ্ণ রাধাকে বেশ জব্দ করলেন। মুখে ভালোবাসা দেখিয়ে—রাধা যখন কৃষ্ণের কোলে ঘুমিয়ে পড়ল—তখন রাধাকে ফেলে পালালেন। এইখানেই প্রায় শেষ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথিখানিতে গ্রাম্যভাব যথেষ্ট আছে। ভাগবদ্‌-উক্ত রাধা-কৃষ্ণ অপেক্ষা যে যুগের গ্রাম্য প্রণয়ী-প্রণয়িনী কেন্দ্রিক কোনো কাহিনীকেই যেন রাধাকৃষ্ণ প্রণয়লীলার ছাঁচে ঢালা হয়েছে। তবে কবিত্বের দিক থেকে বিচার করতে গেলে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে তার অভাব নেই। অন্তত বিরহখণ্ড তো কাব্যরসে বেশ সমৃদ্ধ। জয়দেবের কয়েকটি পদাংশ এবং ভাগবতেরও কিছু অংশ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কয়েকটি পদের শিরোভূষণ হয়ে আছে। এর দ্বারা তাঁর গভীর সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞানেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বেশীর ভাগ পদ পয়ার ছন্দে রচিত। তবে ত্রিপদীও মাঝে মাঝে আছে। বাঙ্‌লা ছন্দ তখনও সুষ্ঠু ও পাকাপোক্ত হয়ে ওঠেনি। অনেকে মনে করেন দুর্বল ছন্দের পদগুলো হয়ত বড়ু চণ্ডীদাসের রচনা নয়। গায়েনদের বা লিপিকরদেরও হ'তে পারে। আমরা পরের যুগে যে ধামালী গানের উল্লেখ পাই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যুগেও যে এই ধামালী বাঙ্‌লা সমাজে প্রচলিত ছিল উক্ত কাব্যই তার প্রমাণ। চর্যাপদের মতো এখানেও অনেক

রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে যার অনেকগুলিই বর্তমানে প্রচলিত রাগরাগিণীর মধ্যে পাওয়া যায় না।

কবি কৃত্তিবাস

চণ্ডীদাসের আগে বা পরে বা এমনও হতে পারে যে তাঁর সমসাময়িক কালে কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণ রচনা করেন। কৃত্তিবাসই বাঙ্‌লা সাহিত্যে প্রথম কবি যিনি কাব্য রচনা করতে বসে নিজের ও নিজের পরিবারবর্গের একটা ভালো রকমের পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছিলেন। কৃত্তিবাসের পিতার নাম বনমালী, মা মেনকা এবং পিতামহ মুরারী ওঝা। রাঢ়ের ফুলিয়া গ্রামে তাঁর বাস ছিল। তাঁরা সাত ভাই (বা ছয় ভাই) ও এক বোন (সৎ বোন)। বারো বছর বয়সে কৃত্তিবাস লেখাপড়া শিখতে বিদেশে যান। লেখাপড়া শিখে ফিরে এসে গৌড়েশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর আদেশে রামায়ণ রচনা করেন। এসব খবর তাঁর আত্মবিবরণীতে পাওয়া যায়। গৌড়েশ্বরের দরবারে পাত্রমিত্রদের উল্লেখে 'খাঁ' উপাধিধারী কেদার খাঁর উল্লেখ পাই। এতে বুঝতে পারি যে তখন মুসলমান রাজারা উপাধি বিতরণ করছেন। দুঃখের বিষয় কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের পাত্রমিত্রদের নাম উল্লেখ করেও গৌড়েশ্বরের নাম উল্লেখ করেন নি। আবার নিজের জন্মবার তিথি মাস উল্লেখ করেও বৎসরটা উল্লেখ করেন নি। আর সেজন্যেই কৃত্তিবাসের জন্মকাল নিয়ে এক সমস্যা দেখা দিয়েছে। আত্মবিবরণীতে তিনি বলছেন—

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘমাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥

এ থেকে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় প্রথমে ১৩৫৪ শকাব্দ, ২৯শে মাঘ, রবিবার (১৪৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দ) এবং পরে প্রাচীন দিনে পুণ্য শব্দ "পূর্ণ" লেখা হ'ত এই মত অনুসারে তিনিই আবার ১৩৩৭ শকাব্দ (১৪১৫-১৬ খ্রীঃ) অথবা ১৩২০ শকাব্দ (১৩৯৮-৯৯খ্রীঃ) বলে ঠিক করলেন। অবশ্যি শেষের দুটো শকাব্দের শেষেরটা গ্রহণ করলে তখন রাজ গণেশকে পাচ্ছি। গণেশ ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দের দিকে বৃদ্ধ বয়সে গৌড়ের সিংহাসনে ছিলেন। এই গণেশকে অনেকে রাজা কংস বলে মনে করেন। বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের মতে এই গৌড়েশ্বর তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ। কিন্তু

এঁর সন তারিখ নিয়েও মতদ্বৈধ আছে। আর কৃত্তিবাস যদি গণেশ-পুত্র যদু সেন বা জলালুদ্দিনের কথা উল্লেখ করে থাকেন তা হলে গৌড়েশ্বরকে দেখার তারিখটা ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দের পরের দিকের হবে। কিন্তু জলালুদ্দিন না হওয়াই সম্ভব। আর গণেশের সময় হলে কৃত্তিবাসের জন্মকাল আনুমানিক ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দই ধরে নিতে পারি।

আমরা যে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাই তার অনেক অংশ কৃত্তিবাসের রচনা নয়। কৃত্তিবাসের যে আদিকাণ্ড ও উত্তর কাণ্ড অকৃত্রিম বলে মেনে নেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে বর্তমানের ছাপানো পুঁথির মিল খুবই কম। নানা রচয়িতার রচনা কৃত্তিবাসের নামে আজও চলছে। যেমন, অঙ্গদের রায়বার অংশটি শঙ্কর কবিচন্দ্রের রচনা। পরবর্তীকালের অনেক রচয়িতার রচনাংশও কৃত্তিবাসী রামায়ণে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। তার কারণ, যদি প্রাচীন দিনে কোনো রচনা একটু জনপ্রিয় হয়ে উঠত অমনি নানা প্রক্ষিপ্ত রচনাংশে এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার রূপান্তরে তার রূপ বদলে যেত। কৃত্তিবাসী রামায়ণের ব্যাপারেও তাই ঘটেছে। তবুও তাঁর নিজস্ব বলে যেটুকু ধরে নেওয়া হয় তাতে তাঁর পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব সম্বন্ধে উচ্চ ধারণাই জন্মে। কৃত্তিবাসও নিজের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তিনি আত্মবিবরণীতে বলছেন—

'পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
সরস্বতী প্রসাদে আমার মুখে শ্লোকে সরে॥
… … …
যত যত মহা পণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে॥

কৃত্তিবাস বাল্মীকির অনুসরণে রামায়ণ রচনা করেন বলে নিজেই বলেছেন। অথচ তাঁর নামে প্রচলিত রামায়ণের সঙ্গে বাল্মীকির রামায়ণের মিল খুব বেশী নেই। তাই তাঁর রামায়ণকে অনুবাদ না ব'লে রচনা বলাই যুক্তিযুক্ত। কৃত্তিবাস বাঙালী কবি। তাই তাঁর রচনায় বাঙালীয়ানা বেশী প্রকাশ পেয়েছে। সীতা উদ্ধারের পর রামের সীতার প্রতি অবিশ্বাস, একমাত্র সমাজের ভয় ছাড়া আর কিছু নয়। কৃত্তিবাসের রচনা বলে পরিচিত একটি অংশ আমরা উদ্ধৃত করছি। এই অংশে রামের চরিত্রটি অত্যন্ত দুর্বলভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। রামের সমাজ ভয়, লোকভয় স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

....

শোক সম্বরিঞা রাম বলেন ধীরে ধীরে ॥
রাবণের ঘরে ছিলে করিলাঙ উদ্ধার।
তোমার লাগিয়া অপযশঃ ঘোষএ সংসার ॥
আমার অপযশঃ ঘুচিল তোমার উদ্ধারে।
উদ্ধারিঞা মেলানি দিলাঙ সভার ভিতরে ॥
আমার কেহ নাহি ছিল তোমার পাশে।
শয়ন ভোজন তোমার না জানি দশ মাসে ॥
সূর্যকুলে জন্ম দশরথের নন্দন।
তোমা হেন স্ত্রীয়ে মোর নাঞি প্রয়োজন ॥
আজ হৈতে নহ সীঞা (সীতা) আমার ঘরণী।
যথা তথা যাহ তুমি দিলাম মেলানী ॥

....

যথা তথা যাহ সীতা আপনার স্থখে।
কেন আজ আইঞা কান্দ আমার সমুখে ॥

সীতার প্রতি রামের এই অদ্ভুত ব্যবহার, তখনকার দিনে সমাজে নারীর কি অসহায় অবস্থা ছিল তাই মনে করিয়ে দেয়। সীতা যখন বলেন—

আন্ত উপান্তের কথা শুন ঠাকুর রাম।
তোমা বিনু অন্যপুরুষ পিতার সমান ॥

তবুও রামের মন টলে না, তিনি বলেন—

অযোধ্যায় জন্ম আমার রাজার নন্দন।
তোমা হেন স্ত্রীয়ে মোর নাহি প্রয়োজন ॥

শেষপর্যন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়ে সীতা নিজের সতীত্ব প্রমাণ করলেন।

কৃত্তিবাস রাম না হ'তে রামায়ণের যে উল্লেখ করেছেন বাল্মীকি রামায়ণ তা বলে না—সেখানে রামচন্দ্রের রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেন বলে উল্লেখ আছে। দস্যু রত্নাকরের বাল্মীকিত্বলাভের সাধনায় যে "মড়া মড়া" আবৃত্তি তাও কৃত্তিবাসের অথবা অন্য কোনো বাঙালী রামায়ণকারের কল্পনা।

কৃত্তিবাসী রামায়ণে শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভাব লক্ষিত হয়। কৃত্তিবাসের

মূল ও অকৃত্রিম রচনায় এই তিনটির কোন্‌টার প্রভাব বেশী ছিল তা জোর করে বলা যায় না। হয়ত বিভিন্ন রচয়িতার ধর্মমতের প্রকাশ ঘটেছে। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণবদের মধ্যে সমাজের সামনের আসনটি দখল করার অদম্য আকাঙ্ক্ষা ছিল। তাই শৈব রাবণের বিষ্ণু পুজা, বিষ্ণু অবতার রামের চণ্ডী পুজা, তরনীসেন ও বীরবাহুর রামভক্তি—এগুলো ধর্মকলহজাতই বলা যায়। পরে সবটা হয়ত একসূত্রে গাঁথা হয়ে কৃত্তিবাসের নামে চলে গেছে। সার্থক ও জনপ্রিয় বাঙ্‌লা রামায়ণ বলতে আজ আমরা কৃত্তিবাসী রামায়ণকেই জানি। কৃত্তিবাস নিজেই বলেছেন—

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব মধুর।
শুনিলে পরমানন্দ পাপ যায় দূর॥

মালাধর বসু

প্রাক্-চৈতন্যযুগের আর একটি শ্রেষ্ঠ রচনা হচ্ছে মালাধর বসু বা গুণরাজ-খানের শ্রীকৃষ্ণবিজয়। কবির নিবাস ছিল বর্ধমানের কুলীন গ্রামে। তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। মালাধর রুকনুদ্দিন বারবক্ শাহ্‌এর কাছ থেকে গুণরাজ খান উপাধি পান। তাঁর পুত্রও 'সত্যরাজ খান' উপাধি লাভ করেন। হিন্দুরা সে যুগে মুসলমানদের দেওয়া মুসলমানী উপাধি গ্রহণ করতেন।

মালাধরের পুঁথিখানির বিশেষত্ব এই যে, প্রাচীনযুগে বোধ হয় এইখানিই একমাত্র পুঁথি যাতে স্পষ্ট সন তারিখ দেওয়া আছে। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচনাকাল সম্বন্ধে মালাধর বলছেন—

তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দশ দুই শকে গ্রন্থ সমাপন॥

অর্থাৎ রচনা কাল ১৩৯৫ শক বা ১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৪০২ শক বা ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় একখানি অনুবাদ গ্রন্থ। কৃত্তিবাস এবং মালাধরের রচনা প্রধানত অনুবাদ। কিন্তু তা একেবারে মৌলিকতাবর্জিত নয়। শ্রীকৃষ্ণ-বিজয় ভাগবতের (১০ম ও ১১শ স্কন্ধের) অনুবাদ। এতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো অপৌরাণিক দানখণ্ড তাম্বুলখণ্ড নেই। অনেকে তাই মালাধরের রচনাকে বড়ু চণ্ডীদাসের রচনার পুর্বে বলে মনে করেন। অবশ্য কোনো কোনো

পুঁথিতে (মনে হয় পরে প্রক্ষিপ্ত হয়ে থাকবে) দানখণ্ড, লীলাখণ্ড আছে।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় অত্যন্ত সম্মানিত গ্রন্থ। মহাপ্রভু মালাধরের পুত্র সত্যরাজ খান ও পৌত্র রামানন্দ বসুকে বলেছিলেন—

গুণরাজ খাঁন কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাঁহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময় ॥
'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।'
এই বাক্যে বিকাইলুঁ তাঁর বংশের হাথ ॥
তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহ মোর প্রিয় অন্যজন রহু দূর ॥

শ্রীকৃষ্ণবিজয় শুধু অনুবাদই নয়, এতে কবির কবিত্ব শক্তিরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষ্ণ মথুরায় গমন করলে গোপীরা বিরহে যে আর্তি প্রকাশ করেন তার বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলেন—

আজ শূন্য হৈল মোর রসের বৃন্দাবন।
শিশু সঙ্গে কেবা আর রাখিবে গোধন ॥
অনাথ হইল আজ সব ব্রজবাসী।
সব সুখ নিল বিধি দিয়া দুঃখ রাশি ॥
আর না যাইব সখী চিন্তামণি ঘরে।
আলিঙ্গন না করিব দেব গদাধরে ॥
আর না দেখিব সখী সে চাঁদ-বদন।
আর না করিব সখী সে মুখ চুম্বন ॥
আর না যাইব সখী কল্পতরু তলে।
আর কানু সঙ্গে সখী না গাঁথিব ফুলে ॥
... ...
অল্পধন লোভ লোক এড়াইতে পারে।
কানু হেন ধন সখী ছাড়ি দিব কারে

শরৎকাল বর্ণনায় কবি বাঙ্‌লা দেশের চিত্রই এঁকেছেন—

... ...
হেন মতে গেল তথা বরিষা সময়।
হরষিত সর্বলোকে শরৎ উদয় ॥

আকাশে নির্মল পথ নীরদ ঘুচিল।
হরিষে বিমান যেন নির্মল হইল॥
অগাধ জল-চর যেন না জানে টুটা পানী।
কুটুম্ব-পোষণে নর যেন দুঃখ নাহি জানি॥
দৃঢ় করিয়া আলি কৃষক রাখে পানী।
গোবিন্দ সেবিয়া যোগী যেন রাখয় পরাণী॥

শ্রীকৃষ্ণবিজয় ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ নয়—তাকে ভাবানুবাদ বলা যায়। প্রাক্-চৈতন্যযুগের পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথচ কবিত্বময় রচনা হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়কে শ্রেষ্ঠ কাব্য বলা যেতে পারে। এই রচনায় তৎকালীন সমাজের চিত্র তেমন না পেলেও সে যুগের সমাজের চাহিদার একটা দিক ফুটে উঠেছে। যে ভক্তি ও নিষ্ঠাকে সমাজের প্রয়োজনে তুলে ধরা প্রয়োজন ছিল, শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে সে প্রয়োজনের উপযুক্ত উপকরণ আছে।

মঙ্গলকাব্য

এযুগের মনসামঙ্গল কাব্যগুলির সাহিত্যমূল্য নির্ণয়ের আগে মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস-প্রণেতা অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন, 'ইহা বাঙ্‌লা দেশের একটি বিশেষ যুগের সাহিত্য-সাধনা হইলেও ইহার সৃষ্টি-প্রেরণার কোন একটি বিশেষ সাম্প্রদায়িক ধর্মবিশ্বাস দায়ী নহে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হইয়া বাঙ্‌লা দেশের লৌকিক ও বহিরাগত বিভিন্ন ধর্মমতের যে অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হইয়াছে, মঙ্গলকাব্যগুলি তাহারই পরিচয় বহন করিতেছে। বিভিন্ন যুগের আচার-আচরণ, সংস্কার-সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাসের বিস্তৃত ভিত্তির উপরই ইহাদের প্রতিষ্ঠা।' মঙ্গলকাব্যে যেসব দেবদেবীদের পাই, তাঁদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবার একটা চেষ্টা আমরা মঙ্গলকাব্যগুলিতে লক্ষ্য করি।

এ দেশে আর্য ও অন্-আর্য বিরোধ ও বিরোধাবসানের আগে যে ধর্ম-বিশ্বাসগুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল—মঙ্গলকাব্যগুলি তাদেরই একটা পৌরাণিক মর্যাদা দেবার চেষ্টা করেছে। মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীরা একটু স্বার্থপর এবং তাঁদের রাগও খুব বেশী। তখনকার দিনে তাঁদের প্রতি মানুষ ভীতিজনিত ভক্তি দেখালেও তাঁদের ভালোবাসেনি। দেবদেবীরা

এত প্রতিহিংসাপরায়ণ হবার মূলে আর্য-দর্পী সমাজের নিম্নতর সমাজ-সংস্থার প্রতি নিরন্তর অবজ্ঞার ভাব অন্যতম কারণ বলে মনে হয়। অনেক সময় এই নিষ্ঠুর দেবতা মুসলমান সমাজেরও ভক্তি শ্রদ্ধা লাভ করেছেন।

মঙ্গলকাব্যের নায়কের সঙ্গে দেবতার প্রবল বিরোধের অবসানে নায়ক দৈবী-মহিমার কাছে মাথা নত করেন। এবং এভাবেই মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী সমাজে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু অনেক সময় নায়ক ও দেবতার মধ্যে একেবারেই বিরোধ দেখা যায় না। সে সব বিরোধহীন কাব্যে সামাজিক মনের নানা অনুভূতির বৈচিত্র্যও তেমন লক্ষিত হয়না।

কিন্তু লৌকিক বিশ্বাসকে পৌরাণিক মর্যাদা দেবার যতই চেষ্টা হোক না কেন, মঙ্গলকাব্যে এই পৌরাণিক দিকটাই অপেক্ষাকৃত কম উজ্জ্বল। যেখানে সাংসারিক জীবনের ঘাত-প্রতিঘাতের ছবি ফুটে উঠেছে, যেখানে তৎকালীন যুগের সমাজ ও যুগচিত্তের প্রকাশ ঘটেছে, সেখানেই কাব্য সার্থকতা লাভ করেছে। কারণ মঙ্গলকাব্যগুলিতে সে যুগের সমাজ-চিত্র এবং সর্বকালের মানব চরিত্র স্বাভাবিকভাবে বিকাশ লাভ করেছে।

শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছেন, "এই মঙ্গলকাব্যগুলি হইতে তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের অনেক তথ্যও সংগৃহীত হইতে পারে।" সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক পরিস্থিতিরও একটা রূপ আমাদের চোখে পড়ে। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবায়ন প্রভৃতি তার প্রমাণ। তবে এগুলি অলৌকিকত্বের ভারে এতই ভারাক্রান্ত যে তার ভিতর থেকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক পরিবেশকে সতর্কভাবে বাছাই করে নিতে হয়। অলৌকিকত্বের অতিরিক্ততা তখনকার সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। হয়ত সে যুগের মানুষ বাস্তব ঘটনার চেয়ে অলৌকিক গল্পেরই বেশী পক্ষপাতী ছিল।

মঙ্গলকাব্যের সূচনাতে নানা দেবদেবীর বন্দনা থাকে। তারপর কবি নিজের পরিচয় দিয়ে কাব্য-রচনার কারণ বিবৃত করেন। মানুষের মনে বিশ্বাস উৎপাদন করার জন্য প্রায় সব মঙ্গলকাব্যগুলিই দৈবাদেশে রচিত বলে উল্লেখ করা হ'ত। কাব্যে দেবতাই প্রধান—মানুষ সেখানে উপলক্ষ্য মাত্র। তবুও কখনও কখনও মানুষ দেবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেবতার চাইতেও বড়ো হয়ে উঠেছেন। চাঁদ সদাগর তার প্রমাণ।

স্বর্গভ্রষ্ট দেবতা এবং দেবী হচ্ছেন কাব্যের নায়ক। তাঁরা মর্তধামে কাব্যোক্ত দেবতার পূজা প্রচলিত ক'রে শাপমুক্ত হয়ে আবার স্বর্গে চলে যেতেন। কাব্যের সাধারণত দুটো ধারা থাকত। একটি হচ্ছে পৌরাণিক ধারা—যেখানে মানুষের কোনো সংবাদ নেই, আছে শুধু দৈবী-মহিমা কীর্তন। এই ধারায় সংস্কৃত পুরাণের প্রভাবই বেশী। আর একটি হচ্ছে লৌকিক ধারা—যেখানে সে যুগের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনের কথা, তার সুখদুঃখানুভূতির কথা প্রকাশ পেয়েছে।

মধ্যযুগে লৌকিক প্রভাবযুক্ত মঙ্গলকাব্যগুলি এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে বৈষ্ণব কবিরাও তাঁদের কাব্যগুলিকে অনেকসময় মঙ্গলকাব্য নামে অভিহিত করেছেন। চৈতন্যমঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল, অদ্বৈতমঙ্গল প্রভৃতি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু এগুলিকে যথার্থ মঙ্গলকাব্য বলা যায় না। মঙ্গলকাব্যে অলৌকিকত্ব ও আধ্যাত্মিকতা যতই থাক না কেন 'বাঙ্‌লার মৌলিক দেবতাদিগকে অবলম্বন করিয়া যে সকল কাব্যের মধ্যে বাঙালীর ব্যক্তি-চরিত্রেরই জয়গান করা হইয়াছে তাহাদিগকেই মধ্যযুগের বাঙ্‌লার মঙ্গলকাব্য' বলা যায়। যে সকল কাব্যে সুখদুঃখময় সমাজ জীবনের সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে, সে সকল কাব্যকেই আমরা যথার্থ মঙ্গলকাব্য বলব। স্বর্গ নয়, যেখানে মাটির পৃথিবী বড়ো—মনসা নয়, যেখানে চাঁদ সদাগর, সনকা, ধনামোনা, চণ্ডী নয়—যেখানে ফুল্লরা, কাঁড়ুদত্ত, মুরারীশীল প্রভৃতি জীবন্ত হয়ে উঠেছে—সে সকল কাব্যই যথার্থ মঙ্গলকাব্য। এই দিক থেকে বিচার করলে মঙ্গলকাব্যগুলিকে আমরা বাঙালীর জাতীয়কাব্যের পর্যায়ভুক্ত করতে পারি।

মনসামঙ্গল কাব্য

এই যুগে মনসা-বিষয়ক কাব্য রচনার প্রথম নিদর্শন পাচ্ছি, বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাস চক্রবর্তীর মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ কাব্যে। এর আগেও হয়ত মনসামঙ্গল বা অন্যান্য মঙ্গলকাব্য রচনার সূত্রপাত হয়েছিল কিন্তু তার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি। বৃন্দাবনদাস তাঁর চৈতন্যভাগবতে যে ভাবে মনসা প্রভৃতির পূজার প্রতি কটাক্ষ করেছেন তাতে মনে হয় বেশ কিছুদিন ধ'রেই এসব লৌকিক দেবদেবীরা সমাজে পূজিত হচ্ছিলেন। আগে কোনো

বিচ্ছিন্ন রচনা থাকলেও মনসা কাহিনী সাহিত্যরূপে প্রকাশ পাচ্ছে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে।

মনসামঙ্গলের মনসা পৌরাণিক দেবতা নন। প্রাচীন কোনো পুরাণে তাঁর উল্লেখ নেই। তাঁরই প্রতিরূপ জরৎকারুকে আমরা মহাভারতে পাই। কিন্তু তিনি এবং আমাদের মনসা যদিও বা পরের দিকে এক হয়ে গেছেন তবুও মূলত তাঁরা এক নন। মনসা দেবীকে নিয়ে নানা মত প্রচলিত আছে। তবে এক সর্পদেবীর পূজা যে প্রায় সারা ভারতে, বিশেষ ক'রে সর্প-প্রধান দেশগুলিতে প্রচলিত ছিল একথা স্বীকৃত। সাপকে এত ভয় করার অর্থ এই যে, ওই জীবটি ভয়ানক হিংস্র, মানুষ তার সঙ্গে এঁটেও উঠতে পারেনা। আমরা দেখতে পাই, মানুষের মনে যা ত্রাসের সঞ্চার করে যা মানুষের আয়ত্তের বাইরে, তাকেই সে তুষ্ট করার জন্য দেবতায় রূপান্তরিত করেছে। এমনি ক'রে আমাদের দেশে শ্রীমতী বসন্ত (শীতলা), কলেরা (ওলাদেবী), বাঘ (রায়মঙ্গলের দক্ষিণ রায়) সাপ (মনসা), কুম্ভীর (কালুরায়) প্রভৃতি তখনকার সমাজে বেশ জায়গা দখল করেছেন। এখনও এঁদের প্রভাব কম নয়।

মনসামঙ্গলের মনসাকে দক্ষিণ ভারতাগতা বলে কেউ কেউ মনে করেন। চ্যাংমুড়ি বা চ্যাংমুড় (মনসাগাছ) শব্দটাও তার সাক্ষ্য দেয়। মহিশূরের দিকে মন্‌চা আম্মা নামে এক সর্পদেবীর পূজা হয়। বাঙ্‌লাদেশে যে মনসাকে পাচ্ছি তিনি নানা পরিকল্পনা ও মতবাদের ভেতর দিয়ে বাঙালীর রূপ ধরে বাঙ্‌লার সমাজ ও সাহিত্যে এসে পড়েছেন।

আর্যদের মধ্যে দেবী পূজা প্রায় ছিলনা বললেই হয়। অন্-আর্য জাতি থেকেই মুখ্যত এই পূজা এসে পড়ে। আর্যদের রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক জয়ের সঙ্গে সঙ্গে আর্য-অন্-আর্য সংমিশ্রণের ফলে আর্যেতর সংস্কৃতি ও ধর্মবিশ্বাসও কিছু কিছু এসে পড়েছিল। দুর্গা, মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি এভাবেই আমাদের সমাজে এসে পড়েছিলেন। তাছাড়া বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকদের মধ্যে যে সব নারী-দেবতারা ছিলেন—তাঁরাও প্রচ্ছন্ন বা অপ্রচ্ছন্নভাবে হিন্দু আবরণের মধ্যে এসে পড়েছিলেন। তারপর ধর্ম কলহ যখন কমে এসেছে এবং যখন পরস্পর সম্প্রীতি বজায় রেখে পাশাপাশি বাস করছে তখন একজন আর একজনের ধ্যান-ধারণা ভাবনার সঙ্গেও পরিচিত হচ্ছে। প্রয়োজন হলে

কিছু কিছু গ্রহণও করছে। আর্য ও আর্যেতর সংমিশ্রণ—বিবাহ বন্ধন, ধর্মানুষ্ঠান, সংস্কৃতির আদানপ্রদান প্রভৃতির ভেতর দিয়েই ঘটেছিল। আর্যদের রাজনৈতিক জয় বা political conquest যেমন গুরুত্বপূর্ণ আর্যেতর সমাজের সাংস্কৃতিক জয় বা cultural conquestও তেমনই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

বাঙলাদেশে মনসা দেবী প্রায় দশম-একাদশ, কি তারও আগে থেকে পূজা পেয়ে আসছেন। মনসার প্রভাব যে সমগ্র বাঙালী সমাজকে আচ্ছন্ন করেছিল তা মনসা পূজার ব্যাপক প্রচলন থেকেই বেশ বোঝা যায়। কারও কারও মতে মনসা পূজা রাঢ় বা পশ্চিম বঙ্গেই বেশী প্রচলিত ছিল। কিন্তু আমাদের মনে হয় নদীমাতৃক বাঙলা দেশের সর্বত্রই প্রচলিত ছিল। বিশেষ ক'রে সর্পসঙ্কুল পূর্ববঙ্গেই বেশী প্রচলিত হওয়া স্বাভাবিক। এখনও পূর্ববঙ্গে যেভাবে ঘটা করে মনসার পূজা হয় পশ্চিমবঙ্গে ততটা নেই। এই সর্পভীতি এমন ব্যাপারও ঘটিয়েছিল যে দেবী বীণাপাণীও এই সর্পপ্রভাবমুক্ত হতে পারেননি। তিনিও 'শুক্লসর্পবিভূষিতা'। বৌদ্ধ জাঙ্গুলী দেবীও "নাগেন্দ্রৈঃ কৃতশেখরাং ফণীময়ীং....।" হয়ত ইনিও মনসার সঙ্গে এক হয়ে গেছেন। কারণ, কোনো কোনো মন্ত্রে পাওয়া যায়—'বন্দে শঙ্খ-মুদ্রিকাং বিষহরীং পদ্মোদ্ভবাং জাঙ্গুলীম্'। (দ্রঃ—বাঙলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য)। আর্যেতর ধারা থেকে আর্য ধারায় এই মনসাদেবী এসে পড়েছেন। তবে একথা সত্য যে, উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যে তাকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে নিতে ভক্তদের, এমনকি নিজেরও বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। তখন ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির মধ্যে মনসা নিজেকে ততটা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেননি। ব্রাহ্মণ্যবাদের সঙ্গে লৌকিক দেবতাদের লড়াই চলেছে। সর্বশক্তির দেবতা মানুষের ওপর নির্মম আঘাত হানছেন। পৌরুষ একদিকে আর দৈবীশক্তি একদিকে। এই সংগ্রামে নিয়তিরই জয় হচ্ছে।

তখনকার দিনের ধর্ম সম্প্রদায়ের রেষারেষি থেকেই অনেক সময় মঙ্গল-কাব্যগুলি রচিত হয়েছে বললে অসঙ্গত হবেনা। শিব ও শক্তির পূজা সমাজে প্রচলিত ছিল। সমাজে যে নবাগত ও নবাগতা দেবদেবীরা এলেন তাঁরা তখনও উদ্বাস্তু। ঘর চাই, যজমান চাই, পূজা চাই। এঁদের মধ্যে মনসার শক্তি যথেষ্ট। বাঙালী এমনিতে সর্প ভয়ে অস্থির—আর সঙ্গে সঙ্গে

বিদেশী মুসলমান শক্তি সম্বন্ধে ভীতি ত আছেই। তাই মনসা যেন ভয়ঙ্করী দেবতারূপেই ভীরু বাঙালীসমাজে স্থান পেলেন।

মঙ্গলকাব্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখতে পাই যে, নানা লেখকরাও কয়েকটি দেবদেবী নিয়ে তাঁদের মাহাত্ম্য কীর্তন শুরু করে দিলেন। এক দেবতা বা দেবী নিয়েও অনেক কবি লিখেছেন। বিভিন্ন যুগে বাঙ্‌লা দেশের লৌকিক ও বাইরের বিভিন্ন ধর্মমতের যে সমন্বয়—মঙ্গলকাব্যগুলি সেই যুগের আচার সংস্কার, সংস্কৃতি ও ধর্ম বিশ্বাসের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে মঙ্গলকাব্যের দেবতারা সমগ্র সমাজে বিশেষ শ্রদ্ধাসহকারে পূজিত হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। নতুন দেবদেবীদের পৌরাণিক মহিমা দান মঙ্গলকাব্যগুলির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এবং সম্পূর্ণ না হ'লেও আংশিকভাবে সাফল্যও লাভ করেছিল। সমাজে দেবদেবীরা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা লাভ করছেন। অবশ্যি মধ্যযুগের বৈষ্ণব ভক্তির প্লাবনে এই ধারা কিছুটা দুর্বলও হয়ে পড়েছিল।

মঙ্গলকাব্যের মধ্যে মনসামঙ্গলের নিদর্শনই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলা যায়। মূলত এই কাব্যের কথা হচ্ছে নিয়তির সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম এবং শেষ পর্যন্ত পুরুষকারের শোচনীয় পরাজয়। মানুষ অদৃশ্য শক্তির কাছে হার মানছে। মনসা মর্তে পূজা পেতে চান—এবং চাঁদ সদাগরের পূজা পেলে অর্থাৎ অভিজাত ঘরে সম্মান পেলে সমাজে তার প্রতিষ্ঠা লাভ করতে বিশেষ বাধা থাকবেনা। ওদিকে চাঁদ সদাগর শৈব। তিনি মনসার পূজা করবেন না। চাঁদকে জব্দ করবার জন্য মনসা তাঁর ছেলেদের হত্যা করলেন, তাঁর ঐশ্বর্য নিলেন হরণ করে। তবুও চাঁদ অচল-অটল। সে বলে—

'যেই হাতে পূজি আমি দেব শূলপাণি।
সেই হাতে পূজিব (না পূজি) চ্যাংমুড়ি কাণি॥

মনসা অবশেষে বারবনিতার বেশে চাঁদকে ভুলিয়ে তাঁর মহাজ্ঞান হরণ ক'রে তাঁকে দুর্বল ক'রে ফেলেন। তবুও লোহার বাসর ঘরে শেষ পুত্র লখিন্দরের প্রাণনাশ ক'রে বেহুলাকে বিবাহের রাত্রেই বিধবা করেও পুত্র-শোকাতুর চাঁদকে দিয়ে নিজের পূজা করাতে পারলেন না। নানা দুঃখ কষ্ট পেয়ে, নানা বিপদের ভেতর দিয়ে স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে বেহুলা গেলেন স্বর্গপুরে। দেবতাদের সন্তুষ্ট ক'রে মনসাপূজার সর্তে স্বামীর জীবন ফিরে পেলেন।

মর্তে ফিরে এসে শ্বশুরকে মনসাপূজা করার জন্য অনুরোধ করেন। চাঁদের আরাধ্যদেবতা শিবও তাঁকে পূজা করতে বলেন। পুত্রবধূর অনুরোধেই বামহাতে ফুল দিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে মনসাকে পূজা করতে সম্মত হলেন। তাতেই পূজা-প্রত্যাশী দেবী সন্তুষ্ট। অবশ্য কোনো কোনো পুঁথিতে চাঁদ 'জোড় হাতে মনসার করয়ে স্তবন' বলে বর্ণিত আছে। চাঁদও মনসার পূজা ক'রে আবার হারানো পুত্রদের এবং সব ঐশ্বর্য ফিরে পেলেন। বেহুলাও আর সংসারে প্রবেশ করলেন না। লখিন্দর ও বেহুলা দুজনেই অভিশপ্ত স্বর্গবাসী—অভিশাপের মেয়াদ ফুরোতেই দুজনেই স্বর্গে ফিরে গেলেন।

গল্পের দিক থেকে দেখতে পাই, চাঁদ সদাগরের চরিত্র যেন আকস্মিক-ভাবে মধ্যযুগে দৈবীশক্তির অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। বিরাট পুরুষকারের ইঙ্গিত রয়েছে এই চরিত্রে। তখনকার দিনে এমন দেবদ্রোহী চরিত্র আর কোনো রচনায় পাওয়া যায়না। কিন্তু এও দেখতে পাই যে, মানুষ দৈবীশক্তিরূপ অদৃশ্য নিয়তির কাছে একান্ত অসহায়। এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এখানে মানুষ বনাম দেবতার সংঘর্ষ নয়। চাঁদেরও পেছনে শিবের ঐশীশক্তির আশীর্বাদ রয়েছে। এ যেন চাঁদের মাধ্যমে দুটো বা তারও বেশী মতবাদের দ্বন্দ্ব চলেছে। জনসাধারণের কাছে লেখকের প্রচারের জোরে মনসাই যেন বেশী 'ভোট' পেলেন।

মনসা হিন্দু মুসলমান উভয় সমাজেরই পূজা পেয়েছিলেন বলেই মনে হয়। বিজয়গুপ্ত বা বিপ্রদাসের এবং অন্যান্য কবিদের হাসান-হুসেন পালাতে প্রথমে হাসান-হুসেনের মনসাকে অস্বীকার ও পরে বিধিমত পূজা করার ব্যাপারে আমরা তাই লক্ষ্য করি। অবশ্যি বিজেতা মুসলমানসমাজকে দিয়ে হিন্দুদেবতা স্বীকার করিয়ে নেওয়াও বোধহয় উদ্দেশ্য ছিল।

কাহিনীর দিক থেকে চাঁদের যে পরাজয় তা একেবারে অস্বাভাবিক নয়। কারণ দেবতার কাছে মানুষের হার মানার পালা চিরদিন চলেছে। বিশেষ করে ধর্মসংগ্রামে বিভিন্ন দেবতার ভক্তরা তাদের নিজ নিজ উপাস্য দেবতাকে বড়ো করবার জন্য মানুষকে পরাভবের যূপকাষ্ঠে বলি দিয়েছেন। সাহিত্যের দিক থেকে চাঁদের পরাজয় করুণ ট্রাজেডির সৃষ্টি করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর কবি মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণ

চরিত্রে চাঁদের চরিত্রবৈশিষ্ট্যের মিল পাওয়া যায়। আমরা আগে বলেছি পুত্রবধূর প্রতি স্নেহবশে তিনি নিজে এই পরাজয় মেনে নিয়েছেন। মনসামঙ্গলে চাঁদ সদাগর দেবতার চাইতেও মহান হয়ে উঠেছেন। সাধারণত মধ্যযুগের সাহিত্যে দেবতারাই প্রধান স্থান অধিকার করে থাকতেন। মনসামঙ্গলে কবি অজ্ঞাতসারেই যেন মঙ্গলকাব্যের বিধিনির্দেশকে কিছু কিছু উপেক্ষাও করেছেন। মঙ্গলকাব্যের নায়ক-নায়িকারা স্বর্গ থেকে আসতেন। কোনো একটা শাপে এখানে এসে কোনো দেব বা দেবীর পূজা প্রচলিত করে শাপমুক্ত হয়ে আবার চলে যেতেন। কাব্যের শেষের দিকে এমন একটা স্বর্গীয় আভাস থাকে যে তাকে শুভপরিণামান্তক বলেই গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু মনসামঙ্গলে এসব বজায় রাখার চেষ্টা থাকলেও চাঁদসদাগরের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর করুণ পরাজয় মঙ্গলকাব্যের সব conventionকে ছাপিয়ে উঠেছে।

এই যুগে সতীত্বের মহিমা ঘোষণাও হয়ত সামাজিক কারণে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সমাজের ঢিলেঢালা ভাব এবং অসংযম সমাজকে নিশ্চয় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এজন্য নারীকেও যেন সচেতন করে দিতে হচ্ছিল। বেহুলা সতীত্বের জীবন্ত আলেখ্য। সতীত্বের জোরে যে দেবতাকেও বশ করা যায়—এমন কি মৃত্যুদূতকেও যে পরাজিত করা যায়, বেহুলার চরিত্রের মধ্যে সে পরিচয় আমরা পেয়েছি। মনসামঙ্গলে আর একটি জীবন্ত অথচ বেদনাপূর্ণ চরিত্র হচ্ছে লখিন্দরের মাতা সোণকার। পুত্রহারা মা তীব্র বেদনায় বেহুলাকে বলেছেন—

… … বধু তুমি পরম রূপসী।
আমার বাছা খাইতে আইলা পরম রাক্ষসী ॥

আবার যখন বেহুলা মৃতস্বামী নিয়ে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দিচ্ছেন তখন বলেন, 'লখাইর বদলে মোরে মা বলিয়া ডাক।' পুত্র ও পুত্রবধূ সবাইকে হারিয়ে সহৃশীলা রমণীর চাঁদের গৃহকোণে দীর্ঘনিঃশ্বাস সম্বল করে থাকতে হয়। কাব্যের শেষে শিব যখন বলেন—যে চণ্ডী, সেই শিব, সেই মনসা—মনে হয় তখন যেন সকল ধর্ম মতের বা বিশ্বাসের সমন্বয়ের চেষ্টাও চলছে। অন্তত সব ধর্মমতের মাঝে একটা সহজ প্রবেশের পথ যে নির্মিত হচ্ছিল এটা ধরে নেওয়া যেতে পারে।

মনসামঙ্গলে যে যুগের সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে সে যুগে বাঙ্‌লাদেশে ব্যবসাবাণিজ্য বেশ ভালোভাবেই চলত। ব্যবসাতে বাঙালীর অসাধুতাও বেশ স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। বাজে জিনিস দিয়ে ভালো জিনিস আদায় করছে। তখন ব্যবসাবাণিজ্য মুখ্যত দ্রব্যবিনিময়ের মাধ্যমেই চলত।

মুসলমান বিজেতাদের অত্যাচারের কাহিনী মনসামঙ্গলে গাজীর পালাতে পাওয়া যায়। শেষে অবশ্যি মনসার কাছে হার মেনে হাসান-হুসেন মনসার পুজা করছেন। সমাজে চাঁদসদাগরের মতো মধ্যস্তরের লোকদের বেশ প্রতিপত্তি ছিল। মনসার পুজা প্রথম নারীদের দ্বারাই সম্ভবত প্রচারিত হয়েছিল। আর সেও নিম্ন ও মধ্যস্তরের মধ্যে। ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজে এ পুজার প্রচলন ততটা হয়নি। মনসামঙ্গলে চণ্ডীভক্ত বা শাক্ত এবং শৈবদের সঙ্গেই যেন দ্বন্দ্ব বেশী করে দেখা দিয়েছে। বোধহয় চণ্ডীর পুজা তখন একটু বেশী প্রচলিত ছিল। মনসামঙ্গলে ত চণ্ডী আর মনসা মারামারিই করে বসলেন। চণ্ডী দিলেন মনসার চোখ কানা করে, আর মনসা চণ্ডীর বুকে ছোবল বসিয়ে দিলেন। শেষে চণ্ডী হার মানলেন। আর শিবের যা অবস্থা, তা অত্যন্ত শোচনীয়। চরিত্রের দিক থেকে এত দুর্বলচরিত্র মঙ্গলকাব্যে খুব কমই আছে। শিব তাঁর কন্যা মনসাকে চিনতে না পেরে এক কেলেঙ্কারী করে বসলেন। বেহুলা যখন স্বর্গপুরে স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনতে গেলেন, তখন প্রথম ত একবার নেচে সবাইকে মুগ্ধ করতে হ'ল। তার ওপর আবার নারায়ণদেবের শিব বলেন—

যদি আলিঙ্গন দাও তুমি
জিয়াইব লক্ষীন্দর পাঠাইয়া দিব ঘর
সদয় হইয়া তবে আমি।

এই মনোভাব দেবোচিত নয়। তাই সেখানেও তাঁকে চণ্ডীর কাছে লজ্জা পেতে হল। মনে হয় শিব এবং শৈবরা তখন সমাজে নিজেদের সম্মান অনেকখানি হারিয়েছেন। নইলে শিবের যে চরিত্র মনসামঙ্গলে (অন্যান্য মঙ্গলকাব্যেও) প্রকাশ পেয়েছে তা নিয়ে খুব গর্ব করা চলে না।

সন তারিখ দেবার সময় মুসলমান সুলতানদের উল্লেখ ছাড়া এসময়ে মনসামঙ্গল কাব্যে দেশের রাজরাজড়ার উল্লেখ বিশেষ পাচ্ছিনা—তবে শাসকবর্গের অত্যাচারের বর্ণনা হাসান-হুসেন পালায় কিছুটা রয়েছে। তখন

যে নির্বিবাদে হিন্দুরা তাদের ধর্মানুষ্ঠান করতে পারত না এই কাব্য থেকে তা বুঝতে পারি। মনসামঙ্গল গান যাঁরা করতেন তাঁদের আর্থিক অবস্থা বিশেষ ভালো ছিলনা। অনেক সময় দেখি গায়েনরা 'লখিন্দরকে' বাঁচাবার সময় তার গায়ে বস্ত্র নাই বলে শ্রোতাদের কাছ থেকে বস্ত্র আদায় করছেন। তখনকার দিনে বৈশ্য ও শূদ্রদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত ছিল। মনসা-মঙ্গলের এক জায়গায় বলা হচ্ছে—

'তোরা ত বৈশ্যের ঝি   অসম্ভব আছে কি
সাঙ্গা তোদের আছে পূর্বাপর।'

ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরাবির্ভাবে এবং তার কঠোর নির্দেশে আবার এ বিধবাবিবাহ উঠে যায়। সহমরণ প্রথাও তখন প্রচলিত ছিল। চাঁদসদাগরের উক্তি থেকে জানতে পারি—

বধূর ঠাঁই জিজ্ঞাসা কর কি আছে সাহস।
লখাইর সঙ্গে পুড়িয়া মরুক ঘুচুক অপযশ॥

সে সময় দেবোদ্দেশ্যে পশুবলি-প্রথারও বহুল প্রচলন ছিল। বৈষ্ণবরা এই প্রথার বিরোধী ছিলেন। শৈবরা বলি-প্রথার অনুকূলে ছিলেন না। কিন্তু চাঁদসদাগর বোধহয় সামাজিক সাধারণ নিয়ম মেনেই নানা রকম পশু বলি দিয়েছিলেন। তখন চণ্ডীর পূজায় বলির বিশেষ দরকার ছিল—এখনও তাই আছে।

মনসামঙ্গলের লেখকদের এক আধজন ছাড়া প্রায় সবাই দরিদ্র মধ্যবিত্ত ঘরের লোক ছিলেন। আর শ্রোতাদের বেশীর ভাগই বোধহয় ছিল সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোক। মনসাকে সমাজের উপরতলায় প্রতিষ্ঠিত করতে বেগ পেতে হয়েছে। চণ্ডী যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন তার কারণ শিবের স্ত্রী হিসাবে তিনি তখন সমাজে বেশ পরিচিতা। কাজেই উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে নিজের জায়গা করে নিতে তাঁর ততটা অসুবিধা হয়নি। এসব পূজার মধ্যে যে বৌদ্ধ বা তান্ত্রিক প্রভাব ছিল বৈষ্ণবযুগে তা অনেকটা কমে এসেছে। পরের যুগেও অনেক মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে, কিন্তু বৈষ্ণবপ্রভাবিত সমাজে তার সুর তেমন উচ্চগ্রামে এসে পৌছাতে পারেনি। অবশ্যি বলিষ্ঠ হাতের কোনো কোনো রচনা বৈষ্ণব সাহিত্যের পাশে দাঁড়াবার সম্মান ও অধিকার লাভ করেছিল। আমাদের আলোচ্য

যুগের মনসামঙ্গল কাব্যগুলির কাহিনীঅংশ প্রায় এক হলেও প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে বিভিন্ন কবির রচনায় কিছুটা পার্থক্য আছে।

এ যুগের মনসামঙ্গল রচয়িতাদের মধ্যে বিজয় গুপ্ত ও বিপ্রদাস চক্রবর্তীকে (পিপিলাই) পাচ্ছি। অনেকে নারায়ণদেবকেও এই সময়ের বলে মনে করেন। ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় তাঁকে সপ্তদশ শতকের দিকেই বলে ধরেছেন। অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁর 'বাঙ্‌লা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে নারায়ণদেবকে আরও আগের লোক বলে মনে করেন। তাঁর মতে, কুলকারিকা প্রভৃতির বিচারে নারায়ণদেব পঞ্চদশ শতকের দিকেরই হবেন। নারায়ণদেবের গ্রন্থে কোনো সন তারিখ পাওয়া যায় না। ৺দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় মনে করেছিলেন নারায়ণদেব বিজয় গুপ্তেরও কিছু পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

নারায়ণদেব ময়মনসিংহ জিলার কিশোরগঞ্জের বোরগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষেরা রাঢ় অঞ্চল থেকে এসেছিলেন। কবির পিতার নাম নরসিংহ দেব। এঁরা জাতিতে কায়স্থ। আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে কবি এক জায়গায় বলেছেন, 'জন্ম লভিল শুদ্ধ কাহেস্তের ঘর'। নারায়ণদেবকে আসামের অধিবাসীরাও নিজেদের বলে দাবী করেন। আসামে তাঁর কাব্যের বিশেষ প্রচলন ছিল। তবে সেখানে তাঁর রচনার ভাষাগত অনেক পরিবর্তন ঘটেছিল। এসব অবশ্যি তর্কের কথা। নারায়ণদেবের যে কাব্য আমরা পাচ্ছি তাতে যে অনেক প্রক্ষিপ্ত অংশ ঢুকে পড়েছে তা বেশ বোঝা যায়। তাঁর কাব্যের আলোচনা আমরা পরে করছি।

সম্পূর্ণ মনসামঙ্গল কাব্য যে একজনই রচনা করেছিলেন তা বলা দুষ্কর। এক কবির নামে প্রচলিত কাব্যে নানা কবির ভণিতাও পাওয়া গেছে। হয়ত অনেক লিপিকর বা গায়েনরা অনেক অংশ জুড়ে দিয়েছিলেন। আবার এমনও হতে পারে যে অনেক কবির রচনাংশ সংযোজিত হয়ে মনসার অনেক পালাগানও গড়ে উঠেছিল।

বিজয় গুপ্ত

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গলের রচনাকাল সম্বন্ধে তাঁর কাব্যে দুটি ছত্র পাওয়া যায়। তাতে কবি বলছেন—

ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হুসেন শাহ নৃপতি তিলক॥

এই শ্লোক থেকে মনে হয় বিজয় গুপ্ত ১৪১৬ শকাব্দে (১৪৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দ) পদ্মাপুরাণ রচনা করেন। তিনি বরিশালের গৈলা-ফুল্লশ্রী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। পদ্মাপুরাণের এক জায়গায় কবি বলছেন—

মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কাণা হরিদত্ত॥
হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হইল কালে।
যোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে॥

এই উক্তির দ্বারা মনে হয় বিজয় গুপ্তের পূর্বে (কাণা) হরিদত্ত নামে এক কবিও মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। কাব্য রচনা, তার প্রচার এবং বিলুপ্তি—সব মিলিয়ে দেখতে গেলে হরিদত্তের কাব্য চতুর্দশ শতকের প্রথম দিকে রচিত হয়েছিল বলে মনে হয়। অবশ্যি এটা খুব স্পষ্ট অনুমান নয়। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে হরিদত্ত ময়মনসিংহের অধিবাসী ছিলেন।

ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় বিজয় গুপ্তের ভাষাকে "অত্যন্ত আধুনিক" বলে মনে করেন। আমাদের মনে হয়, নানা হাতে পড়ে হয়ত কাব্যের ভাষার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। বিজয় গুপ্তের রচনা সরসতাবর্জিত নয়। তখনকার দিনের মা-সৎমা অধ্যুষিত ঘরের কাহিনীও তিনি বেশ সরসভাবে বর্ণনা করে গেছেন। তৎকালীন গ্রাম্য সমাজেরও কিছু কিছু ছবি পাওয়া যায়। হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের অত্যাচার বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলছেন—

পরেরে মারিতে কিবা পরের লাগে ব্যথা।
চোপাড় চাপড় মারে দেয় ঘাড় কাত্তা॥
যে ব্রাহ্মণের পৈতা দেখে তারা কান্ধে।
পেয়াদা বেটা লাগ পাইলে তার গলায় বান্ধে॥
ব্রাহ্মণ পাইলে লাগ পরম কৌতুকে।
তার পৈতা ছিড়ি ফেলে থু দেয় মুখে॥

এই প্রসঙ্গে অন্যত্র বলছেন—

হারাম জাত হিন্দুর হয় এত বড় প্রাণ।
আমার গ্রামেতে বেটা করে হিন্দুয়ান॥

গোটে গোটে ধরিব গিয়া যতেক ছেমরা।
এড়া-রুটি খাওয়াইয়া করিব জাতি-মারা॥

সোণকার রান্নার ব্যাপারে কবি শাক থেকে মাছ মাংস প্রভৃতি ব্যঞ্জনের এবং পায়েস পিঠার যে দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন তাতে কবির রসনা-রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। তবে মনে হয়, রসনা-রুচি অপেক্ষা আকাঙ্ক্ষাই বেশী প্রকাশ পেয়েছে। ব্যঞ্জনাদি যাতে সুস্বাদু হয় তার জন্য সোণকা রান্নার আগে—

অগ্নি প্রদক্ষিণ করি মাগে বর দান।
মুঞি যেন রন্ধন করি অমৃত সমান॥

স্বামী-পুত্রকে সুখী করবার জন্য নারী-হৃদয়ের আকুলতা সোণকার এই প্রার্থনার ভেতর দিয়ে সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

মানব সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য মনসার ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে চণ্ডীর কাছে মনসার খেদোক্তিতে—

জনম দুখিনী আমি দুখে গেল কাল।
যেই ডাল ধরি আমি ভাঙ্গে সেই ডাল॥
শীতল ভাবিয়া যদি পাষাণ লই কোলে।
পাষাণ আগুন হয় মোর কর্মফলে॥
কারে কি বলিব মোর নিজ কর্মফল।
দেবকন্যা হৈআ স্বর্গে না হইল স্থল॥

এই অক্ষমা দেবকন্যা একেবারে সাধারণ নারীর মতোই নিজের অদৃষ্টকে দোষারোপ করে।

বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে অনেক কবির উল্লেখ পাওয়া যায়। তাতে মনে হয় পদ্মাপুরাণের সবখানিই বিজয় গুপ্তের রচনা নয়। তবে সবটুকু বিজয় গুপ্তের রচনা না হলেও বিজয় গুপ্ত যে একেবারে অর্বাচীন একথাও জোর করে বলা যায় না। ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় বিজয় গুপ্তের ভাষায় যে আধুনিকতা দেখতে পেয়েছেন তাও হয়ত বিজয় গুপ্তের কাব্যের বহুল প্রচলনের জন্যই ঘটেছে। তাঁর কাব্যে পয়ার লাচাড়ি প্রভৃতি ছন্দ এবং পূর্ববঙ্গে প্রচলিত বহু শব্দের প্রয়োগ লক্ষিত হয়।

বিপ্রদাস চক্রবর্তী

বিপ্রদাস চক্রবর্তীর পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গলের রচনাকাল সম্বন্ধে কবি নিজে বলছেন—

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন শাহ গৌড়ের প্রধান ॥

এই সঙ্কেত থেকে ১৪১৭ শকাব্দই (১৪৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দ) তাঁর মনসামঙ্গলের রচনাকাল হিসাবে পাওয়া যায়। বিপ্রদাস বসিরহাটের নাদুড়্যা-বটগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কবির পিতার নাম ছিল মুকুন্দ পণ্ডিত।

বিপ্রদাস মনসার 'জাগুলি' বলে আর একটি নামেরও উল্লেখ করেছেন। চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য-যাত্রার পথে যেসব জায়গাগুলি পড়েছিল সেগুলির নামেও কিছুটা বৈচিত্র্য আছে। কবি কলিকাতা, কালীঘাট, চিৎপুর, বারুইপুর, রিষড়া, কাঁকিনাড়া প্রভৃতি অঞ্চলের উল্লেখ করেছেন। কালীঘাটের উল্লেখ পরবর্তীকালে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলেও আছে। তবে এসব নাম যদি পূর্ব থেকেই প্রচলিত না থাকে তাহলে আমরা এইটুকু ধরে নিতে পারি যে এসব অংশ বিপ্রদাসের কাব্যে প্রক্ষিপ্ত হয়ে থাকবে। কবির মনসামঙ্গলে আর একটি লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই কাব্যে ধর্মঠাকুরের উল্লেখ পাচ্ছি। বিজয় গুপ্তের কাব্যে এর উল্লেখ নেই। ধর্মঠাকুরের পূজা পশ্চিম বঙ্গেই বেশী প্রচলিত। কিন্তু ধর্মঠাকুর নিয়ে পৃথক সাহিত্য রচনা আরও পরের দিকে হয়েছে। পশ্চিম বঙ্গ বা রাঢ় অঞ্চলের অন্যান্য দেব-দেবী বিষয়ক কাব্যেও এই ধর্মঠাকুরের বন্দনা এবং ধর্মপুরাণ কথিত সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি পাওয়া যায়।

বিপ্রদাসের কাব্যে শ্রীচৈতন্যের কোনো উল্লেখ নেই। চৈতন্য-পরবর্তী কালে বাঙলা দেশে খুব কম মঙ্গলকাব্যই আছে যাতে শ্রীচৈতন্যের অবতার হিসাবে বন্দনা নাই। বিপ্রদাসের কাব্যের সরস মাধুর্য এবং ছন্দসৌষ্ঠব লক্ষণীয়। তাঁর কাব্যেও তৎকালীন পশ্চিম বাঙলার সমাজের অনেক কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য পাওয়া যায়। বাঙালী ব্যবসায়ীরা দ্রব্য-বিনিময়ের সময় যে কপটতার আশ্রয় নিত এই মনসামঙ্গলে তার উল্লেখ পাই। চাঁদসদাগরের অনুপম-পাটনের রাজার সঙ্গে দ্রব্য-বিনিময়ে :

কৌতুকে দেখায় রাজা (চাঁদ) ঝুনা নারিকেল।
দক্ষিণাবর্ত দেহ ইহার বদল॥
হরিদ্রা দেখায় চাঁদ করিয়া মন্ত্রণা।
ইহাতে খণ্ডায় যত ব্যাধি যন্ত্রণা॥
ইহার বদল সোণা কহিনু তোমারে।
ওজন করিয়া লও দেহ তো আমারে॥
খেম ধুতি যত দেখহ রাজন।
বদলিয়া পাটে বোঝা দেহ তো বসন॥
পাঁড়ু কুমড়া দিয়া কহে নৃপবর।
ইহার বদলে দেহ সিসার থাপর॥
হস্তিদন্ত দেহ মোর মিশির বদলে।
তণ্ডুল বদলে দেহ মুকুতা প্রবালে॥ ইত্যাদি

বিপ্রদাস তাঁর কাব্যের ভণিতায় 'মনসাবিজয় দ্বিজ বিপ্রদাসে ভাষে' বলেছেন। কবি নিজে কাব্যটিকে মনসাবিজয় বলে উল্লেখ করেছেন। বিপ্রদাসের কাব্যের আখ্যানবস্তুর সঙ্গে বিজয় গুপ্ত বা পূর্ববঙ্গের অন্যান্য কবিদের কাব্যের আখ্যানবস্তুর তেমন মিল নেই। বিপ্রদাসের কাহিনী-পরিকল্পনায় কিছু নতুনত্ব আছে। তবে শিব ও চণ্ডী চরিত্র এখানেও স্খলন-পতনের উর্ধ্বে নয়। ব্রহ্মাও নারীর রূপের কাছে একান্ত অসহায়। মনসা-বিজয়ের সবখানি বিপ্রদাসের রচনা নয় বলেই মনে হয়। পরের দিকে অনেক অংশ হয়ত প্রক্ষিপ্ত হয়ে থাকবে।

নারায়ণদেব

বিজয় গুপ্ত ও বিপ্রদাসের মতো নারায়ণদেবের কাব্যেও শ্রীচৈতন্যের কোনো উল্লেখ নেই। কিন্তু অন্যদিকে ধনপতি ও বীরসিংহের কাহিনী চণ্ডীমঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দরের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। অথচ এসময়ে কোনো চণ্ডীমঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্যের নিদর্শন পাওয়া যায় না। হয়ত এসব কাহিনী পরের দিকে তাঁর কাব্যে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। নারায়ণদেবের রচনায় কবিত্বের অভাব নেই, তবে ময়মনসিংহ অঞ্চলের ভাষাপ্রয়োগহেতু অনেক সময় তাঁর রচনা পড়তে অসুবিধা হয়। তাহলেও মধ্যযুগের ভাষার যেটুকু

সঙ্গতি ছিল তাঁর কাব্যে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। যেমন লখিন্দরের মৃত্যুতে বেহুলার শোক-বর্ণনায় কবি বলছেন—

কোলেতে করিয়া বিপুলা কান্দে উচ্চস্বরে।
বিপুলার ক্রন্দন শুনি বৃক্ষের পাতা ঝরে॥
পাষাণ বিদরে আর বিদরে মেদিনী।
সর্বদাএ ঝরে তবে দুই নয়নে পানী॥

আবার বিপুলার ভাই নারায়ণ বিপুলাকে স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে অজানার উদ্দেশে ভেসে যেতে যখন নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে তখন বিপুলা বলে—

বিপুলাক বোলে ভাই কোন চিন্তা নাই।
পুণরপি আসিবাম প্রভুক জীআই॥
ভাইক বিদায় করি বিপুলা সুন্দরী।
ছাড়াইয়া যায় বিপুলা চিত্ত স্থির করি॥

নারায়ণের চাঁদ সদাগর একটু গোঁয়ার গোছের মানুষ। বিজয় গুপ্তের চাঁদের মতো 'জোড় হাতে' ভালো মানুষটি হ'য়ে মনসার পূজা করেননি। বেহুলার উপরও তিনি কোনো সুবিচার করেননি। যে নারী সতীত্বের মহিমা বলে স্বামী, ভাশুর এবং ভাইদের পুনরুজ্জীবিত করে ফিরিয়ে আনতে পারে তার সতীত্ব পরীক্ষার এত কি প্রয়োজন ছিল? সমাজে রামায়ণের সীতার মতো হয়ত প্রশ্ন উঠতে পারে—তাই শুধু নারায়ণদেব নন, মনসামঙ্গলের প্রায় সব কবিরাই বেহুলার এই পরীক্ষা দেখিয়েছেন। নায়ায়ণদেব এবিষয়ে আরও একটু কঠিন। তাঁর কাব্যের বিপুলা সাতটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অষ্টম পরীক্ষার সময় পৃথিবী থেকে একেবারে বিদায় নিল। অনেকটা সীতার শেষ পরীক্ষার সময় পাতালে প্রবেশের মতোই।

কবি বিদ্যাপতি

এই যুগের কথা শেষ করার আগে মৈথিলী কবি বিদ্যাপতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। বিদ্যাপতি বাঙালী নন, কিন্তু বাঙালী তাঁর পদাবলীর সঙ্গে এত বেশী পরিচিত যে বাঙ্‌লা সাহিত্যে তাঁর স্থান চিরদিন সবার উপরেই থাকবে। বিদ্যাপতির আবির্ভাব কাল নিয়ে সঠিক কিছু বলা যায় না। তবে চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার

দিক তাঁর আবির্ভাব কাল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। বিদ্যাপতি মিথিলার রাজা শিবসিংহের প্রায় সমসাময়িক। তিনি দীর্ঘজীবী কবি ছিলেন। সম্ভবত তিনি শৈবসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু এদেশে সবাই তাঁকে বৈষ্ণব বলে শ্রদ্ধা করে। তাঁর শিব বিষয়ক পদও কিছু কিছু পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি পদাবলী ছাড়া কীর্তিলতা, পুরুষপরীক্ষা, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। কীর্তিলতা অপভ্রংশ বা অবহট্‌ট ভাষায় রচিত একখানি ঐতিহাসিক কাব্য। চৈতন্যচরিতামৃতকার বলেছেন—

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।
এই তিন গীতে করায় প্রভুর আনন্দ॥

শ্রীচৈতন্য বিদ্যাপতির পদের রস আস্বাদন করতেন। তাঁর পদলালিত্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে বলা যায়, এমন অপূর্ব ঝংকারপূর্ণ সঙ্গীতমাধুর্যেভরা পদ শুধু প্রাচীন যুগে কেন, পরবর্তী কালেও ক্বচিৎ মিলে।

বিদ্যাপতির দুয়েকটি পদ উদ্ধৃত না করলে মধ্যযুগের বাঙ্‌লা বৈষ্ণব সাহিত্যের রসাস্বাদন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। রসোদ্গারের একটি পদে কবি বলছেন—

নাহি উঠল তিরে রাই কমল-মুখি
সমুখে হেরল বর কান।
গুরুজন সঞে লাজে ধনি নতমুখি
কৈছনে হেরব বয়ান॥
সখিরে অপরুপ চাতুরি গোরি।
সব জন তেজি আগুসরি ফুকরই
আড় বদন তহিঁ ফেরি॥ ধ্রু॥
তহিঁ পুন মোতি-হার টুটি পেলল
কহত হার টুটি গেল।
সব জন এক এক চুনি সঞ্চরু
শ্যাম দরশ ধনি কেল॥
নয়ন-চকোর কানু-মুখ শশি-বর
করল অমিয়া রসপান।
দুহুঁ দোহাঁ দরশনে রসহুঁ পসারল
বিদ্যাপতি ভালে জান॥

এই পদে রাধা-প্রেমের যে অপূর্ব রূপ ফুটে উঠেছে তাতে শকুন্তলার প্রথম প্রণয়াভাসের সঙ্গে যেমন সাদৃশ্য দেখতে পাই, তেমনই বিদ্যাপতি-পরবর্তী কালের বৈষ্ণব কবিদের কৃষ্ণপ্রেমে আকুল রাধার সাদৃশ্যও লক্ষিত হয়।

বিদ্যাপতির অভিসারানুরাগিণী রাধা—

নব অনুরাগিণী রাধা।
কছু নাহি মানয়ে বাধা॥
একলি কয়লি পয়ান।
পন্থ বিপথ নাহি মান॥ ইত্যাদি।

গোবিন্দদাসের অভিসারিকা রাধাতেও এই বিঘ্নজয়ী প্রেমিকার রূপটি প্রকাশ পেয়েছে। এদিক থেকে কবি জয়দেব ও বিদ্যাপতি মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিদের গুরুস্থানীয় বললে অত্যুক্তি হবে না। জয়দেবের তিমিরাভিসারিকা রাধা কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য অভিসারে চলেছেন—

রতি-সুখ-সারে গতমভিসারে মদন মনোহর বেশম্।
নকুরু নিতম্বিনি গমন-বিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্॥
ধীরে-সমীরে যমুনা-তীরে বসতি বনে বনমালী॥ ধ্রু॥
নাম-সমেতং কৃত সঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্।
বহুমনুতে ননুতে তনু-সঙ্গত-পবন-চলিতমপি রেণুম্॥
পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত-ভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিত-নয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্॥
মুখরমধীরম্ ত্যজ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলম্।
চল সখি কুঞ্জং সতিমিরপুঞ্জং শীলয় নীল-নিচোলম্॥

এই অভিসার ও প্রেমোল্লাসের ললিত পদগুলি পরবর্তী যুগের বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যকে রসমধুর করে তুলেছিল। বিদ্যাপতির প্রেমোল্লাসের পদ ও ভক্তিরসাশ্রিত পদগুলি বাঙালী হৃদয়কে একাধারে উদ্দীপিতও করেছে, বেদনাবিধুর করেও তুলেছে। কবি যখন বলেন—

মাধব বহুত মিনতি করু তোয়
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পলুঁ
দয়া জনু ছোড়বি মোয়॥

তখন বুঝতে পারি এ আকুলতার অর্থ মানবজীবনের মাঝে নিত্য-সুন্দরকে

পাওয়ারই আকুলতা। বিদ্যাপতির কবিতা শুধু বৈকুণ্ঠের উদ্দেশেই রচিত হয়নি। সেখানে মানবজীবনের প্রেমবৈচিত্র্যানুভূতির সার্থক প্রকাশও ঘটেছে।

বিদ্যাপতির পদাবলী এতই জনপ্রিয় হয়েছিল যে মিথিলা থেকে আসাম পর্যন্ত তার অনুকরণ চলেছিল। এবং তাঁর ভাষার অনুকরণ করতে গিয়ে বাঙ্‌লা দেশে 'ব্রজবুলি'র মতো একটি নতুন ভাষারও উদ্ভব ঘটেছিল। জ্ঞানদাস, বলরামদাস, গোবিন্দদাস প্রভৃতি এই 'ব্রজবুলি'তে বহু পদ রচনা করেছেন। মিথিলার চেয়ে বাঙ্‌লাদেশেই বিদ্যাপতির পদ বেশী প্রচলিত ছিল। তবে অনেক বাঙালী পদকর্তার 'ব্রজবুলি'তে রচিত পদ বিদ্যাপতির নামে চলে গেছে। 'সখি কি পুছসি অনুভব মোয়', 'এ সখি হমরি দুখের নাহি ওর', 'আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু পেখনু পিয়া মুখ চন্দা' প্রভৃতি বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত পদগুলি বিদ্যাপতির নয় বলেই প্রমাণিত হয়েছে। বিদ্যাপতির পদমাধুর্য আধুনিক কালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথকেও ভানুসিংহের পদাবলী লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিল। বাঙ্‌লা সাহিত্যে, বিশেষ করে বৈষ্ণব সাহিত্যে, বিদ্যাপতির প্রভাব অনস্বীকার্য বলেই বিদ্যাপতি বাঙালী না হলেও বাঙালীরই অতি আদরের কবি।

মোটামুটি এই পর্যন্ত প্রাক্-চৈতন্য যুগের সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ৺দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় শূন্যপুরাণ, গোরক্ষ বিজয়, মীনচেতন, সঞ্জয়ের মহাভারত, অনন্ত রামায়ণ, দ্বিজ জনার্দনের চণ্ডী, শিবের ছড়া, মহাভারত পাঁচালী রচয়িতা কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী প্রভৃতিকে এই যুগের মধ্যে এনে ফেলেছেন। নিঃসংশয়ে এই রচনাগুলিকে এযুগের বলা যায় না। তবে অনেক কাহিনী যে এই যুগ বা তার পূর্ব থেকে প্রচলিত ছিল একথা বলা অসঙ্গত হবে না। শিবের ছড়া বা পাঁচালী এবং কিছু কিছু লৌকিক কাব্য সম্ভবত এসময়ে লেখা হয়েছে। সমাজের নিম্নস্তরে যে সব দেবদেবীদের নিয়ে কাহিনী প্রচলিত ছিল এসময় নিশ্চয় ভদ্র পাড়ায় তাঁদের আনাগোনা চলেছে। আমরা পরবর্তী কালের ধর্মমঙ্গলে যে সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থার উল্লেখ পাই, তাও এই যুগ বা এর পূর্বের পাল-সেন যুগের। 'ধর্মের দেহারা' ভেঙে দেবার যে পদ্ধতি ছিল, তাও বোধহয় মুসলমানেরা দেহারা বা দেবগৃহ ভেঙে দিয়েছিলেন বলেই। শূন্যপুরাণকে ধর্মপূজাপদ্ধতির একখানি সংকলন বলা যেতে পারে। গ্রন্থখানি পাঠে মনে হয় মন্ত্রগুলো প্রাচীন যুগের হওয়াই সম্ভব।

সে যুগের সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা, আচার সংস্কার, তখনকার ধর্মমত এবং বিভিন্ন ধর্মমতের রেষারেষি, সংঘর্ষ, তখনকার শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবস্থা প্রভৃতির একটা পরিচয় এই যুগের মঙ্গলকাব্যগুলিতে কিছু কিছু পাওয়া যায়। সে যুগের চাষী, তাঁতী, কৈবর্ত এবং নিম্নবিত্ত দরিদ্রের মনোবেদনা দরিদ্র রচয়িতার লেখনীতে সুন্দরভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। সেই দুঃখ যেমন দরিদ্র রচয়িতার, তেমনই তখনকার সমগ্র দরিদ্র বাঙালী সমাজের দুঃখও বটে।

এই যুগটিকে বলা যেতে পারে ইতস্ততবিক্ষিপ্ত অব্যবস্থিত সমাজের গুছিয়ে নেবার যুগ। নানা ধর্মসম্প্রদায়ের, নানা শ্রেণীর মানুষের, আপন আপন অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য জীবনসংগ্রামের যুগ।

বিভিন্ন সংস্কৃতির সংঘাত ও সংমিশ্রণের ফলে এতদিন যে দেবদেবীরা দূরে দূরে ছিলেন, তাঁরা ধীরে ধীরে বাঙালীর মনোভূমিতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছেন। বৌদ্ধদের ক্ষমতা লোপ পাওয়াতে তাঁদের দেবদেবীরাও হিন্দু ধর্মসংস্কারের মধ্যে এসে পড়েছিলেন। মুসলমানরা আসার পর এদেশের অধিবাসীরা অনেক শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত থাকলেও, মুসলমান ও অ-মুসলমান এই দুটোই প্রধান ধারারূপে দেখা দেয়। অনেকে মুসলমানদের প্রতি ভক্তি ও ভয়েতে ইস্‌লাম-ধর্মও গ্রহণ করছিল। বাঙ্‌লাদেশের আর্দ্র আবহাওয়ায় অনেকদিন বাস করার ফলে বিদেশী মুসলমানরা সুকোমল-চিত্ত বাঙালী হয়ে পড়ছিলেন। তবে এটা ঠিক যে, শ্রেণীস্বার্থ সম্বন্ধে সমাজের উপরতলার হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই সচেতন ছিল। এই বিভিন্ন শ্রেণীতে যে বিরোধ, যা তখন ধর্মবিরোধের রূপ পরিগ্রহ করেছিল, কখনও কখনও তা সুস্পষ্ট শ্রেণীবিরোধ হয়েও দেখা দিয়েছে। মঙ্গলকাব্যগুলিতে রাজশক্তির বিরুদ্ধে প্রকৃতিপুঞ্জের যুদ্ধ বা বিদ্রোহের কাহিনী তার উদাহরণস্বরূপ ধরে নেওয়া যেতে পারে।

সমাজে টিকে থাকতে হলে রাজার বা অভিজাত সম্প্রদায়ের করুণার উপর যে নির্ভর করতে হবে সে মনোভাব তখনকার লেখকদের মধ্যে বেশী পাওয়া যায়। এযেন সমাজে স্ত্রীপুত্র নিয়ে বেঁচে থাকার নিরুপায় প্রয়াস। লেখকরা ধনী-সমাজ ও দেবতার দিকে বেশী লক্ষ্য রাখা সত্ত্বেও সমাজের দরিদ্র-সাধারণকে একেবারে এড়াতে পারেননি।

প্রাচীন যুগ থেকেই একমাত্র বৈষ্ণবধর্ম-প্লাবিত সমাজ ছাড়া বাঙ্‌লা দেশের

সমাজব্যবস্থা বা রাষ্ট্রব্যবস্থা দীর্ঘদিন স্থায়ী কোনো পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়নি। যে যে স্তর-পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে সমাজ একটা সুনির্দিষ্ট জায়গায় এসে পৌঁছাতে পারে অনেক সময় দেশ ও সমাজের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। 'ধর্ম কলহে' যে 'শ্রীবৃদ্ধি' হচ্ছিল, ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব প্রেমধর্মের বন্যায় তার গুরুত্ব অনেকখানি কমে গেল। তখনকার বাঙালী সমাজে যে সংহতির প্রয়োজন ছিল, শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব আন্দোলনে তার একটি ঝোঁক (tendency) ছিল। এই বৈষ্ণব-ধারাও যখন ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছিল তখন বিশেষ করে অনুবাদ সাহিত্য, ধর্ম-নিরপেক্ষ কাব্য এবং পূর্বের সাহিত্য-ধারার পুনরাবৃত্তি দেখা দিয়েছিল। সেই থেকে সমাজ-ব্যবস্থার আশানুরূপ ক্রম-পরিবর্তন না ঘটে' ইংরেজ জাতির আবির্ভাবের পরে ঊনবিংশ শতাব্দীতে তা থমকে দাঁড়ায়, এবং নতুন চিন্তাধারার সম্মুখীন হয়। তার পরিচয় আমরা পাবো।

আগামী দিনের সূচনা

আমরা পূর্বে যে মুসলমান রাজত্বকালের উল্লেখ করেছি, তার শেষের দিকে যে বাঙ্‌লা দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কিছুটা শান্তি ফিরে আসছিল, তারও আলোচনা করেছি। ইলিয়াশ শাহী আমল থেকে বাঙ্‌লার সমাজে একটি সংগঠনমূলক দিক দেখা দিয়েছিল। মালাধর বসু রুকনুদ্দিন বারবক্ শাহ্এর (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রীঃ) যে উল্লেখ করেছেন তাতে তখন শাসকবর্গের সহিষ্ণুতার এবং কিছুটা উদারতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সহিষ্ণুতার আরও সার্থক রূপ দেখি আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্এর (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) আমলে। হুসেন শাহ্এর রাজত্বকাল যে বাঙ্‌লা দেশের ও সমাজের পক্ষে অতি শুভকাল তা মালাধর বসু, বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস চক্রবর্তী, ছোট বিদ্যাপতি, যশোরাজ খান প্রভৃতির উক্তি থেকে বুঝতে পারি। তাঁর সেনাপতি পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত রচনা করেন। তাঁর পুত্র ছুটিখাঁর আদেশে শ্রীকর নন্দী অশ্বমেধ পর্ব রচনা করেন। হুসেন শাহ্ যেমন ক্ষমতা-শালী শাসক ছিলেন—তেমনি তাঁর উদারতারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে। মধ্য যুগের মুসলমান সুলতানদের মধ্যে হুসেন শাহ্‌কে শ্রেষ্ঠ বললে অত্যুক্তি হবে না। ইলিয়াশ শাহী আমলের যা ভালো তাকে গ্রহণ করে প্রজাবর্গের

কল্যাণের দিকে তাকিয়ে তিনি এমনভাবে শাসনকার্য চালিয়েছিলেন যে তখনকার যুগের হিন্দুরা তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলে উল্লেখ করতেও দ্বিধাবোধ করেনি। তাঁকে 'নৃপতি-তিলক' 'জগৎভূষণ' প্রভৃতি আখ্যাও দেওয়া হয়েছিল। এতদিন ধরে অত্যাচার ও শোষণ যে জনসাধারণকে বিব্রত ক'রে তুলেছিল সেই তাদেরই মধ্যে তিনি আবার শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। ধর্মের দিক থেকে উদারতার তুলনা করতে গেলে একমাত্র আকবরের সঙ্গেই তাঁর তুলনা চলে। তিনি রাজ্য-পরিচালনায় হিন্দুদের গুরু দায়িত্ব দিয়েছিলেন। রূপ ও সনাতন তাঁর রাজত্বকালে শাসন বিভাগে প্রধান প্রধান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর সময়ের বৈষ্ণব লেখকরাও তাঁর যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। কথিত আছে যে, হুসেন শাহ্ মহাপ্রভুর প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন এবং মহাপ্রভুর গৌড় পরিক্রমণ কালে তিনি তাঁর কর্মচারীদের প্রতি এই আদেশ দিয়েছিলেন যেন প্রত্যেকে মহাপ্রভুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং তাঁর পরিক্রমণের ব্যাপারে সর্বপ্রকার সাহায্য করে।

তাঁর পুত্র নসিরুদ্দিন নুস্‌রৎ শাহ্‌ও (১৫১৯-৩২ খ্রীঃ) পিতৃ-চরিত্রের উদারতার অধিকারী ছিলেন। তিনি নিজেও বাংলা সাহিত্য রচনায় উৎসাহ দিতেন। তাঁর সময়ে পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁ শ্রীকর নন্দীকে দিয়ে মহাভারতের অনুবাদ করিয়েছিলেন। নুসরৎ শাহ্‌এর সমসাময়িক কবি কবিরঞ্জন (বিদ্যাপতি) অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে সম্রাটের উল্লেখ করেছেন।

নুসরৎ শাহ্‌এর পুত্র আলাউদ্দিন ফীরোজ শাহ্‌এর (১৫৩২-৩৩) আদেশে বাঙালী কবি শ্রীধর বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেন। এতে ফীরোজ শাহ্‌ও যে বাঙ্‌লা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী ছিলেন তা স্পষ্ট বুঝতে পারি।

ইলিয়াশ শাহী আমলের দ্বিতীয় পর্ব থেকে আলোচিত সময় অবধি বাঙ্‌লা সাহিত্যে উৎকর্ষের কাল বলতে পারি। এসময় বাঙ্‌লা ভাষা সাহিত্যের প্রকাশের বাহন হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। এবং অনেক ভাবুক ও শিল্পী-মন সৃষ্টির প্রেরণায় সাহিত্য ও সমাজের এই সমৃদ্ধিময় যুগে লেখনী ধারণ করেছেন। এই যুগেই মহাপ্রভুর আবির্ভাব। এই যুগই বাঙ্‌লার নব চেতনা বা জাগরণের মাহেন্দ্রক্ষণ।

দ্বিতীয় পর্ব

চৈতন্য ও চৈতন্য-প্রভাবিত যুগ

১

চৈতন্য ও চৈতন্য-প্রভাবিত যুগ

যে প্রাক্-চৈতন্যযুগ আমরা পেরিয়ে এলাম, সে যুগে প্রধানত মুসলমান-শক্তির বঙ্গ-অভিযান ও জয় এবং তাঁদের রাজত্বের আরম্ভ ও ক্রম-পরিণতির রূপ দেখতে পেয়েছি। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙ্‌লায় মুসলমান রাজশক্তির কিছুটা প্রতিপত্তি থাকলেও ষোড়শ শতাব্দী থেকে মোগলশক্তির চাপে তাঁরা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়েন। কিন্তু ছোটোখাটো কর্মচারীদের অত্যাচার অব্যাহত ছিল। কবি মুকুন্দরাম ডিহিদার মামুদ সরীপের যে অত্যাচারের কথা উল্লেখ করেছেন তা থেকে আমরা বুঝ্‌তে পারি যে রাজকর্মচারীদের অত্যাচারে তখন দেশবাসীকে বেশ উৎকণ্ঠায় থাকতে হত।

সুলতান হুসেন শাহ্ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীঃ) এবং তাঁর ছেলে সুলতান নুস্‌রৎ শাহ্‌এর (১৫১৯-১৫৩২ খ্রীঃ) পর থেকে ইলিয়াশ্‌শাহী আমলের সুলতানদের পতন ঘটতে থাকে। তারপর বাঙ্‌লাদেশ কিছুদিনের জন্য আফগানদের হাতে চলে যায়। সুলতান হুসেন শাহ্ ও নুসরৎ শাহ্‌এর রাজত্বকালেই বাঙ্‌লাদেশ সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে সার্থক রূপ লাভ করে। সুলতান হুসেন শাহ্‌এর সময় হিন্দুরা বেশ কিছুটা উৎকণ্ঠামুক্ত হন। নুসরৎ শাহ্‌এর সময়ও এই উদার রাজনীতির যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

এদিকে সমাজক্ষেত্রে দেখতে পাই হিন্দু সমাজে যে বর্ণভেদ ছিল তাকে মোটামুটি বজায় রেখে ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণ অভিজাতশ্রেণী সমাজে শাসন চালিয়ে যাচ্ছেন। রাষ্ট্রব্যবস্থাও তখন একটি নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করছে। অনেকে তখন স্বেচ্ছায়ই হোক আর চাপে পড়েই হোক ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করছেন। এমন কি মুসলমানদের ছোঁয়াছুঁয়ির মধ্যে যাঁরা এসে পড়েছিলেন তাঁরাও তখন আর হিন্দু সমাজে আপন অধিকার বজায় রাখতে পারছেন না। একেবারে নিম্নস্তরে যারা ছিল তারা ধীরে ধীরে নিজেদের একটি সমাজ গ'ড়ে তুলছে। এদের একটু ওপরে যারা ছিল তারা 'নবশাখ' ইত্যাদি রূপে পরিচিত হয়েছে।

সমাজে হিন্দুরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার খুব চেষ্টা করছেন।

কিন্তু হিন্দুধর্মে নিশ্চয় কিছুটা গোঁড়ামি ও শৈথিল্য দেখা দিয়েছিল। নইলে এত ধর্মান্তর গ্রহণ সম্ভব হতে পারেনা। অন্যদিকে ব্রাহ্মণপ্রধান সমাজ ন্যায়নিষ্ঠা বজায় রাখবার চেষ্টা করলেও নানা বাধা এবং অসুবিধার জন্য বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেনি।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে, বিশেষ ক'রে হুসেন শাহ্‌এর সময়, বাঙ্‌লা সাহিত্য কিছু কিছু রচিত হলেও পরবর্তী যুগের প্রয়োজনীয় উপকরণ এই যুগেই সংগৃহীত হয়েছে। বাঙ্‌লাদেশে তখন ব্যাপক শাস্ত্রচর্চা চলছে এবং বিশেষ ক'রে নবদ্বীপ তখন নব্যন্যায় শাস্ত্রের পীঠস্থান হয়ে উঠেছে।

মুসলমান রাজারা পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে প্রত্যক্ষভাবে বাঙ্‌লা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করছেন। হিন্দুদের সাহিত্য সাগ্রহে শুনছেন, পাঠ করছেন, লেখাচ্ছেনও। হুসেন শাহ্‌এর আদর্শ অনুসরণ করে তাঁর সেনাপতি পরাগল খাঁ এবং নুসরৎ শাহ্‌এর সময়ে পরাগল-পুত্র ছুটি খাঁ যথাক্রমে যে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীকে দিয়ে মহাভারতের অনুবাদ করান একথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। নুসরৎশাহ্‌এর সময় বিখ্যাত কবি কবিরঞ্জনের (ছোটো বিদ্যাপতি) আবির্ভাব ঘটে।

বৃন্দাবনদাসের রচনা থেকে জানতে পারি যে, তখন দুর্গা, চণ্ডী, মনসা, ষষ্ঠী প্রভৃতির পূজা বেশ প্রচলিত ছিল। যোগীপাল, ভোগীপাল, মহীপাল প্রভৃতির গীত শুনতে সবারই বেশ আগ্রহ ছিল। জনসাধারণ এইসবই বেশী পছন্দ করত। এযুগে হিন্দুরা নিজ সমাজ ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য সংস্কৃতিগত নানা রকম প্রতিরোধ সৃষ্টির চেষ্টা সত্ত্বেও মুসলমান সমাজের আচার সংস্কার বেশ-কিছু গ্রহণ করেছেন। কেউ কেউ হয়ত আচারে বিচারে ব্যবহারে, এমন কি নামধারণেও মুসলমানদের রীতিনীতি গ্রহণ করেছেন।

চৈতন্যদেবের জন্মের পর থেকে আরম্ভ করে তাঁর চরিত্রপ্রভাব ও জীবনের অলৌকিকত্ব সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করার পূর্ব পর্যন্ত আমরা যে সাহিত্য পেয়েছি তা প্রধানত চৈতন্য-প্রভাব-বর্জিত। এসব সাহিত্যে সমাজের যে রূপ দেখতে পাই চৈতন্যযুগে তার খুব বেশী পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের প্রভাব বাঙ্‌লাদেশে যে যুগান্তর এনেছিল সেই প্রভাব চৈতন্য-পরবর্তী কালের ওপরও স্পষ্ট স্বাক্ষর রেখে গেছে। এই যুগের সব চেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, একদিকে স্মার্ত রঘুনন্দন, রঘুনাথ শিরোমণির দলের

নব্যন্যায়, অপর দিকে চৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণব প্রেমধর্ম একই সময় এদেশে পাশাপাশি দেখা দিয়েছিল। এই দুই ধারা কি করে পাশাপাশি থাকতে পারে—এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই মনে হয় 'Bengal is the land of extremes—a land of paradoxes'. এখানে রঘুনন্দন-রঘুনাথের নব্যন্যায় দেখা দিতে পারে, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবও ঘটতে পারে। একদিকে সমাজের সংরক্ষণশীল অংশের গতানুগতিক সংস্কারের পথ, অপর দিকে প্রগতির ঝোঁকসম্পন্ন ব্যক্তিদের অপেক্ষাকৃত সহজ সরল ও ব্যাপক ধর্মবিশ্বাসের পথ খোঁজা দুইই এযুগে সম্ভব হয়েছে।

হিন্দু সমাজে মানুষে মানুষে যে বিরাট ব্যবধান ছিল শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব সেই ব্যবধান ঘোচাবার সহায়কই হয়েছিল। সবাইকে একটি সংস্থার মধ্যে আনার চেষ্টার আভাস আমরা শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত প্রেমধর্মে পাই না কি? তিনি এই ধর্মমতকে সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য করে সমাজকে অনেকখানি জীর্ণতামুক্ত কি করেন নি? পূর্বে যে সংস্কৃতিকে বাঁচানো অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল মহাপ্রভুর আবির্ভাবে তা আরও সহজ ও সার্থক হয়ে উঠল। নানা মত ও পথের ভিড় ঠেলে শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম সমাজে একটি সুন্দর প্রশস্ত পথ নির্মাণ করেছিল। তখনকার সমাজে কেউ চণ্ডী, কেউ মনসা পুজা করছেন, কেউ-বা ন্যায়নিষ্ঠ বেদপ্রিয়। তাদের মাঝে শুধু নাম ও প্রেমের সহজ ও সোজা পথটি দেখিয়ে দিয়ে এবং সবাইকে সেই পথের পথিক করে তোলার চেষ্টা এই বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে পাই।

তখনকার ছোটো বড়ো সবার মনে বৈষ্ণব প্রেমভক্তিবাদ অপূর্ব আবেগ এনে দিয়েছিল। সমাজের মধ্যে যে স্তর বা জাতিভেদ ছিল, এই প্রেমভক্তির কাছে তা একেবারে গৌণ হয়ে গেল। মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা এই মতবাদের অন্যতম লক্ষ্য—অবশ্যি প্রধান লক্ষ্য হল মানুষের সুখদুঃখ-দ্বন্দ্বাতীত ভগবৎরসাস্বাদন। এই বৈষ্ণব প্রেমধর্ম তখনকার সামাজিক মানুষকে ঐক্যসূত্রে বাঁধবার চেষ্টা করেছিল এবং কিছুটা সফলও হয়েছিল। এভাবে চৈতন্য-প্রচারিত প্রেমধর্ম বহিরাগত ইসলামধর্মের পরোক্ষ প্রতিরোধ হিসাবেও দেখা দিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই প্রেমধর্ম মাটির সীমানা ছেড়ে ভাবের উর্ধ্বলোকে যাত্রা করেছে।

শ্রীচৈতন্যের সময়ে সমাজ ও সংস্কৃতির গঠনের পালা শেষ হয়ে এসেছে।

মহাপ্রভু এমন এক অপূর্ব ভাববৈচিত্র্য সবার সামনে প্রকাশ করলেন যাতে সামাজিক মন সহজেই আকৃষ্ট হয়। বিশেষ করে তখন শান্তিপুর-নবদ্বীপকে ভিত্তি করে সংস্কৃতির যে প্রাণকেন্দ্র গড়ে উঠছিল, তার যুগনায়ক ছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য। তাঁর ব্যক্তি-প্রতিভা সমাজের আপামর জনসাধারণের মধ্যে এক বিরাট আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছিল। কিন্তু সে আলোড়নকে রাজনৈতিক আলোড়ন বললে ভুল হবে। রাজনৈতিক কোনো সম্ভাবনা থাকলেও উদারদৃষ্টিসম্পন্ন ধর্মের ঝোঁকটাই প্রধান ছিল।

শ্রীচৈতন্যের ব্যক্তি-প্রতিভার দিগন্তপ্রসারী দীপ্তিচ্ছটা বাঙ্‌লার মানুষকে মুগ্ধ করেছে। দেবমহিমার ফাঁকে ফাঁকে মানবমহিমা কীর্তিত হয়েছে। কথাকে 'ভাবের স্বর্গে' এবং 'মানবেরে দেবপীঠস্থানে' নিয়ে গেছে। ষোড়শ শতাব্দীর পটভূমিকায় আমরা দেখি যে তখন ব্রাহ্মণ্য ও অন্যান্য মতের বাহুল্য থাকা সত্ত্বেও চৈতন্য-প্রচারিত ও প্রভাবিত বৈষ্ণবমত বাঙালীকে বেশী আকৃষ্ট করেছে। তৎকালীন বৈষ্ণব সাহিত্যে সামাজিক নরনারীজীবনের অনুভূতি স্বর্গীয় সুষমা লাভ করেছে।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, শ্রীচৈতন্যের পূর্বেও বৈষ্ণবধর্ম বাঙলা দেশে বর্তমান ছিল। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের সময় এই বৈষ্ণবধর্ম এত গভীর ও মধুর হ'য়ে দেখা দিল যে বাঙালী সমাজ তার মধ্যে আপনার বেদনাহত জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেল। যে বংশগত কৌলীন্য ও বর্ণবিন্যাস বাঙ্‌লার সমাজজীবনকে সংকুচিত করে আনছিল, আচণ্ডাল মানুষের বৈষ্ণব-ভাবুকতা সেই সংকীর্ণতাকে দূর করে দিল। সেখানে আর মুষ্টিমেয়ের কথা নয়, সেখানে রয়েছে সমষ্টিগত জীবনের মাধুর্যানুভূতির ব্যঞ্জনা। সমাজে ছোটো-বড়োর ব্যবধান অনেকখানি ঘুচে গেছে এই বৈষ্ণব রসতত্ত্ব প্রচারের মাধ্যমে। ব্রাহ্মণে চণ্ডালে বিভেদের দুস্তর দুর্লঙ্ঘ্য সাগর শুকিয়ে শুধু রইল মিলনের স্রোতস্বিনীর কুলু কুলু সঙ্গীত। 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তি পরায়ণঃ' এই হ'ল মূলমন্ত্র। যে ধর্ম তখন প্রচারিত হ'ল তাও 'বেদ-বিধি বহির্ভূত'। ব্রাহ্মণ্যধর্ম-কণ্টকিত সমাজে যে নতুন ভাবধারা দেখা দিল তার ধারক ও বাহকগণ অধিকাংশই জোলা, তাঁতি, চামার, শূদ্র, নাপিত প্রভৃতিই ছিলেন। শ্রীচৈতন্য ব্রাহ্মণ হলেও তাঁর সম্প্রদায়ের অধিকাংশই ব্রাহ্মণেতর জাতিসম্ভূত ছিলেন। তখনকার গোঁড়া সনাতনপন্থীরা এই নতুন ধর্মমতের স্রোতকে বন্ধ করতে পারেননি।

শ্রীচৈতন্য মধ্যযুগীয় সংস্কারের মধ্যে থেকেও জাতিভেদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর প্রেমধর্ম জাতিভেদের অনেক উর্ধ্বে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ব্রাহ্মণ্যপন্থী গোঁড়া সমাজে তখন নানা সঙ্কোচনের দিক দেখা দিলেও হুসেন শাহী আমলের উদারতা শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত ধর্ম এবং মধ্যযুগীয় সাহিত্যের গতিপথ আরও বাধাবন্ধহীন করেছিল। তখনকার বহু রচনায় হুসেন শাহ্‌এর যশঃ বর্ণনা দেখতে পাই। তখন ধর্মানুষ্ঠান ইত্যাদিতে আর তেমন কোন বাধা ছিল না। হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ই পাশাপাশি বাস ক'রে নিজ নিজ আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে পারত।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শ্রীজগন্নাথ মিশ্র এবং মাতার নাম শ্রীশচী দেবী। জগন্নাথ মিশ্র পরম পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর আদি বাস ছিল শ্রীহট্ট। চৈতন্যদেবের গার্হস্থ্য জীবনের নাম ছিল বিশ্বম্ভর—ডাক নাম ছিল নিমাই। গায়ের রঙ্ গৌরবর্ণ ছিল বলে তাঁর আর এক নাম ছিল গৌরাঙ্গ বা গোরা। তিনি ছেলেবেলায় বেশ দুষ্টুমি করে বেড়াতেন। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের বাল্যলীলা অংশে সে পরিচয় আমরা পেয়েছি। জগন্নাথমিশ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হয়ে সংসার পরিত্যাগ করাতে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর বিবাহ একটু তাড়াতাড়িই হয়। কথিত আছে, বিবাহের পূর্বেই দুজন দুজনকে দেখে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হন। এবং শ্রীচৈতন্য বিবাহের অনুকূলে মাকে মত জানিয়েছিলেন। ব্যাকরণ প্রভৃতি শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হয়ে শ্রীচৈতন্য নবদ্বীপে একটি টোল খুলে অধ্যাপনা শুরু করে দেন। কেশব কাশ্মীরীর মতো বিখ্যাত পণ্ডিতকেও তিনি তর্কযুদ্ধে পরাজিত করেন। সবাই যখন তাঁকে ধর্ম বিষয়ে কিছু বলতে যেতেন—তিনি সেসব কথা উড়িয়ে দিয়ে কেবল ব্যাকরণ ও অলংকারের ভুল ধরতেন। সন্ন্যাসের পূর্বে তাঁর মনে যুক্তিবাদের প্রাধান্য বেশী ছিল। এই পণ্ডিত বিশ্বম্ভর মিশ্রই একদিন সকল ব্যাকরণ-অলংকারের অতীত ভাব-সমুদ্রে নিজেকে ভাসিয়ে দিলেন।

শ্রীচৈতন্যের সংসার-বৈরাগ্যের নানা কারণের মধ্যে একটি কারণ মনে হয় প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর সর্পদংশনে মৃত্যু। লক্ষ্মীদেবীকে তিনি অত্যন্ত

ভালোবাসতেন। তাঁর মৃত্যু এবং গয়ার ঈশ্বর পুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও তাঁর কাছ থেকে দীক্ষাগ্রহণ মহাপ্রভুর জীবনে অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। মহাপ্রভু দ্বিতীয়বার মায়ের অনুরোধে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেন। কিন্তু ভগবৎপ্রেমে পাগল শ্রীচৈতন্যকে সংসারের বাঁধন আর বাঁধতে পারলো না। মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে (১৫০৯-১০ খ্রীষ্টাব্দে) তিনি সংসার ত্যাগ করে কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি যে ভক্তিধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করলেন তাতে 'আত্মনেপদী' ও 'উৎপ্রেক্ষা' আর রইল না।

মহাপ্রভু নবদ্বীপের গণ্ডী পেরিয়ে ভারতের বৃহত্তর পরিবেশের মাঝে প্রেমভক্তিবাদ নিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর মধুর ব্যক্তিত্ব এবং প্রেমভক্তিবাদ সারা ভারতের জনসাধারণকে উদ্বেলিত করে তুলেছিল। রাজা থেকে পথের কাঙাল ভিখারী পর্যন্ত সবাই তাঁকে ঘিরে প্রেমের মধুচক্র রচনা করেছিল। নিত্যানন্দ, হরিদাস, শ্রীবাস ভ্রাতৃগণ, অদ্বৈতাচার্য, বাসুদেব ঘোষ, মুকুন্দ, মুরারি গুপ্ত প্রভৃতি তাঁর সন্ন্যাসাশ্রমের জীবনকে আরও মহীয়ান্ করে তুলেছিলেন। সারা ভারতে পর্যটনের দ্বিতীয় পর্যায়ে রামকেলিতে হুসেন শাহ্‌এর মন্ত্রী দবীর খাস (সনাতন গোস্বামী) এবং সাকর মল্লিক (রূপ গোস্বামী) তাঁর সংস্পর্শে আসেন। জীবনের শেষের দিকে তিনি পুরীতে বাস করতেন। এবং সেখানেই ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৪৮ বৎসর বয়সে তাঁর তিরোভাব ঘটে। বাঙ্‌লার সমাজে এসময়ের মধ্যেই চৈতন্য মহাপ্রভু অবতার হিসাবে স্বীকৃত হয়েছেন। বাঙালীর হৃদয়-সমুদ্র মন্থন করে চৈতন্যরূপ অমৃতময় বিরাট ব্যক্তি-সত্বার যে আবির্ভাব ঘটেছিল, সেই মহান্ ব্যক্তিসত্তা প্রেমের নিত্যতাকে মানবজীবনের মূলমন্ত্র করে দিয়ে অমর স্বর্গীয় প্রেম-মহিমার ইতিহাস রচনা করলেন।

বাঙালীর জীবনে চৈতন্যদেবের দান অনস্বীকার্য। তাঁর প্রচারিত প্রেম-ধর্ম, নামধর্ম, নাম-সংকীর্তন মধ্যযুগের বাঙালী জীবনের মূলধন স্বরূপ। আজও বাঙালীর হৃদয় এই পাগলকরা প্রেমধর্মের মাঝে আত্মার শান্তি ও জীবনের চরম আনন্দকে খুঁজে পায়। চৈতন্যদেব কোনো সংগঠন রচনা না করলেও দেশবাসীকে একটি সংহতি দান করেছিলেন। বিশুদ্ধ ভক্তির পরিবর্তে বৈষ্ণব সমাজে 'রাগানুগা' ভক্তিকেই জীবনের চরম আদর্শ বলে মেনে নেওয়া

হয়েছিল। মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর থেকেই বৈষ্ণবদের মধ্যে অনেক শাখা দেখা দেয়। চৈতন্যদেবকে ভগবান বলে মেনে নিয়ে নরহরি সরকার ঠাকুর প্রভৃতি গৌড়নাগরী শাখার প্রবর্তন করেন। অদ্বৈতাচার্য, নিত্যানন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্যদের নিয়ে কয়েকটি বৈষ্ণব শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। নিত্যানন্দ-শাখায় বৌদ্ধ সহজিয়া তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের নেড়ানেড়ীরাও ছিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম-মত সহজিয়া মতবাদের প্রতিকূল ছিল না বলেই মনে হয়।

বৃন্দাবনের ষড়্‌গোস্বামীরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। পরের দিকে এই ধর্মমতই বেশীর ভাগ বাঙালী বৈষ্ণবের ধর্মমত হয়ে দাঁড়ায়। এই মতেও শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণের অবতার। এঁরা কিন্তু শাক্ত, তান্ত্রিক অর্থাৎ বামাচারী প্রথার বিরোধী ছিলেন। বৃন্দাবনের ষড়্‌গোস্বামী প্রবর্তিত মতবাদের ধারক ও বাহক হিসাবে পরের দিকে আমরা শ্রীনিবাস আচার্য, শ্রীনরোত্তম দাসঠাকুর ও শ্রীশ্যামানন্দ দাস প্রভৃতি মহাজনদের পাই।

মহাপ্রভু যে প্রেমভক্তিবাদের দ্বারা বাঙালী তথা সমস্ত ভারতবাসীর হৃদয় জয় করেছিলেন (এখানে সংক্ষেপে আমরা তার রসতত্ত্বটি বোঝার চেষ্টা করব।) পরমাত্মা ও জীবাত্মার সেব্য সেবক ভাবই বৈষ্ণব ধর্মমতের গোড়ার কথা। (রামানুজ, বল্লভ, নিম্বার্ক, মধ্বাচার্য প্রভৃতি বৈষ্ণবদার্শনিকরা এই মতবাদ বিভিন্নভাবে প্রচার করেন।) বাঙ্‌লার বৈষ্ণবরা বললেন, জীব শুধু ব্রহ্মকে চায় না, ব্রহ্মও জীবকে কামনা করেন। কৃষ্ণ রাধা-প্রেমে বিভোর হয়ে বলেন—

কহিব রাধারে তাহার অন্তরে
সদাই আছি যে বাঁধা।
করে করি কর জপি নিরন্তর
এ দুই অক্ষর রাধা॥

বৈষ্ণব সাধকরা স্বর্গের দেবতাকে, দূরের দেবতাকে, বহু তপযজ্ঞের দেবতাকে, মানুষের প্রেমভিখারীরূপে, প্রিয় সখারূপে কল্পনা করেছেন। আমাদের দেশে অধ্যাত্ম সাধনার তিনটি পথের নির্দেশ দেওয়া হয়। প্রথমটি জ্ঞানের পথ। কিন্তু এ পথ সাধারণের পথ নয়। কারণ জ্ঞানের পথ হচ্ছে শাণিত ক্ষুরধারের পথ। দ্বিতীয়টি হচ্ছে কর্মের পথ। এ পথ জ্ঞানের পথের চেয়ে সোজা। তাই ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক মন এ পথেই চলতে চেয়েছে। তবু প্রাণের পিপাসা এতেও মেটেনি। গীতা, শঙ্করাচার্য অনেক

কিছু দিলেও, অমৃত-রস-সমুদ্রের তীরে নিয়ে গেলেও, তার আস্বাদের আনন্দ থেকে দূরে রেখেছিল। তাই এল ভক্তির পথ। এই পথ দুঃখদারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষের মনে আশার বাণী বয়ে আনল। বাইরে যে মীমাংসাকে—যে সার্থকতাকে এতদিন সবাই খুঁজে বেড়াচ্ছিল—ভক্তিবাদ তাকে আরও নিকটের করে আনল। ভক্তিবাদ যখন বলে—'রসো বৈ সঃ। রসহ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতী'—তখন সে পরম রসসম্পদ আর কিছুরই অপেক্ষা রাখে না। সে শুধু ব্যথিত পতিত কাঙালের জন্যই যেন অপেক্ষা করে রয়েছে। ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতিতে যে ভক্তি-সূত্রের আভাস রয়েছে বৈষ্ণব পদাবলীতে তারই পূর্ণ প্রকাশ দেখতে পাই।

বৈষ্ণবের কৃষ্ণ মহাভারত, গীতা, ভাগবতের কৃষ্ণ নন, তিনি বৈকুণ্ঠের হরিও নন। তিনি মানুষের চিরদিনের রসময় সৌন্দর্য-আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণ ও সার্থক বিকাশস্বরূপ। বৈষ্ণবের কৃষ্ণ যেন 'আমার পরাণ যাহা চায়, তুমি তাই তুমি তাই গো'—তিনি রসো বৈ সঃ।

রাধা কৃষ্ণের সর্বার্থসাধিকা। তিনি কৃষ্ণের প্রেম ও আনন্দের অবলম্বন। কৃষ্ণ যা কামনা করেন, রাধাতে তাই পান। রাধাও কৃষ্ণকে পাবার জন্য নিত্য ব্যাকুলা।

রাধা দর্শনে আমার জুড়ায় নয়ন।
আমার দর্শনে রাধা সুখে অচেতন॥

পরমাত্মা ও জীবাত্মার প্রেমের যে নিবিড় বন্ধন, মিলনের যে আকুল আকাঙ্ক্ষা, আবার বিরহে যা অনুপম, তাই হচ্ছে বৈষ্ণব সাধনার মূল সংকেত এবং চৈতন্য-প্রচারিত প্রেম-ভক্তিবাদের গোড়ার কথা। মহাপ্রভু রঘুনাথকে বলেছিলেন—

অমানী মানদ কৃষ্ণনাম সদা লবে।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিবে॥

নিরভিমানতা, নাম গ্রহণ ও মানস-সেবার দ্বারাই জীবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে প্রেমের বন্ধনে বাঁধা পড়বে।

এই সংসারে নরনারীজীবনে যে প্রেমবৈচিত্র্য লক্ষিত হয়, বৈষ্ণবরা সেই প্রেমের ভিত্তিতেই অধ্যাত্ম-প্রেমের লীলারূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁরা বলেন, জীবনদেবতার একটুকু করুণার জন্য যেমন জীবাত্মা আকুল হয়ে ওঠে, ঠিক তেমনই দেবতাও জীবাত্মার প্রেমভিখারীরূপে তারই আঙিনায়

কাঙালের মতো দুহাত বাড়িয়ে অধীর প্রতীক্ষায় থাকেন। তবে তাঁর প্রেম এমনিতে পাওয়া যায় না। অনেক চোখের জলের করুণ মুহূর্তগুলি যখন চরম রূপ পায়, তখনই সে জীবনেশ্বরের পরশটুকু পাওয়া যায়। তিনি অনেক কাঁদিয়ে, অনেক দুঃখ দিয়ে তবে কোলে টেনে নেন। তখন তিনি বলেন—

'সুন্দরি, কাঁহে করসি তুহুঁ খেদ।
তুয়া বিনা রাতি দিবস হম না জানিয়ে
কোন কয়ল তুহুঁ ভেদ॥
* * * *
এ ত কহি মাধব, ছল ছল লোচন—
হৃদয় উপরে ধনী রাখি।
চরণ পরশি কহে হাম তুয়া অনুগত
প্রেমদাস তাহে সাখী॥

কৃষ্ণপ্রেম পেতে হলে অহংজ্ঞানটুকু ছাড়তে হবে। নিজেকে সবার চেয়ে ছোটো করে, নিজের আমিত্বকে একেবারে মুছে দিয়ে, তবে তাঁর উদ্দেশ্যে আকুল অভিসারের পথে ছুটতে হবে। পথের বাধা-বিঘ্ন পেরিয়ে তবেই মিলন, তবেই মুক্তি। এই যে মিলন—এই মিলন-সম্ভোগে 'আমি' নেই। আমার 'আমি' না হলে তাঁর আনন্দ নেই। কিন্তু তাঁর প্রেমে ধরা দিয়ে আমার 'আমি' তাঁর মাঝেই লোপ পেল। মহাপ্রভুর প্রেম-ভক্তিবাদে 'আত্মেন্দ্রিয়ের' স্থান নেই।

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে কহি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
....
সর্ব ত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।
কৃষ্ণের সুখ হেতু করে প্রেম সেবন॥ (চৈতন্যচরিতামৃত)

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর বৈষ্ণব প্রেমধর্মের যে স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল, বাঙ্‌লা সাহিত্যে তার সাবলীল গতি কোথাও ব্যাহত হয়নি। তাঁকে এবং তাঁর প্রচারিত প্রেমভক্তিবাদকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব সাহিত্যের শুধু নয়, সমগ্র বাঙ্‌লা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ পদাবলী সাহিত্য রচিত হয়। প্রাক্-চৈতন্য যুগের সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গী, এমন কি শাস্ত্র-নির্দিষ্ট সাহিত্যসংজ্ঞা,

অলংকার, রস প্রভৃতির এক মুহূর্তে যেন ব্যতিক্রম ঘটে গেল। এই যুগে জীবনী, কাব্য প্রভৃতি রচিত হলেও সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ ছিল বৈষ্ণব গীতকাব্য। এদেশে গান পূর্বেও রচিত হয়েছে। বাঙালী জাতিও স্বভাবত গীতিপ্রবণ। এই গীতিপ্রবণতা বৈষ্ণব যুগে চরম উৎকর্ষ লাভ করে। তার পূর্বে সিদ্ধাচার্যদের চর্যাগীতি, জয়দেবের শ্রীগীতগোবিন্দ, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, এবং বিদ্যাপতির মধুর পদাবলীর পরিচয় আমরা পেয়েছি। বিদ্যাপতির পদাবলীর প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে মৈথিলীর অনুকরণজাত যে 'ব্রজবুলির' সৃষ্টি হয়েছিল তার উল্লেখও আমরা পূর্বে করেছি। এই 'ব্রজবুলি' বৈষ্ণব সাহিত্যে যে একটি সুস্নিগ্ধ সুকোমলতা এনে দিয়েছিল তার অজস্র নিদর্শন আমরা এই যুগে এবং পরবর্তী যুগে পেয়েছি।

বৈষ্ণব পদাবলী

শ্রীচৈতন্যের সময় এবং তার পরে পদাবলী সাহিত্য বাঙ্‌লা সাহিত্যকে গৌরবের উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্য বাঙ্‌লা দেশে এতই জনপ্রিয় যে বৈষ্ণব গীতিকবিতা না বলে শুধু 'পদ' বললেও হয়। ষোড়শ শতাব্দীর বাঙালী বৈষ্ণব পদাবলীতে একেবারে তন্ময় হয়ে রইল। বাঙ্‌লা সাহিত্যেও তখন পদাবলীই রসিকজনকে সর্বাপেক্ষা আকৃষ্ট করেছে। বৈষ্ণব পদাবলীকে ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় চার ভাগে ভাগ করে দেখিয়েছেন। প্রথম, গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ; দ্বিতীয়, প্রার্থনার পদ; তৃতীয়, রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পদ; এবং চতুর্থ, রাগাত্মিক পদ। প্রথমে চৈতন্য-লীলা বর্ণিত হয়েছে, তারপরে কতকগুলি পদে গুরুবন্দনা এবং প্রার্থনা প্রভৃতি পাচ্ছি। রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পদে বাৎসল্য, দাস্য, সখ্যরস প্রভৃতি থাকলেও বিরহ ও মিলনের পদই এই লীলার চরম পরিচয় বহন করে। রাগাত্মিক পদ পূর্ব থেকেই আমাদের সাহিত্যে ছিল। চর্যাপদ থেকে শুরু করে আধুনিক বাউল গানেও তার নিদর্শন পাওয়া যায়।

বৈষ্ণব পদে মুখ্যত রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলাই বর্ণিত হয়েছে। এখানে প্রেমকে বিশুদ্ধ ও বৈদেহীভাবে দেখানো হয়েছে। নারী যে শ্রদ্ধাপূর্ণ গভীর ভালোবাসার দ্বারা আপন দয়িতকে জয় করে নিতে পারে, সে ভালোবাসাই ভগবৎ উদ্দেশ্যে নিবেদন করলে তিনিও জীবনসর্বস্বরূপে ধরা দেন। এই ভাবে

ভাবিত হওয়াকে রাধাভাব বলা যায়। দার্শনিক নিউম্যান বলেন—'If thy soul is to go into higher spiritual blessedness, it must become a woman ; Yes, however manly thou may be among men.' শুধু এদেশে নয়, বাইরের জগতেও এই স্বর্গীয় ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা মানুষের মধ্যে গভীরভাবে দেখা দিয়েছে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ 'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান' বলে প্রশ্ন করলেও এটা ঠিক যে, পদকর্তাদের লক্ষ্য বৈকুণ্ঠই ছিল। তবুও ব্যক্তিজীবনের বিরহের বেদনা ও মিলনের আনন্দাশ্রু কি বৈষ্ণব গীতি-কবিতাকে অধ্যাত্মভাবে রসপুষ্ট করেনি? প্রত্যক্ষের চাইতে পরোক্ষ বড়ো হয়ে উঠলেও প্রত্যক্ষের পরিচয় কি একেবারে মুছে গেছে?

বৈষ্ণব গীতি-কবিতার ভাবাবেগ ও প্রেমবন্যা বাঙালীকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। যে মাটির বুকে এই গান ফুল হয়ে ফুটেছিল, বৈষ্ণব গীতিকবিতা সে মাটির বহু ঊর্ধ্বে ভাবলোকে উঠে মাটির কথা গেছে ভুলে। কেঁদে কেঁদে ক্লান্ত ও দুর্বল হলে পড়লেও চোখের জল মুছে নিয়ে নিজেকে আর সামলে নিতে পারেনি। বৈষ্ণব পদগুলিতে তাই হয়ত কিছুটা নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস রয়ে গেছে।

পদকর্তা চণ্ডীদাস

শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক পদাবলী সাহিত্য ও পদকর্তাদের আলোচনার পূর্বে চণ্ডীদাস সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন। আমরা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি চণ্ডীদাস সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব মেনে নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাসকে যদি পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কিংবা চতুর্দশ শতাব্দীর লোক বলে মেনে নিই তাহলে পদকর্তা চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা করাও দরকার। অবশ্যি পদকর্তা চণ্ডীদাসও বোধহয় একজন নন, দ্বিজ দীন প্রভৃতি উপাধিধারী কয়েকজন চণ্ডীদাসের নামও পাওয়া যায়। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির মিলনের যে কিম্বদন্তী আছে, মনে হয় তা দীন চণ্ডীদাস ও কবিরঞ্জন বিদ্যাপতিকে নিয়ে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি চণ্ডীদাস ও পদকর্তা চণ্ডীদাস (একাধিকও হতে পারেন) এক নন।

চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা এমন এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক সুরে গেয়েছেন যে তাঁর পদগুলির ভাবমাধুর্য স্বর্গীয় সুষমা লাভ করেছে। তাঁর পূর্বরাগের পদে প্রেমের আকুলতা আছে কিন্তু চাঞ্চল্য নাই।

সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মনপ্রাণ॥
না জানি কতেক মধু শ্যামনামে আছে গো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো
কেমনে পাইব সই তারে॥ ইত্যাদি।

উল্লিখিত পদাংশে রাধার যে পূর্বরাগ বর্ণিত হয়েছে তা ভক্তহৃদয়ের আকুলতারই রূপান্তর।

চণ্ডীদাসের রাধা কৃষ্ণঅনুরাগিনী। কৃষ্ণকে পাবার জন্য 'বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে, যেমতি যোগিনী পারা,' কিন্তু তাঁকে পেয়েও তাঁর সব সময় ভয়, 'পাছে যদি আবার হারাই'! এদিকে কৃষ্ণও তাঁকে হারাতে চান না, তাই 'দুহুঁ কোড়ে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া।' এতদিন ধরে যাকে পাবার জন্য রাধা অধীর প্রতীক্ষায় ছিলেন, আজ যখন তিনি একেবারে তাঁর আঙিনায় এসে উপস্থিত হয়েছেন, তখন নানা দ্বিধাসংকোচজড়িত রাধার মন গেয়ে ওঠে—

এ ঘোর রজনী, মেঘের ঘটা, কেমনে আইল বাটে।
আঙিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজিছে, দেখিয়া পরাণ ফাটে॥
... ...
বঁধুর পীরিতি, আরতি দেখিয়া, মোর মনে হেন করে।
কলঙ্কের ডালি, মাথায় করিয়া, আনল ভেজাই ঘরে॥

চণ্ডীদাসের পদে স্বাধিকারলোপ ও আত্মসমর্পণের সুর জেগে উঠেছে। চণ্ডীদাসের রাধা বলেন—

তোমার প্রেমে বন্দী হইলাম শুন বিনোদ রায়।
তোমা বিনে মোর চিতে কিছুই না ভায়॥
শয়নে স্বপনে আমি তোমার রূপ দেখি।
ভরমে তোমার রূপ ধরণীতে লেখি॥

যে কৃষ্ণ-প্রেমকণা পেতে এত দুঃখ পেতে হয় তাকে ভুলতে চেষ্টা করেও—

যত নিবারিয়ে চিতে নিবার না যায়।
আনপথে ধাই তবু কানু পথে ধায়॥
এ ছাড় রসনা মোর হইল কি বাম।
যার নাম নাহি লব লয় তার নাম॥

চণ্ডীদাসের রাধা অভিমান করতেও জানেন না। বহুদিন বিচ্ছেদের দুঃখ দিয়ে তবে কৃষ্ণ এলেন। চোখের জল মুছে রাধা তাঁকে বলেন—

দুখিনীর দিন দুখেতে গেল।
মথুরাপুরে ছিলে ত ভাল॥

যেন, দুঃখ যা পেয়েছি—সে আমারই দোষে। তবুও—

কানু সে জীবন, জাতিপ্রাণধন, এ দুটি আঁখির তারা।
পরাণ অধিক হিয়ার পুতুলি, নিমিখে নিমিখে হারা॥

চণ্ডীদাসের ভাব-সম্মিলনের পদগুলি সকল যুগের সাহিত্যে অতুলনীয় বললেও অত্যুক্তি হবে না। কবি রাধাকৃষ্ণের পায়ে অনন্তকালের প্রণাম জানিয়ে বলেন—

বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে, জনমে জনমে, প্রাণনাথ হৈও তুমি॥

কিংবা,

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ॥
দেহ মন আদি, তোহারে সঁপেছি, কুল শীল জাতি মান॥

চণ্ডীদাসের পদে ভাবের গভীরতা ও প্রাণের আকুলতা সুন্দর ও সার্থক ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। চণ্ডীদাস 'হৃদয়ে ও জীবনে প্রকৃত কবি'।

অন্যান্য পদকর্তাগন

চৈতন্যোত্তর যুগের পদাবলী সাহিত্যের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের ব্যক্তিসত্তার মহিমা সব কিছুকেই ছাপিয়ে উঠেছে। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম থেকে তাঁর জীবিতাবস্থাতেই রাধাকৃষ্ণ লীলাবিষয়ক পদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিয়েও পদ রচনা শুরু হয়েছিল। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক কালে বা সামান্য পরে যাঁরা পদ রচনা করেন তাঁদের মধ্যে নরহরি সরকার, বংশীবদন, বাসুদেব ঘোষ,

মাধব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, পরমানন্দ গুপ্ত, মুরারি গুপ্ত, মুকুন্দ দত্ত, বাসুদেব দত্ত, গোবিন্দ আচার্য, লোচনদাস, রামানন্দ বসু, জ্ঞানদাস, মাধবাচার্য, পুরুষোত্তম দাস, বলরাম দাস প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পদাবলী ছাড়া এঁদের কারও কারও বৈষ্ণব সাধনতত্ত্ব-বিষয়ক, কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক, শ্রীচৈতন্যবিষয়ক রচনাও আছে।

শ্রীচৈতন্যের অন্যতম অনুচর মুরারি গুপ্ত সংস্কৃতে চৈতন্য জীবনীও রচনা করেছিলেন। বর্তমানে এই পুঁথিখানি মুরারি গুপ্তের কড়চা নামেই বিশেষ প্রচলিত। ইনি বাঙ্‌লা এবং ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেছিলেন। তবে তাঁর পদসংখ্যা খুব বেশী নয়। কিন্তু এই অল্পসংখ্যক পদের চমৎকারিত্ব অস্বীকার করা যায় না। তাঁর একটি পদ এখানে উদ্ধৃত করছি। পদটি এই—

সখি হে ফিরিয়া আপন ঘরে যাও।
জীয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে
তারে তুমি কি আর বুঝাও॥
নয়ন পুতলী করি লইলোঁ মোহন রূপ
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ।
পিরীতি-আগুনি জ্বালি সকলি পোড়াইয়াছি
জাতিকুলশীল অভিমান॥
না জানিয়া মূঢ় লোকে কি জানি কি বলে মোকে
না করিয়ে শ্রবণ গোচরে।
স্রোত বিথার জলে এ তনু ভাসাইয়াছি
কি করিবে কুলের কুকুরে॥
খাইতে শুইতে রইতে আন নাহি লয় চিতে
বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়।
মুরারি গুপতে কহে পিরীতি এমন হৈলে
তার যশ তিন লোকে গায়॥

মহাপ্রভুর সমসাময়িক নরহরি সরকার শ্রীখণ্ড নিবাসী ছিলেন। ইনি মহাপ্রভুর পূজা প্রচারেও অগ্রণী ছিলেন। নরহরি কৃষ্ণলীলা ও গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ রচনা করেছিলেন। লোচনদাস, কবিরঞ্জন প্রভৃতি এঁর কয়েক জন শিষ্যও বিখ্যাত পদকর্তা ছিলেন। বাসুদেব, মাধব ও গোবিন্দ—এই তিন

ভ্রাতার মধ্যে বাসুদেবই বেশী পদ রচনা করেছেন। তাও প্রায় বেশীর ভাগই গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ। বাসুদেব শ্রীচৈতন্যকে নিজের চোখে দেখেছিলেন এবং ঠিক প্রত্যক্ষদর্শীর মতোই গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ রচনা করেন। অনাড়ম্বর মাধুর্য তাঁর পদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তিনি শ্রীচৈতন্যকে কৃষ্ণের সঙ্গে অভিন্ন মনে করতেন। বাসুদেবের পদাবলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সহজ ও সাবলীল প্রকাশভঙ্গী। পরবর্তী চৈতন্যজীবনী-লেখকরা তাঁকে যথোচিত শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন। বাসুদেবের দুয়েকটি পদাংশ উদ্ধৃত করলে তাঁর কবিত্ব-শক্তি সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে। গৌরাঙ্গের শৈশব বর্ণনায় কবি বলছেন—

রজত কাঞ্চন   নানা আভরণ
          অঙ্গে মনোহর সাজে।
রাতা উতপল   চরণ যুগল
          তুলিতে নূপুর বাজে ॥
শরীর অঙ্গনে   নাচয়ে সঘনে
          বোলে আধ আধ বাণী।
বাসুদেবঘোষে বলে   ধর ধর কর কোলে
          গোরা মোর পরাণের পরাণি ॥

তাঁর গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসবিষয়ক পদের কোনো তুলনা নেই। গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসী হয়ে যখন ঘর ছেড়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করলেন তখন তাঁকে দেখতে না পেয়ে শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার কি অবস্থা হয়েছিল তা বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলছেন—

সুধা খাটে দিল হাত   বজ্র পড়িল মাথাত
          বুঝি বিধি মোরে বিড়ম্বিল।
করুণা করিয়া কান্দে   কেশ বেশ নাহি বান্ধে
          শচীর মন্দির কাছে গেল ॥
শচীর মন্দিরে আসি'   দুয়ারের কাছে বসি'
          ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।
শয়ন মন্দিরে ছিল   নিশা-অন্তে কোথা গেল
          মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া ॥

গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে নিদ্রা নাহি দু'নয়নে
শুনিয়া উঠিল শচীমাতা।
আলুথালু কেশে যায়, বসন না রহে গায়
শুনিয়া বধূর মুখে কথা ॥
তুরিতে জ্বালিয়া বাতি দেখিলেন ইতি উতি
কোন ঠাঁই উদ্দেশ না পাইয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূসাথে কান্দিয়া কান্দিয়া পথে
ডাকে শচী নিমাই বলিয়া ॥ ইত্যাদি।

এমন সহজ সরল বর্ণনা খুব কম কবির রচনায়ই পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া আর কারও পক্ষে এরকম রচনাও সম্ভব নয়।

গুণরাজখানের পৌত্র রামানন্দ বসু বাঙ্‌লা ও ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদ রচনা করেছিলেন। তাঁর 'বেলি অবসান কালে একা গিয়াছিলাম জলে—জলের ভিতরে শ্যামরায়' পদখানি বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের একখানি বিখ্যাত পদ বলা যায়। বংশীবদনও উৎকৃষ্ট পদকর্তা ছিলেন। অনেকে মনসামঙ্গল রচয়িতা সুকবি বংশীদাস এবং বংশীদাস নামে আর এক পদকর্তার সঙ্গে এক করে দেখেন। এই বংশীবদন ও পদকর্তা বংশীদাস এক ব্যক্তি হতে পারেন! মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের পর বংশীদাস শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার অভিভাবক স্বরূপ তাঁদের গৃহে থাকতেন। 'দীপকোজ্জ্বল' ও 'দীপান্বিতা' নামে দুখানা বইও বংশীবদনের নামে চলে। বংশীবদনের 'রাই জাগ, রাই জাগ—শারী শুক বলে' ইত্যাদি পদগুলো পড়লে তাঁর পদমাধুর্য সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকেনা। নরহরি সরকারের অন্যতম শিষ্য লোচনদাসও বিখ্যাত পদকর্তা ছিলেন। ইনি বিখ্যাত চৈতন্যমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা। লোচনদাসের রচনার বড়ো গুণ হচ্ছে—প্রসাদগুণসম্পন্ন ভাষার ব্যবহার। লোচনদাস মধ্যযুগে কথ্য ভাষা ব্যবহারের দুঃসাহস দেখিয়েছেন। লোচনদাসের কৃষ্ণ-প্রেমে [illegible] রাধা বলেন—

এস এস বঁধু এস আধ আঁচরে বস
আমি নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।
আমার অনেক দিবসে মনের মানসে—
তোমাধনে মিলাইল বিধি ॥

বঁধু তুমি মণি নও মাণিক নও হার ক'রে গলায় পরি ;
ফুল নও যে কেশের করি বেশ।
আমায় নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণ নিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ ॥ ইত্যাদি।

লোচনদাসের কিছু কিছু পদ চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত আছে। ইনি বৈষ্ণব সাধনতত্ত্ব নিয়ে কয়েকখানি ছোট ছোট গ্রন্থও রচনা করেছিলেন।

বলরামদাস বাঙ্‌লা ও ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেছেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে একাধিক বলরামদাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রেমবিলাস রচয়িতা নিত্যানন্দ দাসের আর এক নাম ছিল বলরাম দাস। নিত্যানন্দশিষ্য আর একজন বলরামদাসও ছিলেন। বলরামদাসের রাধা বলেন—

কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই না জানি।
জাগিতে স্বপন দেখি কালা-রূপ খানি ॥
আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে।
পরাণ হরিলে রাঙা নয়ন-নাচনে ॥ ইত্যাদি।

বিচ্ছেদের বেদনা রাধা ও কৃষ্ণকে কি রকম উতলা করে তুলেছে তা দেখাতে গিয়ে কবি বলছেন—

পদ আধ চলত, খলত পুন বেরি।
পুন ফেরি' চুম্বই দুহুঁ মুখ হেরি ॥
দুহুঁজন নয়নে গলয়ে জলধার।
রোই' রোই' সখীগণ চলই না পার ॥
খেনে ভয়ে সচকিত নয়নে নেহার।
গলিত বসন ফুল কুণ্ডল ভার ॥
নূপুর আভরণ আঁচর নেল।
দুঁহ অতি কাতরে দুহুঁ পথে গেল ॥ ইত্যাদি।

বলরামদাসের ব্রজবুলির পদের চেয়ে বাঙলা পদই অপেক্ষাকৃত সহজ, সরল ও মধুর। রূপানুরাগ, বাৎসল্য প্রভৃতি রসের পদে তাঁর কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশী। পাণ্ডিত্য ও পদলালিত্যের দিক থেকে বিচার করলে চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাসের পরেই বলরামদাসের নাম করা যেতে পারে। তিনি চণ্ডীদাসের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন বলে মনে হয়।

এই যুগের অবিসংবাদিত ভাবে শ্রেষ্ঠ কবি হচ্ছেন জ্ঞানদাস। অনেকের মতে গোবিন্দদাস যেমন বিদ্যাপতির দ্বারা প্রভাবিত হন—জ্ঞানদাসও তেমনই চণ্ডীদাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। অনেক সময় তিনি ভাবমাধুর্য ও রসসৃষ্টিতে চণ্ডীদাসকেও ছাড়িয়ে গেছেন। পূর্ণ মিলনের বর্ণনায় কবির—

'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর ॥'—

পদটি বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে উচ্চাসন লাভ করবে। বর্ষা রজনীর স্বপ্ন-জড়ানো ঘুমের বর্ণনায় কবি বাইরের বর্ষার সঙ্গে কাব্যের ধ্বনির যে অপূর্ব মিলন ঘটিয়েছেন বাঙ্‌লা সাহিত্যে তার তুলনা নেই। কবি বলছেন—

রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিম ঝিম শবদে বরিষে।
শয়ন পালংকে রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিদ যাই মনের হরিষে ॥

বর্ষার বর্ষণধ্বনির এই একটানা সুরের মধুর ব্যঞ্জনা পৃথিবীর কাব্য সাহিত্যে দুল ভ বললেও অত্যুক্তি হবে না। বাঙ্‌লা দেশে বহুল প্রচলিত জ্ঞানদাসের 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাধিনু আনলে পুড়িয়া গেল' ইত্যাদি আরও অনেক পদ চণ্ডীদাসের নামে বহুদিন ধ'রে চলে আসছিল। জ্ঞানদাস ব্রজবুলিতেই বেশী পদ রচনা করেছিলেন। তবে তাঁর বাঙ্‌লা পদ ব্রজবুলির চেয়ে অনেক মধুর। এখানে দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর নামাঙ্কিত ব্রজবুলিতে রচিত দুটি পদের কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছি। তা থেকে তাঁর ভাব, ভাষা ও ছন্দের রসরূপ বোঝা যাবে।

কানু অনুরাগে হৃদয় ভেল কাতর
রহই না পারই গেহে।
গুরু-দুরুজন-ভয় কিছু নাহি মানয়ে
চির নাহি সম্বরু দেহে ॥
দেখ দেখ নব অনুরাগক রীত।
ঘন আন্ধিয়ার ভুজগ ভয় কত শত
তৃণহ না মানয়ে ভীত ॥ ধ্রু ॥

কিংবা, একলি কুঞ্জহি কাণ।
পথ হেরি আকুল পরাণ॥
মনমথে জর জর ভেল।
তৈখনে সুন্দরি গেল॥
হেরই নাগর কাণ।
হোয়ল অমিয়া-সিনান॥ ইত্যাদি।

চৈতন্যশিষ্য নয়নানন্দ মিশ্রের সবই গৌরাঙ্গ বিষয়কপদ। এছাড়া পুরুষোত্তম দাস, পরমেশ্বর দাস, দেবকীনন্দন (কবিশেখর), জগন্নাথদাস প্রভৃতি আরও অনেক কবি এযুগে কৃষ্ণলীলা ও গৌরাঙ্গ লীলাবিষয়ক পদ রচনা করেন।

জীবনী-কাব্য

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে বাঙ্‌লা দেশে নানা দেব-দেবী ও রামায়ণ মহাভারত ভাগবতের উপাখ্যান নিয়ে বাঙ্‌লা সাহিত্য রচিত হচ্ছিল। কিন্তু চৈতন্যের প্রেমভক্তিবাদ প্রচারের পর থেকে বাঙ্‌লার জনসাধারণ তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এবং তাঁর তিরোভাবের পূর্ব থেকেই তিনি অবতার হিসাবে স্বীকৃত হন। ষোড়শ শতাব্দীতে তাঁর ব্যক্তিত্বের মহিমা সব কিছুকে ছাপিয়ে ওঠে। অবশ্যি এই ব্যক্তিত্ব অলৌকিকত্বের মধ্যেই রূপ লাভ করেছিল। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর ষোড়শ শতাব্দীতে দেবদেবী নিয়ে ধর্মকলহ অনেকখানি কমে এসেছে। তখন জীবনের মহিমা প্রকাশ করা—তার মান নির্ধারণ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। শ্রীচৈতন্য সে যুগের মহামানব। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব সে যুগের সমাজ ও সাহিত্যে এত বেশী ছিল যে মানুষ তখন দেবতা ছেড়ে মানুষের জয়গান গাইতে শুরু করল। মানুষ নিল দেবতার স্থান। মানবত্ব দৈবীমহিমার আবরণে আপন মহিমাকে প্রকাশ করল। শ্রীচৈতন্যের ব্যক্তিত্বের মাধুর্য তৎকালীন যুগচিত্তকে এতই অভিভূত করেছিল যে তাঁর জীবনের নানাদিকের আলোচনা করা তখনকার বাঙ্‌লা সাহিত্যের প্রধান বিষয়বস্তু হ'ল। এখানে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন, এই বৈষ্ণব জীবনীকাব্যগুলি কেবলমাত্র জীবনী নয়, যুগধর্মানুসারে এগুলিতেও যথেষ্ট অলৌকিকত্ব রয়েছে। সে যুগের যে ভক্তির প্রেরণা চৈতন্যজীবনী বা অন্যান্য

জীবনী রচনায় লেখকদের উৎসাহিত করেছিল তাতে ধর্মানুভূতিই ছিল বেশী। সেই জন্য এই কাব্যগুলি প্রধানতঃ মানুষের জীবনকে আশ্রয় করে ভক্তি-রসাশ্রিত কাব্য হয়ে উঠেছে। তবে যাঁদের জীবনমাহাত্ম্য এসব কাব্যে বর্ণিত হয়েছে, তাঁদের জীবনের বাস্তব দিকটা একেবারে ঢাকা পড়েছে বললে ভুল বলা হবে। ব্যক্তিজীবনের অলৌকিক লীলাবর্ণনার অন্তরালে সহজ যে মানুষটি রয়েছে, সেও আমাদের দৃষ্টি এড়ায়না। শুধু তাই নয়, জীবনীকাব্যে তৎকালীন সমাজেরও একটা রূপ আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠে। এই চরিতকাব্যের নিদর্শন প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেও পাই। কেউ কেউ বলেন, হর্ষচরিত, রামচরিত, শঙ্করচরিত ইত্যাদির অনুসরণে হয়ত চৈতন্য-জীবনী-কাব্য রচিত হয়ে থাকবে।

চৈতন্য-জীবনী-কাব্যের আলোচনা করতে গেলে দেখতে পাই যে প্রথম চৈতন্য-জীবনী সংস্কৃতে রচিতে হয়েছিল। এ ধরনের রচনা হিসাবে প্রথম মুরারিগুপ্তের কড়চার নাম করা যায়। কড়চাখানির যথার্থ নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃত। তাছাড়া প্রদ্যুম্ন মিশ্রের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী এবং কবি-কর্ণপুর পরমানন্দ সেনের শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত কাব্য এবং শ্রীশ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কবি কর্ণপুরের গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা নামে আর একখানি রচনাও আছে। স্বরূপ-দামোদরও চৈতন্য বিষয়ক কয়েকটি শ্লোক রচনা করেছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চরিতামৃতে তার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এসবই সংস্কৃতে লেখা।

বৃন্দাবনদাস—চৈতন্যভাগবত

বাঙ্‌লাভাষায় লেখা চৈতন্যজীবনীকাব্যের মধ্যে প্রাচীনতম হিসাবে বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের উল্লেখ সবাই করেছেন। বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশে ও উৎসাহে চৈতন্যভাগবত রচনা করেন। তিনি নিজেকে শ্রীবাসের ছোট ভাই শ্রীরামের কন্যা নারায়ণীর পুত্র বলে নিজেই উল্লেখ করেছেন। ভক্তিরত্নাকরের উল্লেখ থেকে জানতে পারি যে বৃন্দাবনদাস খেতরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর আবির্ভাবকাল নিয়ে ৺দীনেশচন্দ্র সেন, অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী, ডাঃ বিমানবিহারী মজুমদার, ডাঃ সুকুমার সেন প্রভৃতি নানা আলোচনা করেছেন। শ্রীচৈতন্যের জীবৎকালেই আনুমানিক

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষে অথবা দ্বিতীয় দশকে বৃন্দাবনদাস জন্মগ্রহণ করেন বলে মনে হয়। চৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবনদাস বলেছেন—

হইল পাপিষ্ঠ জন্ম না হইল তখনে।
হইলাম বঞ্চিত সে সুখ দরশনে॥

এই উক্তি থেকে সাধারণত মনে হয় যে শ্রীচৈতন্যের জীবৎকালে হয়ত বৃন্দাবনদাসের আবির্ভাব ঘটেনি। কিন্তু এও হতে পারে যে চৈতন্যদেব যখন নবদ্বীপে ছিলেন তখন হয়ত তিনি জন্মাননি। কিংবা হয়ত নিতান্ত শিশু ছিলেন বলে মহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলা প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি।

বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবত রচনা করতে গিয়ে নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য, গদাধর প্রভৃতি চৈতন্যলীলার প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে চৈতন্যদেব সম্বন্ধে যা শুনেছিলেন তাই তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন বলে ভাগবতে অনেক জায়গায় উল্লেখ করেছেন। চৈতন্যভাগবতকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি অনেকেই চৈতন্যমঙ্গল বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু বৃন্দাবন দাসের চৈতন্যজীবনী-কাব্যের প্রকৃত নাম শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত। এই নামকরণ নিয়ে একটি গল্প আছে। লোচনদাস ও বৃন্দাবনদাসের কাব্যের নাম এক হওয়াতে বৃন্দাবনের মাতা নারায়ণী ছেলের রচিত কাব্যের নাম বদ্‌লে চৈতন্যভাগবত রাখেন। কিন্তু প্রেমবিলাসে বলা হয়েছে যে চৈতন্য ভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গলই ছিল—বৃন্দাবনের বৈষ্ণব মোহান্তরা এই গ্রন্থের নামকরণ করেন চৈতন্যভাগবত। চৈতন্যভাগবতে চৈতন্যের আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা বর্ণিত আছে। তার মধ্যে আদি ও মধ্যখণ্ডে শ্রীচৈতন্যের বাল্য ও সন্ন্যাস জীবনের লীলার কথা বিশদভাবে বর্ণিত আছে। অন্ত্যলীলাতে এসে কাব্য যেন হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে। ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় মনে করেন যে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পূর্ব থেকেই এই গ্রন্থ রচনা শুরু হয়েছিল।

চৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবনদাসের পাণ্ডিত্য ও কবিত্বশক্তির সার্থক প্রকাশ দেখতে পাই। যতই তিনি অলৌকিকত্ব আরোপ করতে চান না কেন তাঁর রচনায় মানব-জীবন-রসের অনেক উপাদান পাওয়া যায়। একদিকে যেমন চৈতন্য রূপ বর্ণনায় তিনি বলেন—

প্রতি অঙ্গ নিরুপম লাবণ্যের সীমা।
কোটি চন্দ্র নহে এক নখের উপমা ॥—

তেমনই চৈতন্যের পাঠ্যাবস্থার কথা বলতে গিয়ে যে সহজ ও সরল বর্ণনা করেছেন, এবং যে বাস্তব নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন তাতে চৈতন্য-জীবনের দৈবমহিমা ছাড়াও মানবরসপুষ্ট আর একটি চৈতন্যচরিত্রও প্রকাশ পেয়েছে। মুরারিগুপ্তকে নিমাই পণ্ডিত বলেন—

প্রভু কহে বৈদ্য তুমি ইহা কেনে পড়।
লতাপাতা দিয়া গিয়া নাড়ী কর দঢ় ॥
ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষম-অবধি।
কফ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি ॥
মনে মনে চিন্ত তুমি কে বুঝিবে ইহা।
ঘরে যাহ তুমি রোগী দঢ় কর গিয়া ॥

বৃন্দাবনদাস ভাগবতের অনুসরণে চৈতন্যভাগবত রচনা করেছিলেন—কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতে বলেছেন—

কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলায় ব্যাস বৃন্দাবনদাস ॥

বৃন্দাবনদাস চৈতন্যদেবকে কৃষ্ণের অবতাররূপে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। তবে তাঁর গ্রন্থে চৈতন্যদেবের চেয়ে নিত্যানন্দের কথাই যেন বেশী বলা হয়েছে। তার একটি কারণও আছে। নিত্যানন্দ তাঁর গুরু ছিলেন। তখনকার দিনে নিত্যানন্দের সম্বন্ধে নানা কুৎসাও রটেছিল। তাই বৈষ্ণব হয়েও বৃন্দাবনদাস বৈষ্ণববিনয়ের tradition ভঙ্গ করে স্থানে স্থানে অত্যন্ত রূঢ় হয়ে পড়েছেন। তাঁর এই অসহিষ্ণুতা ঠিক বৈষ্ণবজনোচিত হয়নি। যখন তিনি বলেন—

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
তবে লাথি মারোঁ তার শিরের উপরে ॥—

তখন বুঝি যে তাঁর অসহিষ্ণুতা বৈষ্ণবজনোচিত চরিত্রমাধুর্যকে ছাড়িয়ে গেছে। চৈতন্যভাগবতে নিত্যানন্দের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বৃন্দাবন দাস আকুলভাবে চেষ্টা করেছেন। চরিতামৃতকারও বলেছেন—

নিত্যানন্দলীলা বর্ণনে হইল আবেশ।
চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ ॥

একদিন শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ সম্বন্ধে শ্রীবাসকে বলেন—

....
এই অবধূত কেন রাখ নিরন্তর ॥
কোন্ জাতি কোন্ কুল কিছুই না জানি।
পরম উদার তুমি বলিলাম আমি ॥
আপনার জাতি কুল যদি রক্ষা চাও।
তবে ঝাট এই অবধূতেরে ঘুচাও ॥

তখন শ্রীবাস বলেছিলেন—

দিনেক যে তোমা ভজে সে আমার প্রাণ।
নিত্যানন্দ তোর দেহ মো হতে প্রমাণ ॥
মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।
জাতি প্রাণ ধন যদি মোর নাশ করে ॥
তথাপি মোহার চিত্তে নহিব অন্যথা।
সত্য সত্য তোমারে কহিল এই কথা ॥

বৃন্দাবনদাসের এত বলার কারণ এই যে, তখন সমাজে নানা লোক নিত্যানন্দের সম্বন্ধে নানা নিন্দা করে বেড়াত।

চৈতন্যভাগবতের যুগে সাধারণ মানুষ যোগীপাল, ভোগীপাল ও মহীপালের গীত শুনতে ভালোবাসত। বিষহরি, চণ্ডী, বাশুলী প্রভৃতির পূজা এবং তান্ত্রিক-পদ্ধতিতে সাধনা বহুলভাবে প্রচলিত ছিল। তখনকার দিনের জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা মোটামুটি অসচ্ছল ছিলনা। ছেলেমেয়ের বিয়েতে তারা অযথা অর্থ ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হত না। দরিদ্রের মধ্যেও যে যথার্থ মানুষ আছে একথা তখনকার সমাজে স্বীকৃত হত না ব'লে বৃন্দাবনদাস দুঃখ করেছেন। ধর্মকলহ তখন বেশী বই কম ছিল না। নব্যন্যায়ের কেন্দ্রগুলিতে তর্কযুদ্ধ যেন স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। তখনকার দিনে সমাজে বৈষ্ণবদের অনেক দুর্গতিও সইতে হ'ত।

চৈতন্যভাগবতের নানা রাগ-রাগিণীর উল্লেখ থেকে এটা বোঝা যায় যে তখন ভাগবতখানি গাওয়া হত। ভাব ভাষা ও ছন্দের দিক থেকে চৈতন্যভাগবত অতুলনীয়। চৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবনদাস রচিত কয়েকটি পদও পাওয়া যায়। কাব্যখানির রচনাকাল ১৫৩০ থেকে ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বলে অনুমান করা যেতে পারে। বৃন্দাবনদাস ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে দেহত্যাগ করেন।

লোচনদাস—চৈতন্যমঙ্গল

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের পর লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের উল্লেখ করা যায়। লোচনদাস বর্ধমানের কোগ্রাম নিবাসী ছিলেন। মুরারি গুপ্তের কড়চা অনুসরণ করে তিনি চৈতন্যমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। তিনি কাব্যে অনেক রাগ-রাগিণীর উল্লেখ করেছেন। তা থেকে মনে হয় তাঁর কাব্যখানিও গাওয়া হ'ত। মঙ্গলকাব্যের মতো এতেও নানা দেব-দেবীর বন্দনা আছে। কবি শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে তেমন নতুন কোনো তথ্য দেন নি।

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের চেয়ে জীবনীকাব্য হিসাবে নিকৃষ্ট হলেও কাব্যের রসঘন পরিবেশ লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে। এই কাব্যময়তা লোচনদাসের রচনার বড় গুণ।

লোচনদাস শ্রীচৈতন্যের অন্ত্যলীলার কথা বিশেষ কিছু বলেন নি। চৈতন্য-মঙ্গল বিচারে যে যাই বলুন না কেন, পদকর্তা হিসাবে লোচনদাসের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। এখানে চৈতন্যমঙ্গলের দুয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করছি। কবি মুখ্যত পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে কাব্যখানি রচনা করেছেন। যেমন—

(ক)
গৌরাঙ্গের-নয়ন-সন্ধান শরঘাতে।
মানিনীর মান-মৃগী পলায় বিপথে॥
অথির নাগরীগণ শিথিল বসন।
মাতল ভুজঙ্গকুল খগেন্দ্র যেমন॥
ভুরুভঙ্গী-আকর্ষণে রঙ্গিনীর গণ।
দোলমান হৃদয় করিছে অনুক্ষণ॥

(খ)
কেহো ত কাপড় পাটশাড়ী পরে
কাণে গন্ধরাজ চাঁপা।
গজেন্দ্র গমনে চলিতে না জানে,
মৃগী দিঠে চাহে বাঁকা॥
অঞ্জনে রঞ্জিত খঞ্জন নয়নে
চঞ্চল তারক-জোর।
গোরা-রূপ পঙ্কে পঙ্কিল আলসে
অবলা চলিল ভোরে॥ ইত্যাদি

লোচনদাসের কাব্যের ভাষার প্রসাদ গুণ লক্ষণীয়।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলের পর উল্লেখযোগ্য চৈতন্য-জীবনী-কাব্য হচ্ছে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। এই গ্রন্থখানি বৈষ্ণব ভাবুকতা ও দর্শনের সার্থক নিদর্শন। চৈতন্যচরিতামৃতের রচনাকাল সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা সম্ভব নয়। কোনো কোনো পুঁথিতে রচনাকালের যে সঙ্কেত দেওয়া আছে, তাতে চরিতামৃতের রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বলে মনে হয়। নানা যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখিয়ে ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় চরিতামৃতের রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে বলে মনে করেন।

কাটোয়ার উত্তরে নৈহাটির কাছাকাছি ঝামটপুর গ্রামে কৃষ্ণদাস কবিরাজের আদি নিবাস ছিল। পরিণত বয়সে কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবন-বাসী হন এবং রঘুনাথদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বৃন্দাবন বাস কালে তিনি রূপসনাতনের সংস্পর্শে আসেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃদ্ধবয়সে কাব্য রচনা আরম্ভ করেন বলে নিজেই উল্লেখ করেছেন। তিনি বৃন্দাবনদাসের অনুমতি নিয়েই কাব্য রচনা শুরু করেন। কথিত আছে, শ্রীনিবাস আচার্য যেসব বৈষ্ণবগ্রন্থ বৃন্দাবন থেকে বাঙ্‌লা দেশে নিয়ে আসছিলেন সেগুলির সঙ্গে চরিতামৃতও ছিল। বিষ্ণুপুরে বীর হাম্বীরের দলের দস্যুরা শ্রীনিবাসের সর্বস্ব লুঠ করে নেয়। এই সংবাদ কবিরাজ গোস্বামীর কাছে যখন পৌছাল তখন তিনি দুঃখে একেবারে ভেঙে পড়েন এবং সেই আঘাতে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। এই কাহিনী কতখানি নির্ভরযোগ্য তা বলা দুষ্কর। তবে বীর হাম্বীর যে শ্রীনিবাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন তার উল্লেখ বৈষ্ণবগ্রন্থে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবগ্রন্থগুলি উদ্ধার করতে গিয়ে শ্রীনিবাসের সঙ্গে বীর হাম্বীরের দেখা হয়। বীর হাম্বীর দস্যুবৃত্তি ছেড়ে বৈষ্ণব হয়ে পড়েন। তাঁর ভণিতাযুক্ত কয়েকটি পদও পাওয়া যায়।

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের আদ্যলীলার উল্লেখ করে কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যচরিতামৃতের আদ্যলীলা বা বাল্যলীলা সংক্ষেপে শেষ করেছেন। কারণ চৈতন্যভাগবতে আদ্যলীলা বিশদভাবে বর্ণিত হওয়াতে, পাছে বৃন্দাবন দাসের প্রতি অবিনয় দেখানো হয়, এই আশঙ্কায় তিনি আর তার বর্ণনা করেননি। চরিতামৃতে মধ্য ও অন্ত্যলীলা বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্য এবং বৈষ্ণবতত্ত্বের বিস্তারিত আলোচনা

করেছেন। চরিতামৃতে তত্ত্বের প্রাধান্যই বেশী দেওয়া হয়েছে। চৈতন্যলীলার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণলীলাও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্র সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজের গভীর জ্ঞান ছিল। অনেকে বলেন যে অতিরিক্ত তত্ত্বের চাপে তাঁর রচনা অত্যন্ত শুষ্ক ও দুর্বোধ্য হয়ে পড়েছে। কিন্তু গভীর তত্ত্ব আলোচনা থাকলেও তাঁর রূপানুরাগ প্রভৃতি অংশ পাঠ করলে সে ভুল ভেঙে যায়। শ্রীচৈতন্যের দিব্যোন্মাদ অবস্থার বর্ণনাটি বৈষ্ণব সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। খাঁটি বৈষ্ণবের লক্ষণ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মাত্র দুটি ছত্রে তিনি সুন্দরভাবে বলেন—

যাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম।
তাহারে জানিও তুমি বৈষ্ণব প্রধান॥

শ্রীচৈতন্যের রাধাভাব বর্ণনা করতে গিয়ে একেবারে দশম অবস্থা পর্যন্ত এমন অপূর্ব ও অদ্ভুতভাবে বর্ণনা করেছেন যে সেই বর্ণনার মধ্যে কবিরাজ গোস্বামীর ভক্তিরসাপ্লুত সংযত কবিহৃদয়ের সার্থক পরিচয় পাই। ভক্তির আতিশয্যে যুক্তি ও বিচারবুদ্ধিকে তিনি হারাননি। ধর্মের মূলতত্ত্বগুলির দার্শনিক ব্যাখ্যা, প্রেমধর্মের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আমাদের বিস্ময়ে অভিভূত করে। লোচনদাসের রচনার মতো রসঘন না হলেও ভাবগাম্ভীর্যে কৃষ্ণদাস কবিরাজের রচনা অতুলনীয়। এখানে তাঁর রচনার একটি অংশ উদ্ধৃত করছি। তা থেকে তাঁর রচনাশক্তির স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে। যেমন,

কৃষ্ণ প্রেম সুনির্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল
সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু।
নির্মল সে অনুরাগে না লুকায় অন্য দাগে
শুক্ল বস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু॥
শুদ্ধপ্রেম সুখসিন্ধু পাই তার একবিন্দু
সেই বিন্দু জগৎ ডুবায়।
কহিবার যোগ্য নহে তথাপি বাউলে কহে
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায়॥ ইত্যাদি।

কবিরাজ গোস্বামীর রচনায় ভাষা ও ছন্দের কোনো দুর্বলতা দেখা দেয়নি। ভাবের কথা এখানে বলাই বাহুল্য। সূক্ষ্ম তত্ত্ব বিশ্লেষণ ও তথ্যনিষ্ঠা তাঁর

জীবনীকাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। চৈতন্যচরিতামৃত বোধ হয় গাওয়া হ'ত না—পাঠ করা হ'ত। কারণ তাতে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ নেই। কবিরাজ গোস্বামী সংস্কৃতে গোবিন্দলীলামৃত নামে এক মহাকাব্য রচনা করেছিলেন। বাঙ্‌লায় তাঁর অনুবাদও হয়েছে।

৺জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়ের মতে কবিরাজ গোস্বামী ১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দে আবির্ভূত হন এবং ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর তিরোভাব ঘটে। এই সময় যদি ঠিক হয় তবে এটা ঠিক যে কবিরাজ গোস্বামী দীর্ঘজীবী ছিলেন। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, শ্রীচৈতন্যের মাত্র দশ বছরের ছোটো হয়ে তিনি কি তাঁর কোনো লীলাই প্রত্যক্ষ করেননি? শুধু কি রঘুনাথদাস গোস্বামী এবং রূপ গোস্বামীর কাছে শুনেই চরিতামৃত রচনা করেছিলেন? এ সবই নির্ভর করছে নির্ভুল সন তারিখের উপর। যাই হোক, বাঙ্‌লাদেশে চৈতন্যচরিতামৃত বৈষ্ণবদের কাছে চৈতন্যভাগবতের মতোই পরম শ্রদ্ধার ও আদরের সামগ্রী হয়ে রয়েছে। দস্যুকর্তৃক চরিতামৃত লুণ্ঠিত হবার গল্প মেনে নিয়েও একথা বলতে পারি যে, আজও সেই গ্রন্থ সর্বজনসমাদৃত এবং কবিরাজ গোস্বামীও অমর হয়ে আছেন। আমাদের সৌভাগ্য যে গ্রন্থখানি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। এবং বাঙালীও তার ঐশ্বর্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়নি।

জয়ানন্দ—চৈতন্যমঙ্গল

ষোড়শ শতাব্দীতে জয়ানন্দ নামে আর একজন চৈতন্যমঙ্গল রচয়িতার পরিচয় পাওয়া যায়। কবির দেশ বর্ধমানের নিকট মান্দারনের কাছাকাছি আমাইপুরা গ্রামে। তাঁর পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র। জয়ানন্দ জনসাধারণের উপযোগী করে চৈতন্যমঙ্গল রচনা করেন। তিনি পাঁচালীর ঢঙে কাব্য রচনা করেছেন। রচনার প্রারম্ভে পূর্ববর্তী চৈতন্য-চরিতকারদের কথা বলতে গিয়ে বৃন্দাবনদাস, পরমানন্দ গুপ্ত, গোপাল বসুর নাম উল্লেখ করেছেন, এবং পূর্ববর্তী কবিদের নাম করতে গিয়ে কৃত্তিবাস, গুণরাজ খান, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতির নাম উল্লেখ করেছেন। চৈতন্যমঙ্গলে কবিরাজ গোস্বামীর উল্লেখ নেই। কেউ কেউ বলেন, জয়ানন্দ, বৃন্দাবনদাস এবং লোচনদাস প্রায় সমসাময়িক ছিলেন। সেদিক থেকে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের পরে রচিত চৈতন্যচরিতামৃতের উল্লেখ না থাকা অস্বাভাবিক নয়। আবার এও হতে

পারে যে বৃন্দাবনে রচিত চৈতন্যচরিতামৃত জয়ানন্দের রচনাকালে বাঙ্‌লাদেশে ততটা পরিচিত হয়নি।

জয়ানন্দ তাঁর কাব্যে কয়েকটি নতুন সংবাদ পরিবেশন করেছেন। কিন্তু অনেক ভুল খবরও দিয়েছেন। ঘটনার পারম্পর্যও তেমন রক্ষিত হয়নি। সেদিক থেকে মনে হয় বেশীর ভাগ শোনা কথার উপর নির্ভর ক'রে তিনি চৈতন্যজীবনী রচনা করেছিলেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে হুসেন শাহ্‌এর রাজত্বে প্রজাদের উপর রাজকর্মচারীদের অত্যাচার এবং পিরাল্যা অপবাদগ্রস্ত ব্রাহ্মণদের কাহিনীর উল্লেখ আছে। সেযুগে এভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়কে কোনো লেখক তেমন প্রাধান্য দেননি। তখনকার জনসাধারণের চিন্তা ভাবনার পরিচয়ও জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে পাওয়া যায়। তিনি শ্রীচৈতন্যের মহাপ্রয়াণ নিয়ে নতুন কথা বলেছেন। কিন্তু এই মত বৈষ্ণবসমাজে গৃহীত হয়নি। এবং অনেকটা এই কারণেই জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল বৈষ্ণবেরা গ্রহণ করেননি। তাঁর রচনায় কাব্যিক উপাদান তেমন বেশী নেই। নিতান্ত সরল ভাষায় তিনি চৈতন্য-মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে প্রয়াস পেয়েছেন।

গোবিন্দদাসের কড়চা

গোবিন্দদাসের কড়চা নামে একখানা চৈতন্যজীবনীর উল্লেখ করা হয়। এই গ্রন্থখানি নিয়ে নানা মতভেদ আছে। কেউ বলেন যে গ্রন্থখানি জাল—আবার কেউ বলেন খাঁটি। জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থে তাঁর নিজেরও কিছু কিছু রচনা আছে বলে অনেকে মনে করেন। এই কড়চা থেকে জানা যায় যে, লেখক গোবিন্দ জাতিতে কর্মকার ছিলেন। জয়ানন্দও এক গোবিন্দ কর্মকারের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ভাষার আধুনিকতা কড়চায় যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে এবং কতকগুলি স্থানের নাম (রসাল কুণ্ডা প্রভৃতি) এতই পরের দিকের যে কড়চার অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে স্বাভাবিকতই সন্দেহ জাগে।

ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় চূড়ামণিদাস নামে এক কবির চৈতন্যচরিতের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তাঁর কাব্যখানি অসম্পূর্ণ। কবি তাঁর কাব্যখানির নাম 'ভুবন মঙ্গল' বলে উল্লেখ করেছেন।

অন্যান্য জীবনীগ্রন্থ

এ ছাড়া এ যুগে আর যে সব জীবনীগ্রন্থ পাওয়া যায় তার প্রায় সবই চৈতন্যপার্ষদ বা তাঁদের শিষ্যদের জীবনী। তবে তাতেও চৈতন্যলীলাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এখানে আর একটি লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে নিত্যানন্দ প্রভুকে নিয়ে এসময় কোনো আলাদা কাব্য রচিত হয়নি। অথচ চৈতন্যভাগবত থেকে প্রায় সব গ্রন্থেই নিত্যানন্দ প্রভুর লীলাবর্ণনা হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীতে অদ্বৈতাচার্য ও তাঁর পত্নী সীতাদেবীকে নিয়ে দুচারখানি জীবনীগ্রন্থ রচিত হয়েছে। তার মধ্যে হরিচরণদাসের অদ্বৈতমঙ্গল, ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ (সম্পূর্ণ রচনা ১৫৬৮ খ্রীঃ), বিষ্ণুদাস আচার্যের সীতা-গুণকদম্ব, লোকনাথদাসের সীতাচরিত্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ঈশান নাগর অদ্বৈত আচার্যের গৃহেই থাকতেন। সীতাদেবীর জীবনী-কাব্য রচনায় মনে হয়, মধ্যযুগের এ সময় নারীও সমাজে অকুণ্ঠিত প্রীতি ও শ্রদ্ধা পাচ্ছেন।

কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য

এই যুগে বেশ কয়েকখানি কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য রচিত হয়েছিল। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর বেশীর ভাগ কাব্যই চৈতন্য-প্রভাবে প্রভাবিত। বৈষ্ণব সাহিত্য বা পদাবলীর কথা বাদ দিলেও মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি বিষয়ক কাব্যে চৈতন্যদেবকে অবতার হিসাবে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে। বাঙ্‌লার সমাজে চৈতন্যদেবের বিরাট ব্যক্তিসত্তা তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। বৈষ্ণব প্রেমধর্ম ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙ্‌লা সাহিত্য ও সমাজে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকে এই ধারার প্রবল বেগ কিছুটা কমে আসে। তখন সবাই নতুন কথা বলবার ও নতুন বিষয় জানবার জন্য উৎসুক হয়ে ওঠে। অথচ তখন নতুনের বিশেষ কোন আভাস পাওয়া যায়নি। শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত প্রেমধর্মের নতুনত্ব বাঙালীকে কিছুটা এগিয়ে যাবার সুযোগ এনে দেয়।

ষোড়শ শতাব্দীতে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পুঁথির আলোচনাপ্রসঙ্গে প্রথম যশোরাজখানের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি একখানি কৃষ্ণমঙ্গলকাব্য রচনা করেছিলেন বলে বলা হয়। কিন্তু তাঁর সেই কাব্যের কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। যশোরাজখানের ব্রজবুলি পদ পাওয়া যায়। গোবিন্দ আচার্য নামে

একজন কবি একখানি কৃষ্ণমঙ্গল রচনা করেন। শ্রীচৈতন্যের প্রধান অনুচরদের মধ্যে একজন গোবিন্দ আচার্য ছিলেন। সম্ভবত ইনি সেই গোবিন্দ আচার্যই হবেন। চৈতন্যভক্ত পরমানন্দ গুপ্ত একখানি 'কৃষ্ণস্তবাবলী' রচনা করেছিলেন। ইনি একজন উৎকৃষ্ট পদকর্তাও ছিলেন। ভাগবতের অনুসরণে কবি রঘুনাথ বা রঘুপণ্ডিত 'কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিনী' রচনা করেছিলেন। কথিত আছে, শ্রীচৈতন্য তাঁর মুখে ভাগবত শ্রবণ করে তাঁকে ভাগবতাচার্য উপাধিতে ভূষিত করেন। ভাগবতের অনুবাদ বলেই হয়ত তাঁর কাব্যের ভাষা ও ভাব বেশ গম্ভীর।

মাধবাচার্য নামে একজন কবি 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' নামে একখানি কাব্য রচনা করেন। ইনি যে কোন্ মাধবাচার্য তা বলা দুষ্কর। গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ও চৈতন্যচরিতামৃতের মতে ইনি চৈতন্য-শিষ্যদের একজন। আবার প্রেমবিলাসের মতে ইনি চৈতন্য-পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ভ্রাতুষ্পুত্র। আবার কেউ কেউ চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতা মাধব আচার্য ও শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা মাধবাচার্যকে অভিন্ন বলে মনে করেন। কবি যে চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন তা কৃষ্ণমঙ্গলে উল্লিখিত আছে। মাধবাচার্যের কৃষ্ণমঙ্গলে ব্রজবুলিতে লেখা কয়েকটি পদও পাওয়া যায়।

এর পর কবিশেখরের 'গোপালবিজয়কে' কৃষ্ণায়ণ কাব্যধারার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বললে অত্যুক্তি হবেনা। কবিশেখর শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে একজন। তিনি কবিশেখর, শেখর, রায় শেখর, শেখর রায় প্রভৃতি ভণিতাসহযোগে বাঙ্‌লা ও ব্রজবুলিতে বহু পদ রচনা করেছেন। কবিশেখরের পদগুলি বাঙ্‌লা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এঁর অনেক পদ বিদ্যাপতির নামেও প্রচলিত আছে। বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত বিখ্যাত 'এ সখি, আমারি দুখের নাহি ওর' পদটি শেখর কবিরই রচনা। কবিশেখরের সংস্কৃত ও বাঙ্‌লা উভয় ভাষা এবং সাহিত্য সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ছিল। 'গোপালবিজয়' কাব্য ও পদাবলী ছাড়া তিনি কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য এবং নাটকও রচনা করেন। 'গোপালবিজয়' কাব্যের কাহিনী ও চরিত্র প্রায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো। কবিশেখরের রচনার কোথাও অধ্যবসায়ের পরিচয় নেই। সর্বত্র কবিত্বের সহজ ও সাবলীল গতিভঙ্গী তাঁর কাব্যরচনাকে বিশিষ্টতা দান করেছে। কেউ কেউ কবিশেখর ও কবিরঞ্জন-বিদ্যাপতিকে অভিন্ন বলে মনে করেন। কবিশেখরের প্রকৃত নাম দেবকীনন্দন সিংহ। পদাবলী আলোচনায় আমরা কবিশেখরের পদের আলোচনা করিনি।

এখানে তাঁর কয়েকটি পদাংশ উদ্ধৃত করছি। তা থেকে বোঝা যাবে যে কেন এবং কি করে তাঁর পদ বিদ্যাপতির নামে চলে গেছে।

(ক) ঝরঝর বরিখে সঘন জলধারা।
দশদিশ সবহুঁ ভেল আন্ধিয়ারা॥
এ সখি কীয়ে করব পরকার।
অব জনি বাধয়ে হরি অভিসার॥

* * *

ঝলকই দামিনি দহন সমান।
ঝনঝন শবদ কুলিশ ঝনঝান॥ ইত্যাদি।

(খ) সুখদ বৃন্দাবন সুখময় শ্যাম।
সুখময়ি রাধা তহিঁ অনুপাম॥
দুহুঁ মেলি কেলি-বিলাস করু।
দুহুঁ অধরামৃত দুহুঁ মুখ ভরু॥ ইত্যাদি।

(গ) গগনে অব ঘন মেহ দারুণ
সঘনে দামিনী ঝলকই।
কুলিশ-পাতন শবদ ঝনঝন
পবন খরতর বলগই॥
সজনি আজু দুরদিন ভেল।
হমারি কান্ত নিতান্ত আগুসরি
সঙ্কেত কুঞ্জহি গেল॥ ইত্যাদি।

শুধু ব্রজবুলি নয়, তাঁর বাঙ্‌লাতে লেখা পদও লালিত্যে ও মাধুর্যে সার্থক। বিরহিনী রাধা সখীকে বলছেন—

কহিও কানুরে সই কহিও কানুরে।
একবার পিয়া যেন আইসে ব্রজপুরে॥
রোপিণু মল্লিকা নিজ করে।
গাঁথিয়া ফুলের মালা পরাইও তারে॥
নিকুঞ্জে রাখিনু এই মোর হিয়ার হার।
পিয়া যেন গলায় পরয়ে একবার॥ ইত্যাদি।

'দুঃখী' শ্যামদাস নামে একজন কবিও গোবিন্দমঙ্গল রচনা করেন। তাঁর রচনাতেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রভাব এসে পড়েছে। মঙ্গলকাব্যের নিয়মেই শ্যামাদাস সম্ভবত গোবিন্দমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। কারণ গোবিন্দমঙ্গলে রাধার বারমাস্যাও বর্ণিত হয়েছে।

মহাভারত-পাঁচালী (অনুবাদ কাব্য)

এ যুগে বৈষ্ণব সাহিত্য রচনার সঙ্গে সঙ্গে মহাভারতও অনূদিত হয়েছে। তখনকার মুসলমান রাজা, সেনাপতি ও হিন্দু রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় কিছু কিছু অনুবাদ চলেছিল। মহাভারতের গল্প পূর্ব থেকেই এদেশে প্রচলিত ছিল। গুপ্ত আমল থেকে আজ পর্যন্ত রামায়ণ মহাভারতের গল্প পুরানোও হয়নি, শেষও হয়নি।

মহাভারতের প্রাচীন অনুবাদক হচ্ছেন পরমেশ্বর দাস। ইনি কবীন্দ্র উপাধি লাভ করেন। অবশ্যি এ নিয়েও মতভেদ আছে। কবীন্দ্র পরমেশ্বর একই ব্যক্তি, না কবীন্দ্র এবং পরমেশ্বর দুজন ছিলেন তা নিয়ে অনেক বাদানুবাদও হয়েছে। কবীন্দ্র ও পরমেশ্বর একই ব্যক্তি বলেই আমাদের মনে হয়। ইনি হুসেন শাহ্‌এর সেনাপতি পরাগল খানের আদেশে মহাভারতের অনুবাদ করেন। কাব্যটি আকারেও খুব বৃহৎ নয়। কবি সম্ভবত চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

পরাগল খানের পুত্র নুসরৎখান বা ছুটিখান শ্রীকর নন্দীকে অশ্বমেধ পর্ব রচনা করতে আদেশ করেন। শ্রীকর নন্দী জৈমিনি সংহিতা অবলম্বনে বিস্তৃতভাবে অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করেন। কবি তাঁর কাব্যে সুলতান হুসেন শাহ্‌ এবং তাঁর পুত্র নুসরৎ শাহ্‌এর উল্লেখ করেছেন। শ্রীকর নন্দীর রচনা থেকে মনে হয় তখনও পরাগল খান বেঁচে আছেন। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় শ্রীকর নন্দীকে শ্রীচৈতন্যের প্রায় সমসাময়িক বলে মনে করেন। গ্রন্থে সুলতান হুসেন শাহ্‌এর উল্লেখ তার একটি কারণ।

সঞ্জয় নামে আর একজন মহাভারতের অনুবাদকের নাম পাওয়া যায়। তবে সঞ্জয় নামে আদৌ কেউ ছিলেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। যদি কেউ থাকেনও তাহলে অনুবাদক অপেক্ষা সংকলয়িতা বা সংগ্রাহক হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

এ ছাড়া এসময় আর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অনুবাদ হচ্ছে রামচন্দ্র খানের অশ্বমেধ পর্ব, দ্বিজ রঘুনাথের অশ্বমেধ পর্ব, কবি অনিরুদ্ধের মহাভারত পাঁচালী।

২

ইলিয়াশ শাহী আমলের পর

ইলিয়াশ শাহী আমলের শেষে পাঠান শের শাহ্ শূর বাঙ্লার সিংহাসন অধিকার করেন। তারপর থেকে বাঙ্লা দেশে শূর বংশ কিছুকাল (১৫৫৩-১৫৬৪) রাজত্ব করেন। কালাপাহাড়ের বীভৎস ধ্বংসলীলা এসময়েই সম্ভবত কিছু দিনের জন্য বাঙ্লা, বিহার, উড়িষ্যা ও আসামকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে। শূর বংশ কিছু দিনের জন্য মোগলদের পরাজিত করে দিল্লীর সিংহাসনও অধিকার করেছিলেন। শূরবংশের পর বাঙ্লা দেশে কর্‌রাণী বংশের রাজত্ব (১৫৬৪) শুরু হয়। তাজ্খান কর্‌রাণী বাঙ্লার সিংহাসন দখল করার এক বছর পর মৃত্যুমুখে পতিত হন। তারপর তাঁর ভাই সুলেইমান কর্‌রাণী (১৫৬৫-১৫৭২) প্রায় আট বছর রাজত্ব করেন। এ সময়েই বিশ্বসিংহ বর্তমান কোচবিহারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এবং বিশ্বসিংহের পুত্র নরনারায়ণ (১৫৩৮-১৫৮৭) ও তাঁর ভ্রাতা শুক্লধ্বজ (চিলারায়) বহুদূর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। সুলেইমান কর্‌রাণীর মৃত্যুর পর তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র দাউদ খান কর্‌রাণী বাঙ্লার সিংহাসনে বসেন। দাউদ খানের সময় থেকে আবার বাঙ্লা দেশে উপদ্রব ও অশান্তি শুরু হয়। তখন দিল্লীর সিংহাসনে আকবর বিরাজমান। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে দাউদ্খান কর্‌রাণী মোগল সেনাপতি মুনিম খাঁর হাতে পরাজিত হ'লে বাঙ্লা দেশ মোগলের অধীনে চলে আসে। এই সময় থেকে বাঙ্লা দেশে ব্যাপক অশান্তি কিছুটা দূরীভূত হয়। তবে সাধারণ কর্মচারীর অত্যাচার লেগেই ছিল। মুকুন্দরামের 'প্রজার পাপের ফলে ডিহিদার মামুদ সরীপ'—এই উক্তি ইতিহাসের দিক থেকে খুবই সত্য।

দাউদ্‌খান বা ওসমান প্রভৃতি ছাড়াও এসময় খিজিরপুরের ঈশাখাঁ ও তাঁর পুত্র মুশাখাঁ, হিজলির সলিম খাঁ, ভূষণার রাজা শত্রুজিৎ, যশোহরের প্রতাপাদিত্য, বাক্‌লার রামচন্দ্র, ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য, শ্রীপুরের কেদাররায়-চাঁদরায়, সুসঙের রঘুনাথ, ভাওয়ালের বাহাদুর গাজী, বীরভূমের বীর হাম্বীর, পাছেটের শাম্‌স্‌ খাঁ প্রভৃতি বিখ্যাত ভূইয়ঁারা তখনও মোগলের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। প্রায় ৩৫ বৎসর কাল এঁরা মোগলশক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত মানসিংহ এবং ইস্‌লাম খাঁর হাতে এঁরা অনেকে পরাজিত বা নিহত হন। কিন্তু এই বিখ্যাত বীর ভূইয়ঁাদের কথা তখনকার সাহিত্যে বিশেষ কোনো প্রাধান্য পায়নি।

মোগল আমলে বাঙ্‌লার সমাজ একটি নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতিতে বাঙ্‌লীর সংকীর্ণতা অনেকখানি ঘুচে যায়। বাঙ্‌লা দেশে এসময় বৈষ্ণব সংগঠন গড়ে ওঠে। বলতে গেলে এই বৈষ্ণব ধর্মের ভিতর দিয়েই বাঙালীর জাতিগত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেতে থাকে। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মের সুকোমলতা বাঙালীকে অনেকখানি কোমল ও দুর্বল করে ফেলে। বাঙালী শিখল 'তৃণাদপি সুনীচ' এবং 'তরোরিব সহিষ্ণু' হতে। কিন্তু সুনীচই হ'ল—দৃঢ়তা এবং সহিষ্ণুতার আর তেমন কোনো চিহ্ন রইল না। পুরুষকার মাথা তুলে আর দাঁড়াতে পারলো না। এই সময়ে বাঙ্‌লার মুসলমান সমাজেরও অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। বৈষ্ণব ধর্ম এবং সুন্নি মতবাদ বাঙ্‌লার হিন্দুমুসলমানের মধ্যে একটা সাড়া এনে দেয়।

১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর দিল্লীর সিংহাসন লাভ করেন। এদিকে মানসিংহের পর কুতুব-উদ্‌-দীন খান কোকাহ্‌ (১৬০৬-১৬০৭) এবং তারপর জাহাঙ্গীর কুলী খান (১৬০৭-১৬০৮) বাঙ্‌লার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। বাঙ্‌লার শাসনকর্তা ইসলাম খাঁর (১৬০৮-১৬১৩) সময়ে দেশের অন্তর্বিদ্রোহ বহুল পরিমাণে প্রশমিত হয়। কিন্তু ইসলাম খাঁর ভাই কাশিম খাঁর সময়ে (১৬১৩-১৬১৭) আবার বাঙ্‌লাদেশে উপদ্রব ও অশান্তি দেখা দেয়। সম্রাট জাহাঙ্গীর কাশিম খাঁকে দিল্লীতে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর পরিবর্তে ইব্রাহিম খাঁ ফৎ-ই-জঙ্‌কে (১৬১৭-১৬২৪) বাঙ্‌লার শাসনকর্তা করে পাঠান। ইব্রাহিম খাঁ-ই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্‌লার ঘরে বাইরে শান্তি বজায় রাখতে সমর্থ হন। এবং তাঁর সময়ে দেশে নানা দিক থেকে উন্নতিও দেখা দেয়। ইব্রাহিম খাঁ যখন

বাঙ্‌লার শাসনকর্তা তখন দিল্লীর সিংহাসনকে কেন্দ্র করে ভারতের বুকে অশান্তি তীব্র হয়ে দেখা দেয়। ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দের দিকে শাহ্‌-জাহান (খুরম) পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই বিদ্রোহ অনেকখানি শাহ্‌-জাহানের বিমাতা নূর-জাহানের বিরুদ্ধেই। শাহ্‌-জাহান উড়িষ্যা অধিকার ক'রে বাঙ্‌লাদেশ অভিমুখে অভিযান চালান। শাহ্‌-জাহানের সেনাদলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে ইব্রাহিম খাঁন নিহত হন। বাঙ্‌লার রাজনৈতিকক্ষেত্রে এ সময় অরাজকতা বিরাজ করছে।

বাঙ্‌লা দেশ প্রায় এক বৎসর কাল (১৬২৪-১৬২৫) শাহ্‌জাহানের অধীনে ছিল। জাহাঙ্গীরের বিখ্যাত সেনাপতি মহাবত্‌ খাঁর হাতে তিনি পরাজিত হ'লে বাঙ্‌লা দেশ আবার জাহাঙ্গীরের অধীনে চলে যায়। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পর শাহ্‌-জাহানের রাজত্বকাল থেকে বাঙ্‌লা দেশে আবার কিছুটা শান্তি ফিরে আসে। পর্তুগীজ (দস্যু ও বণিক), ওলন্দাজ প্রভৃতি বণিকরা পূর্ব থেকেই ভারতবর্ষে ব্যবসাবাণিজ্য করতে এসেছিল। ইংরেজরা আসে তাদের একটু পরে। এবং বাঙ্‌লা দেশের সঙ্গেও এই ব্যবসাসূত্রে তাদের যোগাযোগ ঘটে। বিদেশদের ফলাও করে ব্যবসা-বাণিজ্য করা—এই শাহ্‌-জাহানের রাজত্বকাল থেকেই শুরু হয়। পর্তুগীজরা অনেক আগে এসে বাঙ্‌লা ভাষাকে নিজেদের শব্দভাণ্ডার দ্বারা বেশ কিছুটা সমৃদ্ধ করে। শাহ্‌-জাহানের বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার সময় (১৬৫৭ খ্রীঃ) দিল্লী সিংহাসন লাভের জন্য তাঁর ছেলেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিরোধ দেখা দেয়। বুদ্ধিমান ঔরংজীব অন্যান্য ভাইদের হত্যা করে এবং তাড়িয়ে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। সুজা বাঙ্‌লা দেশ থেকে আরাকানে পালিয়ে যাওয়ার পর ঔরংজীব মীর জুম্‌লাকে বাঙ্‌লার শাসনকর্তা করে পাঠান। মীর জুম্‌লা আসাম পর্যন্ত অভিযান চালান। মীর জুম্‌লার অভিযানের আগেও আসামের উপর বাঙ্‌লার মুসলমান শাসনকর্তারা আক্রমণ চালিয়েছেন কিন্তু সুবিধে করতে পারেন নি।

মীর জুমলার পর অল্প কয়েক দিনের জন্য দাউদ্‌খান, দিলির খান্‌ প্রভৃতি শাসনকার্য চালালেও প্রকৃতপক্ষে শায়েস্তা খান বাঙ্‌লার শাসনভার (১৬৬৪ খ্রীঃ) গ্রহণ করেন। তাঁর শাসনকালে চট্টগ্রাম, সন্দীপ প্রভৃতি মোগলের অধীনে আসে এবং ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ ঘটে। শায়েস্তা খানের

পর ইব্রাহিম খান বাঙ্‌লার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তাঁর সময়েই জব্ চার্ণক কর্তৃক কলিকাতার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

শায়েস্তা খানের সময় বাঙ্‌লা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যেমনই থাকুক—চাল ডাল খুব সস্তায় পাওয়া যেত। সে সময় টাকায় আট মণ চালের দাম বাঙ্‌লা দেশের প্রায় সবাই জানেন। হয়ত এসব কারণেই তাঁর কথা এদেশে এখনও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। শায়েস্তা খান ১৬৬৪ থেকে ১৬৭৬ এবং ১৬৭৯ থেকে ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দুবার বাঙ্‌লার সুবাদারি করেন।

শায়েস্তা খানের পর যখন ইব্রাহিম খান বাঙ্‌লার শাসনকর্তা হন তখন আবার শোভাসিংহ ও রহিম খান ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহ করেন। দ্বিজ-হরিরামের কাব্যে এই শোভাসিংহের উল্লেখ আছে। ইব্রাহিম খান অসমর্থ হলেও তাঁর পুত্র জবরদস্ত্ খান ও ফৌজদার নূর-উল্লাহ্ খান এই বিদ্রোহ দমন করেন। এরপর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক ইতিহাসে আর বিশেষ কোনো বৈচিত্র্য নেই।

১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় তাতে দেখতে পাই যে, বাঙ্‌লা দেশের রাজনৈতিকক্ষেত্রের উপর দিয়ে তখন কি ভীষণ ঝড় বয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সাহিত্য রচনার দিক থেকে বিশেষ কোনো বাধাও সৃষ্টি হয় নি। এর একটি কারণ হয়ত এই, ইলিয়াশ শাহী আমল থেকে বাঙালী যে আত্মস্থ ও প্রকৃতিস্থ হবার সুযোগ পেয়েছিল, মহাপ্রভুর আবির্ভাব তাকে আরও সহজ গতি দান করেছিল। তাই দেখতে পাই দেশের রাজনৈতিকক্ষেত্রে দুর্যোগ দেখা দিলেও সাহিত্যক্ষেত্রে সেই ঘন দুর্যোগের ছায়া তেমন পড়েনি। সাংস্কৃতিকক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মিলনের বিভাস বেজে উঠেছে। এই দুই সম্প্রদায় বাঙালী হিসাবে বাইরের কাছে পরিচিত হয়েছেন।

মোগল আমলে দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা ক্রমশ দুর্বল হয়ে আসছিল। কারণ দেশের ঐশ্বর্য-সম্পদ তখন বাইরে চলে যাচ্ছে। এ দেশের লোক দুবেলা যাহোক দুমুঠো খেতে পেলেই যথেষ্ট মনে করছে। অন্ন-বস্ত্রের একটা যাহোক ব্যবস্থাতেই বাঙ্‌লার জনসাধারণ তখন নিজেদের কৃতার্থ মনে করছে। এই দুর্বলতার জন্য বাঙ্‌লার বৈষ্ণবধর্মের ভাবপ্রবণতাও কিছুটা দায়ী।

চৈতন্য-প্রভাবিত যুগের সাহিত্য

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর থেকে বাঙ্‌লা দেশে বৈষ্ণবধর্ম এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের দানের অজস্রতা বাঙালীকে মুগ্ধ করে রাখে। ভারতবর্ষের বহুস্থানে বৈষ্ণবধর্মের আকুল-করা আবেগ ছড়িয়ে পড়ে। বাঙ্‌লা দেশে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের পরে বাঙ্‌লা ও বাঙালীকে যাঁরা বৈষ্ণব প্রেমধর্মের উজ্জীবন মন্ত্রের দ্বারা বৈষ্ণবধর্মের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধান্বিত করে রেখেছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন স্বনামধন্য শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দ। এঁদের প্রচারিত প্রেমধর্মে বাঙ্‌লা দেশ আবার ভেসে গেল। বাঙ্‌লার বুকে অহর্নিশ নাম-সংকীর্তনের ঢেউ অপূর্ব আবেগ জাগিয়ে তুল্‌ল। এই তিনজনের মধ্যে শ্রীনিবাস ছিলেন মুখ্য। বৈষ্ণবসমাজ তাঁকে শ্রীচৈতন্যের দ্বিতীয় অবতার বলে মনে করত। দুয়েকটি পদ ছাড়া সাহিত্যে শ্রীনিবাসের দান তেমন কিছু নেই। তবে তাঁর শিষ্যরা নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ পদকর্তা হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। শ্রীনিবাসের শিষ্যদের মধ্যে গোবিন্দদাস কবিরাজ, গোবিন্দদাস চক্রবর্তী, যদুনন্দন, বংশীদাস, রঘুনাথদাস, গোকুলানন্দ, রাধাবল্লভ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীনিবাস আচার্য বৃন্দাবনের গোস্বামীদের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। নরোত্তম ও শ্যামানন্দের সঙ্গে সেখানেই তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। বিষ্ণুপুরের রাজা বীর হাম্বীর যে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন চৈতন্যচরিতামৃত প্রসঙ্গে তার উল্লেখ করেছি।

নরোত্তমদাস ঠাকুর বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্যে নতুন করে প্রাণ সঞ্চার করেন। ইনি ধনী জমিদারবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পদ্মাতীরবর্তী খেতরি গ্রামে তাঁর নিবাস ছিল। ইনি সম্ভবত শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর আবির্ভূত হন। নরোত্তম বৃন্দাবনে গিয়ে লোকনাথ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং শ্রীজীব গোস্বামীর কাছে শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন। এখানেই তাঁর সঙ্গে শ্রীনিবাস শ্যামানন্দের মিলন ঘটে। বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসে নরোত্তম নিজ গ্রাম খেতরিতে বৈষ্ণব মহাসম্মেলনের সার্থক আয়োজন করেন। খেতরির এই উৎসব বৈষ্ণব ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বাঙ্‌লা কীর্তনগান এই সময় থেকেই বিশেষভাবে প্রচলিত হয়। নরোত্তমের চরিত্রমাধুর্য তখনকার বাঙালী

সমাজকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করে। অনেকে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শিষ্যদের মধ্যে বসন্ত রায়, শিবরাম দাস প্রভৃতি পদকর্তাদের নাম উল্লেখযোগ্য। নরোত্তম নিজেও বিখ্যাত পদকর্তা ছিলেন। এঁর 'প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা' শ্রেষ্ঠ রচনার পরিচয় বহন করে। বাঙলার বৈষ্ণবসমাজ তাঁকে চিরকাল সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করবে। নরোত্তম ভণিতাযুক্ত একটি পদের কিছুটা অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি। তা থেকে তাঁর কবিত্বশক্তি ও ভাবাবেগের পরিচয় পাওয়া যাবে।

সখি পিরিতি আখর তিন
জপহ রজনী দিন।
পিরিতি না জানে যারা
কাষ্ঠের পুতুলি তারা।
পিরিতি জানিল যে
অমর হইল সে।
পিরিতে জনম যার
কে বুঝে মহিমা তার।
যে জনা পিরিতি জানে
বেদবিধি সে কি মানে। ইত্যাদি।

এই যুগের আর একজন বিখ্যাত বৈষ্ণব আচার্য শ্যামানন্দদাস ছিলেন জাতিতে সদ্‌গোপ। ইনি মেদিনীপুর জেলার লোক ছিলেন। চৈতন্য-অনুচর গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য হৃদয়ানন্দের নিকট তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইনিও শ্রীনিবাস-নরোত্তমের মতো বৃন্দাবনে গিয়ে শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেন। শ্যামানন্দের প্রধান শিষ্য ছিলেন রসিকানন্দ। গোপীবল্লভদাস রসিকমঙ্গল নামে রসিকানন্দের জীবনী রচনা করেন। প্রেমবিলাস, প্রেমামৃত, ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস, মনোহরদাসের অনুরাগবল্লী প্রভৃতিতে শ্যামানন্দের শিষ্যদের কথা বিশেষভাবে বর্ণিত আছে।

গোবিন্দদাস কবিরাজ

ষোড়শ শতাব্দীতে 'গোবিন্দ' নামধারী দুজন পদকর্তা ছিলেন। অবশ্যি বৈষ্ণবসমাজে বহু গোবিন্দের সাক্ষাৎ মিলে। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি হচ্ছেন

গোবিন্দদাস কবিরাজ। কবির পিতার নাম চিরঞ্জীব এবং মাতার নাম সুনন্দা। আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় বা চতুর্থ দশকে তাঁর আবির্ভাব ঘটে। গোবিন্দদাস প্রথম শাক্ত ছিলেন, পরে শ্রীনিবাস আচার্যের নিকট বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। গোবিন্দদাসের প্রায় পদই ব্রজবুলিতে রচিত। বাঙ্‌লাতে লেখা যে সব পদ পাওয়া তা আদৌ তাঁর রচনা কিনা সে সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগতে পারে। বাঙ্‌লা পদগুলি গোবিন্দদাস চক্রবর্তীর হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

ভাষা, ছন্দ ও অলংকার এবং সর্বোপরি ভাবমাধুর্য—গোবিন্দদাসের পদাবলীর প্রধান বৈশিষ্ট্য। এখানে তাঁর রচনার দুয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করছি। রাধা কৃষ্ণাভিসারে যাবার পথের বাধা অতিক্রম করার জন্য ঘরে মহড়া দিচ্ছেন—

কন্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি ঢারি' করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি ॥
মাধব, তুয়া অভিসারক লাগি।
দূতর পন্থ গমন ধনী সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি ॥

উদ্ধৃত পদাংশটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দের একটি সার্থক উদাহরণ।

দিনের বেলায় রাধা কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে অভিসার যাত্রা করেছেন। তার বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলছেন—

মাথহি তপন তপত পথ বালুক,
আতপ দহন বিথার।
নোনিক পুতলি তনু চরণ কমল জনু,
দিনহিঁ চললি অভিসার ॥
হরি হরি! প্রেমক গতি অনিবার।
কানু-পরশ-রসে অবস রসবতী।
বিছরলুঁ সবহুঁ বিচার ॥

বিরহাবসানে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হবার পর রাধার আর নিজের বলে কিছু রইল না। তিনি নিজেকেই কৃষ্ণের কাছে সমর্পণ করলেন। এ শুধু প্রেম নয়, এ যেন জীবনের পূর্ণ প্রণাম। রাধার মুখে কবি-হৃদয়ের অশ্রুসজল আকুলতা যেন শুনতে পাই—

যাঁহা পহুঁ অরুণ-চরণে চলি যাত।
তাঁহা তাঁহা ধরণি হইয়ে মঝু গাত॥
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ।
হাম ভরি সলিল হোই তথি মাহ॥
এ সখি, বিরহ মরণ নিরদ্বন্দ্ব।
ঐছনে মিলই যব গোকুল (শ্যামর) চন্দ॥ ইত্যাদি।

এই পদে শ্রীচৈতন্যের ব্যক্তিত্বের প্রভাব রয়েছে মনে হয়।

নিম্নোদ্ধৃত পদাংশে বর্ষাভিসারিকার চিত্রটি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে—

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥
তহি অতি দুরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল॥
সুন্দরী কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস সুরধনী পার। ইত্যাদি—

কথিত আছে, গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির কয়েকখানি অসমাপ্ত পদ পূরণ করেন। তার মধ্যে একখানি বিখ্যাত পদের কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করছি। তাতে বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাসের ভাষাগত কোনো পার্থক্য খুঁজে পাওয়া দুরূহ ব্যাপার—

প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল,
ন ভেল যুগল পলাশা।
প্রতিপদ চাঁদ উদয় জৈ সে কামিনী
সুখ লব ভৈ গেল নিরাশা॥
সখিহে, অব মোহে নিঠুর মধাই
অবধি রহল বিসরাই।

এই পদের শেষে ভণিতায় আছে—

পাপ পরাণ আন নাহি জানত
কাহ্নু কাহ্নু করি ঝুর।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব—
গোবিন্দদাস রসপুর॥

গোবিন্দদাসের পুত্র দিব্যসিংহ এবং পৌত্র ঘনশ্যাম কবিরাজও বিখ্যাত পদকর্তা ছিলেন।

গোবিন্দদাস চক্রবর্তীও শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য ছিলেন। ইনি বাঙ্‌লা এবং ব্রজবুলি, দুই ভাষাতেই পদ রচনা করেছেন। গোবিন্দদাস নামাঙ্কিত বাঙ্‌লা পদগুলি বোধ হয় তাঁরই রচনা।

বসন্ত রায় এবং রায়-চম্পতিও এই যুগের বিখ্যাত পদকর্তা। বসন্ত রায় রাজা প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্যও হতে পারেন।

কামরূপ-কামতায় বাঙ্‌লা সংস্কৃতির প্রভাব

কামরূপ-কামতা প্রাচীন দিন থেকেই তান্ত্রিক সাধনার প্রধান পীঠস্থান হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল। মুসলমানরা আসাম অভিমুখে অভিযান চালিয়ে আংশিক সাফল্য লাভ করেছিলেন বটে কিন্তু কামরূপ অভিযানে তাঁদের বারবার ব্যর্থ হতে হয়েছিল। এই যুগে সেখানে বাঙ্‌লার সংস্কৃতির প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে বিস্তার লাভ করেছিল। কোচ রাজা বিশ্বসিংহের সময় (আনুমানিক ১৫২২-২৩ খ্রীঃ) কামতা রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁর পুত্র নরনারায়ণ এবং শুক্লধ্বজের সময় সেখানে বাঙ্‌লা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটে।

কামরূপ-কামতায় যেসব সাহিত্য বিকাশ লাভ করে তাদের রচয়িতাদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন মাধব-কন্দলী, শঙ্করদেব ও মাধবদেব। মাধব-কন্দলী শ্রীরাম-পাঁচালী রচনা করেন। তিনি বোধ হয় লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত রামায়ণের অনুবাদ করেছিলেন।

শঙ্করদেব ছিলেন শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক। ইনি আসামে শুধু বৈষ্ণব আন্দোলন নয় বৈষ্ণব সাহিত্যেরও প্রবর্তক।

ব্রহ্মপুত্র-তীরে বড়দোয়া গ্রামে অভিজাত কায়স্থ বংশে শঙ্করদেব জন্মগ্রহণ

করেন। তিনি যে নামধর্ম প্রচার করতে থাকেন তাতে আচার-বিচারে তিনি আর জাতিভেদ, ধর্মভেদ মানলেন না। এর জন্যে তখনকার ব্রাহ্মণরা তাঁর উপর ভয়ানক চটে যান। ব্রাহ্মণ, কৈবর্ত, কোচ সবাই একসঙ্গে বসে খাবে—তাহলে জাত থাকে কোথায়! ব্রাহ্মণরা যখন শঙ্করের নামধর্ম-প্রচার ও জাত্যাভিমান-বর্জনকে অস্বীকার ক'রে তাঁকে বিব্রত করে তুলতে চাইলেন তখন তিনি রাজা নরনারায়ণ ও শুক্লধ্বজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। শঙ্কর রামায়ণের উত্তর কাণ্ড এবং কিছু রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদও রচনা করেন। এছাড়া তিনি ভাগবত পুরাণ, অনাদি পাতন প্রভৃতি কতগুলো পৌরাণিক নিবন্ধও রচনা করেছিলেন। নীলাচলে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে।

শঙ্করের শিষ্য মাধব দেবও ভক্তিরত্নাবলী, শ্রীকৃষ্ণজন্মরহস্য প্রভৃতি কয়েকটি পৌরাণিক নিবন্ধ রচনা করেন।

বাঙ্‌লার সংস্কৃতির প্রভাব শুধু আসাম নয় একদিকে মণিপুর অপর দিকে নেপাল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। এমন কি সপ্তদশ শতাব্দী থেকে সুদূর আরাকান অঞ্চলেও বাঙ্‌লা সাহিত্য রচিত হচ্ছিল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে অনেক বৈষ্ণবসাহিত্যের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু বৈষ্ণবসাহিত্যের পাশাপাশি এই যুগে অন্যান্য ধারার সাহিত্যের গতিও অব্যাহত রয়েছে। মঙ্গলকাব্য ধারায় মনসামঙ্গল ছাড়া চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, রায়মঙ্গল, শিবায়ণ প্রভৃতি রচিত হচ্ছে। আবার যে সব ছোটো খাটো দেব-দেবীদের কথা লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল সপ্তদশ শতাব্দীর দিকে তাদের নিয়ে মঙ্গলকাব্যের অনুকরণে পাঁচালী প্রভৃতি রচিত হয়েছিল। মুসলমান কবিদের দ্বারা এ সময় ধর্মপ্রভাবমুক্ত প্রণয়মূলক কাব্য, ইস্‌লাম ধর্ম-মাহাত্ম্য-বিষয়ক কাব্যও রচিত হয়েছে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে যে সব কাব্য রচিত হয়েছে তার মধ্যে প্রথম চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আলোচনা করা প্রয়োজন। চৈতন্য-ভাগবতে বৃন্দাবনদাসের উক্তি থেকে জানতে পারি যে চণ্ডীর পূজা এবং চণ্ডী-বিষয়ক কাব্য পূর্বেই এদেশে প্রচলিত ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে চণ্ডী-বিষয়ক কাব্যের কোনো সন্ধান না পেলেও অন্তত চণ্ডীর পূজা নিশ্চয় বাঙ্‌লা দেশে

প্রচলিত ছিল। বাঙ্‌লার ঘরে ঘরে তখন মঙ্গলচণ্ডীর পূজা হত। বৃন্দাবন-দাসের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে' উক্তি থেকে মনে হয় পাঁচালী বা ছড়া-জাতীয় চণ্ডীর কোনো গীত তখন বাঙ্‌লা দেশে প্রচলিত ছিল। চট্টগ্রাম অঞ্চলে চণ্ডীর পাঁচালীকে 'জাগরণ গান' বলে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দেবী চণ্ডী বাঙালীর কাছে শিবের স্ত্রীরূপে পরিচিতা। শিবঠাকুরও যেমন প্রাক্-বৈদিক যুগের ও পরবর্তীযুগের নানা কল্পনাপ্রসূত লৌকিক দেবতা, চণ্ডীও তেমনই বৈদিক দেবতা নন। রামায়ণ-মহাভারতে চণ্ডীর কোনো উল্লেখ নেই। পরবর্তীকালের ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, দেবীভাগবত, বৃহদ্ধর্মপুরাণ প্রভৃতিতে তাঁর উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এইসব পুরাণাদিও বেশী প্রাচীনত্বের দাবী করতে পারে না। এবং এও সত্য যে তিনি উক্ত পুরাণ-সৃষ্ট দেবতাও নন। সমাজে বহুল প্রচলনের মধ্যে দিয়ে পুরাণের যুগেই চণ্ডী পুরাণাদিতে গৃহীত হয়েছেন। মহাভারতের ভীষ্মপর্বে কৃষ্ণ অর্জুনকে যুদ্ধে জয় লাভের কামনা করে দুর্গার কাছে প্রার্থনা জানাতে বলেন। অর্জুনের প্রার্থনা অংশে দুর্গার—উমা, চণ্ডী, চণ্ডা, কালী প্রভৃতি নাম পাওয়া যায়। আমাদের বিশ্বাস মহাভারতের এই দুর্গাস্তোত্র অংশটি পরে সংযোজিত হয়েছে। যে চণ্ডীকে আমরা পুরাণশাস্ত্রে পাচ্ছি, তিনি এবং আমাদের কাব্যের চণ্ডীও সম্পূর্ণ এক নন।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে যে দুটো কাহিনী আছে, তার সূত্র-স্বরূপ বৃহদ্ধর্মপুরাণে একটি শ্লোক পাই। সেখানে বলা হচ্ছে—

ত্বং কালকেতু-বরদা চ্ছল গোধিকাসি
যা ত্বং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্যা।
শ্রীশালবাহন-নৃপাদ্ বণিজ স্বসূনোঃ
রক্ষেঽম্বুজে করিচয়ং গ্রসতী বমন্তী॥

এই গোধিকা এবং গজ গ্রাস ও বমন, কালকেতু ও ধনপতি সদাগরের উপাখ্যানে যথাক্রমে রয়েছে।

ছোট নাগপুরের ওরাঁও জাতিরা 'চাণ্ডী'নামে এক দেবীর পূজা করে। ইনি শিকারীদের দেবতা। কালকেতু-উপাখ্যানে যে বনচণ্ডীকে পাওয়া যায় তিনি কি মূলত এই 'চাণ্ডীরই' নতুন সংস্করণ? দ্বিজমাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর-গীতের ভূমিকায় শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেন যে, ওরাঁওদের দেবীর

নাম চাণ্ডী নয়—চান্দী। কাজেই চাণ্ডী এবং চণ্ডীর সমীকরণ তিনি স্বীকার করেন না।

অনেকের মতে বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবী বজ্রতারা কিংবা বজ্রযানী-বৌদ্ধদের বজ্রধাত্বীশ্বরীই হয়ত চণ্ডী নামে পরিচিতা হন। বজ্রধাত্বীশ্বরীর স্তোত্রে ব্যাঘ্র, বরাহ প্রভৃতি পশুর উল্লেখ আছে।

শিবের পত্নী হিসাবে দুর্গা, অম্বিকা, গৌরী, কালী প্রভৃতি যেসব দেবীর নাম করা হয় চণ্ডীও তাঁদের মধ্যে একজন। প্রথমদিকে এসব দেবীরা নিশ্চয় পৃথকভাবে পূজা পেতেন। পরের দিকে সবাই মিলে এক হয়ে যান। বাঙ্‌লার জন-সমাজে দেখতে পাই, চণ্ডীও এভাবে নানাজনের কাছে নানা রূপ পরিগ্রহ করে পূজা পেয়েছেন। এদেশে তিনি, রণ চণ্ডী, নাটাই চণ্ডী, উড়ন চণ্ডী, ঘোর চণ্ডী, ওলাই চণ্ডী, কুলুই চণ্ডী, মঙ্গল চণ্ডী প্রভৃতি বিভিন্ন নামে এবং বিভিন্ন ভাবে পূজা পেয়ে আসছেন। বাঙ্‌লার নারীসমাজ এবং অন্যান্য দল বা উপদল নিজেদের প্রয়োজনে চণ্ডীর এক একটা রূপকল্পনা গ্রহণ করেছিল।

অনেকে মনে করেন বাশুলীদেবীর সঙ্গে হয়ত চণ্ডীর একটা সাদৃশ্য আছে। বিশেষ করে বৃদ্ধ শিবের প্রতি ইঙ্গিত করে যখন—

বাশুলী বলেন বাছা শুন প্রাণ জোড়া।
কোথা পাব জোয়ান আপনি ভজি বুড়া॥

(ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল)

তখন মনে হয় শিবের পত্নী যদি বহু-নাম্নী হন তাহলে চণ্ডী ও বাশুলী হয়ত এক হ'তে পারেন। কিন্তু বাশুলী-মন্ত্রে কোথাও বলা হয়নি যে তিনি শিবের পত্নী।

চণ্ডী এদেশে গোড়াতে নিম্ন জাতির দ্বারা পূজিতা হতেন। তাঁর পূজায় মদ্য, মাংস ইত্যাদি নিবেদন করা হত। দস্যুদেরও একজন চণ্ডী আছেন। তিনি 'ডাকাতে কালীর' সমগোত্রীয়া। বাঙ্‌লার ঘরে ঘরে যিনি পূজা পেয়ে আসছেন তাঁর নাম মঙ্গলচণ্ডী। বৃহদ্ধর্মপুরাণ বলেন যে ইনি প্রথম মঙ্গলগ্রহের দ্বারা পূজিতা হতেন বলে এঁর নাম মঙ্গলচণ্ডী হয়েছে। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ বলেন,

মঙ্গলেষু চ যা দক্ষা সা চ মঙ্গলচণ্ডিকাঃ।

যিনি অপরের মঙ্গল সাধনে দক্ষ তিনিই মঙ্গলচণ্ডী। অবশ্যি ব্রহ্মবৈবর্ত-

পুরাণেও মঙ্গলগ্রহের দ্বারা পূজা পাওয়ার কথার উল্লেখ আছে। আবার এও বলা হয়েছে যে মঙ্গল নামক এক রাজা দেবীর পূজা করতেন বলে তাঁর নাম মঙ্গলচণ্ডী হয়েছে। কোনো কোনো গ্রন্থে মঙ্গল নামে এক দৈত্যকে নিধন করার জন্য দেবীর নাম মঙ্গলচণ্ডী হয় বলেও উল্লেখ আছে।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, দেবীভাগবত প্রভৃতিতে বলা হয়েছে যে, চণ্ডী হিন্দুসমাজে প্রথম নারীদের দ্বারাই পূজা পান। কালকেতু-উপাখ্যানে দেখি চণ্ডী ব্যাধ জাতির পূজা পাচ্ছেন আর ধনপতি-উপাখ্যানে তিনি নারীর দ্বারা পূজিতা হচ্ছেন।

কৃত্তিবাসী-রামায়ণে রামের চণ্ডীপূজা অংশ যদি পরের দিকে প্রক্ষিপ্ত না হয়ে থাকে ত একথা স্বীকার করতে হয় যে লৌকিক চণ্ডী চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর দিকে পৌরাণিক মর্যাদা লাভ করেছেন। নবম বা দশম শতাব্দীর দিকের স্বর্ণগোধিকা সমেত চণ্ডীমূর্তিও পাওয়া গেছে। এ থেকে বেশ প্রাচীন কাল থেকেই যে চণ্ডী পূজা প্রচলিত ছিল তা কল্পনা করা শক্ত নয়।

অর্বাচীন কাল থেকে চণ্ডী ও দুর্গার অভিন্ন রূপ কল্পনা করা হয়েছে। এই মঙ্গল চণ্ডীই 'মূর্তি ভেদেন সা দুর্গা'। দুর্গা পূজাতে চণ্ডী পাঠের রীতি আছে। চণ্ডীর পরিকল্পনাতেও পার্থক্য রয়েছে। দ্বিজমাধব বা মুকুন্দরাম প্রভৃতি চণ্ডী-মঙ্গল রচয়িতাদের পরের কবিরা প্রধানত মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীর অনুসরণ করেছেন।

মঙ্গলকাব্যের দেবতারা সাধারণত উগ্র প্রকৃতির হন। কিন্তু মঙ্গলচণ্ডী সেদিক থেকে কিছুটা কোমল স্বভাবের। তবে সিংহলে মশান-লীলায় তিনি তাঁর স্বরূপ ঢাকতে পারেননি।

বাঙ্লা দেশে যে চণ্ডী ঘরে ঘরে নিজের পূজা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁর মধ্যে বৌদ্ধ-তান্ত্রিক কোনো দেবী, লৌকিক ও পৌরাণিক চণ্ডী, বিশেষ করে মহিষ-মর্দিনী চণ্ডী, লক্ষ্মী, আদ্যাশক্তি, সরস্বতী প্রভৃতি মিশে গেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, লৌকিক ও পৌরাণিক ধারার দেবীদের মিশ্রণ ঘটলেও তাঁদের নিয়ে যে পৃথক্ পৃথক্ কাহিনী ছিল তার বিশেষ কোনো পরিবর্তন বা মিশ্রণ ঘটেনি।

চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী

চণ্ডীমঙ্গলের আখ্যানবস্তু তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে সৃষ্টিতত্ত্ব এবং শিব-চণ্ডীর পারিবারিক জীবনালেখ্য রয়েছে। সেখানে দরিদ্র শিবের বিবাহ, তাঁর অভাব-অনটনের সংসার প্রভৃতির পৌরাণিক ও অপৌরাণিক কাহিনী

মিশে একটি উপাখ্যান গ'ড়ে উঠেছে। তাছাড়া চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আমরা দুটি আলাদা গল্পও পাই। প্রথমটি হচ্ছে কালকেতুর গল্প আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে ধনপতি সদাগরের গল্প। একটিতে বনচণ্ডী বা অরণ্যচণ্ডী—যিনি ব্যাধ, পশু প্রভৃতির দ্বারা পূজিতা হচ্ছেন, অপরটিতে মঙ্গলচণ্ডী—যিনি বাঙ্‌লার ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। অবশ্যি খুল্লনাও বনে ছাগল হারিয়ে চণ্ডীর পূজা করেছিল। আমাদের মনে হয় কালকেতু পূজিত চণ্ডীই প্রাচীন। পরের দিকে সমাজের উচ্চস্তরে চণ্ডীকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য ধনপতি সদাগরের কাহিনী পরিকল্পিত হয়েছিল।

কালকেতুর উপাখ্যানটি সংক্ষেপে এই—

চণ্ডীদেবী মর্ত্যলোকে পূজা পাবার জন্য মনস্থ করে তাঁর পূজা প্রচারার্থে ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরই উপযুক্ত হবে ভেবে শিবকে গিয়ে বললেন, নীলাম্বরকে যাহোক একটা অভিশাপ দিয়ে মর্ত্যলোকে পাঠাতে। শিব আপত্তি করলেন। তারপর একদিন নীলাম্বর যখন শিবপূজার জন্য ফুল তুলছিল চণ্ডী সেই ফুলের মধ্যে কীট হয়ে লুকিয়ে রইলেন। ফুল দিয়ে শিবপূজা করার সময় কীটরূপিনী চণ্ডী শিবকে দংশন করেন। শিব যন্ত্রণায় ক্রুদ্ধ হয়ে নীলাম্বরকে এই বলে অভিশাপ দিলেন, মর্ত্যে সে ব্যাধরূপে জন্মাবে। অভিশপ্ত নীলাম্বর ধর্মকেতু নামে এক ব্যাধের ঘরে কালকেতুরূপে জন্মগ্রহণ করল। নীলাম্বর-পত্নী ছায়া আর এক ব্যাধের ঘরে ফুল্লরা নামে জন্মগ্রহণ করে।

ছেলেবেলা থেকেই কালকেতু বেশ বলিষ্ঠ ও শক্তিমান। সে বাঘ ভালুক নিয়ে খেলা করে। কাউকে ভয় করে না। কালকেতুর বয়স হলে পিতা ধর্মকেতু ফুল্লরার সঙ্গে কালকেতুর বিয়ে দিল।

দরিদ্র হলেও কালকেতুর সংসারে কোনো দুঃখ ছিল না। প্রতিদিন শিকার ক'রে যা আনে, তাই বাজারে বিক্রি করে তাদের সংসার চলে। কিন্তু বনের পশুরা কালকেতুর ভয়ে বনে টি`কতে পারছেনা। প্রতিদিন তাদের কালকেতুর হাতে প্রাণ দিতে হয়। তারা একদিন চণ্ডীর কাছে আবেদন জানালো, 'মা আমাদের বাঁচাও।' চণ্ডী বললেন, 'ভয় নেই। আমি তোমাদের রক্ষা করব।' তারপর থেকে কালকেতু বনে গিয়ে আর কোনো শিকার পায় না। দেবীর মায়ায় পশুদের সে দেখতেও পায় না। কদিন ধরে কালকেতুর ঘরে খাওয়া জুটছে না।

একদিন কালকেতু শিকারে যাওয়ার পথে এক স্বর্ণগোধিকা দেখতে পেল। যাত্রাকালে গোধিকা অত্যন্ত অশুভ চিহ্ন। কালকেতু ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে গোধিকাটি ধনুকের ছিলায় বেঁধে প্রতিজ্ঞা করল 'আজ যদি কিছু না পাই ত এই গোধিকাটি পুড়িয়ে খাব।' সেদিন সমস্ত বন ঘুরেও কোনো শিকার মিলল না।

বাড়ী ফিরে এসে কালকেতু ফুল্লরাকে বলল, 'আজ কিছুই পাইনি, তবে এই গোধিকাটি এনেছি। এর ছাল ছাড়িয়ে তুমি রান্না কর। তোমার সই বিমলার বাড়ী থেকে কিছু খুদ ধার করে নিয়ে এসো।' এই বলে সে বাসি মাংসের পসরা নিয়ে বাজারে বিক্রি করতে গেল।

রান্না করার আগে ফুল্লরা স্নান করতে গেল। ফিরে এসে দেখে গোধিকা নেই। সে জায়গায় এক অপূর্ব সুন্দরী যুবতী দাঁড়িয়ে আছে। তিনি আর কেউ নন—স্বয়ং চণ্ডীদেবী। ফুল্লরা তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। তিনি নিজের জীবনের দুঃখের কথা বলে পরে বললেন, 'আনিয়াছে তোর স্বামী বাঁধি নিজ গুণে।' দরিদ্রের সংসার হলেও স্বামীর সঙ্গে ফুল্লরার সুখেদুঃখেই দিন কাটছিল। কিন্তু এই যুবতী এসে হয়ত তার সুখের সংসার ভেঙে দেবে। ফুল্লরা তাঁকে কত অনুরোধ করল তার ঘর ছেড়ে যেতে। নিজের জীবনে যে দারিদ্র্যকে বরণ করে নিয়েছে তার ভয় দেখাতে লাগল। কিন্তু দেবী কেবল মুচকি হাসেন। ফুল্লরা ছুটে গেল হাটে কালকেতুর কাছে। কালকেতু সব শুনে বাড়ী ফিরে এসে দেবীকে নানাভাবে প্রশ্ন করাতে অবশেষে দেবী নিজের পরিচয় দিলেন—আর দিলেন তাদের অশেষ ধনসম্পদ।

কালকেতু এখন খুব বড়োলোক। সে গুজরাত নগর পত্তন করল। সেই নগরে হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে সবাইকে এনে বসাল। এদের সঙ্গে এসেছিল ভাঁড়ুদত্ত নামে এক ধূর্ত কায়স্থ। কালকেতুর কাছ থেকে চালাকি করে কিছুটা স্বার্থ আদায় করে সে প্রজাদের উপর অত্যাচার করতে লাগল। ভাঁড়ুদত্ত হাটে গিয়ে জিনিস কিনে আর দাম দিতে চায় না। দাম চাইতে গেলে দরিদ্র ব্যবসায়ীদের সঙ্গে 'চটাচটি' করে। প্রজারা কালকেতুর কাছে নালিশ জানাতেই কালকেতু ভাঁড়ুদত্তকে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করল। তখন ভাঁড়ুদত্ত গেল কলিঙ্গ রাজার দেশে। সেখানে কালকেতুর নামে নানা মিথ্যাকথা বলে কলিঙ্গরাজ ও কালকেতুর মধ্যে যুদ্ধ বাধিয়ে দেয় এবং তারই ছলনায়

চণ্ডী শেষপর্যন্ত মঙ্গলচণ্ডী রূপে ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হন। কালকেতুর উপাখ্যান পুরানো হলেও গুজরাত নগরে যে মুসলমান প্রজাদের জায়গা জমি দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা হয় বলে চণ্ডীমঙ্গলে উল্লেখ করা হয়েছে মধ্যযুগের কবিরা যুগধর্মানুযায়ীই তা করেছিলেন। কিংবা মুসলমান শ্রোতাদের সন্তুষ্টি সাধনের জন্যই বোধ হয় এরকম করা হয়েছিল। তবে এটা ঠিক যে সাধারণ মানুষের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান বিভেদ তখন অনেকটা ঘুচে এসছে।

চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ ঃ
মাণিক দত্ত

চণ্ডীমঙ্গলের প্রাচীন কবি হচ্ছেন মাণিক দত্ত। মুকুন্দরাম বলেছেন—

মাণিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়।
যাহা হৈতে হৈল গীত পথ পরিচয়॥

কবিকঙ্কণচণ্ডী-বঙ্গবাসী সং (১৩৩২)

কিন্তু তাঁর রচনাকাল জানা যায়নি। সম্ভবত পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মাণিক দত্ত তাঁর কাব্য রচনা করেন। মাণিক দত্তের মনসামঙ্গলের যে খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গেছে তাতে কালকেতুর নগরপত্তন উপলক্ষে 'ফিরিঙ্গী'র উল্লেখ পাওয়া যায়—

'আকন ফিরিঙ্গী সব বসিল একত্তরে।'

এই 'ফিরিঙ্গী' শব্দটি প্রক্ষিপ্ত না হলে মাণিক দত্তের কাল অনেক পরে এসে পড়ে। কিন্তু এখানে মুকুন্দরামের উল্লেখের উপর আমাদের নির্ভর করতে হবে। মাণিক দত্ত নামাঙ্কিত পুঁথিতে চৈতন্যদেবের বর্ণনা আছে। আমাদের মনে হয়, প্রাপ্ত পুঁথির লিপিকরও কিছু অংশ নিজ দায়িত্বে কাব্যের মধ্যে জুড়ে দিয়েছিলেন।

মাণিক দত্তের পুঁথি মালদহ অঞ্চলে বিশেষভাবে প্রচলিত আছে। তাঁর পুঁথিতেও এমন কয়েকটি স্থানের নাম আছে যা উত্তর বঙ্গে, বিশেষ ক'রে মালদহের কাছাকাছি অবস্থিত। এ থেকে মনে হয়, তিনি হয়ত মালদহের লোক ছিলেন।

মুকুন্দরামের মতো মাণিক দত্তের তেমন কবিত্ব শক্তি ছিল না। তিনি সহজভাবে কালকেতু ও ধনপতি উপাখ্যান বলে গেছেন। ভাবসম্পদ যাই

থাক, ছন্দ-সম্পদের দিক থেকে তিনি কিছুটা দুর্বল ছিলেন। তবে তাঁর কাব্যে ছড়ার ছন্দের প্রয়োগবৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। কাব্যের আখ্যানবস্তুর মধ্যে নতুন কিছু না থাকলেও মাঝে মাঝে তিনি রসিক পাঠককে কাব্য সম্বন্ধে উৎসুক করে তুলেছেন। চরিত্র সৃষ্টির দিক থেকে তিনি তেমন নতুন কিছু করতে পারেননি।

দ্বিজ মাধব

দ্বিজ মাধবের কাব্যের নাম 'সারদা চরিত' বা 'সারদামঙ্গল'। কাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধে কবি বলছেন—

ইন্দু-বিন্দু-বাণ-ধাতা শক নিয়োজিত
দ্বিজ মাধব গায়ে সারদা-চরিত।

এ থেকে তাঁর কাব্যের রচনাকাল ১৫০১ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দ হয়। কবি তাঁর আত্ম-পরিচয়ে সম্রাট আকবরের নাম উল্লেখ করেছেন। মনে হয়, দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দরাম প্রায় এক সময়েই আবির্ভূত হয়েছিলেন। মুকুন্দরামের কাব্যের রচনাকাল ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দে থেকে ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ধরা যেতে পারে। কাব্য রচনা আরম্ভ করার দিক থেকে মুকুন্দরাম দ্বিজ মাধবের চেয়ে প্রাচীন হবেন। কিন্তু মুকুন্দরামের কাব্য রচনা যখন শেষ হয় তার আগেই সম্ভবত দ্বিজ মাধব তাঁর কাব্য রচনা শেষ করেছেন।

দ্বিজ মাধবের কাব্যে আমরা সপ্তগ্রাম, নদীয়া প্রভৃতি স্থানের নাম পাই। তা থেকে ধরে নেওয়া হয় যে, কবি পশ্চিমবঙ্গের লোক ছিলেন। কিন্তু দ্বিজ মাধব নামাঙ্কিত উত্তরবঙ্গের দুয়েকখানি পুঁথি ছাড়া বাকি সব পুঁথিই চট্টগ্রাম, নোয়াখালী অঞ্চলেই পাওয়া গেছে। চট্টগ্রামে চণ্ডীমঙ্গল বলতে দ্বিজ মাধবের চণ্ডীকেই বোঝায়। তাহলে কি আমরা এই ধরে নিতে পারি যে, কবি পশ্চিমবঙ্গের হ'লেও শেষ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে গিয়ে বাস করেন? পশ্চিমবঙ্গের সপ্তগ্রাম-অধিবাসী মাধবাচার্যের নামে গঙ্গামঙ্গল এবং শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল (ভাগবতসার) নামক আরও দুইখানি কাব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতা দ্বিজ মাধবই এই সব কাব্যের রচয়িতা কিনা তা নিয়ে নানা মতভেদ আছে।

মুকুন্দরামের সঙ্গে দ্বিজ মাধবের তুলনা না করেও এই কথা বলা যায় যে, দ্বিজ মাধব ষোড়শ শতাব্দীর একজন প্রথম শ্রেণীর কবি ছিলেন। চরিত্র সৃষ্টিতে

তিনি মুকুন্দরামের সমকক্ষ না হলেও প্রায় কাছাকাছি ছিলেন। দ্বিজ মাধব সে যুগের সমাজ-চিত্র অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে অঙ্কন করতে চেষ্টা করেছেন। দরিদ্র ঘরের দুঃখ, সতীনের সঙ্গে ঘর করার দুঃখ, ভাঁড়ু দত্ত জাতীয় লোকের প্রতারণা প্রভৃতির চিত্র সুন্দরভাবে এঁকেছেন। দ্বিজ মাধবের কাব্যে তান্ত্রিক ভাব থাকলেও বৈষ্ণবপ্রভাব, বিশেষ করে চৈতন্যপ্রভাব সুস্পষ্ট। কবি কাব্যের ধুয়ায় বলেন—

জয় গোপাল করুণাসিন্ধু।
এহ লোকে পরলোকে তুমি দীনবন্ধু॥

অথবা

সখি, নন্দকি নন্দনা।
চূড়ার উপরে ময়ূরের পাখা কিবা চাহনা॥

অথবা,

ভাল নাচেরে গৌরাঙ্গ রঙ্গিয়া।
রসভরে করে ডগমগিয়া॥

অথবা,

দেখরে গোরা-চান্দের বাজার।
প্রেমময় রসের পসার॥

দ্বিজ মাধবের কাব্যে ফুল্লরার বারমাস্যার বর্ণনা মুকুন্দরামের বর্ণনার মতোই উজ্জ্বল ও মধুর ; কোনো কোনো জায়গায় স্বাভাবিকতায় মুকুন্দরামকেও অতিক্রম করে গেছেন। দ্বিজ মাধবের কাব্যের বৈশিষ্ট্য যাই থাকুক না কেন, মুকুন্দ-রামের চণ্ডীমঙ্গলই বাঙালীর হৃদয় অনেকখানি জয় করে নিয়েছিল। বাঙলা দেশে মুকুন্দরামই অবিসংবাদিতভাবে চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি বলেই স্বীকৃত। পূর্ববঙ্গে অবশ্যি মুকুন্দরামের চেয়ে দ্বিজ মাধবের কাব্যের প্রচলনই বেশী ছিল।

দ্বিজ মাধব তাঁর কাব্যকে সারদাচরিত বা সারদামঙ্গল নামে অভিহিত করেছেন। তাতে মনে হয় যে, চণ্ডীতে ও সরস্বতীতে একটি ভাবযোগ রয়েছে। দ্বিজ মাধবের কাব্যে চৈতন্য বন্দনা নেই, কয়েকটি বিষ্ণুপদে শুধু গৌরাঙ্গের উল্লেখ আছে। কাব্যখানি গাওয়া হত বলে তাতে অনেক রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে।

কবি মুকুন্দরাম

মুকুন্দরাম শুধু ষোড়শ শতাব্দীর নয়, সমগ্র মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তখন সাহিত্যে যে গতানুগতিকতা দেখা দিয়েছিল, বৈষ্ণব গীতি-কবিতার ভিতর দিয়ে যে বিরহ-মিলনের সুরের সঙ্গে বাঙালীর নিবিড় পরিচয় ঘটেছিল, মুকুন্দরাম তার মাঝে মানবজীবন রসকে পরিবেশন করলেন। কবি-সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেন মহাশয় যথার্থই বলেছেন, 'সাহিত্য শক্তির প্রধান উপাদান কবির আনন্দ-সিদ্ধি এবং সত্যে দৃষ্টি বা সহানুভূতি ; সর্বোপরি হৃদয়-ভাবের নামরূপ-প্রদায়িনী সৃষ্টি শক্তি। প্রাচীন বঙ্গের ক্ষেত্রে দুই একস্থলে ব্যতীত, সকল দিকে কবিকঙ্কণের সমজাতীয় বা সমকক্ষ ব্যক্তি আর নাই। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, বিশ্বনাথ বা লোচনদাস হয়ত আনন্দের উচ্ছ্বাস এবং আন্তরিকতায় ইহাকে স্থলবিশেষে অতিক্রম করিয়াছেন ; কৃত্তিবাস এবং কাশীদাস সমুন্নত আর্য-আদর্শের সহানুভূতিক্ষেত্রেও ইহাকে অতিক্রম করিয়াছেন, স্বীকার করিব। কিন্তু মানব জীবনের—প্রকৃত বাঙালী জীবনের মধ্যক্ষেত্রে 'আসর গাড়িয়া' সাধারণের মধ্য হইতেই অসাধারণতার ভাব উজ্জ্বলিত করিয়া, জাতীয় সাহিত্য নির্মাণের সুদৃঢ় ভিত্তি পত্তন করিতে কবি-কঙ্কণের এই ভাষা, এই হৃদয়গতি, এই দৃষ্টি এবং সৃষ্টিশক্তি পরম মহার্ঘ বিবেচিত হইবে।'

কবি মুকুন্দরাম নিজের পরিচয় দিয়ে কাব্যের প্রায় ভণিতাতেই বলেছেন,

মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ।

মহামিশ্র জগন্নাথের পুত্র হৃদয়মিশ্র—তাঁর পুত্র কবিচন্দ্র এবং মুকুন্দরাম। কাব্যে রমানাথ নামে আর এক ভ্রাতারও উল্লেখ আছে। বর্ধমান জিলার দামুন্যা গ্রামে কবির পৈতৃক নিবাস ছিল। ডিহিদার মামুদ সরিপের অত্যাচারে দামুন্যা পরিত্যাগ করে মেদিনীপুর জিলার আড়রা গ্রামে জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। মুকুন্দরাম বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথের গৃহশিক্ষক ছিলেন।

মুকুন্দরামের জন্মকাল নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে, মুকুন্দরাম আনুমানিক ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থরচয়িতা হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের মতে, তিনি ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। আমরা পূর্বে বলেছি যে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ধরা যেতে পারে। কবির জন্মকাল ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি হবে বলেই মনে হয়।

ডিহিদার মামুদ শরিফের অত্যাচারে গ্রাম ছেড়ে পালাবার সময় যাঁদের নিকট সাহায্য পেয়েছিলেন তাঁদের কথা তিনি কাব্যের মধ্যে আত্ম-পরিচয় অংশে বলেছেন। তাঁর নিজের জীবনের দুঃখ-দুর্দশাকে কাব্যের ভিতর দিয়ে যেভাবে সর্বজনীন হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছেন তা সেযুগে খুব কম লেখকই সমর্থ হয়েছেন। কাব্যের মধ্যে মানব-হৃদয়কে জাগিয়ে তোলা—একেবারে human interest গড়ে তোলা, সত্যিই সেযুগের পক্ষে বিস্ময়কর ব্যাপার। ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'বঙ্গ ঔপন্যাসিকের অধিকাংশ গুণই তাঁহার মধ্যে বর্তমান ছিল। এই যুগে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি যে কবি না হইয়া ঔপন্যাসিক হইতেন, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই।'

অলৌকিকত্বে ভরা মঙ্গলকাব্য লিখতে বসে মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যকে রক্ত-মাংসের মানুষের প্রাণচিত্রিত করে তুলেছেন। বাস্তবচিত্র সম্বন্ধে তাঁর সূক্ষ্ম ও গভীর জ্ঞান ছিল। তা হাট-বাট, ঘর, দুয়ার, শীত ও তার শাড়ী, ভূষণ প্রভৃতি চরিত্র অঙ্কন লক্ষ্য করুন। এছাড়াও চরিত্র সম্বন্ধে কবির নিজস্ব বাস্তব অভিজ্ঞতা ছিল এবং এই অভিজ্ঞতা থাকার জন্যই তাঁর কাব্যের চরিত্রগুলি এত জীবন্ত ও সার্থক হয়ে উঠেছে।

কালকেতু-উপাখ্যানের প্রথমভাগে দেখতে পাই, কালকেতু অতি দরিদ্র, দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোটেনা তার। এই দারিদ্র্য শুধু কালকেতুর নয়, এ দারিদ্র্য সে যুগের নিম্নবিত্ত বা নিঃস্ব বাঙালীর দারিদ্র্য। চণ্ডীর বরে কালকেতুর রাজা হবার মধ্যে তৎকালীন সাধারণ মানুষের আশার ইঙ্গিত রয়েছে। এবং সেই আশাকে দৈবশক্তির দ্বারা সফল করে তোলার ব্যবস্থার জন্য দিতেই চণ্ডীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। কালকেতু-উপাখ্যানের চণ্ডী যেন, আসলে লক্ষ্মীর প্রতীক। মনে হয়, কবির অন্তরে দারিদ্র্য অবসানের ঐশ্বর্যলাভের যে অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল কালকেতু-উপাখ্যানে তাকেই রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন।

হিংসামতি ব্যাধ আমি অতি নীচ জাতি।
কি কারণে মোর গৃহে আসিবে পার্বতী॥

বর্তমানে মানুষের মূল্য বিচার জাতবিচারের মাধ্যমে কেউ কখনও করে না। সে যুগের বিত্তহীন দরিদ্রশ্রেণীর চিত্রটি কালকেতু-উপাখ্যানে পশুদের মাধ্যমেও কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে। ভালুক যখন বলে—

উই চারা খাই পশু নামেতে ভালুক।
নেউগী চৌধুরী নহি না রাখি তালুক॥

(দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত চণ্ডীমঙ্গল)

তখন বুঝতে পারি কবির ইঙ্গিত কোথায় গিয়ে পৌঁছায়! মুকুন্দরাম প্রাচীন প্রবাদ-প্রবচন সম্বন্ধেও অনবহিত ছিলেন না। তাঁর 'হরিণ জগত-বৈরী আপনার মাংসে' কথাটি চর্যাপদের 'আপনা মাঁসে হরিণা বৈরী'র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। হাস্যরস বর্ণনাতেও তিনি অদ্বিতীয়। শিবে চণ্ডীতে ঝগড়া এবং মুরারি শীল ও ভাঁড়ুদত্তের কাহিনীতে এই হাস্যরস সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

মুকুন্দরাম দুঃখের কবি কিন্তু দুঃখবাদী কবি নন। জীবনে দুঃখ তিনি পেয়েছিলেন বলেই দুঃখের চিত্রগুলিকে এত সজীব করে আঁকতে পেরেছিলেন, দৈনন্দিন জীবনের অভাব ও দুঃখের তিক্ততা তাঁকে অনেকখানি বাস্তবনিষ্ঠ করে তুলেছিল। কিন্তু এও ঠিক যে, যুগধর্মানুযায়ী তিনি সাহিত্যের মধ্যে অলৌকিকত্বের ছড়াছড়িকেও অতিক্রম করে যেতে পারেন নি। জীবনের দুঃখের এমন যথার্থ সত্য রূপ সাহিত্যে বিরল। কবি-সমালোচক শশাঙ্কমোহন এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'সাহিত্যের ক্ষেত্রে দুঃখের নামও আনন্দ। কবির হৃদয় মধ্যে সাংসারিক সুখ-দুঃখ আনন্দ মূর্তিতে উপস্থিত হইতে না পারিলে সাহিত্য জন্মলাভ করিত না। কবিত্বের প্রধান উপাদান জীবনপথে আনন্দ-সিদ্ধি। এই গ্রাম্য-কবি জীবনের পরমার্থ লাভ করিয়াছিলেন।' মুকুন্দ-রামের যে পাণ্ডিত্য ছিল, তাতে তিনি রস ও অলঙ্কারবহুল উচ্চাঙ্গের সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু জীবনরসে রসিক কবি রাজপথ ছেড়ে মেঠো পথে চলতে চলতে বাঁশীতে দীপকের বদলে ভাটিয়ালিতেই সুর ধরেছিলেন।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলে অর্থনৈতিক অবস্থার যে ইঙ্গিত রয়েছে তাতে দেখতে পাই, বর্তমান দিনের মতো সে যুগের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পাই-

কারি ও খুচরা দুই ধরণের ব্যবসা চলত। এ ছাড়া তখন কারিগরী ব্যবসাও (manufacturing) চলছে। কালকেতুর নগর পত্তনেও যে তেলী-কলুদের উল্লেখ আছে তারা এ ধরণের ব্যবসা করত। কালকেতু-উপাখ্যানের প্রথম পর্যায়ে দেখি, তখনকার সমাজের আর্থিক সচ্ছলতা বর্তমান দিনের চাইতে খুব বেশী ভালো ছিল না। কালকেতুরই শুধু 'খুদ কুঁড়া' ধার করতে হয় না, প্রয়োজন হলে শিবঠাকুরের ত্রিশূল বাঁধা দেবার কথাও পার্বতী ভাবেন। মুকুন্দরাম খাওয়ার ব্যাপারটা বেশ ঘটা করে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেই বর্ণনার মাঝে কবির জীবনের করুণ দীর্ঘশ্বাস যেন শুনতে পাওয়া যায়। তাঁর নিজের ঘরে যখন 'শিশু কাঁদে ওদনের তরে' তখন অন্নাকাঙ্ক্ষিই কবির বর্ণনায় যেমন বুভুক্ষুর আকুলতা প্রকাশ পাচ্ছে তেমনই তার মাঝে একটি অশ্রুসজল দিক যে প্রচ্ছন্ন থাকবে এতে আশ্চর্য কি! এই জন্যেই মুকুন্দরাম রোমাণ্টিক। তাঁর সাহিত্য জীবনের সুখ-দুঃখের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলকে ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্‌লার সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস বলা যেতে পারে। তিনি পর্তুগীজ জলদস্যু বা 'হার্মাদে'র কথাও উল্লেখ করেছেন। এদের ভয়ে এদেশের মানুষকে সর্বদা সশঙ্কিত থাকতে হ'ত। সে যুগে যে অরাজকতা দেখা দিয়েছিল, রাজকর্মচারীদের যে অন্যায় জুলুমে প্রজাগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল, তাও তিনি প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। মহাজনরা ধার দিতে গিয়ে কি রকম করে ঠকাত, কোটালরা টাকা পয়সার জন্য কি রকম মারধোর করত—সবই তাঁর কাব্যে পাওয়া যায়। সে সময়—

সরকার হইলা কাল   খিল ভূমি লেখে লাল
বিনা উপকারে খায় ধুতি।
পোদ্দার হইল যম   টাকা আড়াই আনা কম
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি।

এই অত্যাচারে প্রজারা দেশ ছেড়ে পালিয়ে বাঁচতে চায়। কিন্তু—

পেয়াদা সবার কাছে   প্রজারা পালায় পাছে
দুয়ার চাপিয়া দেয় হানা।
প্রজা হইল ব্যাকুলি   বেচে ঘরের কুড়ালি
টাকার দ্রব্য বেচে দশ আনা॥

এই অরাজকতায় দরিদ্র প্রজাদের অন্নাভাবে তিলে তিলে মরা ছাড়া আর কোনো যে উপায় থাকতে পারে তা জানা থাকলেও সেযুগে সে উপায় অবলম্বনের উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাব ছিল।

৩

সপ্তদশ শতাব্দীর দান

মুকুন্দরামের পর আমরা সপ্তদশ শতাব্দীতে এসে পড়ি। এযুগে বৈষ্ণব সাহিত্যধারা পূর্বের মতোই সমানভাবে চলেছে। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে চৈতন্যজীবনী আর কেউ লেখেন নি। তার পরিবর্তে অন্যান্য বৈষ্ণব মহাজন বা মোহন্তদের জীবনীকাব্য রচিত হয়েছে। পদাবলী সাহিত্য আগের মতোই রচিত হচ্ছে। পুরানোর জেরও তখন বেশ জোরালো ভাবেই চলছে। প্রেমভক্তির যে আদর্শ যোড়শ শতাব্দীতে মানুষকে মানুষের খুব কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল, এযুগে প্রথমদিকে তার ভাবাবেগ প্রবল থাকলেও পরের দিকে তা গতানুগতিক হয়ে আসে।

এসময় রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, পুরাণাদির এবং বৈষ্ণবশাস্ত্রের অনেক অনুবাদ হয়েছে। কতগুলি বৈষ্ণব নিবন্ধ এযুগে রচিত হয়েছিল। নতুন সৃষ্ট বৈষ্ণব তান্ত্রিক মত নিয়ে অনেক রচনাও এসময় পাওয়া যায়। সহজ মত বা তান্ত্রিক মতের সহজ দিকটা বৈষ্ণব মতবাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। মহাপ্রভুর পথ থেকে উক্ত মতবাদীরা বেশ কিছুটা দূরে সরে গিয়ে এক নতুন ধরণের মতবাদ প্রচার করতে চেষ্টা করছিলেন। নিজেরা নাম গোপন করে কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতির নামের আড়ালেও লিখছিলেন। এই কড়চাজাতীয় নিবন্ধগুলির মধ্যে বৈষ্ণব রসতত্ত্বকে একটু ঢিলে-ঢালা করে রূপ দেওয়া হচ্ছিল।

যোড়শ শতাব্দীর মতো এই যুগে চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, শিবায়ণ এবং কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কাব্য রচিত হয়েছে। কিন্তু এযুগের সাহিত্যধারায় আমরা কয়েকখানি নতুন ধরণের রচনার সংবাদ পাচ্ছি। ধর্মঠাকুরের কথা পূর্বে

উল্লিখিত হলেও ধর্মমঙ্গলকাব্য সপ্তদশ শতাব্দীতেই পাওয়া যাচ্ছে। রায়মঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল প্রভৃতি কয়েকখানি পাঁচালী কাব্যও এযুগেই রচিত হয়েছে।

ষোড়শ শতাব্দী থেকে মুসলমান শাসনকর্তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং আরাকান-রোসাঙ্‌ রাজসভাকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাঙ্‌লা সাহিত্য গড়ে উঠতে থাকে। হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সমাজের কবিরা সাহিত্য রচনা শুরু করেন। এঁদের মধ্যে মুসলমানদের দানই বেশী। চৈতন্যযুগ ও চৈতন্য-প্রভাবিত যুগে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষ্ণব প্রেমধর্ম অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল। মুসলমানদের স্থফি মতের ভাব-বিভোরতা শ্রীচৈতন্য-প্রচারিত প্রেমধর্মকে প্রভাবান্বিত করে। মুসলমানরাও বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকেন। অনেক মুসলমান কবি বৈষ্ণব পদ রচনা করেছিলেন। মুসলমানদের দ্বারা ধর্মপ্রভাবযুক্ত কাব্যও এযুগে রচিত হয়েছিল।

বাঙ্‌লার বিদ্যাস্থন্দর-কাহিনীর প্রাচীনতম রচনা হচ্ছে দ্বিজ শ্রীধরের। শ্রীধরের এই রচনাকালে প্রায় ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি বলা যায়। শা বিরিদ খান নামে একজন মুসলমান কবিও আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর দিকে বিদ্যাস্থন্দর রচনা করেন। প্রাক্‌-চৈতন্যযুগে এবং চৈতন্য-যুগে ধর্ম-প্রভাবমুক্ত রোমান্টিক অথবা প্রণয়মূলক কাব্যের নিদর্শন পাওয়া না গেলেও সে সময় নিশ্চয় এ ধরণের কাহিনী লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। শ্রীগীতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার অন্তরালে গ্রাম্য প্রেমিক-প্রেমিকার গোপন প্রণয়ের কিছুটা আভাসও হয়ত আছে। হয়ত ধর্মভাবের প্রাধান্য হেতু এই কাব্যগুলি যথাযথভাবে প্রকাশ লাভ করতে পারেনি। মুসলমান কবিরা হিন্দু ধর্ম ও ইসলাম ধর্ম বিষয়ক কাব্যও রচনা করেছেন।

এই যুগের ঐতিহাসিক পটভূমিকার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। রাজনৈতিক ঝড়-ঝাপটার মধ্যেও সাহিত্য রচনার গতি এযুগে অব্যাহত ছিল। মোগল শাসনের স্থত্রপাতে বাঙ্‌লা দেশের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য স্থানের একটি সম্পর্কে গড়ে উঠে। তখন মোগল সাম্রাজ্য দিল্লীকে কেন্দ্র করে সারা ভারতে বিস্তৃত হচ্ছে। এই সঙ্গে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের বৈষ্ণব ধর্মমত প্রচারও ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলের সঙ্গে বাঙ্‌লা দেশের পরিচয় ঘটাতে অনেকখানি সাহায্য করেছিল।

সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বাঙ্‌লা গদ্য রচনার একটা প্রচেষ্টা দেখতে পাই। বৈষ্ণব-কারিকাগুলি বাদ দিলে এযুগে পর্তুগীজ পাদ্‌রীরাই প্রথম গদ্য রচনা শুরু করেন। পর্তুগীজ ও মগরা জলপথে দস্যুতা করে বেড়াতো এবং সুবিধা পেলে এদেশের ছেলে-মেয়ে চুরি করে নিয়ে বিদেশে বিক্রি করত। একবার ভূষণার এক জমিদারপুত্রকে মগদস্যুরা চুরি করে নিয়ে যায়। একজন পোর্তুগীজ পাদ্‌রী টাকা দিয়ে তাকে কিনে নিয়ে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন, এবং নাম রাখেন দোম আন্তোনিও (Dom Antonio)। এই দোম আন্তোনিও 'ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' নামে একখানি গদ্য পুস্তক রচনা করেন।

বৈষ্ণব প্রেমভক্তিবাদ ও সুফি মতবাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে বাঙ্‌লাদেশে হিন্দু-মুসলমানের একটা মিলনের সেতু প্রস্তুত হচ্ছিল। মুসলমান আবির্ভাবের পর থেকে বাঙালী বলতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কেই বোঝাত। সুফি মতাবলম্বী মুসলমান সাধকগণকে হিন্দুরা পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখত। অনেকে তাদের শিষ্যত্বও গ্রহণ করত। এই সময়ে সমাজে অত্যন্ত সাধারণ দরিদ্র শ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে একটা সমবেদনার মাধ্যমে নিবিড় ঐক্যের সম্পর্ক গ'ড়ে উঠছিল। কিন্তু শুষ্ক তত্ত্বের আলোচনা-বাহুল্য বাঙালীর ভাব-ক্ষেত্রের সজীবতা ও সবুজতা ম্লান করে দিচ্ছিল। অপরদিকে সুযোগ-সন্ধানীর দল এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাঙন ধরাবার চেষ্টা অনেকদিন আগে থেকেই করছে। মুসলমান শক্তি ও সুফিবাদ মিলে বাঙ্‌লার ঘরে ঘরে সত্যপীর, মাণিকপীর, ত্রৈলোক্যপীর প্রভৃতি দেবতার আবির্ভাব ঘটিয়েছিল। ধর্মঠাকুর পূর্ব থেকে সমাজে পরিচিত থাকলেও তাঁর বর্ণসংকর রূপটির মধ্যে মুসলমান শক্তির সংযোগ তুর্কী-আক্রমণের পর থেকেই ঘটেছে। এই যুগে সাহিত্যে পুরানোর পুনরাবৃত্তি যথেষ্ট ছিল। তবে তার মধ্যে নতুন কয়েকটি ধারা প্রবাহিত হওয়াতে বাঙ্‌লা সাহিত্যের গতি একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি।

ষোড়শ শতাব্দীর পর সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্‌লার সমাজ ও সংস্কৃতি ধীরে একটা পরিবর্তনের পথপ্রান্তে এসে দাঁড়ায়। অবসিতপ্রায় মোগল যুগে এদেশে পোর্তুগীজ, ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি বণিক্‌রা ব্যবসাবাণিজ্য করতে আসে। এদের অভিনব লোলুপতা সম্বন্ধে তখনকার বাঙালী ততটা সচেতন ছিল না। এই সচেতন না থাকার জন্য এবং দেশের রাজা ও রাজকর্মচারীদের অনবধানতা ও বিলাস-ব্যসনের অতিরিক্ত আসক্তি হেতু অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে

বাঙালীর ভাগ্যাকাশে প্রবল ঝড় দেখা দেয়। এই ঝড়ের পূর্বাভাস সম্বন্ধে বাঙালীর মনে কোনো উৎকণ্ঠা বা ঔৎসুক্য ছিলনা। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী একদিকে যেমন সাহিত্যের অনেক দ্বার খুলে দিয়েছিল, তেমনই নিজেদের বিরাট সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন না থাকাতে বাঙ্‌লার সমাজ ও সংস্কৃতিকে অনিবার্য দুর্যোগের সম্মুখীন হবার সম্ভাবনাও জাগিয়ে তুলেছিল। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে, বাঙ্‌লা সাহিত্যের এই দুই শতাব্দী পরবর্তী কালের সাহিত্য গড়ে তুলতে অনেকখানি সাহায্য করেছে। এই দুই যুগের ভাবধারা বাঙালীর যৌথ-সম্পদ। বাঙ্‌লার শুধু নয়, সমগ্র ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে এমন একটি গভীরতা ও স্নিগ্ধতা আছে যাকে বহিরাগত কোনো জাতির পক্ষে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

এ যুগের সাহিত্য-নিদর্শন

সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব-সাহিত্যের জের সমানভাবে চলেছে। পদাবলী, রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য, ভাগবত প্রভৃতির অনুবাদ, বৈষ্ণব মোহন্তদের জীবনীকাব্য, বৈষ্ণব রসতত্ত্বমূলক নিবন্ধ প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে রচিত হচ্ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব-পদকর্তাদের অনেকে এযুগেও জীবিত ছিলেন। তাঁদের অনেকের সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করেছি। তাঁদের পরে সপ্তদশ শতাব্দীতে যাঁরা পদাবলী রচনা করে খ্যাতি লাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে গোবিন্দদাস কবিরাজের পুত্র দিব্যসিংহ, দিব্যসিংহের পুত্র ঘনশ্যাম কবিরাজ, রাধাবল্লভ দাস, যদুনন্দন, বীর হাম্বীর, বল্লভদাস, গোকুলানন্দ, বংশীদাস, শ্যামদাস, নৃসিংহ, হরিবল্লভ বা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, সৈয়দ মর্তুজা, নসীর মামুদ, এবাদুল্লা, শেখ কবীর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের অনেকেই বাঙ্‌লা ও ব্রজবুলি উভয় রীতিতেই পদ রচনা করেছেন। গোবিন্দ-দাস কবিরাজের পৌত্র ঘনশ্যাম কবিরাজও বাঙ্‌লা ও ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেছিলেন। ঘনশ্যামের পদে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, কবিশেখর প্রভৃতি পদকর্তাদের প্রভাব লক্ষিত হয়। ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় ঘনশ্যামের একটি পদ উদ্ধৃত করে তাতে কবিশেখরের প্রভাব কতখানি তা দেখিয়েছেন। আমরা উক্ত পদের কিছুটা অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি—

ডাকে ডাহুকি ঝমকে ঝুমকল
ঝিঁ ঝিঁ ঝনকত ঝাঁঝিয়া।
ডিণ্ডিমায়িত মণ্ডুকীবর
মউর নাটক-সাজিয়া॥ ইত্যাদি।

শেখর কবির 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর' পদের প্রভাব ঘনশ্যামের উল্লিখিত পদে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ক্ষণদাগীতচিন্তামণি বৈষ্ণব পদাবলীর প্রথম সংকলন গ্রন্থ। বিশ্বনাথ নিজেও হরিবল্লভ বা 'বল্লভ' ভণিতায় পদ রচনা করতেন। তিনি বাঙ্‌লা এবং ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেছেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে মুসলমান রচয়িতার মধ্যে কেউ কেউ বৈষ্ণবপদ রচনা করেছিলেন একথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তাদের মধ্যে সৈয়দ মর্তুজা, নসীর মামুদ প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আলাওলও বৈষ্ণবপদ রচনা করেছিলেন। সৈয়দ মর্তুজার পদের একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই—

শ্যাম বঁধু, আমার পরাণ তুমি!
কোন শুভদিনে দেখা তোমা সনে
পাসরিতে নারি আমি॥
যখন দেখিয়ে ও চাঁদ বদনে
ধৈরয ধরিতে নারি।
অভাগীর প্রাণ করে আন্‌চান্‌,
দণ্ডে দশবার মরি॥
মোরে কর দয়া দেহ পদছায়া
শুন শুন পরাণ-কানু।
কুলশীল সব ভাসাইনু জলে
না জীয়ব তুয়া বিনু॥ ইত্যাদি।

এই পদে অধ্যাত্ম ভাব-বিভোরতা সুন্দর ও মধুর হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে রামায়ণও গাওয়া হত। কৃষ্ণলীলার অনুকরণে রামলীলা নিয়েও অনেক পদ রচিত হয়েছিল।

জীবনীকাব্য

এ যুগে শ্রীচৈতন্যের কোনো জীবনী রচিত হয়নি। যে কয়খানি জীবনী-কাব্য পাওয়া যাচ্ছে তার প্রায় সবই বৈষ্ণব মোহান্তদের নিয়ে। এসব জীবনী-কাব্যের মধ্যে নিত্যানন্দদাসের প্রেমবিলাস (১৬০১-২ খ্রীঃ) একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। এই গ্রন্থে শ্রীনিবাস ও তাঁর লীলাসহচরদের এবং নরোত্তম, শ্যামানন্দ প্রভৃতির মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। বাঙ্‌লার বৈষ্ণবধর্ম প্রচার সম্বন্ধে কিছু জানতে হলে 'প্রেমবিলাস'ই তার প্রয়োজন মেটাতে পারে। প্রেমবিলাস রচয়িতা নিত্যানন্দ দাসের আর এক নাম হচ্ছে বলরামদাস। অনেকে মনে করেন, নিত্যানন্দদাস আর বিখ্যাত পদকর্তা বলরামদাস একই ব্যক্তি। কবি নিত্যানন্দমহাপ্রভুর পত্নী জাহ্নবীদেবীর আদেশে তিনি কাব্যখানি রচনা করেন। ঐতিহাসিক দিক থেকে 'প্রেমবিলাস' পরবর্তী কালের জীবনীকাব্য রচয়িতাদের কাছে অপরিহার্য গ্রন্থ ছিল। শ্রীনিবাস আচার্যের দ্বিতীয়া পত্নী গৌরাঙ্গপ্রিয়ার শিষ্য গুরুচরণদাস আচার্য-পত্নীর আদেশে 'প্রেমামৃত' কাব্য রচনা করেন।

শ্রীনিবাস আচার্যের জ্যেষ্ঠ কন্যা হেমলতা দেবীর শিষ্য বিখ্যাত পদকর্তা যদুনন্দন শ্রীনিবাস আচার্যের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে একখানি কাব্য রচনা করেন। কাব্যটির নাম কর্ণানন্দ। যদুনন্দন রূপগোস্বামীর বিদগ্ধমাধব ও দানকেলি কৌমুদী নাটক দুখানি, বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃতকাব্য এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের গোবিন্দলীলামৃত কাব্য প্রভৃতি সংস্কৃত রচনা বাঙ্‌লায় অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু পদাবলী রচয়িতা হিসাবেই যদুনন্দন সমধিক পরিচিত। বৈষ্ণবদাস বোধ হয় এই যদুনন্দনের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'প্রভু-সুতা-চরণ-সরোরুহ-মধুকর জয় যদুনন্দন দাস।' যদুনন্দনের 'যদি কৃষ্ণ অকরুণ হইলা আমারে', 'ফুলবনে দোলয়ে ফুলময় তনু' অথবা 'নয়ান পুতলী রাধা মোর, মন মাঝে রাধিকা উজোর' প্রভৃতি পদগুলি আজও বৈষ্ণব ভাবরসপিপাসু বাঙালীর হৃদয় হরণ করে।

শ্রীনিবাস আচার্যের পুত্র গতিগোবিন্দ 'বীররত্নাবলী' নামে একখানি জীবনী-কাব্য রচনা করেন। কাব্যখানির বিষয়বস্তু হচ্ছে নিত্যানন্দ-পুত্র বীরচন্দ্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা।

১৬৯৬-৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মনোহরদাস শ্রীনিবাস আচার্যের মাহাত্ম্য বিষয়ক

'অনুরাগ-বল্লী' কাব্য রচনা করেন। তাছাড়া এযুগে শ্যামানন্দের শিষ্য রসিকানন্দকে নিয়ে গোপীজনবল্লভ দাস 'রসিকমঙ্গল' নামে একখানি জীবনী-কাব্য রচনা করেন, একথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট। রসিকমঙ্গলে সেযুগের বাঙ্‌লা ও বাঙালীর কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের ঐতিহাসিক উপকরণের অভাবও তাতে নেই। এছাড়া এযুগে আরও অনেক জীবনীকাব্য রচিত হয়েছিল। তবে এই কাব্যগুলিকে একেবারে মৌলিকতা-বর্জিত বললেও অসঙ্গত হবে না। সবাই প্রায় অন্যের রচনার উপর নির্ভর করে নিজেদের কাব্য রচনা করেছেন।

বৈষ্ণব সংস্কৃত গ্রন্থ ও অন্যান্য গ্রন্থাদির অনুবাদ

এযুগে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের সংস্কৃতে-রচিত বৈষ্ণবগ্রন্থের অনুবাদও হচ্ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতেও এই ধরণের অনুবাদ কিছু কিছু হয়েছে।

এযুগের অন্যতম অনুবাদক যদুনন্দনদাসের কথা আগে বলেছি। যে যদুনাথ দাস ভাগবতের ভ্রমরগীতা অংশের অনুবাদ করেন তিনি সম্ভবত এই যদুনন্দনও হতে পারেন। ভক্তিরত্নাকর, উজ্জ্বলনীলমণি অবলম্বনে কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত অনুবাদও হয়েছিল।

পুরানো শাস্ত্রাদির অনুবাদ এ যুগের আগেও হয়েছিল। ভাগবতের আংশিক অনুবাদ মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয়েও পেয়েছি। সপ্তদশ শতাব্দীতে গীতা, বৃহৎ নারদীয় পুরাণ, স্কন্দ পুরাণ প্রভৃতির অনুবাদ ও ভাবানুবাদ চলতে থাকে। কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর দাস স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ড অথবা ব্রহ্মপুরাণ অবলম্বনে ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দের দিকে জগন্নাথ-মাহাত্ম্যবিষয়ক পাঁচালী রচনা করেছিলেন। এ ছাড়া তিনি আরও অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

এই যুগে বৈষ্ণব তান্ত্রিক মতও একটা রূপ পরিগ্রহ করেছে। এবং তা নিয়ে অনেক রচনাও শুরু হয়েছে। এই তান্ত্রিক মতের মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন দেহ-সীমার ইঙ্গিত ছিল। তাই তান্ত্রিক মত নিয়ে লেখা নিবন্ধগুলির মধ্যে বেশ কিছুটা অশ্লীলতা ও গোঁড়ামো প্রকাশ পেয়েছিল।

কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কাব্য

এযুগের কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কাব্যের মধ্যে আর তেমন কোনো নতুনত্ব নেই। ভাগবতের অনুবাদ অথবা ভাগবত, গীতগোবিন্দের মতো রচনার পুনরাবৃত্তি কৃষ্ণায়ন কাব্যগুলিকে আর বৈশিষ্ট্য দান করতে পারেনি। জনসাধারণ তখন একটু হাল্কা ধরনের পরিবেশন চাইত। সেদিক থেকে পূর্ববঙ্গের ভবানন্দের 'হরিবংশের' উল্লেখ করা যেতে পারে। হরিবংশে আদি-রসের অভাব নেই। গ্রন্থকার যদিও পৌরাণিক হরিবংশের অনুসরণ করেছেন বলে বলেছেন, তবুও তার সঙ্গে তাঁর হরিবংশের তেমন কোনো মিল পাওয়া যায় না। ভবানন্দের হরিবংশ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে রচিত হয়।

ভাগবত, হরিবংশ ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অবলম্বনে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ভিন্ন ঘনশ্যাম 'চতুর্থাংশ পরিমিত' শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্য (১৬০৪-৮৯ খ্রী) রচনা করেন। এছাড়া পরশুরাম চক্রবর্তীর শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, কাশীরাম দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণবিলাস, অভিরামের গোবিন্দবিজয়, কবিচন্দ্রের গোবিন্দমঙ্গল, দ্বিজগৌরীকান্তের আদিরসাশ্রিত শ্রীকৃষ্ণচরিত, ভবানীদাস ঘোষের রাধাকৃষ্ণ-বিলাস, ধনীরামের কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক গীতিকাব্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কৃষ্ণায়ন কাব্য। ভবানীদাস ঘোষ অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক হতে পারেন। এই যুগের কৃষ্ণলীলা কাব্যগুলিতে ভাগবত-পুরাণাদির প্রভাবের চেয়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আদিরসের প্রভাবই বেশী। সময় সময় কোনো কোনো কাব্যে শ্লীলতার মাত্রা একেবারে ছাড়িয়ে গেছে।

রামায়ণ ও মহাভারত

এযুগে দুই-একখানি উল্লেখযোগ্য রামায়ণ কাব্য রচনার সংবাদ পাওয়া যায়। তার মধ্যে অদ্ভুতাচার্যের রামায়ণই সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। কাব্যখানি উত্তরবঙ্গে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। কবির প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ আচার্য। তাঁর নিবাস ছিল পাবনা জেলার বড়বাড়ী বা অমৃতকুণ্ডা গ্রামে। ইনি পাবনার নিকটবর্তী সাঁতোলের রাজা রামকৃষ্ণের সভাকবি ছিলেন। অদ্ভুত-রামায়ণ অবলম্বনে রামায়ণ রচনা করেন বলে তিনি অদ্ভুতাচার্য উপাধি লাভ করেন। কবি রামশঙ্কর এই একই কারণে

অদ্ভুতাচার্য ভণিতা ব্যবহার করেছেন। সে যুগে অদ্ভুতরামায়ণই রামায়ণকারদের প্রধান অবলম্বন ছিল। তবে কেউ কেউ অধ্যাত্মরামায়ণ, যোগবাশিষ্ট রামায়ণেরও অনুসরণ করেছেন। দ্বিজ ভবানীনাথ অধ্যাত্ম-রামায়ণ অবলম্বনে এবং দ্বিজ লক্ষ্মণ অদ্ভুত, অধ্যাত্ম ও যোগবাশিষ্ট রামায়ণ অবলম্বনে বাঙ্‌লা রামায়ণ রচনা করেন।

বাঙ্‌লাদেশে রামায়ণের চেয়ে মহাভারতের অনুবাদ বেশী হয়েছে। মহাভারতের সম্পূর্ণ অনুবাদ না হলেও, বিভিন্ন পর্বের বহু অনুবাদ হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীর মহাভারত রচয়িতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রচয়িতা হচ্ছেন কাশীরাম দাস। বাঙ্‌লাদেশে এত রামায়ণ, মহাভারত রচয়িতা ছিলেন, কিন্তু কৃত্তিবাস এবং কাশীরাম দাসই বাঙালীর সর্বাপেক্ষা প্রিয় কবি। কাশীরাম সম্ভবত ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে আবির্ভূত হন। তাঁর পিতার নাম কমলাকান্ত। বর্ধমানের ইন্দ্রাণী পরগণার সিঙ্গি গ্রামে কাশীরামের পৈতৃক নিবাস ছিল। কাশীরামের অগ্রজ কৃষ্ণদাস এবং অনুজ গদাধর দাসও বিখ্যাত কবি ছিলেন। কৃষ্ণদাসের 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' এবং গদাধর দাসের জগন্নাথমঙ্গলের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

বাঙ্‌লা দেশে কাশীরামের যে মহাভারত বহুল প্রচলিত তার সবটা সম্ভবত কাশীরামের রচনা নয়। কারণ,

আদি সভা বন বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর॥
ধন্য হইল কায়স্থ-কুলেতে কাশীদাস।
তিন পর্ব ভারত যে করিল প্রকাশ॥

কবির জ্ঞাতি ভ্রাতার পুত্র নন্দরাম দাসও বলছেন—

কাশীদাস মহাশয় রচিলেন পোথা।
ভারত ভাঙ্গিয়া কৈল পাণ্ডবের কথা॥
ভ্রাতৃপুত্র হই আমি তিঁহো খুল্লতাত।
প্রশংসিয়া আমারে করিল আশীর্বাদ॥
আয়ুত্যাগে আমি বাপু যাই পরলোক।
রচিতে না পাইল পোথা রহি গেল শোক॥

মনে হয় কাশীরাম সম্পূর্ণ মহাভারত রচনা করে যেতে পারেননি। কাশী-

রামের রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে প্রথমভাগে, এমনকি ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকেও হওয়া অসম্ভব নয়।

কবির পরিবারের প্রায় সবাই বৈষ্ণব ছিলেন। বাঙ্‌লাদেশে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরামের মহাভারত পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে পাঠ করা হয়। বাঙ্‌লার সংস্কৃতির মূলেও এই দুই কবির দান সামান্য নয়।

এযুগের অন্যান্য মহাভারত রচনার মধ্যে নন্দরামের দ্রোণপর্ব, কবি বিশারদের বন ও বিরাট পর্ব, নিত্যানন্দ ঘোষের ভারত পাঁচালী, ঘনশ্যামদাস, অনন্ত মিশ্র ও হরিদাসের অশ্বমেধ পর্ব উল্লেখযোগ্য।

কোচবিহারের রাজসভার নির্দেশে কয়েকজন কবি এযুগে মহাভারতের কয়েকটি পর্ব রচনা করেন। তার মধ্যে গোবিন্দ কবিশেখর, শ্রীনাথ 'ব্রাহ্মণ' প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

মনসামঙ্গল

মনসামঙ্গলকাব্য পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই রচিত হচ্ছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে মনসামঙ্গল রচনা আরও জোরালো হয়ে ওঠে। ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় মনসামঙ্গলের লেখক বংশীদাস ও নারায়ণদেবকে সপ্তদশ শতাব্দীর লোক বলে মনে করেন। বংশীদাস ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জের পাটগ্রাম নিবাসী ছিলেন। ইনি সুপণ্ডিত ও সুগায়ক ছিলেন। কবির বিদুষী কন্যা চন্দ্রাবতী তাঁকে কাব্য রচনায় সাহায্য করেন। চন্দ্রাবতীর নামে একখানি রামায়ণ প্রচলিত আছে। পূর্ববঙ্গে চন্দ্রাবতীকে নিয়ে একখানি প্রণয়মূলক গীতিকাব্যও প্রচলিত আছে। কথিত আছে, দ্বিজ বংশীদাস একবার দস্যু কেনারামের হাতে পড়েন। 'মনসা-ভাসান' গান শুনিয়ে তিনি কেনারামের হাত থেকে ত উদ্ধার পেলেনই, উপরন্তু কেনারাম দস্যুবৃত্তি ছেড়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। এই গল্পটি চন্দ্রাবতীর নামে প্রচলিত 'দস্যু কেনারাম' পালায় পাওয়া যায়।

এযুগের প্রসিদ্ধ মনসামঙ্গল রচয়িতা হচ্ছেন ক্ষেমানন্দ বা ক্ষমানন্দ। কবি পশ্চিমবঙ্গের লোক। এই কবিও মুকুন্দরামের মতো আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে নিজের বিপদের কথা, অপরের কাছে সাহায্য পাওয়ার কথা, অবশেষে দেবীর কাছে গ্রন্থ রচনার আদেশ পাওয়া প্রভৃতি সবই বলেছেন।

ক্ষেমানন্দের কাব্যের সরল প্রকাশভঙ্গী তাঁর কাব্যকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। দেবতার আদেশে রচিত হোক বা নাই হোক—মানুষের রচিত কাব্যের মধ্যে অলৌকিকত্ব থাকা সত্ত্বেও মানুষের সংবাদ পাই। এছাড়া এযুগে পশ্চিমবঙ্গের কবি বিষ্ণুপাল, কালিদাস (১৬৯৭-৯৮ খ্রীঃ), রসিকমিশ্র, কবিচন্দ্র, সীতারাম দাস প্রভৃতি মনসামঙ্গল রচনা করেন। এর মধ্যে রসিক মিশ্র, কবিচন্দ্র প্রভৃতি মনসামঙ্গলকে 'জগতীমঙ্গল' বলে উল্লেখ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের কবি বলেই হয়ত এঁদের সবার কাব্যে ধর্মঠাকুরের উল্লেখ আছে।

শিব-বিষয়ক কাব্য

বাঙ্‌লাদেশে যে শিবঠাকুর আছেন তিনি বহুদেবতার মিশ্রণফলস্বরূপ বর্তমান রূপে রূপান্তরিত হয়েছেন। প্রাক্‌-বৈদিক যুগ থেকেই সম্ভবত শিব পূজা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। বৈদিক রুদ্র, দ্রাবিড়দের শম্ভু ও শিবন্‌, কৃষিজীবীদের দেবতা, লিঙ্গদেব, মহেন-জো-দারোর যোগীন্দ্র-শিব এবং আরও নানা লৌকিক ধারার ধ্যান-ধারণার ফল নিয়ে এই পাগল, নেশায় উন্মত্ত, ভিখারী শিবের প্রকাশ ঘটেছে। ধান ভানতেও শিবের গীত চলে, আবার ছোটদের ছড়া কেটে গল্প বলতেও এই শিবকে নিয়েই হালকা সুরে বলা যায়—'শিবঠাকুরের বিয়ে হবে তিন কন্যে দান'। শিব আমাদের খুব পরিচিত নিকট আত্মীয়। কৃষিজীবীরা জানে তিনি চাষীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চাষী। কিন্তু বিশ্বের কাছে তিনি সৃষ্টির প্রতীক। একদিকে তিনি শান্ত মৌন মহাসুন্দর, আরেক দিকে তিনি প্রলয়ের দেবতা। এককথায়, তিনি ভাঙন-গড়নের দেবতা। শিব দরিদ্র ভিখারী, অথচ নারী-জীবনে ওই সৃষ্টিছাড়া ক্ষ্যাপা স্বামীই একান্ত কাম্য। ইনি অল্পেই খুসী হন, আবার অল্পেই তাঁর অসন্তোষ জেগে ওঠে।

মনে হয়, বাঙ্‌লা দেশে প্রথম কোচ, কিরাত, শবর প্রভৃতি নিম্ন জাতির মধ্যে শিবের প্রভাব বেশী ছিল। চরিত্রের দিক থেকেও লৌকিক শিব স্খলন-পতনের ঊর্ধ্বে নন। আবার শিব ছাড়া কোনো দেববিষয়ক কাব্যও সম্পূর্ণ হতে পারে না। বাঙ্‌লা দেশে যেসব মঙ্গলকাব্য রচিত রয়েছে—শিবচরিত্র না থাকলে সে সব কাব্যের নিশ্চয়ই অঙ্গহানি ঘটত। শিব-বন্দনা প্রাচীন যুগ থেকে প্রায় সব কাব্যেই আছে। অথচ শিবকে তাঁর লাম্পট্যের জন্য যথেষ্ট

অপমানিতও হতে হয়। চণ্ডীমঙ্গলের শিব দরিদ্র ভিখারী। খাওয়া-পরা নিয়ে শিবেতে-গৌরীতে নিরন্তর ঝগড়া লেগেই আছে। ছেলে পুলে নিয়ে অভাবের সংসারে রাজকন্যা গৌরীকে যে সংগ্রাম করতে হয় তাতে শিবের দৈবীমহিমা মুছে গিয়ে বেকার দরিদ্র বাঙালী গৃহস্থের চিত্রটিই ফুটে ওঠে। নানা মতবাদ ও ভাবনা-কল্পনার ফলস্বরূপ যে শিবকে আজ আমরা আমাদের সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে পাচ্ছি তিনি বাঙালীর হৃদয়-দেউলের নিত্য-কালের প্রতিষ্ঠিত দেবতা।

বৌদ্ধধর্মেরও অনেক কিছু লৌকিক শৈবধর্মে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। নাথধর্মও শিব-পার্বতীকে তার মধ্যে টেনে নিয়েছে। বাঙ্‌লা দেশে যে চৈত্র-গাজন অনুষ্ঠান রয়েছে তাতেও শিব-পার্বতী আছেন। এই গাজন সম্ভবত এদেশে আর্যদের আসার আগেই প্রচলিত ছিল।

শিবায়ণ বা অন্যান্য কাব্যের কবিরা শিবকে একটা পৌরাণিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করলেও এবং পৌরাণিক ও লৌকিক শিব এক হয়ে গেলেও শিবের লৌকিক অংশটুকুই প্রাধান্য লাভ করেছে।

শিবের গীত বা পাঁচালী প্রাচীন দিন থেকেই চলে আসছে। বৃন্দাবন দাস বলছেন—

একদিন আসি এক শিবের গায়ন।
ডমরু বাজায়—গায় শিবের কথন॥

এই শিবের কথা বহুদিন থেকেই বাঙালী মনোরাজ্যে আপন প্রতিষ্ঠা বজায় রেখেছে। এদেশের কুমারীরা শিবের মতো বর পাবার জন্য শিব পুজা করেন।

সাহিত্যে শিব স্থান লাভ করেছেন পরের যুগে। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল প্রভৃতিতে শিবের কাহিনী থাকলেও শিবকে নিয়ে তখনকার দিনে কতগুলো স্বতন্ত্র কাব্য গড়ে উঠেছিল। এই শিবায়ণ বা শিবমঙ্গল কাব্যের মধ্যে দ্বিজ রতিদেবের মৃগলুব্ধ, রামরাজার মৃগলুব্ধ, কবিচন্দ্রের শিবায়ণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

'মৃগলুব্ধ' পাঁচালীর মধ্যে দ্বিজ রতিদেবের 'মৃগলুব্ধ'ই সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। দ্বিজ রতিদেবের রচনাকাল আনুমানিক ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দ। রতিদেব চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার চক্রশালা-সুচক্রদণ্ডী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

চট্টগ্রামের সুচক্রদণ্ডী এবং চক্রশালা গ্রামে এককালে বাঙ্‌লা দেশের বহু বিখ্যাত পণ্ডিতের আবির্ভাব ঘটেছিল। মৃগলুব্ধের কাহিনী হচ্ছে শিব-চতুর্দশীর মহিমা ব্যাখ্যান। দ্বিজ রতিদেবের রচনা বেশ কবিত্বপূর্ণ এবং তার মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা বা জড়তা নেই।

কবিচন্দ্র উপাধিধারী একজন কবির একখানি শিবায়ণ কাব্য পাওয়া গেছে। কাব্যখানি আনুমানিক ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। কবিচন্দ্র একদিকে পৌরাণিক চিত্রও এঁকেছেন, অন্যদিকে আমাদের অভাব-অভিযোগ-পূর্ণ সংসারের বাস্তব চিত্র তাঁর লেখনীতে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর শিব-পার্বতী প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে সমাজের দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট নিম্নবিত্তের আলেখ্য জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। কবিচন্দ্রের রচনায় বৈষ্ণবধর্মের যথেষ্ট প্রভাব আছে। তিনি ব্রজবুলিতে কয়েকটি মধুর পদও রচনা করেন।

চণ্ডী ও অন্যান্য দেবী-বিষয়ক কাব্য

এ যুগে চণ্ডীকে নিয়ে কয়েকখানি কাব্য রচিত হয়েছে। চণ্ডী-মাহাত্ম্য কীর্তন করতে গিয়ে মুকুন্দরামের পরের বেশীর ভাগ কবিরাই মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনুসরণ করেছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণের দুর্গাসপ্তশতী ছিল এঁদের প্রধান অবলম্বন। দুর্গা ও চণ্ডীর অভিন্ন রূপ পরিকল্পনা আগে থেকেই হয়েছে।

এই ধরণের কাব্য যাঁরা রচনা করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন দ্বিজ কমললোচন, ভবানীপ্রসাদ রায় এবং রূপনারায়ণ ঘোষাল। কমললোচনের নিবাস ছিল রংপুর জেলার ঘোড়াঘাট পরগণার চরখাবাড়ী গ্রামে। কমল-লোচন সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি চণ্ডিকাবিজয়-কাব্য রচনা করেন। অন্ধকবি ভবানীপ্রসাদ ও রূপনারায়ণ ময়মনসিংহের অধিবাসী ছিলেন ; এঁরা দুজনেই 'দুর্গামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে দ্বিজ হরিরাম একখানি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। তাঁর কাব্যে মেদিনীপুরের ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত চিতুয়া-বরদাবাটী পরগণার বিদ্রোহী সরদার শোভাসিংহের উল্লেখ আছে। কবি শোভাসিংহের আশ্রয় লাভ করেছিলেন। দ্বিজ জনার্দনের নামে একখানি ক্ষুদ্র মঙ্গলচণ্ডী-পাঁচালী পাওয়া যায়। এঁর রচনাকাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। জনার্দনের কাব্যে কালকেতু-উপাখ্যান নেই, শুধু ধনপতি-উপাখ্যান আছে।

'রায়মঙ্গল' রচয়িতা বিখ্যাত কৃষ্ণরামদাস 'কালিকামঙ্গল' নামে একখানি কাব্য রচনা করেছিলেন। কবি তাঁর কাব্যে ঔরংজীব ও শায়েস্তা খাঁর উল্লেখ করেছেন। কাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধে যে সঙ্কেত পাওয়া যায় তা থেকে মনে হয় কাব্যখানি ১৬৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল। কালিকামঙ্গলের মুখ্য বিষয় হচ্ছে বিদ্যাসুন্দরের গল্প। বিদ্যাসুন্দর কাব্যের রচনা এর আগেও হয়েছে। দ্বিজ শ্রীধর এবং সা বিরিদখানের কাব্যের উল্লেখ পূর্বেই করেছি। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম থেকে বিদ্যাসুন্দর কাহিনী এদেশে প্রচলিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদে তার সার্থক প্রকাশ ঘটে। চট্টগ্রাম নিবাসী কবি গোবিন্দদাস একখানি কালিকামঙ্গল রচনা করেন। কাব্যের রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে হওয়াই সম্ভব। গোবিন্দ-দাসের কাব্যে বিদ্যাসুন্দরের গল্প ছাড়া বিক্রমাদিত্যের গল্প, মীননাথের গল্পও আছে। প্রাণরাম চক্রবর্তী নামে একজন কবিও কালিকামঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন।

এ যুগে চণ্ডী, দুর্গা, কালী ছাড়া ছোটো খাটো লৌকিক দেবতাদের নিয়েও কয়েকখানি কাব্য রচিত হয়। কৃষ্ণরাম দাস ষষ্ঠীমঙ্গল, শীতলামঙ্গল এবং কমলা বা লক্ষ্মীবিষয়ক মঙ্গলকাব্য রচনা করেছিলেন। এ সব দেবীরা বাঙ্‌লার নারীদের মুখে মুখে বা ব্রতকথায় আবদ্ধ ছিলেন। অনেক সময় স্থানীয় প্রয়োজনে যে দেব-দেবীদের আবির্ভাব ঘটেছিল এযুগে এবং এর পরের যুগে তাঁদের নিয়েও অনেক কাব্য রচিত হয়েছে। অর্থাভাব এবং অন্নাভাব যখন সমাজকে দুর্বল ও হতাশ করে তুলেছে তখন ধনদা ও অন্নদার প্রয়োজনও দেখা দিল। অভাবের সংসারে লক্ষ্মী ও অন্নপূর্ণার আশীর্বাদ একান্তই কাম্য। জীবনে সচ্ছলতা লাভের স্বপ্নে কমলার আবির্ভাব ঘটেছে। অন্নাভাব দূর করবার আকুল আকাঙ্ক্ষার ফলস্বরূপ আবির্ভাব ঘটেছে অন্নপূর্ণার। বিত্তহীন বাঙালী কুবেরের ধনের প্রত্যাশা করেনি। সে চেয়েছে ক্ষুধার অন্ন, মাথা গুঁজবার পর্ণকুটীরখানি।

রোগ, শোক প্রভৃতি মানুষের জীবনের অবাঞ্ছিত দুঃখ বয়ে আনে। কিন্তু তাকে ঠেকানোও দায়। তবুও যদি কোনো উপায় থাকে, তারও চেষ্টা তারা করেছে। বসন্ত একটা মারাত্মক ব্যাধি। তখন তার ভালো ওষুধও আবিষ্কৃত হয়নি। তাই তার প্রকোপ নিবারণের জন্য দৈবাশীর্বাদ প্রয়োজন হল এবং

শীতলা দেবীর আবির্ভাব ঘটল। এই প্রয়োজনবোধে কলেরা বা ওলাওঠারও এক দেবীর সৃষ্টি হয়েছিল। সন্তানের কল্যাণ কামনায় ষষ্ঠীদেবীর প্রয়োজন দেখা দিল। মানুষ একান্তভাবে দৈবনির্ভর হয়ে পড়ল।

রায়মঙ্গল কাব্য

সর্প-সম্পর্কিতা মনসা দেবীর পর ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়ও বাঙ্‌লা মঙ্গল-কাব্যের বিষয়বস্তু হলেন। এই ব্যাঘ্রদেবতাকে নিয়ে রায়মঙ্গল নামে এক নতুন কাব্য রচিত হয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে মনসা, চণ্ডী ছাড়া ধর্মঠাকুর এবং অন্যান্য আরও দেব-দেবী নিয়ে মঙ্গলকাব্য রচনা শুরু হয়। এঁদের মধ্যে দক্ষিণরায়ও একজন দেবতা। এই সঙ্গে কুম্ভীরদেবতা কালুরায় এবং পীর বড়খাঁ গাজীরও উল্লেখ আছে। বাঘ এবং কুমীরের উপদ্রব এবং বিজয়ী মুসলমানশক্তি সম্বন্ধে আতঙ্ক—এসব মিলেই বোধহয় এই রায়মঙ্গলকাব্যের গোড়া পত্তন হয়েছিল। ভারতবর্ষে ব্যাঘ্র-পূজা অতি প্রাচীনকাল হতেই আর্যেতর সমাজে প্রচলিত ছিল। এখনও ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে ব্যাঘ্র-পূজা প্রচলিত আছে। নেপালে 'বাঘভৈরব' নামে এক ব্যাঘ্রদেবতা আছেন। উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর অঞ্চলের 'বাঘেশ্বর', বিহারের কিষাণদের 'বনরাজা', সাঁওতালদের 'বাঘ দেবতা' প্রভৃতির পূজা এখনও ঘটা করে হয়।

কিন্তু বাঙ্‌লা দেশের সুন্দরবন অঞ্চলের অধিবাসীদের ব্যাঘ্রভীতিজনিত যে ব্যাঘ্র-দেবতার আবির্ভাব ঘটল তার মধ্যে কিছুটা নতুনত্ব আছে।

রায়মঙ্গলের গল্পটা হচ্ছে এই—

বড়দহের ধনী ব্যবসায়ী দেবদত্ত চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতির মতো বাণিজ্য-যাত্রা কালে সমুদ্রে সুন্দরবনের প্রতিচ্ছবি দেখেন। তুরঙ্গ দেশের রাজা সুরথকে দেবদত্ত এই ঘটনা বলতেই রাজা সুরথ তা দেখতে চাইলেন। দেবদত্ত দেখাতে না পারাতে কারারুদ্ধ হন। বহুদিন দেবদত্তের কোনো খোঁজ না পাওয়াতে তাঁর পুত্র পুষ্পদত্ত পিতার খোঁজে যাবেন মনস্থ করে নৌকা তৈরী করার জন্য রতাই নামক এক কাঠুরেকে কাঠ কেটে আনতে আদেশ করেন। রতাই দক্ষিণরায়ের এলাকার একটি বড় গাছ কাটাতে দক্ষিণরায় ক্রুদ্ধ হয়ে রতাইর ছয় ভাইকে মেরে ফেলার আদেশ দিলেন। রতাই ভ্রাতৃশোকে কাতর হয়ে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হলে দক্ষিণরায় দৈববাণী করলেন—রতাই যদি

তার ছেলেকে তাঁর সামনে বলি দিতে পারে, তবে তার ভাইদের ফিরে পাবে। রতাই ছেলেকে বলি দিতেই দক্ষিণরায় রতাইর ছেলে ও ভাইদের বাঁচিয়ে দিলেন।

তারপর পুষ্পদত্ত নৌকা নিয়ে পিতার খোঁজে বের হলেন। পুষ্পদত্তের মা দক্ষিণরায়ের কাছে পুত্রের কল্যাণ প্রার্থনা করাতে দক্ষিণরায় প্রতিজ্ঞা করলেন যে পুষ্পদত্তকে রক্ষা করবেন। যাবার পথে পুষ্পদত্ত দক্ষিণরায়ের পূজার স্থান এবং বড়খাঁ গাজীর পীঠস্থান দেখলেন। তাঁদের সম্বন্ধে কিছুই জানেননা বলে পুষ্পদত্ত নৌকার কর্ণধারের কাছে এঁদের-বৃত্তান্ত জানতে চাইলেন। কর্ণধার বলল,—বহুদিন আগে ধনপতি সদাগর নামে এক শ্রেষ্ঠী বাণিজ্যে যাবার পথে দক্ষিণরায়ের পূজা করে। কিন্তু সে বড়খাঁ গাজীকে পূজা করেনি। উপরন্তু পীর গাজীর ফকিরদেরও মেরে তাড়িয়ে দেয়। গাজী সব শুনতে পেয়ে আদেশ করলেন দক্ষিণরায়কে বেঁধে আনতে। ফলে দক্ষিণরায় ও পীরের মধ্যে বাধল ভীষণ যুদ্ধ। সমানে সমানে যুদ্ধ, কেউ কাউকে হারাতে পারে না। এদিকে পৃথিবী ধ্বংস হবার উপক্রম হ'ল। তখন ভগবান অর্ধ-শ্রীকৃষ্ণ ও অর্ধ-পয়গম্বর বেশে এসে প্রমাণ করে দিলেন—তিনি হিন্দু এবং মুসলমান উভয়েরই ঈশ্বর। তাঁর আবির্ভাবে বিরোধের অবসান ঘটল। এবং তখন থেকে পীরের পূজা, দক্ষিণরায়ের পূজা এবং কালুরায়ের (কুম্ভীর দেবতা) পূজার স্থান ও নিয়ম নির্দিষ্ট হ'ল। শুধু একজনের পূজা করলে চলবেনা, সবারই পূজা করতে হবে। পরের দিকের গল্প একেবারে শ্রীমন্ত-উপাখ্যানের মতো। পুষ্পদত্তও সুন্দরবনের প্রতিচ্ছবি রাজা সুরথকে দেখাতে না পেরে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। পরে দক্ষিণরায়ের কৃপায় রেহাই পেয়ে রাজাকে সুন্দরবনের প্রতিচ্ছবি দেখিয়ে পিতাকে উদ্ধার করলেন, এবং রাজা সুরথের কন্যাকে বিয়ে করে দেশে ফিরলেন।

রায়মঙ্গলে হিন্দু মুসলমান বিরোধের অবসান ঘটাবার একটা চেষ্টা দেখতে পাই। পীর গাজী, দক্ষিণরায় প্রভৃতি দেবতা হিন্দু-মুসলমান উভয়ের দ্বারা পূজিত হন। রায়মঙ্গলের কাহিনীর মধ্যে আমরা রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কল্যাণ-মিশ্রণের প্রয়াস লক্ষ্য করি। এযুগে মুখ্যতঃ বিরোধ ছিল হিন্দু-মুসলমানের। এই সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবসানের একটা আবেদন রায়মঙ্গলের মাঝে আছে। হিন্দুর সমাজ-ব্যবস্থায় যে বিরোধ ছিল রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্যয়ে তা গৌণ হয়ে গিয়েছিল।

দক্ষিণরায় ও বড়খাঁ গাজীর পুজা চব্বিশ পরগণার অনেক অঞ্চলে প্রচলিত আছে। হিজলী কালুরায়ের পীঠস্থান। কিন্তু ময়মনসিংহ অঞ্চলেও পীর গাজী ও কালুরায়ের গান প্রচলিত আছে। পুর্ববঙ্গের বরিশাল অঞ্চলে ব্যাঘ্র এবং কুম্ভীর এই দুই দেবতার পুজার প্রচলন রয়েছে।

রায়মঙ্গল কাব্য দুয়েকখানার বেশী রচিত হয়নি। হয়ত মুখে মুখে এর গল্প প্রচলিত ছিল। পরে মঙ্গলকাব্যে সে গল্প কাব্য-রূপ লাভ করে। রায়-মঙ্গলের প্রথম রচয়িতা হচ্ছেন কৃষ্ণরাম দাস। কাব্যটির রচনাকাল ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দ বলে ধরে নেওয়া যায়। কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল ও শীতলা মঙ্গলের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গল কাব্য বাঙ্‌লা সাহিত্য ও সমাজের ইতিহাসের উপকরণের দিক থেকে খুবই গুরুত্বপুর্ণ। তিনি তাঁর কাব্যে মাধবাচার্য বলে রায়মঙ্গল রচয়িতা একজন কবির নাম উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মাধবাচার্যের কাব্যখানি পাওয়া যায়নি।

কৃষ্ণরামের কাব্য ছাড়া রায়মঙ্গলের আর কোনো উল্লেখযোগ্য রচয়িতার পরিচয় পাওয়া যায় না। বাঙ্‌লা মঙ্গলকাব্যধারায় 'রায়মঙ্গলের' সূচনার গতানুগতিকতা থাকলেও হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্ম-সংস্কৃতির ঐক্য-পরিকল্পনায় তাতে কিছুটা নতুনত্ব প্রকাশ পেয়েছে। এই মিলন কামনা ধর্মমঙ্গলেও পরোক্ষভাবে আছে। জাতি গঠনের পক্ষে এই মিলন যে একান্ত কাম্য তার আভাস আমরা ইলিয়াশ্‌ শাহী আমলের রাজনৈতিক পটভূমিকায়ও দেখতে পেয়েছি।

ধর্মমঙ্গল কাব্য

সপ্তদশ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্যধারায় ধর্মমঙ্গলকাব্যের আবির্ভাব এক অভিনব ব্যাপার। এ যুগের অনেক আগে থেকেই ধর্মঠাকুরের ছড়া, পূজা-পদ্ধতি ইত্যাদি প্রচলিত ছিল। কিন্তু একটা উপাখ্যান গ'ড়ে উঠে সাহিত্য-রূপ লাভ করতে করতে প্রায় সপ্তদশ শতাব্দী গড়িয়ে এল। প্রাচীনযুগে যে ধর্মঠাকুর ছিলেন তাঁর পূজা পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গে প্রচলিত থাকলেও বর্তমান দিনে পশ্চিম বঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে ধর্মঠাকুরের পূজা সীমাবদ্ধ হয়ে আছে। ধর্ম ঠাকুর প্রথমত নিম্নশ্রেণী হিন্দুদের দ্বারা পূজিত হতেন। বর্তমানে উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও ধর্মঠাকুরের পূজা করে থাকেন। আগে ডোমশ্রেণীর লোকেরাই

ধর্মঠাকুরের পূজা করত। ধর্মপূজার পুরোহিতরা ডোমপণ্ডিত ছিলেন। ধর্মমঙ্গলেও দেখি লাউসেনের দক্ষিণ হস্ত হচ্ছে কালু ডোম। অভিজাতশ্রেণীর লোক ধর্মঠাকুরকে প্রথমে আমলই দেননি। ধর্মমঙ্গল রচয়িতা মাণিক গাঙ্গুলী ত জাত যাবার ভয়ে বলেই ফেললেন, 'জাতি যায় তবে প্রভু যদি করি গান।' ধর্মঠাকুরের ব্রাহ্মণেতর সমাজের পূজারীরাও ব্রাহ্মণদের উপবীত ধারণ করার মতো তাম্র ধারণ করেন। ধর্মঠাকুরের পূজার তিনটি রকমভেদ আছে। কোথাও ধর্মঠাকুর কুলদেবতা হিসাবে নিত্য পূজা পাচ্ছেন, কোথাও সমস্ত গ্রামবাসী মিলিত হ'য়ে বছরে একবার ঘটা করে তাঁর পূজা করে। এ ধরণের উৎসবের চিহ্ন বর্তমানে গাজনের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে রয়েছে বলে মনে হয়। আবার কোথাও বা মানৎ করে ধর্মঠাকুরের পূজা হয়। মুখ্যতঃ পুত্র-কামনা করেই মানৎ করা হয়। এখন এই তৃতীয় রকমের পূজার বিশেষ প্রচলন নেই।

ধর্মঠাকুরের উদ্ভব সম্বন্ধে নানা মত প্রচলিত আছে। ধর্মের কোনো মূর্তি নেই। ধর্মের প্রতীকস্বরূপ পাথরকে ভক্তরা পূজা করে। এই পাথর কোনো জায়গায় কূর্মাকৃতি, কোথাও বা দেখতে ডিমের মতো। যমের আরেক নাম ধর্মরাজ। কিন্তু ধর্মমঙ্গলের ধর্ম—যমরাজ নন। মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় ধর্মঠাকুরের মধ্যে বৌদ্ধ-প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, ধর্মঠাকুর ও বুদ্ধদেব অভিন্ন। মনে হয়, বুদ্ধদেব ও ধর্মঠাকুর অভিন্ন না হলেও ধর্ম পূজার মধ্যে লৌকিক বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব প্রচ্ছন্নভাবে আছে। আমরা ধর্মঠাকুরকে ধবল প্রভৃতির রোগের স্বষ্টিকর্তা ও আরোগ্যকারী দেবতারূপে দেখতে পাই। অপর দিকে তিনি শস্যাদিরও দেবতা। শস্যাদি ও ধবল রোগের যে ধর্মদেবতাকে পাচ্ছি, তিনি হয়ত প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ এবং লৌকিক কোনো ধারা থেকে উদ্ভূত। শস্যাদির দেবতা হিসাবে ধর্মঠাকুর ও শিবের মধ্যেও একটি সাধর্ম্য থাকা অসম্ভব নয়। পাথর পূজারও একটা কারণ অনুমান করা যায়। যেখানে মাটির বন্ধ্যাত্ব হেতু শস্যাদি জন্মায় না, যেখানে মাটি পাথরে পরিণত হয়েছে, সেখানে পাথর বা শিলা পূজার প্রচলন বেশী ছিল। অনুর্বর শক্ত পাথরের মতো মাটির কাছে করুণা ভিক্ষা করা শুধু ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর নানা দেশে প্রাচীন দিন থেকেই প্রচলিত ছিল। শক্ত মাটিকে নরম করার জন্য, তাতে ফসল ফলাবার জন্য

মানুষের মধ্যে যে আকুলতা, তা ওই পাথর-পূজার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। সৃষ্টির রূপক স্বরূপ যোনিপীঠ ও লিঙ্গদেবের পূজা প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত ছিল। ধবল ও কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাব যেখানে বেশী সেখানে এখনও ধর্মঠাকুরের পূজার বহুল প্রচলন আছে।

ধর্মঠাকুরের সঙ্গে সূর্যদেবেরও একটা সম্পর্ক আছে। সূর্যপূজা আর্যরা ভারতের আদিবাসীদের কাছ থেকেই নিশ্চয় পেয়েছিলেন। পরের দিকে প্রাগ্‌বৈদিক ও বৈদিক সূর্যদেবতা ধর্মঠাকুরের সঙ্গে এক হয়ে গেছেন। ধর্মপূজা বিধানে ধর্ম ও সূর্যদেব অভিন্ন। কুমারী মেয়েরাও সূর্যের পূজা করেন। কুমারীব্রতের সূর্যের পূজা একান্তভাবে মেয়েরাই করে থাকেন। পুরুষরা এঁর পূজা করেন না।

কূর্মাকৃতি পাথর ধর্মের প্রতীক হওয়াতে কেউ কেউ মনে করেন যে তিনি হয়ত কূর্মদেবতাই হবেন।

ধর্মঠাকুর শিব ও বিষ্ণুর সঙ্গে অর্বাচীন কাল থেকে অভিন্নরূপে পরিকল্পিত হন। শেষের দিকে তিনি জুতা-মোজা-পরা শ্বেত অশ্বারূঢ় বীর সিপাহী যোদ্ধা। শেষের পরিকল্পনায় তিনি অনেকটা মুসলমান রাজশক্তির প্রতীক। তবে যোদ্ধ-বেশী ধর্মের পরিকল্পনা বোধ হয় এর আগেই গ্রহণ করা হয়েছিল। নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণ ধর্মঠাকুরকে গৌড়ের সুলতান হিসাবেও কল্পনা করেছেন। মুসল-মানদের আবির্ভাবে তখন দেশবাসীর মনে যে বিস্ময় ও আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল এবং অভিজাতশ্রেণীর দ্বারা নিপীড়িত দরিদ্র নিম্নবর্ণের জনসাধারণ যখন মুসলমানদের হাতে উচ্চশ্রেণীর লোকের দুর্ভোগ ও লাঞ্ছনা দেখে আনন্দিত ও উৎসাহিত হয়েছিল তখনই সম্ভবত ধর্মঠাকুর বিদেশাগত মুসলমান শক্তির সঙ্গে এক হয়ে যান। ধর্মমঙ্গলে বলা হয়েছে—

হাঁসা ঘোড়া খাসা জোড়া পায়ে দিয়া মোজা।
অবশেষে বোলাইলে গৌড়ের রাজা॥
হিন্দুকুলে বোলাইলে ধর্ম অবতার।
মোমিনকুলে বোলাইলে খোদায় খোন্‌কার॥

ধর্মঠাকুর—প্রাক্‌-আর্য ও বৈদিক সূর্য, কূর্মাকৃতি পাথর, শৈব যোগীদের ধর্ম মত, অন্‌-আর্য ধর্ম-সংস্কার, বৌদ্ধমত ও নানা লৌকিক সংস্কারের মিশ্রিত সংস্করণ। এর সঙ্গে পরে মুসলমানশক্তির মিশ্রণও ঘটে। আবার ইনি সম্ভবত

রণদেবতা। মুসলমান শক্তির কথা বাদ দিলে বাকিগুলির মিশ্রণ সম্ভবত বৌদ্ধ যুগেই ঘটেছিল। শৈব মতের সঙ্গে ধর্মঠাকুরকে সম্পূর্ণভাবে এক করে দেখাও সম্ভব নয়। তার একটি কারণ, শিবপূজায় বলিপ্রথা নেই। কিন্তু ধর্মপূজায় ছাগল, কবুতর, এমনকি শূকরও বলি দেওয়া হয়। ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য বর্ণনায় দেখা যায়, তিনি অনাবৃষ্টি ও অজন্মার সময় মানুষকে রক্ষা করেন, আবার ধবলকুষ্ঠ, চক্ষুরোগ প্রভৃতি নিরাময় করেন। নারীর বন্ধ্যাত্ব ঘুচিয়ে পুত্রদানও করেন। ধর্মঠাকুরের দলুরায়, কাঁকড়াবিছা, শীতলনারায়ণ, অনুকূলকোলা, বাঁকুড়া রায়, যাত্রাসিদ্ধি রায়, কালুরায়, কৌতুকরায়, বুড়ারায় প্রভৃতি অন্য কতকগুলি নামও পাওয়া যায়। কুম্ভীর দেবতার নামও কালুরায়।

ধর্মমঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তু

ধর্মমঙ্গলে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য কীর্তনই হ'ল প্রধান বিষয়। ধর্মঠাকুরের পূজাপদ্ধতির কথাই শুধু বললে চলে না। তাই তাঁর পূজা না করলে জীবনে কতখানি ক্ষতি স্বীকার করতে হয় এবং পূজা করলে কি অলৌকিক আশীর্বাদ লাভ করা যায় তা বোঝাবার জন্য গল্পও সৃষ্টি করতে হয়েছে। ধর্মমঙ্গলে এই গল্পের প্রধান অংশ দুটি হ'ল, সদাখণ্ডের গল্প এবং লাউসেনের গল্প। ধর্মমঙ্গলের গোড়াতে আছে সৃষ্টিতত্ত্ব। এই সৃষ্টিতত্ত্ব বিভিন্ন জাতি প্রাচীন যুগ হ'তে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছে। ধর্মমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্ব একটু নতুন ধরণের। পুরাণ প্রভৃতিতে যে সৃষ্টিতত্ত্ব আছে তার সঙ্গে ধর্মমঙ্গলের সৃষ্টিতত্ত্বের মিল কম হলেও ঋগ্‌বেদের সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে বেশ কিছুটা মিল আছে। 'শূন্যপুরাণ' নামে ধর্মের যে পূজাপদ্ধতি গ্রন্থ আছে তাতে এবং অন্যান্য ধর্মমঙ্গলেও এই সৃষ্টিতত্ত্ব দেওয়া আছে। এই সৃষ্টিতত্ত্বে বলা হয়েছে, সৃষ্টির প্রাক্কালে কোনো বর্ণ, চিহ্ন, কিছুই ছিলনা, সবই শূন্য। নিরঞ্জন নিরাকার প্রভুর মনে সৃষ্টির ইচ্ছা জাগল। তিনি যখন শূন্যে ভাসমান, তখন তাঁর নিঃশ্বাস থেকে জন্মাল 'উলুক'। তারপর তিনি সৃষ্টি করলেন, জল, স্থল এবং আদ্যাশক্তিকে। আদ্যাশক্তিকে বিবাহ করেই শূন্যদেব বা নিরঞ্জন নিরাকার প্রভু বা ধর্মঠাকুর গেলেন বল্লুকা নদীর তীরে তপস্যা করতে। এদিকে আদ্যাশক্তির চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাতে তা থেকে কামদেব জন্মাল। আর অকালে ধর্মের ধ্যান ভাঙল এবং 'বল্লুকায় কালকূট

দিব উপস্থিত।' আদ্যাশক্তি মনের দুঃখে আত্মহত্যা করার উদ্দেশ্যে সেই কালকূট বিষ পান করলেন। কিন্তু—

বিষপানে হৈল দেবী মরিবার তরে।
ডিম্বরূপ জন্মিয়া গেল দেবীর উদরে॥

দেবীর উদরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব জন্মগ্রহণ করলেন। জন্মগ্রহণ করেই তিন জন গেলেন তপস্যা করতে। বারো বছর পর ধর্ম এলেন মৃতদেহরূপে তাঁদের পরীক্ষা করতে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন শিব। এবার ধর্মের মৃতদেহের সৎকারের আয়োজন। ধর্মের মৃতদেহ শিবের কোলে রেখে কাষ্ঠরূপ বিষ্ণু এবং ব্রহ্মার চিতাসজ্জার অগ্নির দ্বারা মৃতদেহের সৎকারের সময় আদ্যাশক্তি ছুটে এসে ধর্মের সঙ্গে সহমরণে গেলেন।

এখানে ধর্মঠাকুরের সঙ্গে শিবের কিছুটা সাদৃশ্য আছে। মনে হয়, পৌরাণিক কাহিনী কিছু কিছু অংশ লৌকিক ধর্মঠাকুরের সঙ্গে মিশে কাহিনীর অংশে কিছুটা অভিনবত্ব এনে দিয়েছিল। ধর্মপুরাণের সদাডোমের গল্প হল এই—

ধর্মের পূজা প্রচারের জন্য আদিত্য পৃথিবীতে রামাই পণ্ডিতরূপে জন্মগ্রহণ করলেন। ধর্মঠাকুর উলুককে নিয়ে তাঁর আশ্রিত সদাডোমের কাছে গেলেন তাকে পরীক্ষা করতে। তাঁরা ব্রাহ্মণ বেশে অতিথি হবার জন্য সদার বাড়ী এলেন। সদা জানতে পারে তাঁর দ্বারা অতিথি সেবা হবে। তিনি যথারীতি পূজা দিতে দিতে তার বাড়ীতেই আতিথ্য গ্রহণ করতে চাইলেন। সদা সন্তুষ্ট হিসাবে। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে সাধ্যমত দিতেক পারলনা। শেষে অতিথিসৎকারের সব ব্যবস্থা করার পর ধর্মঠাকুর যখন জানালেন সদাডোমের অনুরূপ, তখন তিনি বললেন, 'ধীরেধীরে আমাকে খাবার দাও কই করি'। সদা দুঃখে আত্মহত্যা করতে গেল। ধর্মঠাকুর তখন পুত্রলাভের বর দিলেন। সদাডোমের স্ত্রী বলল, 'আমার পুত্র যদি হয় তাহলে সেই পুত্রকে ধর্মের কাছে বলি দেব।' কিছুদিন পর সদাডোমের একপুত্র হ'ল, তার নাম রাখা হল লুইধর। লুইধর যখন বড় হ'ল তখন একদিন রাজা 'হরিচন্দ্র' (হরিশ্চন্দ্র) সদা-ডোমকে বলল, 'তোমার ছেলেকে আমার রাজ্যের রক্ষক নিযুক্ত করলাম, এবং পাট্টায় দিব কাজ করতে'। লুইধর সেই থেকে রাজার বাগানে কাজ করে আর জুন্‌ কি নিতে পারী যায়। একদিন সে 'উলুক'কে আঘাত করে বসল। 'উলুক' ধর্মঠাকুরকে নালিশ জানাল। ধর্মঠাকুরের আদেশ

অভিশাপে মার্কণ্ডেয়ের গায়ে ধবলকুষ্ঠ দেখা দিল। শেষে রামাইএর দয়ায় মার্কণ্ডেয় ধবলকুষ্ঠ রোগ থেকে আরোগ্যলাভ করেন। তখন মার্কণ্ডেয় মুনিও রামাইকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করে নিলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্রের ধর্ম-পুজার প্রধান পুরোহিত হলেন এই রামাই পণ্ডিত। কিন্তু উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণদের কাছে রামাই পণ্ডিতের সম্মান তেমন বাড়েনি।

ধর্মপুজাপদ্ধতির আরম্ভে 'বারমতি' (বার্মতি—দ্বারমুক্ত) বা ঘরভরার পালা এবং গাজনের শেষের দিনে ঘরভাঙা বা 'জালালি কলিমা (বড়জালালি)' গাওয়া হয়। 'জালালি কলিমায়' তুর্কী আক্রমণ কালের ইতিহাসের ইঙ্গিত রয়েছে বলে মনে হয়। 'জালালি কলিমা' বা নিরঞ্জনের রুষ্মায় (উষ্মা) দেখতে পাই, প্রকৃতিপুঞ্জের পাপের ফলে 'কৈলাস তেজিয়া ধর্ম মায়ারূপী হৈল খোন্দকার—' এবং তিনি হিন্দুর উপর অত্যাচার করছেন, 'দেউল দেহারা' ভেঙে দিচ্ছেন। 'ছোট জালালি'র অর্থ বোঝা দুষ্কর। সেখানেও খোন্‌কাররূপী ধর্মই হিন্দু মুসলমান উভয়েরই নিয়ামক। ধর্মপুজার প্রধান লক্ষ্য পুত্রকামনা হলেও ধর্মঠাকুরের গাজনে কৃষিকার্য, কারিগরি, ব্যবসা প্রভৃতি সব কিছুরই উল্লেখ রয়েছে।

ধর্মঠাকুরের মধ্যে রাজশক্তিরও রূপ দেখতে পাই। তাঁর সেবকদের উপাধিও অনেকটা রাজোচিত। যোদ্ধবেশী ধর্মঠাকুরের রূপও রাজার মতোই। রামদাস আদক বলছেন—

শ্বেত অশ্বে চাপি ধর্ম রাউতের বেশে।
দয়া করি দেখা দিল দীন রামদাসে॥

ধর্মঠাকুরের উপর এই রাজশক্তির আরোপ হয়ত মুসলমান শক্তির আবির্ভাবের আগেই শুরু হয়, এবং মুসলমানদের আবির্ভাবের পর তা আরও জোরালো হয়ে দেখা দেয়।

ধর্মপুজাবিধান প্রভৃতি সংকলিত হবার পর যখন ধর্মমঙ্গলকাব্য রচিত হল তখন কাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু হ'ল লাউসেন-রঞ্জাবতীর পালা। পালাটি হচ্ছে এই—

ময়নাগড়ের সামন্তরাজ কর্ণসেনের ছয়পুত্র ঢেকুরের বিদ্রোহী ইছাই ঘোষকে দমন করতে গিয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হয়। বৃদ্ধ কর্ণসেন পরে গৌড়ের রাজার অনুরোধে তাঁর শ্যালিকা রঞ্জাবতীকে বিবাহ করেন। এই

বিবাহে রঞ্জাবতীর ভ্রাতা মহাপাত্র-মন্ত্রী মহামদের আপত্তি ছিল। রঞ্জাবতী ধর্মঠাকুরের সেবিকা ছিলেন। পুত্রলাভের জন্য ধর্মঠাকুরের 'থানে' তিনি শালে ভর দিয়ে পুত্র লাউসেনকে লাভ করেন।

মাতুল মহামদের ইচ্ছা ছিল লাউসেনের জীবন বিনষ্ট করার। কিন্তু 'ধর্মের' কৃপায় তিনি কিছুই করতে পারলেন না। লাউসেন লেখাপড়ায় ও যুদ্ধবিদ্যায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। লাউসেনের ইচ্ছা হল গৌড়ে গিয়ে তাঁর বাহুবলের পরীক্ষা দেন। তিনি তাঁর পোষ্য-ভ্রাতা কর্পূরধবলকে নিয়ে গৌড়ে চললেন। পথে তিনি ব্যাঘ্র হত্যা করলেন, কুমীরকে পরাজিত করলেন। শেষে গণিকা প্রভৃতি অসতী নারীদের হাত থেকে 'ধর্মের' কৃপায় রক্ষা পেয়ে গৌড়ে পৌঁছালেন। সেখানে তিনি বীরত্ব দেখিয়ে অনেক পুরস্কার লাভ করে দেশে ফিরবার পথে কালুডোম ও তার স্ত্রীকে ময়না-গড়ে নিয়ে এলেন। কালুডোম হ'ল লাউসেনের দক্ষিণহস্ত।

মহামদের চক্রান্তে গৌড়েশ্বর লাউসেনকে পাঠালেন কামরূপরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। যুদ্ধে জয়ী হয়ে লাউসেন কামরূপ-রাজকন্যা কলিঙ্গাকে বিবাহ করেন। আসার পথে মঙ্গলকোটের রাজকন্যা অমলা এবং বর্ধমানের রাজকন্যা বিমলাকেও তিনি বিবাহ করেন।

সিমুলের রাজা হরিপালের কানাড়া নামে এক কন্যা ছিল। কানাড়া 'ধর্মরায়ের' আশ্রিতা। গৌড়েশ্বরের ইচ্ছা ছিল তাকে বিবাহ করেন। কানাড়াকে বিবাহ করার এক ভীষণ সর্ত ছিল। লোহার গণ্ডার যে খড়্গ দিয়ে কাটতে পারবে সেই কানাড়াকে বিবাহ করতে পারবে। গৌড়েশ্বর পিছিয়ে পড়লেন। লাউসেন লোহার গণ্ডারের মুণ্ডচ্ছেদ ক'রে কানাড়াকে বিবাহ করেন।

লাউসেনকে আবার পাঠানো হ'ল ঢেকুরের ইছাই ঘোষকে দমন করতে। দুইদলে ভয়ানক যুদ্ধ হওয়ার পর লাউসেন বিজয়ী হলেন। কিন্তু মহামদের চক্রান্তেরও শেষ নাই, লাউসেনেরও পরীক্ষার শেষ নাই। গৌড়ে বন্যা হ'ল। গৌড়েশ্বর আদেশ করলেন এ বন্যার বেগ লাউসেনকে প্রশমিত করতে হবে। লাউসেন বৃষ্টি ও বন্যা থামালেন। তারপর আদেশ হ'ল পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখাতে হবে। লাউসেন ধর্মঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে তিনি তুষ্ট হয়ে পশ্চিমদিকে সূর্যোদয় দেখালেন। এই অলৌকিক ব্যাপারের সাক্ষী ছিল হরিহর বাইতি। মহামদ চেষ্টা করল হরিহরকে লোভ দেখিয়ে

মিথ্যা সাক্ষী দেওয়াতে। বশ করতে না পেরে মিথ্যা অভিযোগে তাকে শূলে দিল। লাউসেন গৌড়েশ্বরকে 'ধর্মের' কৃপায় পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখালেন। এদিকে মহামদ লাউসেনের অবর্তমানে ময়নাগড় আক্রমণ করে তা দখল করে বসে। কালুডোম মহামদের সঙ্গে যুদ্ধ করে বীরের মতো প্রাণ দেয়। অন্তঃপুর রক্ষা করতে গিয়ে কালুডোমের বউ লক্ষ্যাও প্রাণ দেয়। অবশেষে লাউসেনের স্ত্রী কানাড়ার কাছে পরাজিত হয়ে মহামদ পালিয়ে যায়। লাউসেন দেশে ফিরে ধর্মের স্তব করতেই ময়নাগড়ের যুদ্ধে যারা মরেছিল সবাই বেঁচে উঠল। কিছুদিন রাজত্ব করার পরে পুত্র চিত্রসেনের হাতে রাজ্যভার দিয়ে লাউসেন সপরিবারে স্বর্গে চলে গেলেন। এই হ'ল ধর্মমঙ্গলের প্রধান গল্প।

ধর্মায়ণ কাব্যধারার ধর্মপূজাপদ্ধতিবিষয়ক ছড়া ইত্যাদির সাহিত্যিক মূল্য তেমন কিছু নেই। তবে সদাখণ্ডে, লাউসেন-রঞ্জাবতী পালায় মানব-রসবোধের দৃষ্টান্ত কিছু কিছু পাওয়া যায়। ধর্মমঙ্গলের কাহিনীর আড়ালে প্রচ্ছন্নভাবে যদি কোনো সত্য থেকেও থাকে, অলৌকিকত্বের বাহুল্যে তা খুঁজে বের করা দুষ্কর। এদেশে যে যুগে গণশক্তির অভ্যুত্থান ঘটেছিল সে সময়ের একটা গৌণ ইঙ্গিত যেন এই কাব্যে রয়েছে। ধর্মমঙ্গলে গণশ্রেণীর সংবাদ পাওয়া যায়। তখনকার সামন্তরাজদের সহায়ক ডোম, বাগ্‌দী প্রভৃতি রয়েছে। অপরদিকে গোপশক্তিও বিদ্রোহ করছে।

ধর্মমঙ্গলের কাহিনী অনেকটা উপকথার মতো। তাতে শৌর্যবীর্যের অভাব নেই। এই কাব্যকে বীররসপ্রধান কাব্য বলা যেতে পারে। কবিরা অলৌকিকতার অবতারণা করতে গিয়ে মানবরসকে উপেক্ষা করেননি। তাঁরা যে-সব সাধারণ শ্রেণীর মানবচরিত্র এঁকেছেন তার মধ্যে একটা সহজ ও সাবলীল রূপাঙ্কনের কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। কবিরা নিজেদের সুখদুঃখের কথাও বিশদভাবে বলে গেছেন। দারিদ্র্য-পীড়িত বাঙালী কবির বহু আয়াস-লব্ধ ক্ষুধার খাদ্য হয়ত বাতাসে উড়ে যায়, নয়ত পাখীতে ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। অনেক দুঃখ পাবার পর তাঁরা ধর্মের আদেশে তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে দুঃখমুক্ত হন। মুকুন্দরামের পর থেকে নিজের কথা বিস্তারিতভাবে বলার যে রীতি প্রায় সব মঙ্গলকাব্যের রচয়িতাদের মধ্যেই দেখা গিয়েছিল, ধর্মমঙ্গল রচয়িতাদের বেলায় তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

ধর্মমঙ্গলের কবিগণ

রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণ গ্রন্থখানি ধর্মপূজা বিধানের একখানি সংকলন গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। গ্রন্থখানিতে যে সব বিধানের উল্লেখ আছে তা বৌদ্ধ যুগের দিকে রচিত হওয়া অসম্ভব নয়। তবে কিছু কিছু অংশ পরেও রচিত হয়ে শূন্যপুরাণে গৃহীত হয়েছে বলে মনে হয়।

ধর্মমঙ্গলের আদি কবি বলতে ময়ূরভট্টের নাম করা হয়। কিন্তু তাঁর কোনো কাব্য পাওয়া যায়নি। তিনি যে কোন্ ভাষায় রচনা করেছিলেন তাও ঠিক করে বলা যায় না। কবি সীতারাম দাস বলেছেন—

ময়ূরভট্ট-দ্বিজবর যোগে নিরমল।
প্রকাশ করেন যেবা ধর্মের মঙ্গল॥

মাণিক গাঙ্গুলী, ঘনরাম চক্রবর্তী প্রভৃতি ধর্মমঙ্গলের কবিরাও ময়ূরভট্টের উল্লেখ করেছেন। বাণভট্টের ভগ্নীপতি ময়ূরভট্ট সংস্কৃত 'সূর্যশতক' রচনা করে নিজে কুষ্ঠরোগ থেকে নাকি মুক্ত হয়েছিলেন। ধর্মমঙ্গলের কবিরা কি এই ময়ূরভট্টেরই উল্লেখ করেছেন?

এরপর খেলারাম চক্রবর্তীর উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু তাঁরও সম্পূর্ণ কোনো রচনা পাওয়া যায়নি। খেলারামের রচনাকাল সম্বন্ধে একটি সংকেত পাওয়া গেছে। তাতে বলা হয়েছে—

ভুবন শকে বায়ুমাস শরের বাহন।
খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভন॥

এই সংকেত থেকে অনুমিত হয়, তিনি ১৫২৭—২৮ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীতে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। খেলারামের কাব্যখানির নাম ছিল বোধ হয় 'গৌড়কাব্য'।

শ্রীশ্যামপণ্ডিতের ধর্মবিষয়ক পুঁথির নাম নিরঞ্জনমঙ্গল। তাঁরও সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায়নি। শ্রীশ্যামপণ্ডিতের কাব্য সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রচিত হয়েছিল।

রচনাকাল স্পষ্টভাবে পাওয়া যাচ্ছে এমন ধর্মমঙ্গল রচয়িতাদের মধ্যে রূপরাম চক্রবর্তীর নাম প্রথম করতে হয়। রূপরামের কাব্যের রচনাকাল ১৬৪৯—৫০ খ্রীষ্টাব্দ। রূপরাম তাঁর কাব্যে শাহ্‌ শুজার নাম করেছেন।

রাজমহলের মধ্যে যবে ছিল শুজা।
পরমকল্যাণে যত আছিল ত প্রজা॥
সেই হইতে গীত গাই আসর ভিতর।
দ্বিজ রূপরামে গায় শ্রীরামপুরে ঘর॥

বর্ধমানের দক্ষিণ প্রান্তে কাইতি গ্রামের পাশে শ্রীরামপুর গ্রামে রূপরামের পৈতৃক নিবাস ছিল। রূপরামের পিতার নাম শ্রীরাম চক্রবর্তী, মাতার নাম দৈমন্তী বা দময়ন্তী। বড় ভাই রত্নেশ্বর রূপরামের উপর বিরূপ, কিন্তু 'ছোট ভাই রত্নেশ্বর প্রাণের সমান।' সোনা ও হীরা নামে তাঁর দুই বোন ছিল। রূপরামের আত্মবিবরণী বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। আত্মবিবরণীটি এই—

রূপরামের পিতার টোল ছিল। তাতে অনেক পড়ুয়ারা পড়ত। রূপরাম পিতার টোলে ব্যাকরণ ও অভিধান পাঠ করেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর বড় ভাই রত্নেশ্বর তাঁর প্রতি দুর্ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন। আর সহ্য করতে না পেরে এক দয়ালু প্রতিবেশীর কাছ থেকে কড়ি ও বস্ত্র সংগ্রহ করে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লেন। গেলেন রঘুরাম ভট্টাচার্যের টোলে। সেখানে ব্যাকরণ পাঠ শেষ করে শিশুপালবধ, রঘুবংশম্, নৈষধচরিত পাঠ করতে থাকেন। গুরু-শিষ্যে সম্পর্ক খুবই মধুর ছিল। কিন্তু কিছুদিন পর গুরুর সঙ্গে মতানৈক্য ঘটাতে তিনি গুরুগৃহ ত্যাগ করলেন। কথিত আছে, একটি নিম্নজাতীয়া কন্যার প্রতি রূপরামের প্রণয়াসক্তিই গুরুর ক্রোধের প্রধান কারণ।

রূপরাম যাচ্ছিলেন নবদ্বীপ কিন্তু 'জননী পড়িয়া গেল মনে'। কাজেই তিনি বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পলাশনের বিলের কাছে যখন দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরছেন তখন হঠাৎ দেখলেন 'দুটা শঙ্খচিল উড়ে বিষ্ণুপদতলে' আর নীচে দুটো বাঘ বসে লেজ নাড়ছে। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে ভয়ে পালাবার সময় আছাড় খেয়ে পড়লেন। হাতের পুঁথিপত্র চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সেদিন ছিল শনিবারের দুপুরবেলা। ধর্মঠাকুর এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। তাঁর দুয়েকখানি পুঁথিও তুলে দিলেন। রূপরামকে তিনি আদেশ করলেন 'সদাই গাইবে গুণ আমার চরিত'।

রূপরাম ছুটলেন বাড়ীর দিকে। পথে তৃষ্ণা মেটাবার জন্য শাঁখারি পুকুরে নেমে পেট ভরে জল খেলেন। বাড়ী এসে ঢুকতে না ঢুকতেই বড় ভাই রত্নেশ্বরের সঙ্গে দেখা। আর যায় কোথা! রত্নেশ্বর তাঁকে তিরস্কার করে

বাড়ী থেকে বিদায় করে দিলেন। মায়ের সঙ্গে রূপরামের আর দেখা হলনা। সেখান থেকে গেলেন শানিঘাট গ্রামে। সেখানে কিছু ভাজা চিঁড়ে, যাও বা জোগাড় করেছিলেন ধর্মঠাকুরের ছলনায় তাও উড়ে গেল। দামোদরের জল পান করে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ করলেন। সেখান থেকে গেলেন দীঘনগরে। সেখানে এক তাঁতীর বাড়ীতে ফলার জুটল। সেখান থেকে আবার গেলেন এড়াল গ্রামে। 'গোয়ালাভূমের রাজা গণেশরায়' তাঁকে আশ্রয় দিলেন। ধর্মঠাকুর গণেশরায়কেও স্বপ্নে কবির বিষয়ে আদেশ দিয়েছিলেন।

প্রকাশভঙ্গীর সরলতা ও সরসতা রূপরামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর কাব্যে মানুষ যেখানে এসে পড়েছে সেখানে তিনি তার জীবন্ত আলেখ্য অঙ্কন করতে সার্থক চেষ্টা করেছেন। মঙ্গলকাব্যের যুগে সকল কথার শেষ কথা ছিল দেবতার মাহাত্ম্যকীর্তন। রূপরাম সেই দেবমাহাত্ম্য কীর্তন করতে গিয়ে তারই ফাঁকে ফাঁকে মানুষের সংবাদও পরিবেশন করেছেন।

রূপরামের পর রামদাস আদকের ধর্মমঙ্গলকাব্য উল্লেখযোগ্য। রামদাসও রূপরামের মতো আত্মপরিচয় এবং গ্রন্থোৎপত্তির কারণ লিপিবদ্ধ করেছেন। রামদাস ছিলেন জাতিতে কৈবর্ত। তাঁর পিতার নাম রঘুনন্দন। নিবাস হুগলী জেলার ভুরশুট পরগণার হায়াৎপুর গ্রামে। ভুরশুট পরগণাধিপতি প্রতাপ-নারায়ণের কর্মচারী চৈতন্য সামন্ত অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন। একবার পৌষ-কিস্তির খাজনা দিতে না পারায় রঘুনন্দনের অনুপস্থিতিতে চৈতন্য রামদাসকে বন্দী করে রাখে। রঘুনন্দন সেইবার কোন রকমে খাজনা থেকে রেহাই পেয়ে রামদাসকে মুক্ত করলেন। রামদাস ভয়ে মামার বাড়ী পালালেন। পথে যাবার সময় রূপরামের মতো তিনিও শঙ্খচিল দেখলেন। শেওড়া গাছে চাঁপা ফুল দেখে রামদাস চাঁপা ফুল তুলতেই 'বিনাসূত্রে হার হৈল পরমসুন্দর'। ভয় পেয়ে আবার ছুটতেই দেখলেন সামনে সাদা ঘোড়ায় চড়ে এক সিপাহী আসছে। রামদাসের ত মূর্ছা যাবার উপক্রম হ'ল।

দেশে খাজানার তরে পলাইয়া যাই।
বিদেশে বেগারী বুঝি ধরিল সিপাই ॥

রামদাস লুকাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু সিপাহী তাঁকে ধ'রে বলল—

মনে কর বেটা তুমি যাবে পলাইয়া।
এতক্ষণ ঘুরিলাম বেগারী খুঁজিয়া ॥

সিপাহী তাঁর মাথায় মোট চাপিয়ে দিল। বোঝা ছোট হলে কি হবে —রামদাস সে বোঝা বইতে পারেন না। সিপাহী রেগে বলল—

আমার সমুখে যদি ফেলে দিস মোট।
দ্বিখণ্ড করিব তোরে মারি এক চোট॥

রামদাস ভয়ে চোখ বুজলেন। চোখ মেলে দেখেন সে সিপাহী আর নেই। এ সিপাহী আর কেউ নন, স্বয়ং ধর্মঠাকুর। রামদাসের কাছে ধর্মঠাকুর যোদ্ধবেশে দেখা দিলেন। এসব ব্যাপার দেখে ভয়ে রামদাসের জ্বর এল। একটু জল খেতে গিয়ে পুকুরে নেমে দেখেন সেখানে জল নেই। মনের দুঃখে যখন তিনি বসে বসে কাঁদতে শুরু করলেন তখন ধর্মঠাকুর ব্রাহ্মণের বেশে এসে তাঁর মাহাত্ম্য কীর্তন করতে বললেন। রামদাস বললেন, 'প্রভু আমি অশিক্ষিত নিম্নজাতি, গোরু চরিয়ে বেড়াই, আমি ত কিছুই জানিনা।' ধর্মঠাকুর তাকে আশীর্বাদ করে বললেন, 'আজ থেকে তুমি কবি বলে খ্যাতি লাভ করবে। আমায় স্মরণ করে তুমি যা গাইবে তাই কাব্যময় হয়ে উঠবে।'

রামদাসকে যিনি বর দিলেন তিনি হচ্ছেন জাড়গ্রামের 'কালু বামন বা কালু রায়', আর যাঁর মন্দিরে তিনি প্রথম গান করলেন তিনি হচ্ছেন 'যাত্রাসিদ্ধি রায়'। তাঁর কাব্যে রসবৈচিত্র্য তেমন প্রকাশ পায়নি। রামদাসের রচনাকাল আনুমানিক ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দ।

রামদাস আদকের পর আর একজন বিখ্যাত কবি হচ্ছেন সীতারামদাস। ইনি ধর্মমঙ্গল ছাড়া পরের দিকে একখানি মনসামঙ্গলও রচনা করেছিলেন। সীতারামও পূর্বসূরীদের মতো কাব্যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। কবির পিতার নাম দেবীদাস। তাঁর নিবাস ছিল বর্ধমান জেলার সুখসাগর গ্রামে। তাঁরা জাতিতে কায়স্থ। গৃহদেবতা গজলক্ষ্মী তাঁকে ধর্মঠাকুরের গান রচনা করতে স্বপ্নে আদেশ করেছিলেন। কিছুদিন পর মহাসিংহ এসে সাহাপুর গ্রাম লুঠ করে এবং সীতারামদের ঘরবাড়ীও পুড়িয়ে দেয়।

কবির খুল্লতাত তাঁকে শেওড়াবনে কাঠ আনতে পাঠালেন। পথে তিনি শঙ্খচিল প্রভৃতি নানা শুভ লক্ষণ দেখলেন। জামকুড়ির চৌকিতে বসে এক ছিলিম তামাক খাচ্ছেন এমন সময় একজন ছুটে এসে বলল—'যেও নাই ও-পথে বেগার কত ধরে।' কবির মনে ভয় হলেও তিনি সেই পথেই গেলেন। সময়টা হচ্ছে—

বৈশাখ সময় তার কুড়চির ফুল।
ঝুপ ঝুপ ফুল খসে বাতাসে আকুল ॥

কিছুক্ষণ পর দেখলেন একজন সিপাহী আসছে। এই সিপাহী তাকে বেগার ধরবে ভেবে সেখান থেকে পালালেন। তখন ঝড়ও হচ্ছিল। কিছুদূর যেতেই সামনে পড়লেন এক ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ আর কেউ নন, স্বয়ং ধর্মঠাকুর। তিনি সীতারামকে বলেন, 'আমি ধর্মঠাকুর, ইন্দাসে নারায়ণ পণ্ডিতের ঘরে আছি। তুমি আমার গীত রচনা কর।' সীতারাম তক্ষুণি রাজি হন না। কারণ তখন বামুন-কায়েতের পক্ষে ধর্মের গীত গাওয়া দোষের ব্যাপার ছিল। তাহলে যে জাতে নেমে যেতে হবে। তাই এড়িয়ে যাবার জন্য সীতারাম বললেন, 'আমি তো লেখাপড়া কিছুই জানিনা, কি ক'রে কি করব।' ধর্মঠাকুর বললেন, 'সে দায়িত্ব আমার।' সীতারাম আবার বললেন, 'আমার পরকালে কি উপায় হবে বলুন'। ধর্মঠাকুর বললেন, 'পরিণামে মোর পদ পাবে অনায়াসে।'

কবি যখন গৃহে ফিরলেন তখন রামদাস আদকের মতো তাঁরও খুব জ্বর। দেবী গজলক্ষ্মী আবার আদেশ করলেন ধর্মের গীত রচনা করতে। সীতারাম বেরিয়ে পড়লেন বাড়ী থেকে। ইন্দাসের নারায়ণ পণ্ডিতের বাড়ী গিয়ে ধর্মমঙ্গল রচনা শুরু করলেন। বাড়ীর লোক খবর পেয়ে তাঁকে আবার ফিরিয়ে আনল। কবি চল্লিশ দিনে 'বারমতি' পালা শেষ করলেন।

সীতারামের রচনায় পাণ্ডিত্য কম থাকলেও সরসতার অভাব ঘটেনি। তখনকার দিনের প্রায় কবিরাই আত্মপরিচয় দিয়েছেন। ধর্মমঙ্গলের কবিরা নিজেদের কথা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলেছেন। আমরা পূর্বেই বলেছি, মুকুন্দরাম থেকেই এ রেওয়াজ চলেছে। মনে হয়, অবসিতপ্রায় বৌদ্ধযুগ এবং আগত ব্রাহ্মণ্যবাদের সন্ধিক্ষণ ধর্মমঙ্গলের কাহিনীর কাল। এই সঙ্গে কবির যুগের কথাও এসে পড়েছে। ধর্মঠাকুর আরও প্রাচীন হওয়া বিচিত্র নয়। চর্যার সঙ্গে ধর্মপুজাপদ্ধতির ঘর-ভাঙার গীতের কিছুটা মিলও দেখতে পাওয়া যায়। চর্যাগীতিতে কানুপা বলছেন—

নগর বাহিরিরে ডোম্বী তোহোরি কুড়িআ।
ছোই ছোই জাহ সো ব্রাহ্মণ নাড়িআ॥

আর ঘরভাঙার গীতে রয়েছে—

পথুর পাড়েতে সদা ডোমের কুড়িয়া।
ঘন ঘন আইসে যায় ব্রাহ্মণ বড়ুয়া॥

চর্যার মধ্যে যে নিগূঢ় সাধনতত্ত্বের সংকেত নিহিত আছে তার সঙ্গে ধর্মঠাকুরের এবং তার পূজার কোনো সম্পর্ক আছে কি? ধর্মমঙ্গলের ঐতিহাসিক মূল্য বিচার করতে গেলে কষ্টকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। ধর্মমঙ্গলকাব্য সপ্তদশ শতাব্দীতে নতুন ধারা হিসাবে দেখা দিল বটে, কিন্তু তার মধ্যে এক শৌর্য-বীর্য-প্রধান উপকথা ছাড়া নতুনত্ব তেমন বিশেষ কিছুই পাওয়া গেল না। মধ্যযুগের পদাবলী ও অন্যান্য বৈষ্ণব সাহিত্য ধারার পরিবেশ ধর্মমঙ্গলকে ততটা প্রাধান্য লাভ করতে দেয়নি। তবুও এই গতানুগতিকতার ফাঁক দিয়ে মানুষের আবির্ভাবকে ধর্মমঙ্গলের কবিরা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেননি। মানুষকে মানুষ হিসাবেই অঙ্কিত করেছেন। আর কোনো বৈশিষ্ট্য না থাকলেও মানব-রস পরিবেশনের দিক থেকে ধর্মমঙ্গলের দান অনস্বীকার্য।

বাঙ্‌লার সংস্কৃতির প্রসার

বাঙ্‌লার সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চা শুধু বাঙ্‌লা দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বাঙ্‌লা দেশের বাইরেও তার প্রসার ঘটেছিল। বাঙ্‌লার উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্ত সীমায় যে আর্যেতর ধারা বিরাজ করছিল তাদের মধ্যে বাঙ্‌লার সংস্কৃতি অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে। নেপাল, আসাম প্রান্তিক, মণিপুর, চট্টগ্রাম, আরাকান প্রভৃতি অঞ্চলেও বাঙালীর সংস্কৃতির প্রভাব বহুল পরিমাণে লক্ষিত হয়।

নেপালে বাঙ্‌লা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বেশ কিছুটা প্রসার ঘটেছিল। যখন নেপাল গোর্খাদের দ্বারা বিজিত হয়নি তখন থেকে বাঙ্‌লার বহু সাহিত্য-সম্পদ নেপালে রক্ষিত ছিল। বাঙ্‌লা ও মিথিলার সংস্কৃতি নেপালের সংস্কৃতিকে সার্থক করে তোলে। মৈথিলী ও বাঙালী ব্রাহ্মণেরা নেপাল রাজবংশের বিশেষ করে ভাতগাঁওএর মল্লরাজাদের গুরুর পদ অলংকৃত করেছিলেন।

বাঙ্‌লা সাহিত্যের আদি নিদর্শনও এই নেপালেই পাওয়া গেছে। নেপালে বাঙ্‌লা নাটকেরও প্রচলন ছিল। এসব নাটক সেখানে অভিনীত হত।

'রামাঙ্ক নাটিকা'র লেখক ধর্মগুপ্ত ছিলেন বাঙালী ব্রাহ্মণ। এই নাটক সংস্কৃতে রচিত হলেও তাতে প্রাকৃত ও লৌকিক ভাষার প্রয়োগও রয়েছে। প্রায় আঠারশ শতক অবধি নেপালে বাঙ্‌লা ও মৈথিলীর অনুশীলন চলেছিল।

ত্রিপুর-রাজসভাতেও বাঙ্‌লাভাষা সাহিত্যে এবং দলিল-দস্তাবেজে ব্যবহৃত হ'ত। ত্রিপুরার 'রাজমালা' বাঙ্‌লা ভাষাতেই লিখিত। ত্রিপুরার সংস্কৃতি অনেক দিন আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখলেও বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা বহুপূর্বেই সেখানে শুরু হয়েছিল।

আরাকান বা রোসাঙ্‌-রাজসভা

গৌড় দরবারকে কেন্দ্র করে যেমন বাঙ্‌লা দেশে ধীরে ধীরে বলিষ্ঠ বাঙ্‌লা সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, তেমনই বাঙ্‌লার বাইরে আরাকান বা রোসাঙ্‌ রাজসভাকে কেন্দ্র করেও বাঙ্‌লা সাহিত্য ও সংস্কৃতি এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করছিল।

আরাকানের অধিবাসীরা 'মগ' নামে পরিচিত। বাঙ্‌লা দেশে কখনও এই নামটা খুব ভালোভাবে গ্রহণ করা হয়নি। এককালে এই 'মগ'রা জলদস্যু হিসাবে এবং বাঙ্‌লাদেশ-আক্রমণকারী হিসাবে যে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল সেই থেকে আজ পর্যন্ত তারা বাঙালীর কোনো শ্রদ্ধা পায়নি। দেশে কোনো বিশৃঙ্খলা দেখা দিলেই আমরা বলি 'মগের মুলুক'। অথচ এই 'মগ'দের দেশেই এককালে শুধু বাঙ্‌লা সাহিত্য নয়, বাঙ্‌লা সাহিত্যের এক নতুন ধারার বিকাশ ঘটেছিল।

অতি প্রাচীনকালে আরাকান অঞ্চলে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধরা এসে বাস করতে শুরু করেন। এ অঞ্চলের আদিবাসী যারা ছিল, তারা অষ্ট্রিক, তৈনিক, বর্মী প্রকৃতির মিশ্রিত একটি সংকর জাতি। এদের বেশীর ভাগই বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়। প্রায় সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত আরাকান ভারতবর্ষেরই অংশবিশেষ ছিল।

আরকানবাসীরা তাঁদের দেশকে 'রখইঙ্‌' বলতেন। মুসলমানেরা যখন আরাকানের সংস্পর্শে আসেন এবং যখন থেকে তাঁদের হাতে বাঙ্‌লা সাহিত্য উৎকর্ষ লাভ করতে থাকে তখন থেকে এই দেশ তাঁদের ভাষায় 'রোসাঙ্‌' নামে পরিচিত হয়। চট্টগ্রাম শহরে উত্তরদিকে 'রোসাঙ্‌ গিরি' নামে একটি গ্রামও আছে। মোগল-পাঠানের ভাগ্য পরীক্ষার কালে রোসাঙ্‌ স্বতন্ত্র

রাজ্যে পরিণত হয়। কিন্তু বাঙ্‌লা দেশের সঙ্গে তার যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল।

মুসলমানরা প্রাচীন দিন থেকেই ব্যবসাবাণিজ্যসূত্রে চট্টগ্রাম এবং রোসাঙের সংস্পর্শে এসেছিলেন। প্রাচীনকালে চট্টগ্রাম একটি বিখ্যাত বন্দর ছিল। আরব, পারস্য প্রভৃতি দেশের অনেক মুসলমান দশম-একাদশ শতাব্দী থেকে রোসাঙ্‌ অঞ্চলে বাস করতে শুরু করেন। এবং এই সময় থেকেই 'বুদ্ধের মোকাম' নামে অনেকগুলি মসজিদও এই অঞ্চলে গড়ে ওঠে।

বাঙ্‌লা দেশে মুসলমান শক্তি প্রতিষ্ঠিত হবার বহু পূর্ব থেকেই রোসাঙ্‌ অঞ্চলে মুসলমানরা যে বসতি স্থাপন করেন তা মিসরদেশীয় পর্যটক ইবন্‌ বতুতা খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে লিখে গেছেন। তখন বাঙালীর মতো বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরাও মুসলমানী উপাধি ব্যবহার করতেন। মুসলমানরা রোসাঙ্‌-দরবারে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকতেন। বাঙ্‌লাদেশ থেকেও অনেক অভিজাত মুসলমান মোগল-পাঠান সংঘর্ষের কালে চট্টগ্রামে এবং আরাকান বা রোসাঙে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রোসাঙএর অভিজাত মুসলমানদের বেশীর ভাগই সুফি-মতাবলম্বী ছিলেন। এবং সম্ভবত এই কারণেই সেখানে সুফিপ্রভাবিত সাহিত্যের আবির্ভাব ঘটা সম্ভব হয়েছিল। বাঙ্‌লা দেশেও সৈয়দ মতুর্জা, এবাদুল্লা, নসীর মামুদ, আলীরাজা প্রভৃতি বৈষ্ণব পদাকর্তাদের আবির্ভাব ঘটেছিল। সুফি-মতবাদের মধ্যে এমন একটা ভাববিভোরতা ছিল, যার সঙ্গে বৈষ্ণব প্রেমধর্মের একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠা খুব অসম্ভব নয়।

রোসাঙ্‌-রাজারা মূলত বৌদ্ধ হলেও ধর্মসহিষ্ণুতার অভাব তাদের নিশ্চয় ছিলনা। এই ধর্মসহিষ্ণুতার কারণেই হয়ত সেখানে হিন্দু ও ইস্‌লাম সংস্কৃতি-প্রভাবিত সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল।

অনেকের মতে প্রাক্‌-চৈতন্য যুগে ধর্মপ্রভাবমুক্ত উপকথাজাতীয় রচনার নিদর্শন না পেলেও সে সময় যে এ ধরণের গল্প বা কাহিনী প্রচলিত ছিল এটা কল্পনা করা নিতান্ত অযৌক্তিক হবেনা। তবে ধর্মভাবের প্রাধান্য হেতু ধর্মবিষয়ক রচনা, দেবতার মাহাত্ম্যকীর্তন মুখ্য হয়ে ওঠাতে হয়ত ওই কাব্যগুলি নিজেদের মৌলিকতা বজায় রাখতে পারেনি। কিন্তু পরের দিকে বাঙ্‌লা ভাষায় যে সব ধর্মপ্রভাবমুক্ত মানবীয় প্রণয়কাহিনীমূলক রচনার সংবাদ পাওয়া যায় তা মুখ্যত মুসলমান কবিদেরই রচনা। আর তা গড়ে উঠেছিল

রোসাঙ্-রাজসভাকে কেন্দ্র করেই। খাঁটি বাঙ্লা রোমান্স্ (Romance) রচনায় মুসলমানরাই প্রথম পথ দেখিয়েছেন। বাঙ্লা সাহিত্যে প্রণয়কাহিনী দেবদেবীর মাহাত্ম্যকীর্তনের প্রাধান্যে চাপা পড়লেও সংস্কৃত সাহিত্যে তার অভাব ছিল না। অবশ্যি সেখানে মানুষের প্রেমের স্বরূপটি স্বর্গের দেব-দেবীদের মাধ্যমেই বেশী প্রকাশ পেয়েছে। তবুও যাই হোক, রোমান্টিক্ ধারা সংস্কৃত সাহিত্যে অব্যাহত ছিল। বাঙ্লা বিদ্যাসুন্দর কাব্যের অন্তর্নিহিত ভাবসত্যটি নর-নারীর প্রণয়বিষয়ক হলেও তাতে ধর্মের ছিটে-ফোঁটা দিয়ে তার লৌকিক রূপটি প্রায় অস্পষ্ট করে ফেলা হয়েছিল।

দৌলতকাজী

রোসাঙ্-রাজসভায় যাঁরা বাঙ্লা সাহিত্য রচনা করা শুরু করেন তাঁদের মধ্যে দৌলতকাজীর নাম সর্বাগ্রে করতে হয়। দৌলতকাজী 'লোর-চন্দ্রাণী' বা 'সতী-ময়না' রচনা সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। রোসাঙ্-রাজ থিরি-থু-ধম্মা রাজা বা শ্রীসুধর্মা রাজার রাজত্বকালে দৌলতকাজীর আবির্ভাব ঘটে। ইনি রোসাঙ্-রাজের মহামন্ত্রী 'লস্কর উজীর' আশরফখানের আদেশে 'লোর-চন্দ্রাণী' কাব্য-রচনা শুরু করেন। কাব্যের রচনাকাল ১৬২২ থেকে ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই আশরফখান সম্বন্ধে দৌলতকাজী বলেছেন—

মুখ্য পাত্র শ্রীযুত আশরফ খান।
হানিফী মোজাব ধরে চিস্তীর খান্দান॥

আশরফখান 'চিশ্তি' সম্প্রদায়ের সুফিগুরুর শিষ্য ছিলেন। তাঁর নিবাস ছিল চট্টগ্রামের হাটহাজারী থানার চারিয়া গ্রামে। দৌলতকাজী তাঁর কাছে যথেষ্ট অনুগ্রহ ও সমাদর লাভ করেন। রোসাঙ্-রাজ থিরি-থু-ধম্মা-রাজা (শ্রীসুধর্মা-রাজা) সম্বন্ধেও কবি উচ্ছ্বসিতভাবে বলে গেছেন—

কর্ণফুলী নদী পূর্বে আছে এক পুরী।
রোসাঙ্ নগরী নাম স্বর্গ অবতারি॥
তাহাতে মগধবংশ ক্রমে বুদ্ধাচার।
নাম শ্রী সুধর্মারাজা ধর্ম অবতার॥
প্রতাপে প্রভাত ভানু বিখ্যাত ভুবন।
পুত্রের সমান করে প্রজার পালন॥

এই "বুদ্ধাচারী" রাজার প্রধান সমরসচিব ছিলেন—

শ্রীআশরফখান লস্কর উজীর।
যাহার প্রতাপ-বজ্রে চূর্ণ অরি শির॥

দৌলতকাজী কাব্য রচনা শেষ করার আগেই অল্পবয়সে দেহত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর অনেককাল পরে কবিশ্রেষ্ঠ আলাওল আনুমানিক ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রোসাঙ্‌-রাজ থিরি-সান্দ-থু-ধম্মার (শ্রীচন্দ্র সুধর্মা) প্রধান অমাত্য সোলেমানের আদেশে লোর-চন্দ্রাণী বা সতী ময়না কাব্য সমাপ্ত করেন।

দৌলতকাজী আশরফখানের আদেশে 'বাঙ্‌লা ভাষায়' কাব্যটি রচনা করেন। আশরফখান তাঁকে বলেছিলেন—

দেশী ভাষে কহ তাক পাঞ্চালীর ছন্দে।
সকলে শুনিয়া যেন বুঝএ সানন্দে॥

লোর-চন্দ্রাণী কাব্য তিনখণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় কবি আল্লা ও রসুলের বন্দনা করেছেন, পরে রোসাঙ্‌-রাজ থিরি-থু-ধম্মা-রাজার (শ্রীসুধর্মা রাজা) এবং লস্কর-উজীর আশরফখানের মাহাত্ম্য কীর্তন ক'রে আশরফখানের আদেশে কাব্য রচনা শুরু করার কথা বলেছেন। লোর-চন্দ্রাণীর কাহিনীবস্তু বাঙ্‌লা দেশোদ্ভূত নয়। কিন্তু বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যে প্রণয়-মূলককাব্য হিসাবে তা শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। লোর-চন্দ্রাণীর গল্পটি হচ্ছে এই—

রাজকুমার লোর ময়নাবতী নামে এক সুন্দরী রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। দুজন দুজনকে খুবই ভালোবাসতেন। কিন্তু একদিন এক যোগী লোরকে গোহারী রাজকন্যা চন্দ্রাণীর সংবাদ দিল। যোগী লোরকে বলল—

পুরুষের মধ্যে তুমি রূপে স্মরপতি।
স্ত্রীর মধ্যে চন্দ্রাণী শচী কলাবতী॥
চন্দ্রাণীর তোমার মিলন মনোরম।
বিদ্যাসঙ্গে সুন্দরের যেন সমাগম॥

সুদূর রোসাঙ্‌-রাজ্যেও বিদ্যাসুন্দর বহুল প্রচারিত গল্প। বিশেষত বিদ্যাসুন্দর কাব্য-রচয়িতা সা বিরিদখান চট্টগ্রাম-অধিবাসী ছিলেন। তাঁর কাব্য হয়ত তখন সেখানে প্রচলিত ছিল।

চন্দ্রাণীকে পাবার জন্য উন্মত্ত হয়ে লোর বললেন—

রাজ্যে মোর কার্য নাই হৈমু দেশান্তরী।
সর্বদা যাইমু যথা চন্দ্রাণী গোহারী॥

যোগীর সঙ্গে লোর গেলেন গোহারী রাজ্যে। সেখানে লোর ও চন্দ্রাণী উভয়ে উভয়কে দেখে মুগ্ধ হলেন। কিন্তু চন্দ্রাণী নপুংসক বামন-বীরের পত্নী। মিলনের সব বাধা অতিক্রম করে পরস্পর গোপনে মিলিত হলেন। বামনকে এড়াবার জন্য লোর ও চন্দ্রাণী গোহারী রাজ্য ছেড়ে পালাচ্ছিলেন। কিন্তু অরণ্যের মধ্যে বামন এসে পথরোধ করাতে লোর ও বামনে ভীষণ যুদ্ধ হল। যুদ্ধে বামন নিহত হল। চন্দ্রাণীও সেই অরণ্যে সর্প-দষ্ট হলেন। কিন্তু এক মুনি তাঁকে বাঁচিয়ে দিলেন। লোর এবং চন্দ্রাণীর বিবাহ হল। বৃদ্ধ গোহারীরাজ লোরকে গোহারীরাজ্য সমর্পণ করলেন।

দ্বিতীয় খণ্ডে ময়নাবতীর গল্প। গোহারীরাজ্যে লোর চন্দ্রাণী সুখসম্ভোগে মেতে আছেন। লোর ভুলে গেছেন তার পূর্বপত্নী ময়নাবতীকে। ময়নাবতী সবই শুনেছেন, তবুও তাঁর মনে কোনো দুঃখ নেই। জীবনের সব সুখ-সম্পদ ছেড়ে তিনি শঙ্কর-পার্বতীর কাছে স্বামীর মঙ্গল প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাঁরও নিস্তার নেই। ছাতন নামে এক দুশ্চরিত্র রাজপুত্র তাঁকে পাবার জন্য রত্না মালিনীকে নিযুক্ত করল। রত্না নানা কৌশল অবলম্বন করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হার মেনে সে নিজেই বলে—

ধনে তুষ্ট করিতে না পারি রাজসুতা।
বচনে না হয় বশ লোরের বনিতা॥

অনেক ভেবে মালিনী একদিন ময়নাবতীকে বলল—

জীবন যৌবন রূপ চলএ নিমেষে।
নারী বৃদ্ধ হৈলে তারে না পুছে পুরুষে॥

* * *

চন্দ্র সূর্য অস্ত গেলে পুনি উগী যাএ।
যৌবন চলিয়া গেলে পলটি না পাএ॥

ময়নাবতী কোনো উত্তর না দেওয়াতে মালিনী মনে করল তার কথা নিশ্চয় ময়নার মনে ধরেছে। সে তখন আষাঢ় থেকে আরম্ভ করে বারোমাস বিরহিণীদের কি দুঃখ তাই বলে যেতে লাগল—

দেখ ময়নাবতী প্রথম আষাঢ়
চৌদিকে সাজে গম্ভীর।
বধূজন প্রেম ভাবিতে পন্থিক
আইসএ নিজ মন্দির ॥
* * *
হরি মধুপতি মান রসবতী
মতি ভোর তোর ছাঞি (স্বামী)।
অবধি অন্তর ফিরি না পুছল
আর তোর কি বড়াই ॥ ইত্যাদি।

ময়না বিরক্ত হয়ে বললেন—

আএ ধাঞি কুজনি কি মোক ছুনাঅছি (শুনাওসি)
বেদ উকতি নহে পাঠ।
লাখ উপাএ মেটিতে কো পারএ
যো বিধি লিখন ললাট ॥
মালিনী, বোলছি (বোলসি) অনুচিত বানি।
ধরম ন ছোঅতি তেজিআ সতমতি
লোর প্রেম করাঅছি (করাঅসি) হানি ॥ ধ্রু ॥
মোহর স্বনাঅর গুণের সায়র
মধুর মূরতি ভেস (বেশ)।
ছো (সো) মধু তেজিয়ে কৈছনে বিখ (বিষ) পানাও
ভাল ধাঞি কহ উপদেশ ॥ ইত্যাদি।

মালিনীর শ্রাবণ মাসের বর্ণনার উত্তরে ময়নাবতী বললেন—

ছাওন (শাওন)-গগনে সঘন ঝরে নির।
তঞি আহু না জুড়াএ এ তাপ ছরির (শরীর) ॥ ধু (ধ্রু) ॥
মালিনী কি কহব বেদন ওর।
লোর বিনু বামহি বিহি ভেল মোর ॥
* * *
না বোল না বোল ধাঞি অনুচিত বোল।
আন পুরুখ নহে লোর ছমতুল (সমতুল) ॥

লাখ পুরুখ নহে লোরের ছরুপ (স্বরূপ)।
কোথাএ গোময় কীট কোথাএ মহুপ ॥
গরল ছদৃস (সদৃশ) পর পুরুখক ছঙ্গ (সঙ্গ)।
ডংসিআ পলাএ জেন কাল ভুজঙ্গ ॥ ইত্যাদি।

ময়নাবতী ক্রুদ্ধ হয়ে মালিনীকে মেরে তাড়িয়ে দিলেন।

সুদূর রোসাঙ্-রাজসভায় বসে ব্রজবুলিতে পদ-রচনা করার প্রচেষ্টায় দৌলতকাজী একেবারে ব্যর্থ হননি।

এগারো মাসের বিরহ বর্ণনার পর কবি দেহত্যাগ করেন। দ্বাদশ মাসের বর্ণনা ও তৃতীয় খণ্ড কবি আলাওল সম্পূর্ণ করেন। তৃতীয় খণ্ডে ময়নাবতী এক ব্রাহ্মণকে দিয়ে শুক-সারি পাঠালেন লোরের কাছে। লোরের মনে পড়ল ময়নাবতীর কথা। তখন পুত্র প্রচণ্ডতপনের হাতে গোহারী রাজ্যের ভার দিয়ে চন্দ্রাণীকে নিয়ে লোর দেশে ফিরলেন। ময়নাবতী ও চন্দ্রাণী—এই দুই রানীকে নিয়ে নিজ রাজ্যে সুখে বাকি জীবন অতিবাহিত করলেন।

দৌলতকাজীর কাব্যের যেটুকু অংশ পাওয়া গেছে তাতে পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব শক্তির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সেযুগের বাঙ্লার কবিদের মধ্যে তাঁর আসন সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর কাব্যের নাটকীয় গতিবেগ আধুনিক গীতি-নাট্যের সমতুল্য। তাঁর কাব্যের মধ্যে নানা প্রবচনও ছড়িয়ে আছে। যেমন—

'কাতরতা কাপুরুষ জনের লক্ষণ।'

কিংবা,

ভালে ভাল সমযুক্ত মন্দে মন্দ যথা।
বিদ্বানেত বিদ্যা কহি মূর্খেত মূর্খতা ॥

কিংবা,

যাহার নির্বন্ধ যেই না যায় খণ্ডন।

কিংবা,

দারুণ পৃথিবী এই ব্যবস্থা তাহার।
এক যাএ আন আইসে কেহ নহে সার ॥

কবি আলাওল

দৌলতকাজীর পর রোসাঙ্-রাজসভার দ্বিতীয় শক্তিমান কবি হচ্ছেন সৈয়দ আলাওল। আলাওল শুধু রোসাঙ্-রাজসভার নয়, সারা বাঙ্লার—শুধু

মুসলমানদের নয়, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই অতিপ্রিয় কবি। সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্‌লা সাহিত্যক্ষেত্রে যে কয়েকজন শক্তিশালী কবির আবির্ভাব ঘটেছে, কবি আলাওল তাঁদের একজন। আলাওল ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। কিন্তু সব চেয়ে তাঁর বড়ো পরিচয়—তিনি কবি। আরবী, ফারসী, সংস্কৃত, বাঙ্‌লা প্রভৃতি ভাষায় তাঁর অসাধারণ দখল ছিল। শুধু তাই নয়, সঙ্গীত এবং নৃত্যেও তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। আলাওল নিজেই বলেছেন—

রোসাঙ্গেতে মুসলমান যতেক আছেন্ত।
তালিব আলিম সবে আদর করেন্ত॥
বহু মহন্তের পুত্র মহা মহা নর।
নাট গীত সঙ্গীত শিখাইন্থ বহুতর॥

কবির বাসস্থান কোথায় ছিল, তা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেন, ফরিদপুর জেলার ফতেয়াবাদ পরগণায়। কারও কারও মতে তিনি চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী থানার 'জোবরা' গ্রামে এখনও আলাওলের বংশধরেরা বাস করেন। সেখানে আলাওলের দীঘি নামে বিরাট এক দীঘি আছে। এই দীঘির এককোণে আলাওলের কবরও বিদ্যমান। আলাওলের পিতা ফতেয়াবাদ পরগণার শাসনকর্তা 'মজলিস কুতুবের' প্রধান অমাত্য ছিলেন। চট্টগ্রাম শহরের উত্তরে ফতেয়াবাদ নামে একটি গ্রামও আছে। একবার পিতার সঙ্গে কবি যখন জলপথে যাচ্ছিলেন তখন তাঁরা 'হারমাদ্'দের হাতে পড়েন। আলাওলের পিতা জলদস্যুদের সঙ্গে লড়াই করে নিহত হন। আলাওল কোনোরকমে রক্ষা পেয়ে রোসাঙে উপস্থিত হন। সেখানে প্রথম তিনি 'রাজ আসোয়ার' (আসোয়ার) হলেন। আলাওল সম্ভবত রোসাঙ্-রাজ থদো-মিন্তারের রাজত্বকালে (১৬৪৫-৫২ খ্রীষ্টাব্দ) রোসাঙে উপস্থিত হন। কবি লোর-চন্দ্রাণীর শেষ অংশ লেখার সময় বলেছিলেন—

সুধর্মার শেষে তিন নৃপ চলি গেল।

এই সুধর্মা হচ্ছেন রোসাঙ্-রাজ থিরি-থু-ধম্মা-রাজা বা শ্রীসুধর্মা রাজা। আলাওল লোর-চন্দ্রাণী যখন সম্পূর্ণ করছেন তখন রোসাঙ-রাজ থিরি-সন্দ থু-ধম্মা বা শ্রীচন্দ্রসুধর্মা (১৬৬২-১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দ) বর্তমান। মীর জুম্‌লা যখন শাহ্ শুজাকে তাড়া করেন তখন শুজা এই থিরি-সান্দ-থু-ধম্মার (শ্রীচন্দ্র সুধর্মা)

আশ্রয় গ্রহণ করেন। পরে রোসাঙ্-রাজের সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটার ফলে শাহ্ সুজা সপরিবারে নিহত হন। আলাওলও রোসাঙ্-রাজের বিরাগ-ভাজন হওয়াতে কারাগারে বন্দী হন। কিছুদিন পর কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন। এর পরে তিনি অনেক কাব্য রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর রচিত 'সয়ফুল-মুলক বদিউজ্জমাল' কাব্যে তিনি নিজেই বলেছেন 'রচিলুঁ-পুস্তক বহু নানা আলাপাল'। আলাওল জীবনে অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করেছেন। যাহোক, আলাওলের গুণের কথা ছড়িয়ে পড়তে বেশী দেরী হ'ল না। রোসাঙ্-রাজ মন্ত্রী-বিভাগের প্রধান অমাত্য মাগনঠাকুর তাঁর মূল্য বুঝলেন। মাগনঠাকুর কবিকে খুবই ভালোবাসতেন। কবির কথায় মাগন ঠাকুর তাঁর 'অন্নদাতা ও ভয়ত্রাতা দুই মতে বাপ'। এই মাগনঠাকুরের আদেশে কবি 'পদ্মাবতী' ও 'সয়ফুল-মুলক-বদিউজ্জমাল' কাব্য দু'খানি রচনা করেন। 'পদ্মাবতী' কাব্যে আশ্রয়দাতা এই মাগনঠাকুর সম্বন্ধে আলাওল বলেছেন—

মাঘোর 'ম'কার আর ফাগোর 'গ'-কার।
শুভযোগে নক্ষত্রের আনিল 'ন'-কার॥
এই তিন অক্ষরে নাম মাগন সম্ভবে।
রাখিলেক মহাজনে অতি মনোৎসবে॥
আর এক কথা শুন পণ্ডিত সকল।
কাব্যশাস্ত্র-রস-মূল পুস্তক পিঙ্গল॥
পিঙ্গলের মধ্যে আছে 'মহাগণ' মূল।
তাহাতে 'মগণ' আদ্য শুনি কবিকুল॥
তিন স্থির গুরুমাত্রি 'মগণ' ভিতর।
'মগণ' 'মাগন' এক আকার অন্তর॥
আকার সংযোগে নাম হইল 'মাগন'।
অনেক মঙ্গল ফল পাএ সে-কারণ॥

কবি আলাওলের রচনাবলির যে কয়খানি কাব্য পাওয়া গেছে তার মধ্যে 'পদ্মাবতী'ই তাঁর প্রথম রচনা। 'পদ্মাবতীর' রচনাকাল আনুমানিক ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দ। 'পদ্মাবতী' কাব্য বিখ্যাত হিন্দী-কবি মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবৎ' কাব্যের অনুবাদ। জায়সী দীর্ঘকাল ধরে কাব্যখানি রচনা করে

ছিলেন। প্রায় ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে রচনা শুরু করে ১৫৪০-৪২ খ্রীষ্টাব্দের দিকে শেষ করেন। জায়সী চিশ্‌তিয়া-খানদানী সূফি সাধক ছিলেন। আলাওল 'পদ্মাবতী'র অনুবাদকালে শুধু জায়সীর আক্ষরিক অনুবাদ করেই যাননি, 'পদ্মাবতী' কাব্যে তাঁর কবিত্বশক্তি এবং মৌলিকতারও ছাপ রয়েছে।

'পদ্মাবতী' কাব্যখানি প্রেমমূলক গ্রন্থ। ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বন করে এই কাব্যখানি রচিত হয়েছে। তবে ইতিহাস এখানে গৌণ। 'পদ্মাবতী' মূলতঃ চিতোরের পদ্মিনীর কাহিনী। এই মতে পদ্মাবতীর স্বামীর নাম রত্নসেন। পদ্মাবতী ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী। এই রূপই তাঁর কাল হ'ল। চিতোরের রাজসভার রাঘব-চেতন নামে একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনি দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দীনকে বলেন, পদ্মাবতীকে রত্নসেনের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনার জন্য। আলাউদ্দীন রত্নসেনের কাছে পদ্মাবতী সম্বন্ধে অনুরূপ প্রস্তাব করলে রত্নসেন তা প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করে রত্নসেনকে বন্দী করেন। কিন্তু গোরা ও বাদিলা (বাদল ?) নামক দুই বিশ্বস্ত অনুচরের সাহায্যে রত্নসেন মুক্তি লাভ করেন। অন্যদিকে দেবপাল নামে এক রাজার সঙ্গে রত্নসেনের যুদ্ধ বাধল। সেই যুদ্ধে দেবপাল নিহত হল, রত্নসেনও আহত হলেন। আলাউদ্দিন আবার চিতোর অভিমুখে অভিযান চালান। কিন্তু রত্নসেনের এর মধ্যে মৃত্যু ঘটায় পদ্মাবতী তাঁর সঙ্গে সহমৃতা হন। আলাউদ্দিন যখন চিতোরে এসে পৌঁছালেন তখন রত্নসেন-পদ্মাবতীর চিতা জ্বলছে। আলাউদ্দিন মনের দুঃখে পদ্মাবতীর চিতায় প্রণাম করে দিল্লীতে ফিরে গেলেন। এই হল 'পদ্মাবতী'র কাব্যের গল্প। কাব্যের শেষ অংশ পাওয়া যায়নি। 'পদ্মাবতী' কাব্যের বেশীর ভাগ পুঁথিই আরবী-ফারসী হরফে লেখা হয়েছে। তাই তার শুদ্ধ পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি।

'পদ্মাবতীকাব্যে' আলাওলের নিজস্ব ভাবকল্পনাও কিছু কিছু আছে, এবং তাতে কাব্যের সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণই রয়েছে। মাঝে মাঝে জায়সীর প্রাকৃতিক বর্ণনাকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত করে তিনি কাব্যখানিকে সার্থক করে তুলেছেন। যেখানে সঙ্গীত ও নৃত্যের কথা এসে পড়েছে সেখানে তিনি আর লেখনী থামাতে পারেননি। খুব বিনয়সহকারে কবি বলেছেন—

না কহিলে দোষ হয় কৈতে বাসি ডর।
কে কাহারে কহি কথা দুনীর গোচর॥

যুদ্ধের কথা বলতে গিয়ে কবি বলেন—

কহিতে যুদ্ধের কথা   সকল বাড়য় গোথা
না কহিলে শাস্ত্র নহে মতে।
অল্প না কহি যদি   কহিব সংক্ষিপ্ত মতে,
এই কহি লক্ষীত না কাড়ে॥

ভক্তি-সাধক আলাওল প্রেম-সাধনার কথা বলতে গিয়ে বলেন—

প্রেম বিনে ভাব নাহি ভাব বিনে রস।
ত্রিভুবনে যত দেখ প্রেম হন্তে বশ॥
যার হৃদে জন্মিলেক প্রেমের অঙ্কুর।
মুক্তি পায় পাইল সে প্রেমের ঠাকুর॥
প্রেম হন্তে অধমে দিতে নিত অক্ষয়।
সবাকারে দিবনিশি নন্দা পজ্ঞয়॥

এই সাধনার সঙ্গে বৈষ্ণব-সাধনার সাদৃশ্য বা কতখানি? প্রেম-সাধনার রীতি-নীতি সম্বন্ধে আলাওলের গভীর জ্ঞান ছিল।

'পদ্মাবতী' পর বিভিন্ন-কাজ-কু রচনার প্রধান অমাত্য সোলেমানের আদেশে আলাওল কবি দৌলতকাজীর অসমাপ্ত 'লোর চন্দ্রাণী' বা 'সতী-ময়না' কাব্য পরিসমাপ্ত করেন।

সতী ময়না কাব্যের শেষে আলাওল বিনয়সহকারে বলেছেন—

শ্রীযুত দৌলতকাজী গুণাকার।
তাহার আগে কহিতে চাহিলু আমি অল্প।
ভাষা সব দোষের না হয় পরশিতে।
অবিবেকে নিয়াছিলা কহক সভাকথা॥
হরষিত হাসা হাসি কহিলু সাক্ষাতী।
অল্প বন্ধু কাছে কহে যদি প্রেম ভাবি।

কবির দ্বিতীয় কাব্য হচ্ছে 'সয়ফুল-মুলুক-বদিউজ্জামাল'। মাগনঠাকুর তাঁর জনপুত্র দ্বারা দুস্প্রাপ্য কিছু সয়ফুল-মুলুকের পুঁথি তুলে আলাওলকে বলেছেন—

শব্দের না বুঝে এই আরবীর (ফারসী) ভাষ।
পয়ার রচনে কর এই অভিলাষ॥

তখন 'অন্নদাতা ভয়ত্রাতা দুইমতে বাপ' মাগনঠাকুরের অদেশে কবি সয়ফুল-মুলক্‌এর গল্প বাঙ্‌লায় লিখতে শুরু করেন। কিছুটা রচনার পর কবির পরম হিতৈষী আশ্রয়দাতা বন্ধু মাগনঠাকুরের মৃত্যু হলে তিনি একেবারে ভেঙে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে 'সয়ফুল-মুলক্‌-বদিউজ্জমাল' লেখাও বন্ধ হয়ে যায়। শেষে সৈয়দ মুসার সনির্বন্ধ অনুরোধে মাগনঠাকুরের মৃত্যুর প্রায় নয় বৎসর পরে কবি কাব্যখানি সম্পূর্ণ করেন। কাব্যের প্রথম অংশের ভণিতায় মাগন ঠাকুরের উল্লেখ রয়েছে, পরের দিকে সৈয়দ মুসার উল্লেখ রয়েছে। আনুমানিক ১৬৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে কাব্যখানির রচনা শুরু হয় এবং মাগন-ঠাকুরের মৃত্যুর পর সম্ভবত ১৬৬৮-৬৯ খ্রীষ্টাব্দের দিকে আলাওল কাব্যের বাকি অংশ শেষ করেন।

'সয়ফুল-মুলক্‌-বদিউজ্জমাল'ও একখানি প্রেমমূলক কাহিনী কাব্য। এই প্রণয়োপাখ্যানের নায়ক-নায়িকা হচ্ছে মিশরের বাদশাহ্‌ ছিপুয়ানের পুত্র সয়ফুল-মুলক্‌ এবং ইরাণ-বোস্তান নামক পরীরাজ্যের রাজার কন্যা বদিউজ্জমাল। বদিউজ্জমালের একখানা আঁকা ছবি দেখে সয়ফুল-মুলক্‌ তাকে পাবার জন্য অধীর হয়ে ওঠে। কিন্তু কেউ সেই কন্যার দেশের ঠিকানা জানে না। শেষে একদিন বদিউজ্জমাল তাকে স্বপ্নে নিজের পরিচয় দিল। সয়ফুল-মুলক্‌ বন্ধু সঈদকে নিয়ে পরীর রাজ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। পথের নানা বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে তবে সে পেল বদিউজ্জমালকে। তার বন্ধু সঈদও পত্নী-হিসাবে পেল সরন্দীপ রাজকন্যা মল্লিকাকে।

এর পরের রচনা হচ্ছে 'হপ্ত পয়কর' (সপ্ত পয়কর)। এই কাব্যের রচনাকাল সম্ভবত ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি হবে। অন্তত শাহ্‌ শুজার হত্যাকাণ্ডের পূর্বে নিশ্চয় রচিত হয়েছে। কারণ 'হপ্ত পয়করে' কবি বলেছেন—

দিল্লীশ্বর বংশ আসি যাহার শরণে পশি
তান সম কাহার মহিমা।

একথা নিশ্চয় তিনি শাহ্‌ শুজার মৃত্যুর পরে বলেননি। 'হপ্ত পয়কর' রচিত হয় থিরি-সান্দ-থুধম্মার সেনাপতি সৈয়দ মহম্মদের আদেশে।

'হপ্ত পয়করে' সাতটি গল্প আছে। পারস্যের বিখাত কবি নেজামী গজনবীর 'হপ্ত পয়করের' অনুবাদ করেছিলেন আমাদের কবিশ্রেষ্ঠ আলাওল। 'হপ্ত পয়করের' কাহিনী সংক্ষেপে হচ্ছে এই—

আরব ও আজমের রাজা নো'মানের পুত্র বাহ্‌রাম। জ্যোতিষীর কথায় রাজা পুত্রকে য়মন দেশে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ছমনা নামে এক শিল্পী বাহ্‌রামের জন্য সাতরঙের সাতটি 'টঙ্গী' তৈরী করেন। এদিকে নো'মানের মৃত্যু হলে প্রধান মন্ত্রী সিংহাসন দখল করে বসল। বাহ্‌রাম মন্ত্রীকে তাড়িয়ে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করলেন। তারপর পার্শ্ববর্তী সাতটি রাজ্যের সাত রাজাকে পরাজিত করে তাদের সাত কন্যাকে বিবাহ করে এনে সাত টঙ্গীতে বাস করতে দিলেন। সেই সাতটি রাজকন্যা বাহ্‌রামকে যে সাতটি গল্প শুনিয়েছিল তাই কাব্যের মুখ্য বিষয়বস্তু। এই গল্পগুলি ধর্মবিষয়ক নয়, নিছক আনন্দ দানই হল গল্পগুলির প্রধান লক্ষ্য।

তারপর আলাওলের আর একটি রচনা হচ্ছে 'তোহ্‌ফা'। 'তোহ্‌ফা' ইউসুফ গদার ইসলাম-ধর্মসম্বন্ধীয় তত্ত্বোপদেশপূর্ণ ফারসী গ্রন্থের অনুবাদ। গ্রন্থটির রচনাকাল সম্ভবত ১৬৬৩-৬৪ খ্রীষ্টাব্দ। এই সময় আলাওল অতিবৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। 'তোহ্‌ফা'তে তিনি বলছেন—

মুঞি আলাওল হীন দৈববশ অনুদিন
বিধি বিড়ম্বিল বৃদ্ধকালে।

অবশ্যি 'হপ্ত পয়করে'ও কবি বলেছিলেন—

তান আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি কদাচিত।
যদ্যপিও জরাজীর্ণ চিন্তাকুল চিত।

এবং সৈয়দ মুসা যখন 'সয়ফুল-মুলক্-বদিউজ্জমাল' রচনা শেষ করতে অনুরোধ করেন তখনও তিনি বলেছিলেন—

রচিলুঁ পুস্তক বহু নানা আলাঝালা।
বৃদ্ধকালে ঈশ্বরভাবেতে রৈলে ভালা॥

তবুও শেষ পর্যন্ত কবিকে মজলিস-নবরাজের নির্দেশে 'সেকান্দারনামা' রচনা করতে হয়। আলাওলের আর কোনো রচনা থাকলেও এখনও তা আবিষ্কৃত হয়নি। 'সেকান্দারনামার' রচনাকাল আনুমানিক ১৬৭১-৭২ খ্রীষ্টাব্দ হতে পারে। শাহ্‌ শুজার মৃত্যুর এগারো বৎসর পরে কবি এই কাব্য রচনা শুরু করেন। এই কাব্যখানিও কবি নেজামী গজনবীর ফারসী 'সেকান্দারনামা' গ্রন্থের অনুবাদ। এই কাব্যের মূল বিষয়বস্তু হচ্ছে আলেকজান্দারের দিগ্বিজয়-কাহিনী। আলেকজান্দারের পিতা ফিলিপ, শিক্ষাগুরু ও মন্ত্রী

'আরস্তুতালিশ' (আরিস্‌টটল্‌) পারস্যরাজ' দারা' বা দরায়ুস্‌ প্রভৃতির কাহিনী 'সেকান্দারনামায়' বর্ণিত হয়েছে। আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণ এবং কান্যকুব্জ রাজ চৈনিক ও রুশদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ ইত্যাদির কথা বর্ণিত হয়েছে।

আলাওল বাঙ্‌লা ও ব্রজবুলিতে বৈষ্ণব পদও রচনা করেছিলেন। এই পদ-রচনা গতানুগতিক রচনা নয়—তাতে ভক্তহৃদয়ের সার্থক পরিচয় পাওয়া যায়। সুফি-সাধকের পক্ষেই এই ধরণের পদ রচনা সম্ভব। যথা—

আহা মোর বিদরে পরাণ।
জাগিতে স্বপনে দেখি ভূমে নাহি আন ॥ ধ্রু ॥
কি জানি লিখিছে বিধি এ পাপ করমে।
পাইয়া পরশমণি হারাইলুঁ ভ্রমে ॥ ইত্যাদি।

কিংবা,

ননদিনী রস-বিনোদিনী
ও তোর কুবোল সহিতাম নারি ॥ ধ্রু ॥
ঘরের ঘরণী জগত-মোহিনী
প্রত্যূষে যমুনায় গেলি।
বেলা অবশেষ নিশি পরবেশ,
কিসে বিলম্ব করিলি ?
প্রত্যূষ বিহানে কমল দেখিয়া
পুষ্প তুলিবারে গেলুম।
বেলা উদনে কমল মুদনে
ভ্রমর দংশনে মৈলুম ॥
... ...
কুলের কামিনী ফুলের নিছনি
কুলের নাহিক সীমা।
আরতি মাগনে আলওয়াল ভণে
জগৎ-মোহিনী-বামা ॥

অথবা,

তুয়া পদ হেরইতি বাতুল যুবতী
কামিনী মোহন কটাখে হীন ভেল।

প্রেমমদে বিভোল, সতত বহয় লোর,
অবয়ব পরিহরি শুদ্ধিবুদ্ধি হরি গেল ॥ ইত্যাদি।

বাঙ্‌লা সাহিত্যে আলাওলের দান যে কতখানি তা তাঁর অল্প কয়েকখানি পুঁথি ও পদাবলী রচনা থেকেই বুঝতে পারি। তাঁর অনেক রচনা এখনও হয়ত আবিষ্কৃত হয়নি। শুধু তাঁর কেন, সপ্তদশ শতাব্দী ও তার পরের শতাব্দীর বহু মুসলমান কবির রচনা এখনও আমাদের অজ্ঞাত রয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব থেকেই বাঙ্‌লা সাহিত্যে প্রণয়মূলক রোমান্টিক কাব্যধারা নিশ্চয় প্রবাহিত হচ্ছিল। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে মুসলমান কবিদের লেখনীতে তার সার্থকবিকাশ ঘটে। এই কবিদের মধ্যে অবিসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ঠ কবি হচ্ছেন সৈয়দ আলাওল। তাঁদের রচিত এই কাব্যধারা পরের দিকে পূর্ববঙ্গ-গীতিকাব্য, প্রেম-সঙ্গীত প্রভৃতি এবং এমন কি উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য-রচনাকেও সজীব ও উর্বরা করে তুলেছিল।

অন্যান্য মুসলমান কবিগণ

রোসাঙ্‌-রাজসভাকে কেন্দ্র করে তখন যে ধর্মপ্রভাবমুক্ত প্রণয়মূলক বাঙ্‌লা সাহিত্য গড়ে উঠেছিল তার প্রভাব অল্পদিনের মধ্যে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা অঞ্চলেও এই ধরণের বাঙ্‌লা সাহিত্য বহুল পরিমাণে রচিত হতে থাকে। বাঙ্‌লা সাহিত্যে বৈষ্ণব রসধারা ভাবের প্লাবন বয়ে আনলেও এই নতুন ধরণের সাহিত্য বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাসে আপনার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছে। মঙ্গলকাব্যের যুগেও এই ধর্মপ্রভাবমুক্ত কাব্য-সাহিত্য আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছিল। এই কাব্যে আর দেব-দেবী নয়—একেবারে মানুষ এসে প্রধান অংশ জুড়ে বসল। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্‌লা সাহিত্যে বৈচিত্র্যও দেখা দিল। এই বৈচিত্র্য প্রথম সম্পাদিত হয়েছিল মুসলমান কবিদের দ্বারা। বাঙ্‌লা সাহিত্যও এই সময় থেকে কিছুটা গতানুগতিকতা মুক্ত হয়।

এযুগে অন্যান্য যে সব মুসলমান কবিদের রচনার উল্লেখ পাচ্ছি তার মধ্যে কোরেশী মাগনঠাকুরের চন্দ্রাবতীকাব্য উল্লেখযোগ্য। কেউ কেউ মনে করেন, কোরেশী মাগনঠাকুর হয়ত হিন্দু ছিলেন। ৺মৌলবী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ এবং ডাঃ এনামুল হক্ মহোদয়গণের মতে তিনি কুরেশবংশীয় মুসলমান ছিলেন। কোরেশী মাগনঠাকুর চন্দ্রাবতীকাব্যকে রূপকথার মতো

করে সার্থক কাব্যরূপ দান করেছেন। চন্দ্রাবতী কাব্যের গল্পের বিষয়বস্তু হচ্ছে ভদ্রাবতী নগরের রাজা চন্দ্রসেনের পুত্র বীরভান ও সরন্দীপরাজ সুরপালের কন্যা চন্দ্রাবতীকে নিয়ে। বীরভান চন্দ্রাবতীকে পেতে চায়। পথের নানা কঠিন বাধা পেরিয়ে হয়ত বীরভান চন্দ্রাবতীকে পেয়েছিল। 'হয়ত' বলার অর্থ এই যে পুঁথিখানির শেষের দিকের পাতাগুলি নেই। মাগনঠাকুরের কাব্যে কবিত্বের অভাব নেই। গল্প বলার ফাঁকে ফাঁকে কবি কল্পনা-মাধুরী মিশিয়ে কাব্যকে সার্থক করে তুলেছেন।

চট্টগ্রামের পরাগলপুরের সুফি-মতাবলম্বী কবি সৈয়দ সুলতান 'হরিবংশের' অনুকরণে 'নবীবংশ' রচনা করেন। 'নবীবংশের' রচনাকাল আনুমানিক ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দ। এই কাব্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কৃষ্ণ প্রভৃতির মাহাত্ম্যও বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া সৈয়দ সুলতানের তান্ত্রিক যোগ বিষয়ক 'জ্ঞান-প্রদীপ' নামেও একখানি কাব্য পাওয়া যায়। কবি বৈষ্ণব পদও রচনা করেছিলেন।

কবি মোহাম্মদ খান 'মকতুল হোসেন' বা 'মুক্তাল হোসেন', 'কাসিমের লড়াই', 'হানিফার পত্রপাঠ', 'কেয়ামত-নামা' প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন। তার মধ্যে 'মকতুল হোসেন' এবং 'কেয়ামত-নামা' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'মকতুল হোসেন' ফারসী 'মকতু-ল্-হুসয়্‌ন'-এর অনুবাদ। কারবালায় হজরত মোহাম্মদের (দঃ) পৌত্র হোসেনের হত্যা কাহিনী এই কাব্যের বিষয়বস্তু। কারবালার কাহিনী ছাড়া কবির নিজের কথা, নিজের দেশ চট্টগ্রামের কথাও এই কাব্যে বলেছেন। 'মকতুল হোসেন' কাব্যের গোড়ায় কবি মুসলমান কর্তৃক চট্টগ্রাম-বিজয়ের কাহিনীও লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

মোহাম্মদ খানের 'কেয়ামত-নামা'ও সার্থক রচনা। পৃথিবীর শেষের দিনের শেষ বিচারে কার কি অবস্থা হবে তাই এখানে বলা হয়েছে।

দোনাগাজী চৌধুরী নামে একজন কবিও আলাওলের মতো 'সয়ফুল-মুলক্-বদিউজ্জমাল' রচনা করেন। লেখক সম্ভবত ত্রিপুরা জেলার লোক ছিলেন।

আবদুল নবী নামে একজন কবি ফারসী 'দাস্তানে আমীর হাম্‌জা'র বাঙ্‌লা অনুবাদ করেন। 'আমীর হামজা'র অনুবাদকাল আনুমানিক ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। কবি আবদুল নবীর নিবাস ছিল চট্টগ্রামে। বাঙ্‌লা ভাষায় গ্রন্থ রচনার ব্যাপারে কবি যেন ভয়ে ভয়ে বলছেন—

আমীর হামজার কিচ্ছা পারসী কিতাব।
না বুজিআ লোকের মনেত পাই তাব ॥
বঙ্গেত ফারসী ন জানএ সব লোকে।
কেহ কেহ বুজি কেহ ভাবে জেনা সোঁকে ॥
এই হেতু সেই কথা মুঞি রচিবার ॥
নিজ বুদ্ধি চিন্তি মনে কৈলুম অঙ্গিকার ॥
মুছলমানি কথা দেখী মনেহ ডরাই।
রচিলে বাঙ্গালা ভাসে কোপে কি গোঁসাই ॥
লোক উপকার হেতু তেজি সেই ভএ।
দরভাবে রচিবারে ইচ্ছিলুম হৃদএ ॥

কোনো দৈবাদেশে নয়, শুধু নিজের মনের আবেগে কবি কাব্য রচনা করে গেছেন। 'আমীর হামজা' আশী-পর্বে বিভক্ত এক বিরাট কাব্য। কবি আবদুল নবীর রচনাকে পুরোপুরি অনুবাদ বলা যায় না। কাব্যে তাঁর নিজের স্বাধীন কবি-কল্পনার পরিচয়ও পাওয়া যায়।

শাহ্ মোহাম্মদ সগীর 'ইউসুফ-জেলেখা' নামে একখানি প্রণয়মূলক কাব্য রচনা করেন। কবির রচনাকাল সম্বন্ধে সাবিরিদ খানের মতোই কিছুই জানা যায় নি। এঁরা দুজনেই আরও পূর্বের লোক হতে পারেন।

সৈয়দ মোহাম্মদ আকবর নামক এক কবির 'জেবল মূল্‌ক-শামারোখ' নামে একখানি কাব্য পাওয়া গেছে। কাব্যখানি অনেকটা আলাওলের সয়ফুল-মুলক্-বদিউজ্জমালের মতোই। কবির রচনাতেও আলাওলের প্রভাব যথেষ্ট। কবি আকবরও শুধুমাত্র আনন্দ রস পরিবেশনের উদ্দেশ্যেই কাব্য রচনা করেন। ধর্মের কথা বলে কবি কাব্যকে ধর্মমূলক করে তোলেন নি। কাব্যের বিষয়বস্তু হচ্ছে জেবল-মূল্‌ক ও শামারোখের প্রেমকাহিনী। কবি বলছেন—

মোহাম্মদ আকবরে কহে রসের বাহার।
রসিকে চিনিতে পারে রসের ভাণ্ডার ॥

আকবরের কাব্যের ভূমিকাটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। সেযুগে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতাকে কাটিয়ে উঠে কবি হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসের মাঝে একটি মিলনের সেতু রচনা করতে চেষ্টা করেছেন। কবি ঈশ্বরবন্দনা প্রসঙ্গে বলছেন—

বিনঅ করিআ বন্দি ফিরিস্তার পদ।
ছুন্নিকুলে ফিরিস্তা যে হিন্দুতে নারদ॥
তক্ত সিংহাসন বন্দি আল্লার দরবারে।
হিন্দুকুলে ঈশ্বর হেন জগতে প্রচারে॥

....

হজরত রছুল বন্দি প্রভু নিজ সখা।
হিন্দুকুলে অবতারি চৈতন্যরূপে দেখা॥

....

আছব্বা সকল বন্দি নবীর সভাএ।
হিন্দুকুলে দোয়াদস গোপাল ধেয়াএ॥
আওলিয়া আম্বিয়া বন্দি রব্বানি কোরাণ।
হিন্দুকুলে মুনিভাব আছএ পুরাণ॥ ইত্যাদি।

এছাড়া মোহাম্মদ রাজা, মোহাম্মদ রফীউদ্দিন (ইনিও জেবল-মুলুক-শামারোখ রচনা করেন), সেরবাজ (ফারসী 'ফক্কর-নামার' অনুবাদ ও 'কাসেমের লড়াই') শেখসা'দী, আবদুল আলীম ('হানীফার লড়াই') আবদুল হাকীম প্রভৃতি কবিদের রচনার উল্লেখ পাওয়া যায়। আবদুল হাকীম 'নূর-নামা', 'লালমতী-সয়ফুল্-মুল্‌ক্', 'ইউসুফ-জেলেখা' প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন।

চট্টগ্রামের কবি সাবিরিদ খান বিদ্যাসুন্দরকাব্য রচনা করেন। তাঁর সম্পূর্ণ রচনা পাওয়া যায়নি। সাবিরিদ খানের কাব্যের ভাষা বিচারে মনে হয় তিনি প্রায় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকের কবি হবেন। সংস্কৃত সাহিত্যে কবির ব্যুৎপত্তি কম ছিল না। প্রাচীনতম বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচয়িতাদের মধ্যে সাবিরিদ খান ছিলেন অন্যতম। এঁরা ছাড়া আরও অনেক মুসলমান কবি ধর্মবিষয়ক কাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী প্রভৃতি রচনা করেন।

মুসলমান কবিদের প্রণয়মূলক কাব্য রচনায় ফারসী-আরবী রচনার দান অনেকখানি। তবে বাঙ্‌লাদেশে ফারসী-আরবী ভাব নিজের স্বাতন্ত্র্য ততটা বজায় রাখতে পারেনি। কবিরা বাঙালী—কাব্যেও তাঁদের বাঙালীয়ানা প্রকাশ পেয়েছে। মানবীয় প্রণয়-কাহিনী নিয়ে নিশ্চয় আরও কাহিনীকাব্য রচিত হয়েছিল। আমাদের মনে হয় তখন সমাজের ধর্মের গোঁড়ামিতে

এ সকল কাব্য খুব প্রাধান্য লাভ করতে পারেনি। কিন্তু এটা সত্য যে, এই কাব্যধারা সাধারণ শ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানদের যথেষ্ট আনন্দ দান করেছিল। পরের যুগে মাণিকতারা, মলুয়া, মহুয়া, ভেলুয়াসুন্দরী প্রভৃতি গল্প জন-সমাজের কাছে যেমন মানবরস পরিবেশন করেছে, তেমনই পরবর্তীকালে নতুন ক্লাসিকাল রোমান্টিক ধারার সাহিত্য-রচনার পথও সুগম করে দিয়েছে। এখনও হয়ত অনেক কাব্য আত্মপরিচয় জ্ঞাপনের অপেক্ষায় স্মৃতি-বিস্মৃতির অন্তরালে পড়ে আছে! ধর্মপ্রভাবমুক্ত বাঙ্‌লাসাহিত্যধারায় মুসলমান-কবিদের দান অপরিমেয় ও অনস্বীকার্য।

দুই শতাব্দীর বৈশিষ্ট্য

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যেই মোগল-পাঠানের দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ দেখা দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পাঠানরা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে। মোগলদের সময় থেকে বাঙ্‌লার আর্থিক অবস্থা ক্রমশ অবনতির দিকে যেতে থাকে। এই সময় থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যসূত্রে ওলন্দাজ, পর্তুগীজ, আরমানী, ইংরাজ প্রভৃতি বিদেশী বণিকদের আবির্ভাব ঘটে। ভারতের শিল্প-বাণিজ্যও ধীরে ধীরে বিদেশী বণিক্‌দের করতলগত হতে থাকে। বাঙ্‌লাদেশে যে দুঃখ-দারিদ্র্য মোগল আমল থেকে স্পষ্টভাবে দেখা দেয় তার আরও ভীষণ ও ভয়াবহ রূপ প্রকাশ পেতে থাকে পরবর্তী যুগগুলিতে। এদিকে সাহিত্যে বৈষ্ণবকাব্য ধারা, মঙ্গলকাব্য ধারা, অনুবাদসাহিত্য ধারা, ধর্মনিরপেক্ষ প্রণয়মূলক কাব্যধারা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এই দুই শতাব্দীতে সাহিত্যের অনেক ধারা-উপধারা দেখা দিয়েছে। এই ধারা-উপধারার গতিবেগ পরবর্তীকালের সাহিত্য রচনার পথ খুলে দিয়েছিল। শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তিবাদ, সুফিমতবাদ প্রভৃতির যোগাযোগে বাঙ্‌লার হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে একটি আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠছিল। হিন্দুরা মুসলমান পীর ও সাধকদের গুরুর মতোই শ্রদ্ধা করত। সমাজে যখন শান্তি স্থাপনের ও সমন্বয় সাধনের চেষ্টা চলছে তখনই ঘটল মোগল-শক্তির আবির্ভাব। সঙ্গে সঙ্গে মোগল-পাঠান দ্বন্দ্বে রাষ্ট্রে দেখা দিল বিশৃঙ্খলা। সমাজও তখন এই অশান্তি থেকে রেহাই পায় নি। তার প্রমাণ আমরা মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতিতে পেয়েছি।

এরই ফাঁকে ফাঁকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত সাহিত্য রচনা চলতে থাকে। বাইরের

সংস্কৃতির প্রভাব বাঙ্‌লার সংস্কৃতিকে তখন সমৃদ্ধই করেছে, নিশ্চিহ্ন করতে পারে নি। হিন্দু-মুসলমানের একটি নতুন সংস্কৃতিও তখন রূপ লাভ করছে। কিন্তু যে পরিবর্তনের সূচনা তখন দেখা দিয়েছিল, বাঙালীর মনোভূমিতে তার কোনো রেখাপাত হয়নি বলেই মনে হয়। এটা ঠিক যে, জীবনে প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যায় না। তবুও তার স্বীকৃতি তখনকার বাঙালী জীবনে খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি।

মোগলদের আগমনের পর থেকে বাঙালীর জীবনে শুধু অর্থনৈতিক বিপর্যয়ই নয়, আরও দুঃখ-দুর্যোগের সম্ভাবনাও দেখা দেয়। তার সামাজিক জীবনে এলো উচ্ছৃঙ্খল বিলাস-ব্যসনের প্রভাব। মোগলদের কাছ থেকে এই উচ্ছৃঙ্খলতা বাঙালীর চিত্তভূমিতে ক্রমে ক্রমে সংক্রামিত হয়। সামাজিক অধঃপতনও ধীরে ধীরে দেখা দিতে থাকে। পুরানো যুগের সংস্কৃতির ধারাও ক্রমশ ক্ষ'য়ে আসতে থাকে। যদিও এ সময় হিন্দু-মুসলমানের সংস্কৃতির বিভেদ অনেকখানি কমে এসেছে, তবুও পলাশী-প্রান্তরে নিজের উপর আস্থা-হীন, বিলাসী, উচ্ছৃঙ্খল বাঙালী আপন মান-মর্যাদা, স্বাধীনতা সব কিছুই হারালো। তখন তার এমন কোনো শক্তি-সম্পদ নেই যে বিদেশী বণিকশক্তির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। নিজেদের মধ্যে স্বার্থের সংকীর্ণতাও এই দুর্যোগকে ঘনিয়ে আসতে সাহায্য করেছিল। পরের যুগে তার আলোচনা আসছে।

তৃতীয় পর্ব

নবাবী-আমল

(অন্ত্য-মধ্যযুগ)

১
নবাবী-আমল

(১৭০০—১৮০০ খ্রীঃ)

বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যকে আমরা 'নবাবী-আমলের সাহিত্য' আখ্যা দিতে পারি। প্রকৃতপক্ষে নবাবী-আমল বলতে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পরে আর কিছু নেই। পলাশী-প্রান্তরেই বাঙ্‌লার নবাবী-আমলের শেষ সমাধি ঘটেছিল। ইতিহাসের দিক থেকে বিচার করতে গেলে অষ্টাদশ শতাব্দীর মাত্র পঞ্চাশটি বছরকে (১৭০৭—১৭৫৭ খ্রীঃ) নবাবী-আমল বলা যেতে পারে। তারপরে মীর জাফর আলী খান, মীর কাসেম আলী খান প্রভৃতি নবাব হলেও বাঙ্‌লাদেশে সত্যিকারের নবাব ছিল ইংরেজেরা। বিলেতে কোম্পানীর সাহেবদের নাম ছিল 'নাবুব'।

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔরংজীবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্‌লার শাসনকর্তারা সবাই প্রায় স্বাধীন নবাব হয়ে পড়েন। ঔরংজীবের মৃত্যুর পর থেকেই মোগল সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরে। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে মুর্‌শিদ্ কুলী খান বাঙ্‌লা দেশের দেওয়ান হয়ে আসেন। তার আগে ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট ঔরংজীবের পৌত্র মুহম্মদ আজিম-উদ্-দীন বাঙ্‌লা দেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়ে যথেচ্ছভাবে রাজকার্য চালাতে থাকেন। কিন্তু মুর্‌শিদ্ কুলী খান্ আসার পর তাঁর সে সুবিধা আর রইলনা। এবং সেই থেকে আজিম ও মুর্‌শিদ্ কুলী খান্‌এর মধ্যে একটা দ্বন্দ্বও দেখা দেয়। আজিম মুর্‌শিদ্ কুলী খান্‌কে হত্যা করবারও চেষ্টা করেন।

মুরশিদ্ কুলী জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। শৈশবাবস্থায় হাজী শফি' ইস্‌পাহানী নামে একজন মুসলমানের নিকট বিক্রীত হন। হাজী সাহেব তাঁকে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করেন। মুরশিদ কুলী সম্রাট ঔরংজীবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। ঔরংজীবের মৃত্যুর পর মুর্‌শিদ্ কুলী দু'বছর (১৭০৮—১৭০৯ খ্রীঃ) বাঙ্‌লা দেশে ছিলেন না। ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্‌লাদেশে আবার যখন অরাজকতা দেখা দিল আবার তাঁকে বাঙ্‌লার দেওয়ান করে পাঠানো হয়। সেই থেকে ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুকাল অবধি তিনি বাঙ্‌লাদেশে

ছিলেন। মুর্‌শিদ্ কুলী রাজস্ব আদায় ব্যাপারে খুবই কঠোর ছিলেন। এই রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে তিনি হিন্দু কর্মচারীদেরই নিযুক্ত করতেন।

মুর্‌শিদ্ কুলীর মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা শুজা-উদ্-দীন বা শুজা-উদ্-দৌলা আসদ্-জঙ্ (১৭২৭-১৭৩৯ খ্রীঃ) বাঙ্‌লার স্থবাদার নিযুক্ত হন। প্রথমদিকে তিনি ভালোভাবেই রাজকার্য চালাচ্ছিলেন। কিন্তু জীবনের শেষের দিকে চারিত্রিক উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁর সমস্ত গুণগুলি নষ্ট করে দেয়। শুজা-উদ্-দীনের সময় য়্যুরোপীয় বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্য আরও পাকাপোক্ত হয়ে ওঠে। ইংরেজদের কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় ক'রে নবাব তাদের ব্যবসা করার ফরমান দেন। শুজা-উদ্-দীনের মৃত্যুর পর তাঁর চরিত্রহীন পুত্র সরফরাজ (১৭৩৯—৪০ খ্রীঃ) বাঙ্‌লার মসনদে বসে। তাকে হত্যা করে আলীবর্দী খান্ (১৭৪০—১৭৫৬ খ্রীঃ) বাঙ্‌লা বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হলেন। আলীবর্দীর আসল নাম হচ্ছে মীর্জা বন্দে বা মীর্জা মুহম্মদ আলী। আলীবর্দী বিচক্ষণ নবাব হলেও নানা রাষ্ট্রনৈতিক উপদ্রব তাঁকে শেষ পর্যন্ত শান্তিতে রাজ্যশাসন করতে দেয়নি। বারবার মারাঠা-আক্রমণ (বর্গীর হাঙ্গামা) তাঁকে বিব্রত ক'রে তোলে এবং তিনি শেষ পর্যন্ত তাদের হাতে উড়িষ্যা ছেড়ে দিয়ে কোনো রকমে তাদের শান্ত করেন। আলীবর্দী মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদেরও উচ্চপদে নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর সময়ে রাজা কিরাতচাঁদ, উম্মিদ্‌রায়, রাজা জানকীরাম, দুর্লভরাম প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন।

আলীবর্দীর মৃত্যুর পর বাঙ্‌লার রাজনৈতিক পরিবেশের মাঝে দুর্যোগ ঘনিয়ে আসতে থাকে। তারপর যুবক সিরাজ-উদ্-দৌলা বাঙ্‌লার নবাব হলেন। সিরাজ-উদ্-দৌলাই বাঙ্‌লার শেষ স্বাধীন নবাব। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিক থেকেই আমরা আগামী দিনের দুর্যোগের আভাস পেয়েছি। সম্রাট ঔরংজীবের মৃত্যুর পর এই দুর্যোগ মোগল সাম্রাজ্যে ভাঙন ধরায়। মুর্‌শিদ্ কুলী খান কিছুদিন বাংলা দেশ থেকে রাজস্ব আদায় করে মোগল সাম্রাজ্যকে জীইয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাও গেল।

এদিকে বিদেশী বণিকরা ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রমশ অগ্রসর হ'তে হ'তে অবশেষে রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেও হস্তক্ষেপ করবার চেষ্টা করছিল। আলীবর্দী এ ব্যাপারে খুব সচেতন ছিলেন। তাঁর রাজ্যে যাতে এই বিদেশীরা মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে তার জন্য তিনি ইংরেজ ও ফরাসীদের কলকাতা

এবং চন্দননগরে দুর্গ নির্মাণ করতে অনুমতি দেননি। মুর্শিদ্ কুলীও তাঁর সময়ে ইংরেজদের দুর্গ নির্মাণ করতে দেননি। আলীবর্দী জানতেন এরা একবার জেঁকে বসলে বিপদ ঘটতে পারে। তাই তিনি ইংরেজ ও ফরাসীদের বলেছিলেন, "তোমরা ব্যবসায়ী, তোমাদের আবার দুর্গের কি দরকার? আমি যতক্ষণ আছি তোমাদের কোনো ভয় নেই।'

বাঙ্লার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা যখন সিংহাসনে বসলেন তখন চারদিকে অশান্তির আগুন জ্বলে উঠেছে। ঘরে বাইরে শত্রুরা চক্রান্ত করছে। সিরাজের মাসতুত ভাই সওকৎ-জঙ্, মাসীমা ঘসেটি বেগম ত আছেনই, তাছাড়া মীর জাফর আলী খান, রাজবল্লভ, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, রায় দুর্লভরাও আছেন। আর এঁদের সঙ্গে সুযোগ-সন্ধানী ইংরেজরাও ছিল। ইংরেজরা গৃহবিবাদের সুযোগ নিয়ে কলকাতায় বাড়াবাড়ি করতে লাগল। শেষপর্যন্ত সিরাজ-উদ্-দৌলা কলকাতা আক্রমণ করে তা দখল করে নেন। যে কয়জন ইংরেজ সিরাজের সৈন্যের হাতে বন্দী হয় তাদের বন্দীদশা নিয়ে কুখ্যাত হলওয়েল তথাকথিত অন্ধকূপ হত্যার একটি বীভৎস ও মিথ্যা বর্ণনা দিয়েছেন। হলওয়েলের এই মিথ্যা উক্তির বিরুদ্ধে তাঁর স্বদেশবাসীরাও প্রতিবাদ করেছেন।

শেষপর্যন্ত চক্রান্তকারীর দল মাত্র পনেরো মাসের নবাব সিরাজের পতন ঘটাল। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্লার ইতিহাসে নবাবী-আমলেরও যবনিকা পতন ঘটল। ক্লাইভের হাতে সিরাজের পতনের পর 'ক্লাইবের গর্দভ' (Lord Clive's Jack-Ass) মীর জাফর আলী খান (১৭৫৭—১৭৬০ খ্রীঃ) বাঙ্লার সিংহাসনে বসল। কিন্তু মীর জাফর নামেমাত্র নবাব হল—রাজ্যের মূল কলকাঠি রইল ইংরেজদের হাতে। মীর কাশেম ইংরেজ বণিকদের কাছে মেদিনীপুর, বর্ধমান, চট্টগ্রাম প্রভৃতির রাজস্বের অধিকার লিখে দিয়ে বাঙ্লার সিংহাসনে বসার সৌভাগ্য লাভ করে (১৭৬০—১৭৬৪ খ্রীঃ)। কিন্তু পরে মীর কাশেমের সঙ্গে ইংরেজদের বিবাদ খণ্ডযুদ্ধে পরিণত হলে তাঁকেও শেষপর্যন্ত বিদায় নিতে হল।

ওদিকে দিল্লীর বাদশাহ শাহ্ আলম্ ইংরেজ-কোম্পানীকে দেওয়ানীর দায়িত্ব দেন। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কোম্পানীর রাজত্ব শুরু হয়। ইংরেজ-কোম্পানীকে দেওয়ানীর দায়িত্ব দেবার পর থেকে শুরু হল তাদের অত্যাচার।

[illegible]

[illegible] "The land revenue was forced up so high only by the heartless squeezing of the peasantry and inhuman tortures of the [illegible] collectors." [illegible]

হীন ছিলনা। যাঁরা তাঁকে খুব ভালোবাসতেন তাঁরাও একথা বলেছেন। ফরাসী কুঠিয়াল মসিয়ে ল'ও তাঁর চরিত্রের দুর্বলতার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত করেছেন। অথচ তিনি সিরাজের গুণগ্রাহী বন্ধু ছিলেন। দেশের মানুষ তাঁর নাম শুনলে আতঙ্কে মুষড়ে পড়ত। তবুও যেদিন বন্দী সিরাজকে মুর্শিদাবাদের পথ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সেদিন ঐতিহাসিক স্কটের ভাষায় 'When the people beheld him in this position (বন্দী অবস্থায়) they forgot his vices and recollected only the hardship of his present fortune comparing it with splendour they had seen him surrounded with from his infancy till now……'এবং বিশ্বাসঘাতক মীর জাফর সিরাজকে বধ করার আজ্ঞা দিলে 'no person of rank would undertake the murder'. তারপর সিরাজের মৃতদেহ যখন হাতীর পিঠে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন ঐতিহাসিক অর্মের (Orme) ভাষায় 'The populace beheld the procession with awe and consternation and the soldiery, having no long the option of two lords, accepted the promises of Jaffier and refrained from tumult.' এখানেই সিরাজ-অধ্যায়ের শেষ এবং বাঙালী-জীবনের বিষাদময় ইতিহাসের শুরু।

স্টুয়ার্ট, হলওয়েল প্রভৃতির লেখায় সিরাজের যে কলঙ্কময় চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে বাঙালী কোনোদিন তা স্বীকার করেনি। উনবিংশ শতাব্দী থেকে যে পরাধীনতার গ্লানি বাঙালীকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে সেই বাঙালীর চোখে তিনি দেশপ্রেমিক এবং স্বাধীনতার মহান রক্ষক সিরাজ। তাই সিরাজের পরাজয় বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের পরাজয়। সিরাজ বাঙ্‌লার স্বাধীন নবাব, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের প্রধান শত্রু এবং দেশদ্রোহীদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান—যথার্থ দেশপ্রেমিক। উনবিংশ শতাব্দীতে এই দৃষ্টিভঙ্গী সিরাজকে দেশপ্রেমের ideaতে প্রতিষ্ঠিত করেছে। হিন্দু-মুসলমানের এই যে নব-জাতীয়তাবোধ, এই যে নব জাগরণ তার প্রধান পুরোহিত সিরাজ-উদ্-দৌলা। জাতির এই দৃষ্টিভঙ্গীতে সিরাজ স্বাধীনতা সংগ্রামের, তথা জাতীয় সংগ্রামের প্রথম শহীদ্।

নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলাকে কি যে ভীষণ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে

হয়েছিল তা একমাত্র কল্পনা করতে পারি মুষ্টিমেয় ইংরেজ সৈনিকদের সঙ্গে অগণিত নবাব সেনার পরাজয়ে। দেশের মানুষের এই যে ঔদাসীন্য, এর মূলে শুধু সিরাজের প্রতি বিরাগ-বিদ্বেষ নয়, আলীবর্দীর সময় থেকেই রাজকর্মচারী ও জমিদারদের অসন্তোষ, জোর করে দরিদ্র প্রজাদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় প্রভৃতি কারণও ছিল। বিশেষ ক'রে তখনকার সাধারণ মানুষ রাজায় রাজায় যুদ্ধের ব্যাপারে মাথা ঘামাতে চাইত না। কারণ তাতে তাদের লাভ কি! বরং 'এক রাজা যাবে, অন্য রাজা হবে— বাঙলার সিংহাসন শূন্য নাহি রবে।' স্বাধীনতা-লোপ—সে আবার কি! তারা দেখতে পেল সিরাজ গেছেন, শ্বেতদ্বীপবাসী ইংরেজরা রাজা হয়েছে। পল্লীকেন্দ্রিক মন ত সচেতন ছিলই না, এমন কি, নাগরিক ভারতচন্দ্রও এ সম্বন্ধে নীরব ছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ক্ষয়িষ্ণু সমাজে রুচিবিগর্হিত বিলাস-ব্যসন বাঙালীর একমাত্র অবলম্বন হল। এই দুর্বলতার সুযোগ নিল ইংরেজরা। তারা তখন আইন প্রণয়ন করছে আর রাজস্বের নামে দরিদ্র জনসাধারণকে শোষণ করছে। একদিকে দেশের শিল্প-বাণিজ্য ভেঙে পড়ছে, অন্যদিকে বিদেশী ইংরেজরা সবরকমের ব্যবসা নিজেদের হস্তগত করে দুহাতে টাকা লুঠছে। সমাজের মধ্যে যে অসন্তোষ বহ্নি জ্বলে উঠছিল, হঠাৎ রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনের জন্য আর তার কোনো বৈপ্লবিক প্রকাশ ঘটতে পারলনা।

ক্ষয়িষ্ণু সমাজে ইংরেজ বণিকরা নিজেদের পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে কোনো বেগ পেলনা। কিন্তু সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তখনও পরিবর্তনের কোনো আভাস নেই। পুরানো রীতিকে জোর ক'রে আঁকড়ে ধরেও তার অন্তর্নিহিত ভাবশক্তিকে এযুগের মানুষ খুঁজে পাচ্ছেনা। বাইরে জাঁক-জমক বেড়ে উঠ্ছে, কিন্তু প্রাণ-সত্যের ঘটেছে অভাব। সাহিত্যেও তাই দেখা দিয়েছে decadence-এর সকল লক্ষণগুলি।

অষ্টাদশ শতাব্দী বিশেষ নতুন কিছুই দেয়নি। সেই পদাবলী গান, মনসা মঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবের গীত, রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ, পদ-সংকলন প্রভৃতি একইভাবে চলেছে। জাতীয় জীবনে দেখা দিয়েছে শৈথিল্য এবং সেই শৈথিল্যজনিত বিকৃতি। রাজদরবারের ঐশ্বর্য-আড়ম্বরের নির্লজ্জ প্রকাশ দেখা দিয়েছে সমাজ জীবনে,—সমাজে এনেছে যৌন দুষ্টচেষ্টা।

অভিজাতশ্রেণীর অর্থপ্রাচুর্য ও কর্মবিমুখতা সমাজে এনে দিল উচ্ছৃঙ্খল জীবনের অগৌরব মুহূর্ত। এই ভাঙনের পথ বেয়ে এলো ইংরেজ। জাতীয় সংস্কৃতির একটি অধ্যায় এখানে শেষ হ'ল। শুধু বাঙ্‌লার নয়, ভারতের মধ্য-যুগের সাহিত্য ও সংস্কৃতির গতিও হল রুদ্ধ। অথচ আগামী দিনের সম্ভাবনাও তখন দেখা দিচ্ছেনা।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্‌লাদেশে ইংরেজের ঔপনিবেশিক স্বার্থের ভিৎপত্তন করতে যাঁরা সাহায্য করেছিলেন তাঁদের অন্যতম হচ্ছেন মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। কৃষ্ণচন্দ্র বিশ্বাসঘাতকতার জন্য প্রসিদ্ধ। তিনি মুখে তাঁর অন্যতম চক্রান্তকারী বন্ধু রাজবল্লভকে সমর্থন করেন—'রাজবল্লভের বিধবা-বিবাহ প্রচলন চেষ্টা বিফল করেন।' তাঁর রাজসভাকে কেন্দ্র করে তখন যে সাহিত্য গড়ে উঠছিল তাতেও রুচিবোধের অভাব ছিল। প্রণয় কাব্যের নামে কামোদ্দীপক কাব্য রচিত হচ্ছিল।

দরবারের কাজের সুবিধার জন্য এবং জীবনযাত্রা নির্বাহ করবার জন্য, তখন আরবী, ফারসী, হিন্দী প্রভৃতি শেখা হচ্ছিল। এই রেওয়াজ ঊনবিংশ শতাব্দীতেও ছিল। রাজার ভাষা শিখতে হবে, নইলে রুজি-রোজগারের সুবিধা হবে না। তখনকার দিনের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি উচ্চ-শ্রেণীর লোকেরা আরবী ফারসী শিখছিলেন। পলাশীর বিপর্যয়ের পর ইংরেজ বণিকদের কৃপায় কিছু অর্থবান লোক এবং চাকুরিয়া মধ্যবিত্তের উদ্ভব হয়। নতুন একদল জমিদার শ্রেণীরও আবির্ভাব ঘটে। এদের নিয়ে ইংরেজরা শুরু করল রাজস্বের ব্যবসা। এর আগেই তারা যে ব্যবসা ফেঁদে বসেছিল, তার ভেতর দিয়েই একটু একটু করে এগিয়ে এসে বাঙ্‌লার সমাজ ও সংস্কৃতির সর্ববিধ ব্যবস্থায় ঘটাল সুস্পষ্ট ব্যতিক্রম। বিত্তহীন দরিদ্ররা মরে শেষ হয়ে গেল, স্বল্পবিত্তরা হ'ল পথের ভিখারী, আর সুযোগসন্ধানীর দল রইল টিঁকে। যা ছিল তা আর রইল না, যা হবার তাও হ'ল না।

২

অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগচিত্র ও সাহিত্য

এযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যে প্রাচীন ধারার জের লক্ষিত হয়। বৈষ্ণব-
পদাবলী সংগ্রহ, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতিতে পুরানোর অনুবৃত্তি চলেছে। সত্য-
নারায়ণ, মানিকপীর, প্রভৃতির পাঁচালী কাব্যে হিন্দু মুসলমানের সমন্বয়ের
একটা চেষ্টাও দেখা দিয়েছে। অন্যদিকে পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ-
কোম্পানীর শাসনের সূত্রপাতে, মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতির আবির্ভাবে নতুন দিনের
আভাস পাওয়া যাচ্ছে। সপ্তদশ শতাব্দীর মতো এই শতাব্দীতেও গদ্যে বৈষ্ণব
কড়চা গ্রন্থ রচনা এবং খ্রীষ্টান মিশনারীদের দ্বারা ধর্মগ্রন্থ অনুবাদও হচ্ছিল।

পলাশীর যুদ্ধের পর হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে বাঙালী ঠিক কি করবে ভেবে পাচ্ছে
না। তাই পুরানো কাহিনী বারবার আবৃত্তি করছে। বিভিন্ন লেখকদের পদ
সংগ্রহ করছে। কাব্য রচনার মধ্যে সামাজিক জীবনের ব্যর্থতাও প্রকাশ পাচ্ছে।
পুরানোকে আঁকড়ে থাকতে গিয়ে কেউ কেউ কালাতিক্রম দোষও ঘটিয়েছেন।
ভারতচন্দ্র ও মানিকরাম গাঙ্গুলী প্রভৃতি লেখকের রচনায় তার দৃষ্টান্ত পাওয়া
যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নতুন কোনো সাহিত্য যে গড়ে উঠতে
পারেনি তার অনেক কারণের মধ্যে কয়েকটি হচ্ছে—অভিজাত সম্প্রদায়ের
নৈতিক অবনতি এবং সমাজের বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গী হেতু চিন্তাশক্তির অস্বচ্ছতা।
বাঙালী তখন আখ্‌ড়া-তরজা, খেউড়, কবিগান প্রভৃতি পেয়ে চলেছে। কিন্তু
ভাবীকালের পথের সন্ধান তখনও পায়নি। এসব গান পূর্বেও বাঙ্‌লা অন-
সমাজে প্রচলিত ছিল। শুধু স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেল অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে।
এযুগে একদিকে যেমন সাহিত্যকে অভিজাত রূপদানের চেষ্টা চলছিল,
তেমনই অন্যদিকে সাধারণ মানুষের লৌকিক ধর্মবিশ্বাস ও সাধনাকে জোর
করে ধরে রাখবার চেষ্টাও চলছিল। ইংরেজ আমল শুরু হবার পর এই
প্রচেষ্টার কোনো সার্থক রূপ প্রকাশ পেতে পারেনি। ভাঙার পালা শেষ
হয়েছে, কিন্তু গড়ে তোলার অনেক বাকী। দেশের মানুষ হয়েছে দিশেহারা।
খুদে রাজার দল হাত পা কেটে হয়েছেন জমিদার। মুসলমানেরা ছিলেন

রাজা। হিন্দুরা ভাবল এঁদের পরাজয়ে আখেরে ভালোই হ'ল। ইংরেজ বণিকগোষ্ঠীও বুঝেছিল হিন্দুরা এখন হাতে থাকবে। মুসলমানরাও শীঘ্র মাথা নোয়াতে চাইবে না। অভিমান ও মর্যাদাবোধ তাদের তখনও বেশী। হিন্দুর দল ইংরেজ সাহেবদের পিছু নিল। জমিদারের দল হ'ল ইংরেজের রাজস্ব আদায়ের এজেণ্ট। সাম্রাজ্যলোলুপ ইংরেজ-বণিকের দল এই বিভেদের উপর নিজেদের স্বার্থের ভিত্তি পাকা করে নিল। শুধু হিন্দুরা কেন, ক্ষমতালোভী মীরজাফরও বোঝেনি যে উভয়ের আকাশে দুঃখের মেঘ ঘনঘটা করে এসেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যে সাধারণ মানুষের জীবনের সুখদুঃখ-দারিদ্র্যের রূপ তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। মুকুন্দরাম প্রভৃতির রচনায় জীবনের অভিজ্ঞতার এবং যে সার্থকপ্রকাশ দেখতে পেয়েছি এযুগে তা ঠিক তেমন স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়নি। ভারতচন্দ্র নাগরিক কবি। তাঁর কাব্যে নাগর-চাতুর্যের অপূর্ব প্রকাশ ঘটেছে। যাঁরা পল্লীর কবি ছিলেন তাঁরাও পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর বিশেষ নতুন কিছু দিতে পারছেন না। ভারতচন্দ্রের প্রতাপাদিত্য-মানসিংহ উপাখ্যানে আকবরের সময়ের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। গঙ্গারাম দত্ত মহারাষ্ট্র পুরাণে প্রায় সমসাময়িক ঐতিহাসিক কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু অলৌকিকত্বের চাপে যথাযথভাবে সমাজের স্পষ্টরূপ সাহিত্যে প্রকাশ পাচ্ছে না। এসব রচনায় গতানুগতিক মঙ্গলকাব্যের সুরই ধ্বনিত হচ্ছে। অথচ পুরানোও সমাজ চিত্তের আকাঙ্ক্ষা মেটাতে পারছে না। এই অবস্থায় চৈতন্যোত্তর সাহিত্যের ভাবগঙ্গাধারা ক্ষীণ গতি প্রাপ্ত হচ্ছে। অন্যান্য কাব্য-সঙ্গীতের সুরও ক্রমবিলীয়মান। সাহিত্য ও তার যুগ এক নয়। সাহিত্য আর সামাজিক মনকে পথ দেখাতে পারছে না। এযুগে বাঙ্‌লা সাহিত্যের ধারাতে পুরানোর পুনরাবৃত্তি এবং পলাশী-বিপর্যয়ের পর ক্ষণবিরতির লক্ষণ লক্ষিত হয়। সাহিত্যের এই সময়কে বলা যেতে পারে চৈতন্যোত্তর বাঙ্‌লা সাহিত্যের ক্রমবিলীয়মান ধারার যুগ।

বৈষ্ণব পদাবলী

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পূর্বের যুগের মতোই বৈষ্ণবপদ রচিত হচ্ছিল। পদ-কর্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন নরহরি চক্রবর্তী, শশিশেখর, রাধামোহন

ঠাকুর, নটবরদাস, জগদানন্দ, বৈষ্ণবদাস বা গোকুলানন্দ সেন প্রভৃতি। অন্যান্য কবিদের রচনায় গতানুগতিকতার দুর্বলতা খুব স্পষ্ট।

নরহরি চক্রবর্তী অনেক পদ রচনা করেছিলেন। কবিত্বশক্তি যাই থাক, তাঁর গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ (গৌরচরিত্রচিন্তামণি) লোচনদাসের ধামালী পদের মতো নদীয়া নাগরী ভাবের। পদের সহজ ও সাবলীল ছন্দোগতি লক্ষণীয়। নরহরি 'গীতচন্দ্রোদয়' নামে একখানি বিরাট পদসংগ্রহ সংকলন করেন। বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে এবং রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃতসমুদ্রে নরহরি চক্রবর্তীর কোনো পদ পাওয়া যায় না।

এই যুগের পদকর্তাদের মধ্যে শশিশেখরকে শ্রেষ্ঠ বললে অত্যুক্তি হবে না। শশিশেখরের সঙ্গে 'চন্দ্রশেখর' নামটিও পাওয়া যায়। কেউ বলেন এঁরা দু'ভাই, আবার কারও মতে চন্দ্রশেখর নামটিও শশিশেখরের। শশিশেখরের বেশীর ভাগ পদই ব্রজবুলিতে রচিত। পদকল্পতরুতে কোনো পদ পাওয়া যায়নি বলে অনেকে মনে করেন যে, তিনি পদকল্পতরু সংকলয়িতা বৈষ্ণবদাসের পরবর্তী। ইনি বর্ধমান জেলার পড়ান বা পাড়ন গ্রামের (বা কাঁদরা) অধিবাসী ছিলেন। শশিশেখরের পদের অপূর্ব ঝঙ্কার এবং লালিত্য কবিকে উচ্চশ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এখানে তাঁর কয়েকটি পদের অংশ উদ্ধৃত করছি—

শীতল তছু অঙ্গ হেরি পরশ-রস লালসে
করল কুল-ধরম-গুণ নাশে।
সো যদি তেজল কি কাজ ইহ জীবনে
আন লো সখি গরল করি গ্রাসে॥
প্রাণাধিকা রে সখি, কাহে তোরা রোঅসি
মরিলে করবি ইহ কাজে।
নীরে নাহি ডারবি, অনলে নাহি দাহবি,
রাখবি তনু ইহ বরজ মাঝে॥ ইত্যাদি।

কিংবা,

অতি শীতল মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহনা।
হরি বৈমুখ হামারি অঙ্গ মদনানলে দহনা॥ ইত্যাদি।

কিংবা,

তুঙ্গ মণি মন্দিরে ঘন বিজরী সঞ্চরে
মেঘরুচি বসন পরিধানা।
যত যুবতী মণ্ডলী পন্থ ইহ পেখলি
কোই নাহি রাইক সমানা॥ ইত্যাদি।

পদ রচনায় শশিশেখর বিদ্যাপতির অনুকরণ করেছিলেন। কবিশেখর ও শশিশেখরের পদগুলি দু'জনের মধ্যে কার রচনা তা নিয়ে অনেক সময় ভুল হয়।

'পদামৃতসমুদ্র' সংকলয়িতা রাধামোহন ঠাকুর নিজেও পদকর্তা ছিলেন। তাঁর নিজের পদ 'পদামৃতসমুদ্রে' সংকলিত হয়েছে। চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত 'ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার তিলে তিলে আইসে যায়' পদটি অনেকের মতে এবং নটবরদাসের পদসংকলন গ্রন্থ 'রসকলিকা'র ভিত্তিতে স্বয়ং নটবর দাসেরই রচনা। শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের বংশধর জগদানন্দ গোবিন্দদাস কবিরাজের অনুসরণে ধ্বনি-ঝংকারপূর্ণ পদ রচনা করেছিলেন। 'সংকীর্তনামৃত' সংকলয়িতা দীনবন্ধুদাস এবং পদকল্পতরু-সংকলয়িতা বৈষ্ণবদাসও বহু পদ রচনা করেছিলেন।

পদসংগ্রহ গ্রন্থ

এ যুগে অনেকগুলি পদ-সংগ্রহ গ্রন্থ সংকলিত হয়েছিল। এই সংগ্রহ গ্রন্থের মধ্যে বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'ক্ষণদাগীত-চিন্তামণি', নরহরি চক্রবর্তীর 'গীতচন্দ্রোদয়', রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃতসমুদ্র', বৈষ্ণবদাস বা গোকুলানন্দ সেনের 'পদকল্পতরু', দীনবন্ধুদাসের 'সংকীর্তনানন্দ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও 'পদরত্নাকর', 'পদরসসার', 'পদকল্পলতিকা' প্রভৃতি বহু পদসংগ্রহ গ্রন্থ সংকলিত হয়েছিল।

'ক্ষণদাগীত-চিন্তামণিতে' বিশ্বনাথের হরিবল্লভ বা বল্লভ ভণিতায় কিছু কিছু পদ আছে। কিন্তু চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত কোনো পদ সংকলিত হয় নাই। 'ক্ষণদাগীত-চিন্তামণি' গ্রন্থখানি অসম্পূর্ণ সংকলন। নরহরি চক্রবর্তীর 'গীত চন্দ্রোদয়ে' চণ্ডীদাস ভণিতাযুক্ত পদ আছে। পদসংগ্রহগুলিতে বৈষ্ণবরসের স্তরভেদের ভিত্তিতে পদগুলি সাজানো হয়েছে। এবং সংকলয়িতারা যথাসম্ভব এসব রসের সরল ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন।

বৈষ্ণব জীবনী

এযুগে কয়েকখানি জীবনীকাব্য রচিত হয়েছিল। জীবনীকাব্য রচয়িতাদের মধ্যে প্রেমদাস (পুরুষোত্তম মিশ্র সিদ্ধান্তবাগীশ) ও নরহরি ওরফে ঘনশ্যাম চক্রবর্তীর নাম উল্লেখযোগ্য। প্রেমদাস কবিকর্ণপুরের 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়' নাটক অবলম্বনে 'শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় কৌমুদী' (১৭১২-১৩ খ্রীঃ) রচনা করেন। প্রেমদাসের 'বংশীশিক্ষা' (১৭১৬-১৭ খ্রীঃ) আর একখানি বিরাট জীবনীকাব্য। এই কাব্যে কবির পুর্বপুরুষ বংশীবদন চট্টোপাধ্যায়, শ্রীচৈতন্য ও তাঁর লীলাসহচর এবং অন্যান্য বৈষ্ণব মোহন্তদের কথাও বলা হয়েছে।

নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর'কে বৈষ্ণবদের এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বলা যেতে পারে। এই কাব্যে মুখ্যত শ্রীনিবাস আচার্যের এবং সেই সঙ্গে নরোত্তম, শ্যামানন্দ ও বহু বৈষ্ণব মোহন্তদের বিষয়ও বর্ণিত হয়েছে। নরহরি 'নরোত্তম বিলাস' নামে নরোত্তম ঠাকুরের জীবনীকাব্যও রচনা করেন। পদাবলী আলোচনায় পদকর্তা নরহরির উল্লেখ করেছি। নরহরি মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী সৈয়দাবাদ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

এ যুগে জয়দেবের গীতগোবিন্দের যেমন অনুবাদ হয়েছে, তেমনই জয়দেবকে নিয়ে জীবনীকাব্যও রচিত হয়েছে। বনমালী দাস 'জয়দেব চরিত্র' নামে একখানি জয়দেব-জীবনী রচনা করেন। শ্রীহট্টে শ্রীচৈতন্য ও তাঁর আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে কিছু কিছু কাহিনীকাব্য রচিত হয়েছিল। উদ্ধবদাস ব্রজমঙ্গলে কবি লোচনদাসের জীবনীমাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাপ্রসঙ্গে নরহরি সরকার, নিত্যানন্দ প্রভুর কথাও বলা হয়েছে। বৈষ্ণবপ্রধান শ্যামানন্দকে নিয়ে কৃষ্ণচরণদাস 'শ্যামানন্দ প্রকাশ' নামে একখানি কাব্য রচনা করেন।

কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য

এযুগে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য যাঁরা রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগসন্ধিকালের ঘনশ্যামদাস একজন। ইনি 'শ্রীকৃষ্ণ বিলাস' নামক একখানি কাব্য রচনা করেন। ঘনশ্যাম শ্রীকৃষ্ণবিলাসে তাঁর গুরু জয়গোপালদাসের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। জয়গোপাল আসামের

শঙ্করদেবের মতোই জাতিভেদ মানতেন না। এইজন্য তিনি বৈষ্ণব মোহন্তদের দ্বারা 'একঘরে' হন। বলরামদাস ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অনুসরণে 'কৃষ্ণলীলামৃত' কাব্য রচনা করেন। দ্বিজ রমানাথ ভাগবতের অনুসরণে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য রচনা করলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো দানখণ্ড, লীলাখণ্ডও তাঁর কাব্যে পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরের রাজা গোপালসিংহদেবের সভাকবি কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তীর কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য পাওয়া গেছে। কবিচন্দ্র শিবায়ণ, রামায়ণ ও মহাভারতও রচনা করেন। এছাড়া আর যে-সব কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পুঁথি পাওয়া যায় তার মধ্যে চট্টগ্রামে প্রাপ্ত দ্বিজ লক্ষ্মীনাথের 'কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য', পরাণদাসের 'রসমাধুরী', কিশোরদাস এবং শচীনন্দনের 'উদ্ধব সংবাদ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। চট্টগ্রাম অঞ্চলে কৃষ্ণলীলার বহু ক্ষুদ্র পুঁথি পাওয়া গেছে।

বিভিন্ন অনুবাদ গ্রন্থ

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রামায়ণ, মহাভারত ছাড়া বৈষ্ণবগ্রন্থ এবং পুরাণাদির অনুবাদ হচ্ছিল। জয়দেবের গীতগোবিন্দেরও এসময়ে অনুবাদ হয়েছিল। কৃষ্ণদাস তাঁর গুরু বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর চমৎকারচন্দ্রিকা, রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা প্রভৃতি রচনা বাঙ্‌লায় অনুবাদ করেছিলেন। শচিনন্দন বিদ্যানিধি মহাশয় রূপ-গোস্বামীর 'উজ্জ্বলচন্দ্রিকা' নামে 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থের বাঙ্‌লা অনুবাদ করেন।

ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের অনুবাদও হচ্ছিল। ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল পদ্মাপুরাণের কাশীখণ্ডের (১৭৯২ খ্রীঃ) অনুবাদ করান। পুরীর জগন্নাথদেবকে নিয়ে 'জগন্নাথমঙ্গল' নামে কয়েকখানি কাব্য রচিত হয়েছিল। এছাড়া ধ্রুব, প্রহ্লাদ ইত্যাদি চরিত্র নিয়ে ভরত পণ্ডিত, দ্বিজ কংসারি প্রভৃতি ক্ষুদ্র পালাগান রচনা করেছিলেন। বৈষ্ণবরা তাঁদের গুরুদের নিবন্ধ ও অন্যান্য সংস্কৃত রচনা বাঙ্‌লায় অনুবাদ করেছিলেন। পূর্বেই কৃষ্ণদাসের অনুবাদের উল্লেখ করেছি। অন্যান্য কবিদের মধ্যে স্বরূপ গোস্বামী, (রূপ গোস্বামীর 'ললিতমাধব নাটকে'র অনুবাদ 'প্রেমকদম্ব'), রামানন্দ রায়ের জগন্নাথ-বল্লভ নাটকের অনুবাদক গোপালদাস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সপ্তদশ শতকের মতো এযুগেও বৈষ্ণবতান্ত্রিক-নিবন্ধ রচিত হচ্ছিল।

মনসামঙ্গল কাব্য

এযুগে উত্তর-বঙ্গে এবং পূর্ববঙ্গে মনসামঙ্গল কাব্য রচিত হচ্ছিল। উত্তর-বঙ্গের কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন জগৎজীবন ঘোষাল এবং জীবনকৃষ্ণ মৈত্র। জগৎজীবনের কাব্যে দেবখণ্ডে শিবচণ্ডী প্রভৃতি দেবতাদের কাহিনী এবং বণিকখণ্ডে বেহুলা-লখীন্দর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। জীবনকৃষ্ণ মৈত্র ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। জগৎরামের কাব্যের তুলনায় জীবনকৃষ্ণের কাব্যটি আয়তনে বড়ো।

পূর্ববঙ্গে এসময়ে অনেক মনসামঙ্গল কাব্য রচিত হয়। পূর্ববঙ্গে এখনও মনসা-ভাসান গানের সমাদর আছে। চট্টগ্রামের বাঁশখালী থানার বাণীগ্রামের রামজীবন ভট্টাচার্য বিদ্যাভূষণ একখানি মনসামঙ্গল রচনা করেন। কাব্যের রচনাকাল ১৭০৩-৪ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ জীবনকৃষ্ণ মৈত্রের রচনার প্রায় ৪০ বছর আগে। রামজীবন সূর্যঠাকুরকে নিয়ে আদিত্যচরিত বা সূর্যমঙ্গল কাব্য (১৭০৯-১০ খ্রীঃ) রচনা করেছিলেন। শ্রীহট্টের ষষ্ঠীবর দত্ত ও দ্বিজ জানকীরাম মনসামঙ্গল কাব্যের উল্লেখযোগ্য কবি। প্রায় সব কবিই পূর্ববর্তী কবিদের অনুসরণে কাব্য রচনা করেন। কিন্তু গল্প জুড়ে দেবার সুযোগ পেলে তাঁরা ছাড়েন নি। ষষ্ঠীবর শিব-পার্বতীর বিবাহ-মিলন নিয়ে নতুন কথা বলবার চেষ্টা করেছেন। সেখানে ভোগাতীত ত্যাগী শিবকে পাওয়ার জন্য উমার তপস্যা নেই। আছে পুষ্পোদ্যানে উমাকে লম্পট শিবের সম্ভোগ কামনায় বিব্রত করা। ময়মনসিংহের সুসঙের মহারাজা রাজসিংহও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে একটি মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। ইনি রাগমালা ও ভারতীমঙ্গল নামে আরও দুখানি কাব্য রচনা করেছিলেন। ভারতীমঙ্গলে বিক্রমাদিত্যের কাহিনীও বলা হয়েছে। এছাড়া দ্বিজ জগন্নাথ, বৈদ্যকবি কর্ণপুর, গঙ্গাদাস সেন প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের কবিদের রচিত মনসামঙ্গল কাব্যের সংবাদ পাওয়া যায়।

পশ্চিম বঙ্গের মনসামঙ্গল রচয়িতাদের মধ্যে দ্বিজ বাণেশ্বরের নামই একমাত্র করা যায়। দ্বিজ বাণেশ্বরের কাব্যের রচনাকাল অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় দশক বলে মনে হয়। দ্বিজ রসিকও একখানি মনসামঙ্গল রচনা করেন।

চণ্ডী ও অন্যান্য দেবীবিষয়ক কাব্য

অষ্টাদশ শতাব্দীতে চণ্ডী ও অন্যান্য দেবীবিষয়ক বহু কাব্য রচিত হয়েছে। মার্কণ্ডেয়পুরাণ অবলম্বনে যেসব চণ্ডীবিষয়ক কাব্যের নিদর্শন পাওয়া যায় তার মধ্যে দ্বিজ শিবদাসের গৌরীমঙ্গল, হরিশ্চন্দ্র বসুর চণ্ডীবিজয় বা দেবীমঙ্গল, রামশঙ্করদেবের অভয়ামঙ্গল, হরিনারায়ণদাসের চণ্ডিকামঙ্গল, জগৎরাম ও রামপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত দুর্গাভক্তিচিন্তামণি প্রভৃতি কাব্য উল্লেখযোগ্য।

রামানন্দ যতির চণ্ডীমঙ্গলে একটু বিশেষত্ব আছে। নিজের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে কবির বেশ অভিমান ছিল। নিজের মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তিনি মুকুন্দরামের সমালোচনা করেছেন। বাঙ্‌লা সাহিত্যে বোধহয় রামানন্দের মুকুন্দরাম-সমালোচনাই প্রথম সাহিত্য সমালোচনা। মুকুন্দ-রামের কাব্যে ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরের যে পুষ্পচয়ন অংশ আছে তা পুরাণবহির্ভূত বলে রামানন্দ বলছেন—

শাস্ত্রের কথন হয় তবে পণ্ডিতেরা নয়
মিথ্যা বর্ণনাতে এত দোষ।
কিছু বোধ নাই যার দোষগুণ কিবা তার
দোষ গুণ্যা করে আর রোষ॥
... ...
এত দোষ উদ্ধারিতে লোকের চৈতন্য দিতে
চণ্ডী রচে রামানন্দ যতি।

কবি অনেকের অনুরোধ এড়াতে না পেরেই চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন বলে বলেছেন। বিশেষ করে পূর্ববর্তী কবিদের ভুলত্রুটি ধরে দেওয়াও তাঁর অন্যতম দায়িত্ব ছিল। তাই মুকুন্দরামের ভুল ধরতে গিয়ে কবি বিনয়সহকারে বলছেন—

কহে রামানন্দ মুকুন্দের ছন্দ
ধর‍্যা না দেখালে নয়।
প্রত্যেকে দূষিতে কিবা ভাব চিতে
তাহাতেও করি ভয়।

এত বিনয়সহকারে বললেও রামানন্দের পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার যথেষ্ট ছিল। রামানন্দের চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল ১৭৬৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দ। ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর কবি তাঁর কাব্য রচনা করেন। রামায়ণ মহাভারতের আলোচনায় 'রামানন্দ' নামধারী আর এক কবির প্রসঙ্গ আবার উত্থাপিত হবে।

লালা জয়নারায়ণ রায়ও একখানি চণ্ডিকামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। জয়নারায়ণের কাব্যে কালকেতু ও ধনপতি উপখ্যান ত আছেই, এই সঙ্গে আরও আছে ক্রিয়াযোগসারের অনুসরণে মাধব-সুলোচনা উপাখ্যান।

চট্টগ্রাম জেলার চক্রশালা গ্রামের ভবানীশংকর দাস ১৭৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দে 'মঙ্গলচণ্ডী-পাঞ্চালিকা' নামে একখানি চণ্ডীর পাঁচালী রচনা করেন। ইনি কাব্যে অদ্ভুত রকমের সংস্কৃত ও বাঙ্‌লার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। এঁর কাব্যে 'ঘোষা' নামে কতগুলি পদাংশ আছে। চট্টগ্রামের মঙ্গলকাব্যের 'ঘোষা' অনেকটা পাঁচালী গানের ধুয়ার মতোই। চট্টগ্রামের আর একজন চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতা হচ্ছেন মুক্তারাম সেন। মুক্তারাম সেনের কাব্যের নাম 'সারদামঙ্গল'। কাব্যটির রচনাকাল হচ্ছে ১৭৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দ। এ ছাড়া কিছু ছোটো ছোটো চণ্ডীবিষয়ক ব্রতকথাও পাওয়া যায়। এই পর্যায়ের লেখকদের মধ্যে দ্বিজ জনার্দনের চণ্ডীমঙ্গল পাঁচালী, মদন দত্তের মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী, দেবীদাস শর্মার 'নিকট-মঙ্গলচণ্ডিকা' প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। মার্কণ্ডেয়-চণ্ডী অবলম্বনে রামশঙ্কর দেবের অভয়ামঙ্গল, জগন্নাথের দুর্গাপুরাণ প্রভৃতিও রচিত হয়েছে।

চণ্ডী ছাড়া অন্যান্য দেবীদের নিয়েও কতগুলি কাব্য রচিত হয়েছিল। দ্বিজ রামনিধি 'দেবীভাগবত' অবলম্বনে 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী' রচনা করেন। দ্বিজ গঙ্গানারায়ণ 'ভবানীমঙ্গলে' উমার জন্ম থেকে দুর্গাপূজা কাহিনী এবং সেই সঙ্গে কৃষ্ণলীলাও বর্ণনা করেছেন। গঙ্গাবিষয়ক কাব্যগুলির মধ্যে দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাব্যের কোন্ কোন্ অংশ গাওয়া হবে এবং কোন্ কোন্ অংশ আবৃত্তি করা হবে তাও কবি বলে দিয়েছেন। কবি পূর্ববঙ্গের লোকদের সম্বন্ধে কৌতুক করে বলছেন—

কহিব কৌতুক কিছু বঙ্গদেশী লোক নীচু
দেশভাষা কন কতগুলি।

যখন বলেন শুন শুনিতে শুনায় হুন
বালকের নাম পোলাপুলি ॥
... ...
কার আছে এই ভার ডেরবুড়ির তালুকদার
ইহাতে কে টেকে তার ধূমে।
মাদুলিতে ভরা হাথ নাম রামজগন্নাথ
বাদসার নানা যেন জুমে ॥
... ...
সঙ্গে কুলবধূ যত কত রূপ কব কত
পোশাক দেখিলে হরে বুদ্ধি।
ডুবেড়া কাপড় পরা কনুইতক শঙ্খ ভরা
কথা শুনে উড়ে ভূত শুদ্ধি ॥ ইত্যাদি।

বাগ্‌-দেবী সরস্বতীকে নিয়ে যে কয়েকখানি কাব্য রচিত হয়েছিল তার মধ্যে কোনো কোনো কাব্যে নতুন গল্প ফাঁদা হয়েছে আবার কোনো কোনো কাব্যে বিক্রমাদিত্য-কালিদাসের গল্পও বলা হয়েছে। মেদিনীপুর জেলার কাশীজোড়া গ্রামের দয়ারাম 'সারদামঙ্গল' নামে সরস্বতী মাহাত্ম্যবিষয়ক একখানি কাব্য রচনা করেন। সুবাহুর পুত্র মূর্খ লক্ষধর কেমন করে সরস্বতীর বরে পণ্ডিত হল সে কাহিনীই তাঁর কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। মুনিরাম মিশ্রের 'সারদামঙ্গলে' বিক্রমাদিত্য-কালিদাস কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

লক্ষ্মীদেবী বাঙ্‌লার ঘরে ঘরে নারীদের পূজা পেয়ে থাকেন। লক্ষ্মীকে নিয়ে যে সব ক্ষুদ্র পাঁচালী অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত হয়েছিল তার মধ্যে দ্বিজ ধনঞ্জয়, শিবানন্দ কর, দ্বিজ পঞ্চানন, ভরত পণ্ডিত, শঙ্কর প্রভৃতির লক্ষ্মীমঙ্গল বা লক্ষ্মীর পাঁচালী উল্লেখযোগ্য।

সন্তানের কল্যাণ কামনায় ষষ্ঠীঠাকুরাণীর উদ্ভব। তাঁর মাহাত্ম্য নিয়ে রুদ্ররাম চক্রবর্তী প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন। রুদ্ররামের রচনাকাল আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। শীতলা দেবী মনসার মতোই মানুষের মনে ভয় জাগিয়েছেন। তিনি বসন্ত রোগ দিতেও পারেন আবার নিরাময়ও করতে পারেন। তাই তাঁর দেবীত্ব সম্বন্ধে আর কোনো সংশয় রইলনা। লেখা হল শীতলামঙ্গল এবং উল্লেখযোগ্য কবিরা হলেন অকিঞ্চন চক্রবর্তী,

দ্বিজ গোপাল, শ্রীবল্লভ প্রভৃতি। মাণিকরাম গাঙ্গুলীও একখানি শীতলামঙ্গল কাব্য রচনা করেছিলেন। এছাড়া সুবচনী প্রভৃতি দেবী এবং স্থানীয় (local) দেবতাদের নিয়েও অনেক ক্ষুদ্র পাঁচালী রচিত হয়েছিল। গঙ্গাধরদাস কিরীট-কোণার কিরীটেশ্বরীকে নিয়ে কিরীটমঙ্গল কাব্য রচনা করেন।

শিবায়ণ, সত্যনারায়ণ পাঁচালী ও অন্যান্য দেববিষয়ক কাব্য

পূর্বেই বলেছি যে মধ্যযুগের প্রত্যেক কাব্যেই শিবের কথা আছে। আগে শিবকে নিয়ে পৃথক কোনো কাব্য গড়ে ওঠেনি। মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতিতে শিবের কাহিনী বর্ণিত হত। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে শিবকে নিয়ে স্বতন্ত্র কাব্য গ'ড়ে ওঠে। এসব কাব্যে আমরা যে শিবকে পাই তিনি দেবাদিদেব মহাদেব নন। এইশিব অভাব-দারিদ্র্যময় সাধারণ বাঙালী শ্রেণীর প্রতিনিধি।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শিবায়ণ রচয়িতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন দ্বিজ রামেশ্বর বা রামেশ্বর ভট্টাচার্য। রামেশ্বর মেদিনীপুর জেলার যদুপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর শিবায়ণ রচনা শেষ হয় ১৭১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে। শিবের সাংসারিক জীবনের ছবিটি সরল ও সহজভাবে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। শিবচরিত্রে তখনকার দরিদ্র বাঙালী জীবনের আলেখ্যই প্রকট হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে ভারতচন্দ্রের মতো আদিরসাশ্রিত হলেও তিনি যথাসম্ভব ভদ্রকাব্য রচনায় প্রয়াস পেয়েছেন। কবি নিজেই বলেছেন—

চন্দ্রচূড় চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর॥

রামেশ্বর পরে কর্ণগড়ের রাজা রামসিংহ ও তাঁর পুত্র যশোমন্ত সিংহের আশ্রয়ে মেদিনীপুরের কাছাকাছি অযোধ্যানগরে বাস করতেন। কিন্তু তাঁর কাব্যে এই রাজসভার বা নাগরিকতার বিলাস তেমন নেই। বাঙ্‌লার দরিদ্রশ্রেণীর দুঃখ তাঁর কাব্যে যথার্থভাবে প্রকাশ পেয়েছে। রামেশ্বরের কাব্যে দেখতে পাই, কুলীন জামাইয়ের কাছে শাশুড়ী অনুনয় করে বলছেন—

কুলীনের পোকে অন্য কি বলিব আমি।
কন্যার অশেষ দোষ ক্ষমা করা তুমি॥

খাঁচু-ভাকি বস্ত্র দিব সেই করি ভাব।
প্রীতি করা যেমন জানকী রঘুনাথ।

এই সঙ্গেই শুধু দেখিয়ে নয়, আজও কত্তার মাত্রার এই কামনাই থাকে। বাঙ্লার সাহিত্য-নির্মিতির সমাজে ভারতের নিত্য দুঃখ এবং দুঃখ অবসানের জন্য এই যে নিরন্তর অন্তরের আকুল কামনা ছিল তা আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি।

রামেশ্বর একখানি সত্যনারায়ণের পাঁচালীও রচনা করেছিলেন। এযুগের অন্যান্য শিবায়ন কাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, রামকৃষ্ণ রায়, কবিচন্দ্র ও রামরায় দাসের শিবায়ন।

সত্যনারায়ণ-পাঁচালী

সত্যনারায়ণ-পাঁচালী এ যুগের উল্লেখযোগ্য পাঁচালীকাব্য। মুসলমান শাসকসম্প্রদায়ের প্রতি বাঙালী হিন্দুদের মনোভাবের পরিচয় আমরা ধর্মমঙ্গল ও রায়মঙ্গল কাব্যে পেয়েছি। বাঙ্লার জনসাধারণ বৌদ্ধ ও চৈতন্যপ্রভাবকে যে রকমভাবে গ্রহণ করেছিল মুসলমান পীর ফকিরদের প্রতি ভক্তির অনেকটা সে ভাবেই আসে। এদেশে মুসলমানদের আগমনের পর থেকেই মুসলমান পীর ফকিররা হিন্দুদের কাছেও শ্রদ্ধা পেয়েছেন। এঁরাই পরে অর্ধ-হিন্দু অর্ধ-মুসলমান হয়ে একেশ্বর রূপ ধারণ করেছিলেন। বাঙ্লার সমাজে পুরানো দিন থেকেই হিন্দু-মুসলমান মিলনের মিলনের চেষ্টা চলছিল। কবীর যোগে দেখা দিয়েছেন। সত্যপীরের কৃপায় সন্তান লাভ হচ্ছে। সব চেয়ে কৌতূহলের বিষয় এই, সত্যনারায়ণ ঠাকুর দেবতা নন, একজন মানুষ। কবি কৃষ্ণহরিদাসের কাব্যে বলা হয়েছে, তিনি ময়দানবের নামে এক রাজার অবিবাহিতা কন্যার পরিত্যক্ত সন্তান। কুশলঠাকুর নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁকে কুড়িয়ে পান। তিনি সত্যনারায়ণকে পুত্রের মতো লালনপালন করেন। একদিন বালক সত্যনারায়ণ একখানি পবিত্র কোরাণ কুড়িয়ে পান। কিন্তু দৈবীর নির্দেশ থেকে কুশল ঠাকুর তাঁকে যেখানে এই গ্রন্থ পেয়েছেন সেখানে রেখে আসতে বলেন। সত্যনারায়ণ পবিত্র কোরাণের বিষয়বস্তু দিয়ে কুশল ঠাকুরের সঙ্গে তর্ক করে প্রমাণ করেন যে হিন্দুর ধর্মে আর মুসলমানের ধর্মে কোনো ভেদ নেই। খোদা ও ঈশ্বর এক। এই মনোভাবের মধ্যে আমরা

একটি ধারার ক্রমবৃদ্ধির পরিচয় পাই। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে এই নতুন দেবতার পূজা করেন। তিনি হিন্দুদের কাছে সত্যনারায়ণ বা সত্যপীর নামে পরিচিত। তাঁর পূজার মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মিলনের একটি সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। চৈতন্যদেবের উদারনীতির এবং মধ্যযুগের মানবিকতাবোধ এই সমন্বয় প্রচেষ্টার অনুকূল। বাংলা দেশে সত্যনারায়ণের অনেক পাঁচালী রচিত হয়েছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কবিরা এই পাঁচালী রচনা করেছেন। প্রাচীন কবিদের মধ্যে দ্বিজ রামকৃষ্ণ ঘোষ, ঘনরাম চক্রবর্তী, রামেশ্বর ভট্টাচার্য, ফকিররাম দাস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের পরে যাঁরা সত্যনারায়ণ-পাঁচালী রচনা করেন তাঁদের মধ্যে কবিবল্লভের রামচন্দ্র দাস, দ্বিজ জনার্দন, দ্বিজ রামভদ্র, সত্যনারায়ণ সেন, দ্বিজ রামানন্দ, শিবরাম দাস, বিদ্যাপতি উপাধিধারী এক বাঙালী কবি, আরিফ, শঙ্কর আচার্য, কৃষ্ণহরি দাস প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

সত্যনারায়ণ কোথাও কোথাও হিন্দুর ঘরে অবতরণ করেন বলে বলা হয়েছে, আবার কোথাও কোথাও দেখি তিনি মুসলমানের ঘরে আবির্ভূত হয়েছেন। বিদ্যাপতি উপাধিধারী কবি বলেন—

পশ্চিম পাটেতে সত্যপীরের উদয়।
যাহার প্রসূনে কবি পাঁচালী রচয়।
হিন্দু হৈয়া পীরের মহিমা কিবা জানি।
অদ্ভুত হইল যেমন রচিল সেমতি।

পরে বলেছেন—

ত্রিপুটি রাখিল সত্যপীরের কাছেতে।
কহে বিদ্যাপতি কবি রাজার সাক্ষাতে।

বিদ্যাপতির পাঁচালীতে অনেক পীরের নাম আছে।

মুসলমান কবি আরিফ তাঁর সত্যনারায়ণ-পাঁচালীর লালমোহনের-পালায় কাজী-সত্যনারায়ণের মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। 'লালমোহনের-পালা'র শেষে সত্যপীরের কাছে লালমোহনের মায়ের শেষ বিদায় কবি বলেছেন—

সত্যপাক উৎকার দিয়াছি আরিফ গাইয়া।
ছেরেরা দিয়াছি বাদ বিদায় চাহিয়া।

মক্কায় বসিয়া পীর হাসেন নারায়ণ।
এতদিনে আমারে বুঝিলেন লালমোন ॥

কাব্যের শেষে কবি ভণিতায় বলছেন—

আল্লা আল্লা বল ভাই দিন বয়্যা যায়।
হুকুম সত্যের যে আরিফ কবি গায় ॥
এইখানে এই কেচ্ছা হইল তামাম।
বদন ভরিয়া লহ সত্যপীরের নাম ॥

কবি আরিফের কাব্যে সত্যনারায়ণ মুসলমান-বংশোদ্ভূত পীর-গাজী।

কবি শঙ্করআচার্যের সত্যপীর স্থলতান আলা বাদশাহের অবিবাহিতা কন্যার পুত্র। আবার কৃষ্ণহরিদাসের সত্যপীর মালঞ্চার রাজা মহীদানবের অবিবাহিতা কন্যার পুত্র। কৃষ্ণহরিদাসের সত্যপীরের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। কৃষ্ণহরিদাসের কাব্যে দেখতে পাই, কুশল ঠাকুর যখন সত্যপীরকে যুক্তি দেখিয়ে বলেন—

ব্রাহ্মণ হইয়া যদি বিছমিল্লা কয়।
শেষকালে সেই জন বৈকুণ্ঠ না পায় ॥

সত্যপীর তখন সেই যুক্তি খণ্ডন করে বলেন—

এক ব্রহ্ম বিনে আর দুই ব্রহ্ম নাই।
সকলের কর্তা এক নিরঞ্জন গোঁসাই ॥
....
সেই নিরঞ্জনের নাম বিছমিল্লা কয়।
বিষ্ণু আর বিছমিল্লা কিছু ভিন্ন নয় ॥

এখানে কুশল-ঠাকুরদের আর বলবার কিছুই থাকে না।

নাথ-গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ ও যোদ্ধা-পীর মসনদ আলীতে মিলে মছন্দলী বা মোছরা পীর বলে একজন পীরের পাঁচালীও রচিত হয়েছে। এই সব পীরের আবির্ভাব বাঙ্‌লার হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মিলনের অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিল। যাঁরা একাজে ব্রতী হয়েছিলেন তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন সমাজের সাধারণ শ্রেণীর মানুষ। তাঁরা অসাধারণ দেব-দেবীদের পাশে উক্ত কল্পিত সাধারণ দেবতাদের প্রতিষ্ঠিত করবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। হিন্দু-মুসলমানের প্রীতির বন্ধন আরও দৃঢ় করবার

জন্য এই ধরণের শুভকল্পনাপ্রসূত দেবতাদের আবির্ভাবের প্রয়োজনও ছিল।

সূর্য এবং সূর্য-পুত্র জীমূতবাহনকে নিয়ে কয়েকখানি পাঁচালী রচিত হয়। সূর্যের পাঁচালীর রচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন, রামজীবন বিদ্যাভূষণ, দ্বিজকালিদাস প্রভৃতি। এছাড়া ঝাড়খণ্ডের বৈদ্যনাথ, তারকেশ্বরের তারকনাথ, মদনমোহন প্রভৃতি স্থানীয় দেবতাদের নিয়েও কতগুলি ব্রতকথা বা পাঁচালী রচিত হয়। শনিঠাকুরকে নিয়ে বাঙ্‌লাদেশে বহু পাঁচালী গান রচিত হয়েছে।

রামায়ণ-মহাভারত

পূর্বের মতো অষ্টাদশ শতাব্দীতেও সম্পূর্ণ রামায়ণ-মহাভারত অথবা উক্ত কাব্যগুলির কোনো বিশেষ একটি অংশ রচিত হয়েছে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক লেখকের রচনা কৃত্তিবাস ও কাশীরামদাসের কাব্যে মিশে গেছে। হয়ত এখন সেই লেখকদের নাম লোপ পাওয়াতে তাঁদের রচনাগুলি কৃত্তিবাস ও কাশীরামদাসের বলেই সবাই জানে।

মুসলমান শক্তির প্রভাবে হিন্দু রাজারা একে একে লোপ পেতে থাকে। দেশের জনসাধারণের মধ্যে রাজাদের সম্বন্ধে খুব একটা উচ্চ ধারণা ছিলনা। রাজাদের ঐশ্বর্য-আড়ম্বরকে তখনকার দিনের লেখকরা বেশ কটাক্ষও করেছেন। এও দেখা গেছে যে কবিরা একটা অদ্ভুত কল্পনা দিয়ে রাজসংসার চিত্রিত করছেন। হয়ত রানী কৌশল্যা সোনার কলসী নিয়ে পুকুরে জল আনতে গিয়ে ঘাটে বসে সতীনদের নামে পাড়াপড়শিনীদের কাছে নানা কথা বোঝাচ্ছেন। মাঝে মাঝে রাজদরবারকে যে রকম কটাক্ষ করা হয়েছে তাতে বেশ বুঝতে পারি যে তখনকার বাঙালীরা রাজাদের কি চোখে দেখতেন। অঙ্গদ রাবণের রাজসভায় বসে যেভাবে তাঁকে অপমান করছিল বর্তমান দিন হলে মানহানির দায়ে আদালতে অভিযুক্ত হতে হত। তখনকার দিনেও কোতল করতে দ্বিধা করত না—ছাড়া পেল কেবল দূত বলেই। লঙ্কাকাণ্ডে হনুমান যে কাণ্ডটা বাধিয়েছিল, তাতে বেশ বোঝা যায়, লাঞ্ছনা নিপীড়ন ও দুঃখের জ্বালায়, সেদিনের জনসাধারণ রাজৈশ্বর্যকে পুড়ে ছাই করে দিয়ে মনকে কিছুটা সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করেছিল। লেখকদের

অধিকাংশই ছিল দরিদ্রশ্রেণীর লোক। হয়ত নিজেদের দুঃখ-দারিদ্র্যের প্রতিকার না পেয়ে ঝাল মিটিয়েছেন অভিজাতশ্রেণীর উপর।

রামায়ণের কাহিনীকে কেন্দ্র করে অনেক গল্পও বাঙ্‌লা দেশে গড়ে উঠেছিল। লেখকরাও অনেক সময় স্বকপোলকল্পিত কাহিনী রামায়ণে জুড়ে দিয়েছেন। মহাভারত রচনাতেও এ ব্যাপার ঘটেছে। এযুগের রামায়ণ রচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন কবিচন্দ্র, ভবানীশঙ্কর বন্দ্যো, 'ভিক্ষু' রামচন্দ্র, জগৎরাম ও রামপ্রসাদ বন্দ্যো, দ্বিজ ভবানীনাথ, দ্বিজ সীতাসুত প্রভৃতি। পিতা জগৎরাম ও পুত্র রামপ্রসাদ মিলে একখানি রামায়ণ রচনা করেন। রামায়ণখানি রচনার সমাপ্তিকাল ১৭৯০-৯১ খ্রীষ্টাব্দ। নড়ালের গঙ্গারাম দত্তও একখানি রামায়ণ রচনা করেন। এই গঙ্গারাম দত্ত মহারাষ্ট্রপুরাণ নামে একখানি ইতিহাসাশ্রিত কাব্য রচনা করেছিলেন।

যাঁরা সংক্ষিপ্ত রামায়ণ বা রামায়ণের কাহিনী অংশ রচনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ফকীররাম বিদ্যাভূষণ, কৃষ্ণদাস, কৈলাস বসু, রামনারায়ণ, শিবচন্দ্র সেন, প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ফকীররামের 'অঙ্গদ-রায়বার' অংশটি সেকালে খুব জনপ্রিয় ছিল। তাঁর পরে আরও অনেক কবিই 'রায়বার পালা' রচনা করেছেন। কোচবিহার রাজসভার নির্দেশে এই যুগে বংশীমোহন, দ্বিজ ব্রজসুন্দর প্রভৃতি রামায়ণ রচনা করেন। রামানন্দ যতি 'শ্রীরাম পাঁচালী' নামে একখানি রামায়ণ কাব্য রচনা করেন। ইনি একখানি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যও (১৭৬৬ খ্রীঃ) রচনা করেছিলেন। রামানন্দ সংস্কৃতে বহু নিবন্ধ ও টীকা ও রচনা করেছিলেন।

এযুগের সব চেয়ে বিস্ময়কর ব্যক্তি হচ্ছেন রামানন্দ ঘোষ। রামানন্দের বিশেষ কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি নিজেকে একবার বলছেন ব্রাহ্মণ, আবার পরক্ষণেই বলছেন শূদ্র। রামানন্দের আত্মাভিমান যথেষ্ট ছিল। কিন্তু এই আত্মাভিমান শুধু ব্যর্থতারই নামান্তর। রামানন্দ তাঁর কাব্যে বলেছেন যে দেশের অরাজকতার মুহূর্তে দেবীকালী বুদ্ধদেবকে রামানন্দরূপে পাঠান। রামানন্দ নিজেকে বুদ্ধের অবতার বলে পরিচয় দিয়েছেন।

কলিযুগে রামানন্দ বুদ্ধ-অবতার।

অন্যদিকে রামানন্দ জগন্নাথদেবের উপাসক, আবার তান্ত্রিকমতে কালীপূজাও করেন। মনে হয়, তিনি কোনো একটি বিশেষ ধর্ম-বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে

থাকতে পারেননি। রাষ্ট্র ও সমাজের অব্যবস্থার দিনে, জাতির বিপর্যয়ের ক্ষণে, এই ব্যক্তিটি দিশাহারা বাঙালীর প্রতিনিধিস্বরূপ কেবল পথ খুঁজে বেড়াচ্ছেন। ঘর ছেড়ে নিজেকে বঞ্চিত করেছেন, বাইরেও জীবনের যথার্থ শান্তিকে খুঁজে পাননি। জীবনের দুর্যোগের দিনের আঘাত-সংঘাতকে এড়াতে গিয়ে নিজে যেন খেই হারিয়ে ফেলেছেন। জীবনের ব্যর্থতার প্রতি, সাধনার ব্যর্থতার প্রতি নিজে তীব্র কটাক্ষও ক’ ছেন। নিজের সন্ন্যাস-জীবনকে তিনি নিজেই বিদ্রূপ করেছেন। রামানন্দ বুঝেছেন, এ পৃথিবীতে ভালোমানুষের স্থান নেই। অর্থের অভাব মানুষের সব চেয়ে বড়ো অভাব। কারও টাকাপয়সা হয়েছে দেখলে আর একজনের ঈর্ষা হবেই। রামানন্দেরও তাই হয়েছিল। তিনি নিজে বিত্তহীন, সম্পদহীন। কিন্তু “দাসী রূপা হৈলা লক্ষ্মী নীচ জাতি ঘরে।” রামানন্দ দেশের ও দশের উপকারের জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছেন। মুসলমানদের সরিয়ে দিয়ে দেশে তিনি শান্তি স্থাপন করবেন। বিশ্বশান্তির মহান পুরোহিত বুদ্ধদেবের অবতার রামানন্দ বলছেন,—কালী পাঠিয়েছেন বুদ্ধদেবকে রামানন্দরূপে। এই বুদ্ধদেব একবার গীতার শ্রীকৃষ্ণের মতো বলেন, ‘এই দেহে বিশ্বরূপ দেখাব সংসারে।’ আবার অহিংসমন্ত্রের প্রথম উদ্গাতা মহামানবের অবতার রামানন্দ ক্রোধভরে এও বলেন—

যবন ম্লেচ্ছের রাজ্য বলে কাড়ি লব।
একচ্ছত্রে রাজা করি দারুব্রহ্মে দিব॥

তিনি দারুব্রহ্ম জগন্নাথ ও শ্রীরামচন্দ্রকে এক করে দেখেছেন।

দারুরূপী রাজারাম ভুবন ভিতর।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই দারুব্রহ্ম-সেবার অসারতা বুঝতে পেরে সংসার ছাড়ার বোকামির জন্য দুঃখ করেছেন। সন্ন্যাসী হয়ে তিনি জীবনে কোনো পরমার্থই লাভ করতে পারেন নি। জীবন-সায়াহ্নে তাঁর মনে হয়—

ক্ষুধায় না মিলে অন্ন পিয়াসে না পানী
মিথ্যা ধন্দে গেল মোর দিবস রজনী॥
... ...
দারা ছাড়ি পাপ-ভরা ভরিনু অপার।
অস্থিচর্মসার কৈলা অভিশাপ তার॥

দারা সুত সুতা আর বন্ধু কেহ নাই।
অবশেষে কি হইবে নাহি মিলে খাই ॥

কাব্যের শেষে দুঃখ করে বলছেন—

দারুব্রহ্ম সেবা করি জেরবার হৈল।
বৃথা কাষ্ঠ সেবি কাল কাটা নহে ভাল ॥
বস্তুহীন বিগ্রহ সেবিয়া নহে কাজ।
নিজ কষ্ট দায় আর লোক মধ্যে লাজ ॥

ছিন্নপাল ভগ্নহাল বাঙালীজীবনের আশা-নিরাশার করুণ রূপটি ফুটে উঠেছে রামানন্দ ঘোষের চরিত্রে। ধর্মের উপর বিশ্বাস আসছে দুর্বল হয়ে, অন্যদিকে আত্মপ্রতিষ্ঠার দুর্জয় বাসনা—অবশেষে সব দিক থেকে বিফল হয়ে ব্যর্থ-জীবনের যাথার্থ নির্ধারণের দিক থেকে রামানন্দ ঘোষের এই আত্মসমালোচনা শুধু অষ্টাদশ শতাব্দীতে নয়, মধ্যযুগের সাহিত্যেও বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার আকুলতা এবং প্রতিষ্ঠিত করতে না পারার ব্যর্থতার এমন অকুণ্ঠিত স্বীকার সেযুগে আর কোনো কবির মধ্যে দেখা যায়নি। কবির রামায়ণ কাব্য গতানুগতিকতামুক্ত নয় কিন্তু তাঁর কাব্যখানিকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে তাঁর জীবনের ভুল-ভ্রান্তির আত্মসমালোচনার অংশটুকু।

পিতা জগৎরাম রায় ও পুত্র রামপ্রসাদ মিলে রামায়ণ রচনার মতো কৃষ্ণলীলাবিষয়ক 'কৃষ্ণলীলামৃতরস' এবং শক্তিবিষয়ক 'দুর্গাপঞ্চরাত্রি' কাব্য রচনা করেন।

মহাভারত কাব্য রচয়িতাদের মধ্যে কবিচন্দ্র চক্রবর্তী, ষষ্ঠীবর সেন ও তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেন, কোচবিহারের বাসুদেব প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ষষ্ঠীবর ও গঙ্গাদাস সেন দুজনে মিলে একখানা মনসামঙ্গলকাব্যও রচনা করেছিলেন। অনেক কবির দুয়েকটি করে মহাভারতের পর্বের অনুবাদ পাওয়া গেছে। অশ্বমেধ ও ভীষ্মপর্বের বহুল অনুবাদে মনে হয় ঝিমিয়ে-পড়া বাঙালীর জন্য এরকম ঝাঁঝালো রস পরিবেশনের প্রয়োজন ছিল। মহাভারতের অংশবিশেষের এই রকম রচয়িতাদের মধ্যে দৈবকীনন্দন, রাজীবসেন, গোপীনাথদত্ত, উড়িষ্যার কবি সারল, দ্বিজ কৃষ্ণরাম প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। রামায়ণ রচনায় যেমন বাল্মীকি ছাড়া অদ্ভুত, অধ্যাত্ম, যোগ-বাশিষ্ট প্রভৃতি রামায়ণও অনুসৃত হয়েছিল, তেমনই মহাভারত রচনায়ও

ব্যাসছাড়া জৈমিনী প্রভৃতি ভারত-কাব্য অনুসৃত হয়েছে। লোকনাথদত্ত ও রামনারায়ণ ঘোষ তাঁদের রচনায় নল-দময়ন্তী উপাখ্যান এবং রাজেন্দ্রদাস তাঁর আদিপর্বে শকুন্তলা-উপাখ্যানকে বেশী প্রাধান্য দিয়েছেন। ভক্তিভাব-বিভোর বাঙালী কবিরা বিভীষণপুত্র রামভক্ত তরণীসেনকে নিয়ে কাব্যকাহিনী রচনা করেছিলেন। মহাভারত বা জৈমিনীসংহিতা-বহির্ভূত 'দাতাকর্ণ' কাহিনীও তখন রচিত হয়েছিল। কৃষ্ণদাস নামে এক কবি 'দাতাকর্ণের' একখানি পালা গান রচনা করেন।

ধর্মমঙ্গল কাব্য

এযুগে আগের মতোই ধর্মমঙ্গল কাব্য রচিত হচ্ছিল। প্রত্যেক রচয়িতাকেই রূপরাম, রামদাস প্রভৃতি কবির মতো বিপদের দুস্তর সাগর পার হয়ে তবে কাব্য লিখতে হয়েছে। এযুগের ধর্মমঙ্গল কাব্য রচয়িতাদের মধ্যে ঘনরাম চক্রবর্তীই প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ কবি। কবির নিবাস ছিল বর্ধমানের দক্ষিণে কৃষ্ণপুর গ্রামে। কবি বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্রের আশ্রিত ছিলেন। এঁর ধর্মমঙ্গলকাব্যরচনার সমাপ্তিকাল ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দ। ঘনরাম যে একখানি সত্যনারায়ণের পাঁচালীও রচনা করেছিলেন তা পূর্বে উল্লেখ করেছি। ধর্মমঙ্গলকাব্যে ঘনরামের যে আত্মজীবনী পাওয়া যায় তাতে কিছুটা নতুনত্ব আছে। কবির আত্মকাহিনীটি সংক্ষেপে এই—

ঘনরাম যে ভট্টাচার্য মহাশয়ের টোলে পড়তেন একদিন তাঁর জন্য ঘনরাম ফুল তুলছিলেন। তাঁর পায়ে বেগুন-কাটা বিঁধেছিল। কিন্তু তা ছাড়াতে গেলে পাছে পায়ে হাত দিতে হয় এই জন্যে ঘনরাম ওই কাঁটা-বেঁধা পা নিয়েই ফুল তুলে আনলেন। ভট্টাচার্য পণ্ডিত পূজা করতে বসে দেখেন, তাঁর ইষ্ট-দেবতার পায়ে কাঁটাসমেত বেগুন পাতা বিঁধে রয়েছে। গুরুমশায় বুঝলেন, ঘনরামের ভক্তিতে ঠাকুরের তার ওপর দয়া হয়েছে। যে দুঃখ ঘনরাম পেয়েছে ঠাকুর সে দুঃখ নিজেই গ্রহণ করেছেন। গুরুমশায়ের অভিমান হ'ল। তিনি ঠাকুরের পূজা না করে ঘর ছেড়ে পুরীর দিকে যাত্রা করলেন। কিন্তু যাওয়া হলনা। আবার ঘরে ফিরে এলেন হনুমানের কথামতো রামচন্দ্রের পূজা করতে।

গুরুমশায় ঘনরামকে রামায়ণ রচনা করতে আদেশ করলেন। তিনি

যেদিন রামায়ণ রচনা আরম্ভ করলেন তার পরদিন পুঁথির পাতা খুলে দেখেন সেখানে রামের ধ্যান ও বন্দনার পরিবর্তে লেখা রয়েছে ধর্মঠাকুরের ধ্যান ও বন্দনা। শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, 'অনেক কবি রামায়ণ লিখেছে। তুমি ধর্মের মাহাত্ম্য কীর্তন কর।' ঘনরাম তখন ধর্মমঙ্গল রচনা করেন।

ঘনরামের কাব্যে স্বচ্ছন্দ কবিত্বের অভাব নেই। পূর্ববর্তী ধর্মমঙ্গল রচয়িতাদের মতো তিনিও হরিহর বাইতি প্রভৃতির চরিত্র জীবন্ত করেই এঁকেছেন। ঘনরাম যখন বলেন—'রাজার মঙ্গল চিন্তি দেশের কল্যাণ' তখন মনে হয় দেশপ্রীতি ও জাতিপ্রীতির একটা আভাস অষ্টাদশ শতকের সাহিত্যে এসে পড়েছে।

বর্ধমান জেলার শাঁখারি গ্রাম-নিবাসী নরসিংহবসুও একখানি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। নরসিংহ মহারাজা কীর্তিচন্দ্রের সমসাময়িক। তাঁর কাব্যের রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিক হবে বলেই মনে হয়। ৺দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় নরসিংহের কাব্যের রচনাকাল ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দ বলে অনুমান করেন। কবির আত্মপরিচয়ের ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট। কাব্যে তাঁর সমসাময়িক জাফর খাঁর (মুরশিদ্ কুলী খান) উল্লেখ রয়েছে।

কবি শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হয়ে তাঁর ঠাকুরমার কাছে মানুষ হন। তাঁর ঠাকুরমা 'বাঙ্‌লা পারসী উড়্যা পড়াল্য নাগরী।' লেখাপড়া শিখে তিনি আসফ-উল্লাহ্ খানের চেষ্টায় নবাব-দরবারে তাঁর পক্ষের উকিল নিযুক্ত হলেন। একবার আসফ-উল্লাহ্ খানের খাজনা বাকী পড়ায় নরসিংহ অনেক অনুরোধ করে জাফর খানের কাছ থেকে খাজনা শোধ করার সময় নেন। খাজনা মিটিয়ে দিয়ে ফিরে যাবার সময় কবির বাড়ীর কাছে খেজুর তলায় ধর্মঠাকুরকে প্রণাম করতে গিয়ে দেখেন—

'অপূর্ব সন্ন্যাসী এক আস্থা উপস্থিত।
আশীর্বাদ দিয়া কন কিছু গাও গীত॥

নিজের গ্রামে এসে কবির জ্বর হল। নবাবের খাজনা মিটিয়ে দিয়ে কবি ধর্মের গান লিখতে শুরু করেন।

বর্ধমান-বীরভূম সীমান্তের অধিবাসী হৃদয়রাম সাউ ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে একখানি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। মল্লভূমের চাকঘাট গ্রাম নিবাসী রামচন্দ্র বন্দ্যো

১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর ধর্মমঙ্গলকাব্য রচনা সমাপ্ত করেন। মানিকরাম গাঙ্গুলী ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মমঙ্গল রচনা করেন। তিনিও অন্যান্য কবিদের আত্মপরিচয় দিয়েছেন এবং যথারীতি তাঁর পথের বিপদ ও ধর্মঠাকুরের সঙ্গে দেখা, তারপর তাঁর জ্বর হওয়া এবং পরিশেষে বাঁকুড়া রায় নামধারী ধর্মঠাকুরের আদেশে ধর্মমঙ্গলকাব্য রচনা করা—এই সবই তাঁর মঙ্গলকাব্যে রয়েছে। মাণিকরামের ভাব ও ভাষা খুব সহজ ও সরল। তিনি কাব্যে হাস্যরসের যথেষ্ট অবতারণা করেছেন।

বর্ধমান শহরের দক্ষিণে সেহারা গ্রাম নিবাসী রামকান্ত রায় ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে একখানি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। রামকান্ত তাঁর আত্মপরিচয়ে বলছেন— তিনি নিজগৃহে ছয়মাস বেকার বসেছিলেন। চাষীর ঘরের ছেলে কিন্তু চাষবাস আর ভালো লাগেনা। একদিন রামকান্তের পিতা তাঁকে স্নান করে কৃষাণদের জল খাবার নিয়ে মাঠে যেতে আজ্ঞা করেন। কবি কিন্তু স্নান না করেই ক্ষেতের দিকে যাত্রা করলেন। যাবার পথে শঙ্খচিল, পূর্ণকুম্ভ প্রভৃতি শুভলক্ষণ তাঁর চোখে পড়ল। বাড়ী ফেরার পথে গ্রামের নিকটবর্তী বাবলা তলার 'বুড়ারায়ের' 'থানে' আসেন। সরকার বাড়ীর এই 'বুড়ারায়ের' আদেশক্রমে কবি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা শুরু করেন। ধর্মঠাকুর তাঁকে বলেন—

তোমার কলমে আমি স্থির হয়্যা রব।
আপনি কলম ধর্য়া পুঁথি লিখে দিব॥

কবি বাষট্টি দিনে কাব্য রচনা শেষ করেন।

এযুগের সহদেব চক্রবর্তীর অনিলপুরাণ কিন্তু ধর্মমঙ্গল নয়। সহদেব রামাই পণ্ডিত ও ধর্মপূজা সম্বন্ধে বিশদভাবে বলেছেন। তাঁর কাব্যে নাথ-যোগীদের কথাও আছে। মুসলমানদের আসার পর বাঙ্‌লাদেশে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল এবং হিন্দু বাঙালী ক্রমেই যেভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছিল তার সার্থক নিদর্শন তাঁর কাব্যে পাওয়া যায়। সেযুগে বিশেষ করে ফকীর শ্রেণীর মুসলমানরা হিন্দুদের চোখে প্রায় দেবতার মতো ছিল। নিরঞ্জনের রুষ্মায় (যদি সহদেবের রচনা হয়) তার প্রমাণ আছে। এই নিরঞ্জনের রুষ্মা রামাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণেও সংগৃহীত হয়েছে। সহদেব ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে অনিলপুরাণ কাব্য রচনা করেন। সহদেব বলেছেন যে গ্রন্থরচনার জন্য তিনি ধর্মঠাকুর ও 'কালুরায়ের' আদেশ পেয়েছিলেন।

নাথ-যোগী বা সিদ্ধাদের কাহিনী

সিদ্ধাচার্যদের কাহিনী বাঙলা দেশে প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল। মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িপা, কানুপা প্রভৃতি আদি সিদ্ধাদের গল্প এদেশে বাঙ্‌লা সাহিত্য স্থষ্টির গোড়া থেকেই প্রচলিত ছিল। তবে সেযুগের কোনো পুঁথির নিদর্শন পাওয়া যায়নি। মুখে মুখে প্রচলিত কাহিনী সাহিত্য রূপ লাভ করতে করতে কয়েক শতাব্দীর মোড় ঘুরে গেল। সিদ্ধাদের কাহিনী মুখ্যত দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) মীননাথ-গোরক্ষনাথের গল্প (২) গোবিন্দ চন্দ্র বা গোপীচন্দ্র-ময়নামতীর গল্প।

মীননাথ ও গোরক্ষনাথের গল্প বহু পূর্ব থেকেই এদেশে প্রচলিত ছিল। তবে তার সাহিত্য রূপ দেখা দিয়েছে অনেক পরের দিকে। মীননাথ-গোরক্ষনাথ-কাহিনী কাব্যের নাম 'গোরক্ষবিজয়।' 'গোরক্ষবিজয়ের' কাহিনী সংক্ষেপে এই—

আদ্যদেব ও আদ্যাশক্তির ঘরে মৎস্যেন্দ্রনাথ, মীননাথ, গোরক্ষনাথ, কানুপা এবং জালন্ধরীপা বা হাড়িপা এই চার ছেলে এবং গৌরী নামক একটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করেন। আদ্যদেবের আদেশে শিব গৌরীকে বিবাহ করেন। গোরক্ষনাথ মীননাথের এবং কানুপা জালন্ধরীপার দাসানুদাস হিসাবে তাঁর সেবা করতে লাগলেন।

একদিন গৌরী শিবের কাছে বসে 'মহাজ্ঞান' শুনছিলেন। কিন্তু শুনতে শুনতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। মীননাথ মৎস্যরূপ ধারণ করে জলের ভিতর থেকে মহাজ্ঞান সবটা শুনে নিলেন। শিব টের পেয়ে মীননাথকে অভিশাপ দিয়ে বললেন, একদিন তিনি এই মহাজ্ঞান ভুলে যাবেন।

একদিন গৌরী তাঁদের পরীক্ষা করবার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। গৌরীকে পরিবেশন করতে দেখে গোরক্ষনাথ ছাড়া বাকী তিনজনই তাঁর রূপে আকৃষ্ট হলেন। দেবী তখন তাঁদের অভিশাপ দিলেন। জালন্ধরীপাকে বললেন—

হাড়িরূপ ধরি যাও ময়নামতী ঘর।
হাতে ঝাড়ু লও তুমি কাঁধেতে কোদাল॥

কানুপাকে বললেন,—

তুরমানে চলি যাও ডাহুকা হইয়া।

মীননাথকে বললেন,—'তুমি কদলী-দেশে নারীরাজ্যে রাজা হয়ে থাকগে।' দেবী গোরক্ষনাথকে নানা পরীক্ষা করতে গিয়ে নিজেই জব্দ হলেন। শিবের বরে এক তপস্বিনী রাজকন্যা গোরক্ষনাথকে পতিরূপে লাভ করেন। কিন্তু গোরক্ষনাথ রাজকন্যাকে মাতৃরূপে গ্রহণ করে অজেয় রইলেন।

পার্বতীর অভিশাপে গোরক্ষনাথের গুরু মীননাথ কদলী-দেশে নারীদের রূপে ভুলে বিভোর হয়ে আছেন। কানুপার কাছে গুরুর অবস্থা শুনে গোরক্ষনাথ গেলেন মীননাথকে উদ্ধার করতে। নানা চেষ্টা করে মীননাথকে তিনি আশ্বস্ত ও প্রকৃতিস্থ করলেন, এবং গুরুকে নারীদের হাত থেকে উদ্ধার করে ফিরে এলেন। কদলী-দেশের নারীরা গোরক্ষনাথের শাপে 'কলা-বাদুর' হয়ে রইল। শিষ্য গোরক্ষনাথ মীননাথের চেতনা সম্পাদন করেন বলে এই কাহিনীকে 'মীনচেতন'ও বলা হয়।

গোপীচন্দ্র-ময়নামতী গল্পটি শুধু বাঙ্‌লাদেশে নয়, ভারতের অনেক অঞ্চলেও প্রচলিত ছিল। গোপীচন্দ্রের কাহিনীটিও অষ্টাদশ শতকের বহু পূর্বে প্রচলিত ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা মালিক মুহম্মদ জায়সীর পদুমাবৎ কাব্যে এই কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে। তাতে মনে হয়, জায়সীর সময়ে প্রচলিত গল্প অন্তত দু'তিনশ বছর আগে থেকে প্রচলিত থাকা অসম্ভব নয়।

গোপীচন্দ্র-ময়নামতীর গল্পটি হচ্ছে এই—

রাজা মাণিক্যচন্দ্রের স্ত্রী ময়নামতী জালন্ধরীপার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। গোপীচন্দ্রকেও তাঁর শিষ্য হতে অনুরোধ করেন। যুবক গোপীচন্দ্র আপত্তি করলেন। তিনি বললেন—

পাইসালে খাটে হাড়ি না করে সিনান।
তার ঠাঞি কেমনে আছয়ে ব্রহ্মজ্ঞান॥

ময়নামতীর আদেশ খণ্ডাতে না পেরে গোপীচন্দ্র জালন্ধরীপা বা হাড়িপার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। হাড়িপা বিবাহিত গোপীচন্দ্রকে দীক্ষা দিয়ে সন্ন্যাসী করে দিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণ করে অদুনা পদুনা প্রমুখ স্ত্রীদের ছেড়ে তিনি সংসার ত্যাগ করলেন। বারো বছর পর নানা দুঃখকষ্ট পেয়ে গোপীচন্দ্র আবার গৃহে ফিরে এলেন এবং গুরুর আদেশে আবার সংসারে প্রবেশ করলেন।

মীননাথ-গোরক্ষনাথের গল্প নিয়ে যে সব কাব্য রচিত হয়েছে তার বেশীর ভাগ উত্তরবঙ্গে এবং চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরা অঞ্চলে রচিত। সহদেব চক্রবর্তীর

অনিলপুরাণেও এই কাহিনীটি আছে। উত্তরবঙ্গে এখনও নাথসিদ্ধাদের গান প্রচলিত আছে। গোরক্ষবিজয় বা মীনচেতনের পুঁথি অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে পাওয়া যায়নি। গোরক্ষবিজয়ের উল্লেখযোগ্য কবি হচ্ছেন ভীমসেন রায় বা ভীমদাস, শেখ ফয়জুল্লা (গোরক্ষবিজয়), শ্যামদাস সেন (মীনচেতন) প্রভৃতি। মুসলমান কবিরাও নাথসিদ্ধাদের অনেক কাহিনী রচনা করেছেন।

পূর্বেই বলেছি গোপীচন্দ্র-ময়নামতীর কাহিনী প্রায় সারা ভারত প্রচলিত ছিল। সর্বত্রই তিনি গৌড়-বঙ্গালের রাজা। তবে কোথাও তিনি রাজা 'ভরথরির' (ভর্তৃহরির) ভগিনী-পুত্র, কোথাও বা তিনি ধারা নগরের রাজা গোপীচন্দ্র। কিন্তু বেশীর ভাগ গল্পে তিনি বাঙলাদেশের 'পাটিকা ভুবনের' বা ত্রিপুরা অঞ্চলের রাজা। এক সময় এই অঞ্চল তান্ত্রিকসাধনার প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। নেপালে রচিত 'গোপীচন্দ্র নাটক'টি সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রচিত হয়েছিল। আমরা পূর্বেই বলেছি যে মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদ্মাবৎ' কাব্যেও এই কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া গেছে। এছাড়া পশ্চিম বঙ্গের দুর্লভ মল্লিক 'গোপীচন্দ্রের গীত' নামে একখানি কাব্য রচনা করেন। এই যুগে অথবা এর পরের যুগে গোপীচন্দ্র-ময়নামতীর কাহিনী নিয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে শুকুর মামুদের 'গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস' এবং ভবানীদাসের 'ময়নামতীর গান'। পণ্ডিতবর ডাঃ গ্রীয়ারসন উত্তরবঙ্গ থেকে কিছু গান সংগ্রহ করে 'ময়নামতীর' গান নামে উনবিংশ শতাব্দীতে এসিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশ করেন।

গোপীচন্দ্রের গানের মধ্যে আমরা বিভিন্ন কবিদের কবিত্বের সার্থক পরিচয় পেয়েছি। গোপীচন্দ্র পালাটির নাটকীয় গতিবেগ লক্ষণীয়। ধর্মপ্রভাবিত কাব্য হলেও এখানে গল্পই মুখ্য হয়ে উঠেছে। তবে গোরক্ষবিজয় বা মীনচেতন এবং গোপীচন্দ্রের গানের মধ্যে রুচিবিকৃতির পরিচয়ও যথেষ্ট পাওয়া যায়। নাথ-গুরুদের স্ত্রীবৈরাগ্যের কথা বিবৃত করতে গিয়ে তাঁদের অসংযত কামনার কথাও কবিরা বলেছেন। গোপীচন্দ্রের গানের জনপ্রিয়তার একটি কারণ হচ্ছে রামচন্দ্র বা গৌতমবুদ্ধের মতো রাজপুত্র গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। এই ত্যাগের মহিমার দিকটা তখন বাঙ্‌লার, তথা সমগ্র ভারতের জনসাধারণকে আকৃষ্ট করেছিল। ভোগৈশ্বর্য ছেড়ে দুঃখকে স্বীকার করা—সাধারণ মানুষের কাছে তা বিস্ময়ের কারণ। এই যোগী-

সিদ্ধাদের তুইটি কাহিনীর মধ্যে শেষেরটিতে ধর্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের রোমান্টিক্ মাধুর্যও প্রকাশ পেয়েছে।

৩

ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় পলাশীর বিপর্যয়ের পূর্ব থেকেই বাঙ্‌লা সাহিত্যের চর্চা চলছিল। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র আলীবর্দীর সময়ের লোক। তিনি ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কূটবুদ্ধিতে তখনকার দিনে তাঁর সমতুল্য কেউ ছিল কিনা সন্দেহ। তিনি আলীবর্দীকে ভুলিয়ে ২০ লক্ষ টাকা খাজনা মকুব করে নেন। হেষ্টিংসের পত্নীকে মুক্তার হার উপহার দিয়ে তাঁর প্রিয়পাত্র হন। রাজবল্লভের হাতে 'রাখী' বেঁধে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়ে রাজবল্লভের বিধবা-বিবাহ প্রচলনের চেষ্টাকে ব্যর্থ করেন। বাঙ্‌লা দেশে তিনিই ইংরাজ-স্বার্থ কায়েমী করে তুলতে অগ্রণী ছিলেন। অন্যদিকে হিন্দু শাস্ত্রাদিতেও তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। "তাঁহার সভায় কেবল কবিগণের আদর ছিল এমত নহে ; দর্শন, ন্যায়, স্মৃতি, ধর্ম—এ সমস্ত বিষয়েরই সেখানে চর্চা হইত।" একদিকে প্রাণনাথ ন্যায়-পঞ্চানন, রামানন্দ বাচস্পতি, রামবল্লভ বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতির মতো তত্ত্বজ্ঞ দার্শনিকরা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা অলঙ্কৃতও করছেন, গোপাল ভাঁড়ের মতো বিখ্যাত হাস্যরসিকও আছেন, অন্যদিকে কবি বাণেশ্বর, ভারতচন্দ্রের মতো কবিরাও রয়েছেন। এই পণ্ডিত ও রসিক-জনদের দ্বারা যা হ'তে পারতো, রাজসভার বিকৃতরুচির জন্য তার প্রকাশ আর ঘটতে পারলনা। তবুও মধ্যযুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যের যুগপৎ চরম উৎকর্ষের ও অপকর্ষের রূপটি এই সময়েই প্রকট হয়ে ওঠে। আমরা পূর্বেই বলেছি যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি চলেছে। এই পুরাতনের মধ্যে যাঁরা নিজ কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁদের স্বাক্ষর রয়েছে। এ যুগের কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি হচ্ছেন কবিগুণাকর ভারতচন্দ্র রায় এবং তাঁর পরেই সাধক-কবি রামপ্রসাদের স্থান।

ভারতচন্দ্র আনুমানিক ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে ভুরশুট পরগণার হুগলীর অন্তর্গত পেঁড়ো-বসন্তপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতচন্দ্রের পিতা রাজা নরেন্দ্রনাথ রায় ভুরশুট পরগণার জমিদার ছিলেন। একবার বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের মাতা রানী বিষ্ণুকুমারীর উদ্দেশ্যে কটুবাক্য প্রয়োগ করাতে নরেন্দ্র রায় বর্ধমান রাজের আক্রমণে হৃতসর্বস্ব হয়ে পড়েন। ভারতচন্দ্র তাঁর মামার বাড়ী নওয়াপাড়া গ্রামে পালিয়ে যান। সেখানে থেকে তিনি সংস্কৃত পড়া শুরু করেন। চৌদ্দ বছর বয়সে তিনি বিবাহ করেন। এই বিবাহের জন্য এবং শুধু সংস্কৃত শেখার জন্য তাঁর ভাইরা তাঁকে তিরস্কার করাতে তিনি গৃহত্যাগ করে হুগলীর দেবানন্দপুর নিবাসী রামচন্দ্র মুন্সীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে তাঁর ফারসী শিক্ষা আরম্ভ হয়। একদিন মুন্সী-বাড়ীতে তাঁকে সত্যনারায়ণের পাঁচালী পাঠ করতে বলা হয়। তিনি নিজে একখানি পাঁচালী রচনা ক'রে সবাইকে পাঠ করে শোনান। সত্যনারায়ণ-পাঁচালীর রচনার সম্ভাব্যকাল সম্বন্ধে কবি বলেছেন, 'ব্রতকথা সাঙ্গ পায় সনে রুদ্র চৌগুণা।' তাতে মনে হয় কবি ১৭৩৭।৩৮ খ্রীষ্টাব্দের দিকে পাঁচালীখানি রচনা করেন। কিছুদিন পর ভারতচন্দ্র নিজ গৃহে ফিরে এলেন। বর্ধমানের রাজা কবির পৈতৃক ইজারা তালুক খাস করে নেন। ভারতচন্দ্র এই ব্যাপারে বর্ধমানে তদারক করতে গিয়ে সেখানে রাজকর্মচারীদের চক্রান্তে কারারুদ্ধ হন। কোনোরকমে কারাগার থেকে পালিয়ে সোজা পুরী চলে যান। সেখানে কিছুদিন বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের সঙ্গে থেকে নিজেও সন্ন্যাসী হয়ে যান। সন্ন্যাসী হয়ে ভারতচন্দ্র বৃন্দাবনের পথে যাত্রা করেন। কিন্তু পথে আত্মীয়-স্বজনরা তাঁকে ধরে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। শ্বশুর বাড়ীতে কয়েকদিন থেকে ফরাসডাঙায় ফরাসী সরকারের দেওয়ান ইন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর কাছে গিয়ে কিছুদিন রইলেন। ওলন্দাজ সরকারের দেওয়ান গোবিন্দপাড়া নিবাসী রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের আশ্রয়েও তিনি কিছুদিন ছিলেন। ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর অনুরোধে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে মাসিক ৪০৲ টাকা ভাতায় সভাকবি নিযুক্ত করেন। কবি মহারাজকে প্রতিদিন কবিতা রচনা করে শোনাতেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর কবিত্বে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে রায়গুণাকর বা 'কবিগুণাকর' উপাধিতে বিভূষিত করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে কবি ১৭৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দের দিকে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে এসে কবির আর্থিক অভাব দূর হয়। মহারাজ তাঁকে মূলাজোড়ে জায়গা-

জমি দান করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি হিসাবে কিছুকাল অতিবাহিত করার পর ১৭৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে কবি ভারতচন্দ্র দেহত্যাগ করেন। তাঁর তিরোভাবের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যযুগের সাহিত্যধারারও অবসান ঘটে। 'সত্যনারায়ণ-পাঁচালী' এবং 'অন্নদামঙ্গল' ছাড়া ভারতচন্দ্র মৈথিলি কবি ভানুদত্তের 'রসমঞ্জরী' কাব্যের অনুবাদ করেন। এ ছাড়া তাঁর রচিত অনেক কবিতা এবং একখানি অসম্পূর্ণ চণ্ডী নাটক পাওয়া যায়। কথিত আছে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বর্ধমানের রাজকর্মচারী রামদেব নাগের নিকট মূলাযোড় গ্রাম পত্তনী দেওয়ার পর যখন নাগ মহাশয় সবার ওপর অত্যাচার শুরু করেন তখন ভারতচন্দ্র রামদেব নাগের অত্যাচার সম্বন্ধে 'নাগাষ্টক' রচনা করে কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট পাঠান। কৃষ্ণচন্দ্র নাগাষ্টক পড়ে সমস্ত ব্যাপার বুঝতে পেরে রামদেব নাগ সম্বন্ধে যথাবিহিত ব্যবস্থা করেন। নাগাষ্টকের কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করছি। যদিও সংস্কৃতে লেখা তবুও অনুবাদ-অংশে কবির বাক্-বৈদগ্ধ্যের পরিচয় পাওয়া যাবে।

গত রাজ্যে কার্য্যে কুলবিহিতবীর্য্যে পরিচিত
স্বরোদ্দেশে শেষে সুরপুর বিশেষে কথমপি।
স্থিতো মূলাযোড়ে ভবদনুবলাৎ কালহরণং
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরিহরি॥
কিবা রাজকার্য্যে কুলবিহিতবীর্য্যে সকলি ফুরালো
তোমার দেশে শেষে সুরপুর বিশেষে রহিয়াছি হে॥
ওহে মূলাযোড়ে পরম কুশলে কাল হরিছি
বিরাগে হে নাগে সকলি গ্রসিতেছে হরি হরি॥ ইত্যাদি।

অন্ত্য-মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে ভারতচন্দ্র সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর সময়ে তিনিই সাহিত্য রচয়িতাদের একমাত্র আদর্শ ছিলেন। তাঁর পরের কবিরাও তাঁর প্রতিভার প্রভাবকে এড়াতে পারেন নি। মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি উনবিংশ শতাব্দীর অনেক কবিই ভারতচন্দ্রের অনুকরণ করেছেন।

'অন্নদামঙ্গল কাব্য' (১৭৫২-৫৩) ভারতচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনা। কাব্যটি তিন ভাগে বিভক্ত: প্রথম ভাগে—দক্ষযজ্ঞ, শিবের বিবাহ, দেবীর অন্নপূর্ণারূপ, ব্যাসের কাশীনির্মাণ, হরিহোড়ের বৃত্তান্ত, ভবানন্দের জন্ম-বিবরণ প্রভৃতি নানা বিষয়ের বর্ণনা আছে। দ্বিতীয় ভাগে—মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে দমন করতে

এসে বর্ধমানে ভবানন্দ মজুমদারের কাছে বিদ্যাসুন্দর কাহিনী শুনছেন। দ্বিতীয় ভাগে তাই বিদ্যাসুন্দর কাব্যই মুখ্য। তৃতীয় ভাগে—মানসিংহের বর্ধমান থেকে যশোহর যাত্রা, প্রতাপ-আদিত্যকে পরাজিত করা, ভবানন্দের দিল্লীগমন, সেখানে জাহাঙ্গীর কর্তৃক ভবানন্দের নিগ্রহ এবং দেবী অন্নদার কৃপায় পরিশেষে ভবানন্দের মুক্তি লাভ প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম খণ্ডে দেবদেবীর মাহাত্ম্যবর্ণনাপ্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র তাঁর পূর্বের কবিদের, বিশেষ করে মুকুন্দরামের অনুসরণ করেছেন। সমগ্র কাব্যটির মূল বক্তব্য হচ্ছে কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ রায়ের মাহাত্ম্য কীর্তন। প্রথমদিকে হরিহোড় দেবীর কৃপালাভ ক'রে বহু ধন-সম্পত্তি লাভ করেছিল। পরে দেবী তাকে ছেড়ে গেলেন ভবানন্দের ঘরে। প্রথম খণ্ডে তিনি মঙ্গল-কাব্যের পথ অনুসরণ করে চলেছেন, কিন্তু কাব্যরীতি পুরোপুরি মঙ্গলকাব্যের মতো হয়নি। তিনি অন্তরে ভক্তিগদগদ ভাব নিয়ে লিখতে বসেননি। প্রথমদিকে পৌরাণিক শিবের চরিত্র-গাম্ভীর্য কিছুটা প্রকাশ পেলেও শেষপর্যন্ত তাঁর হাতে শিবের দুর্দশার 'একশেষ' হয়েছে। শিব যখন দক্ষযজ্ঞ নাশের জন্য যাত্রা করছেন সেই রুদ্রশিবের রূপটি ভারতচন্দ্র ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে বর্ণনা করছেন—

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম ভভম্ভম শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
... ...
অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে অরে দক্ষ দেরে সতীরে॥
ভুজঙ্গপ্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতীদে সতীদে সতীদে সতীদে॥

আবার যখন তূণক ছন্দে দক্ষযজ্ঞ নাশের বর্ণনা দিচ্ছেন তখন—

ভূতনাথ ভূতসাথ
দক্ষ যজ্ঞ নাশিছে।
যক্ষ রক্ষ লক্ষ লক্ষ
অট্ট অট্ট হাসিছে॥ ইত্যাদির মধ্যে একটা ভীষণতার

প্রকাশ ঘটেছে। আবার যখন দেখি—

ভার্গবের সৌষ্ঠবের
দাড়ি-গোঁপ ছিঁড়িল।

অথবা

ভূত ভাগ পায় লাগ
লাথি কিল মারিছে ॥ তখন মনে হয় ভারতচন্দ্র পৌরাণিক কাহিনীর বর্ণনায় একেবারে তন্ময় হয়ে যান নি। মাঝে মাঝে হাস্যরসের অবতারণা ঘটিয়ে বর্ণনার গুরুত্বকে অনেকটা লঘু করে ফেলেছেন। গৌরীর সঙ্গে বিবাহ হবে শিবের। বৃদ্ধ শিব বর সেজে এসেছেন। কিন্তু ওই বুড়ো জামাইকে দেখে মেনকা দুঃখে আর বাঁচেন না। তিনি কেঁদে বলেই ফেললেন—

আই আই ওই বুড়া কি এই গৌরীর বর লো!
....
উমার কেশ চামর ছটা তামার শলা বুড়ার জটা;
....
উমার নখ চাঁদের চূড়া বুড়ার দাড়ি শণের নুড়া
ছার কপালে ছাই কপালে দেখে পায় ডর লো।
....
আমার উমা মেয়ের চূড়া,
ভাঙ্গর পাগল ওই না বুড়া।
ভারত কহে পাগল নহে ওই ভুবনেশ্বর লো ॥

ভুবনেশ্বর শিব যে সত্যিই পাগল নন, এ তিনি জানলেও তাঁর কাব্যে শিব ত্রুটি-বিচ্যুতির উর্ধ্বে উঠতে পারেন নি। সব চাইতে বিকৃত চরিত্র হচ্ছে মহাভারতকার ব্যাসদেব। ভারতচন্দ্রের কাব্যে ব্যাসদেবের পৌরাণিক ব্যাসত্ব লোপ পেয়ে একটি ভাঁড়ের চরিত্র যেন প্রকাশ পেয়েছে। শিব, নারদ, ব্যাস প্রভৃতির সমাজে আর তেমন সম্মান নেই। এঁরা অনাচরণীয় না হলেও প্রধানদের সঙ্গে সমান আসন পান না।

অন্নদামঙ্গলের দ্বিতীয় ভাগের প্রধান বিষয় হচ্ছে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী। মানসিংহ বাঙ্‌লা দেশে প্রতাপাদিত্যকে দমন করতে এসে বর্ধমানে ভবানন্দ মজুমদারের কাছে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী শুনতে চাইলেন।

এই বিদ্যাসুন্দর কাহিনী বাঙ্‌লা দেশে পূর্ব থেকেই প্রচলিত ছিল। বাঙ্‌লা দেশে প্রাচীন যেসব বিদ্যাসুন্দর কাহিনী পাওয়া গেছে তার মধ্যে দ্বিজ শ্রীধর, সাবিরিদ খান, কবি কঙ্ক (?) প্রভৃতির রচনা উল্লেখযোগ্য। তারও আগে হয়ত এই কাহিনীটি লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল। বররুচির নামে সংস্কৃতে একটি বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান রয়েছে। তাতে দেখতে পাই বিদ্যাসুন্দর গল্পের ঘটনাস্থল উজ্জয়িনী। ইনি যে কোন্ বররুচি তা বুঝবার উপায় নেই। কাশ্মীরী কবি বিহ্লনের 'চৌরপঞ্চাশৎ'ও বাঙ্‌লা বিদ্যাসুন্দর কাহিনী গড়ে উঠতে অনেকখানি সাহায্য করেছে। ভারতচন্দ্রের পূর্বের কয়েকখানি কালিকামঙ্গলে বিদ্যাসুন্দর-উপাখ্যান বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বাঙ্‌লা সাহিত্যে বিদ্যাসুন্দর-কাব্য-রচয়িতাদের মধ্যে ভারতচন্দ্রের স্থান সর্বোচ্চে। ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর-কাব্য' পৃথক কোনো কাব্য নয়। এটি অন্নদামঙ্গলের একটি অংশ-বিশেষ। তবে এখানে কালী-মাহাত্ম্য বর্ণিত হলেও তা একান্তভাবে গৌণ। মুখ্যত বিদ্যা ও সুন্দরের প্রণয় কাহিনীই এই কাব্যাংশের বিষয়বস্তু। এবং তা রচিত হয়েছিল মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার রুচি অনুসারেই। বিদ্যাসুন্দরের গল্পটি এই—

বর্ধমানের রাজা বীরসিংহের কন্যা বিদ্যা শর্ত করেছিল—তাকে যিনি বিচারে পরাজিত করতে পারবেন, তাঁকেই সে বিবাহ করবে। অনেকে এল, কিন্তু বিচারে সবাই বিদ্যার কাছে পরাজিত হল। রাজা প্রমাদ গণলেন। ভাট পাঠালেন কাঞ্চীরাজ্যে। কাঞ্চীরাজ গুণসিন্ধু রায়ের পুত্র সুন্দর ছিলেন সর্বশাস্ত্রবিশারদ। তিনি ভাটের মুখে বিদ্যার রূপের কথা শুনে অধীর হয়ে স্থির করলেন—

... ...

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন॥
একা যাব বর্ধমান করিয়া যতন।
যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন॥

পড়ুয়ার ছদ্মবেশে সুন্দর বর্ধমান এসে পৌছালেন। সুন্দরের অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ নারীরা বিলাপ জুড়ে দিল। দৈবক্রমে সুন্দরের সঙ্গে রাজবাড়ীর মালিনী হীরার সঙ্গে দেখা হ'ল। হীরার ঘরে সুন্দর আশ্রয় গ্রহণ করে বিদ্যার সংবাদ নিলেন। মালিনীর হাতে বিদ্যার উদ্দেশ্যে মাল্য ও শ্লোক রচনা

করে পাঠালেন। বিদ্যাও দিল তার উত্তর। অবশেষে হীরার সাহায্যে দু'জনের মিলন ঘটল এবং গন্ধর্বমতে দু'জনের বিবাহ হ'ল। কিছুদিন পর সন্তান-সম্ভবা বিদ্যা রানীর হাতে ধরা পড়ল। সুন্দরও ধরা পড়লেন কোটালের হাতে। সুন্দর রাজার কাছে শ্লোক পাঠ করে শোনালেন—নিজের পরিচয় দিলেন। তবুও দণ্ডগ্রহণের জন্য তাঁকে শ্মশানে যেতে হল। শ্মশানে কালীর স্তব করতেই কালী সুন্দরকে রক্ষা করলেন। বীরসিংহও দিব্যজ্ঞান লাভ করে সুন্দরকে অর্ধরাজ্য ও রাজকন্যা দিলেন। বিদ্যাকে নিয়ে সুন্দর দেশে ফিরে গেলেন।

তৃতীয় ভাগে—মানসিংহের বর্ধমান থেকে যশোর অভিমুখে যাত্রা এবং প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে যুদ্ধ প্রভৃতির বর্ণনা আছে। মানসিংহ প্রতাপাদিত্যকে শায়েস্তা করবার জন্য যশোর অভিমুখে অভিযান চালালেন। মানসিংহ ও প্রতাপাদিত্যের ভীষণ যুদ্ধ হ'ল। কবি যুদ্ধবর্ণনা প্রসঙ্গে বলছেন—

যুদ্ধে প্রতাপ-আদিত্য।
ভাবিয়া অসার ডাকে মার মার
সংসার সব অনিত্য॥
শিলাময়ী নামে ছিল তার ধামে
অভয়া যশোরেশ্বরী।
পাপেতে ঘিরিয়া বসিল রুষিয়া
তাহারে অকৃপা করি॥
বুঝিয়া অহিত গুরু পুরোহিত
মিলে মানসিংহ রাজে।

সবাই শত্রুপক্ষে চলে গেলেও প্রতাপ বীরের মতো যুদ্ধ করেছিলেন মানসিংহের বিরুদ্ধে। কিন্তু,

পাতশাহী ঠাটে কবে কেবা আঁটে
বিস্তর লস্কর মারে।
বিমুখী অভয়া কে করিবে দয়া
প্রতাপ-আদিত্য হারে॥

ইতিহাসের কথা বলতে গিয়ে কবি সত্য গোপন করেও কিছু কিছু সত্য প্রকাশ করে ফেলেছেন। ভবানন্দ প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতকতা

করেছিল ভারতচন্দ্র মনে মনে জানলেও কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে থেকে তা বলতে পারেন নি।

যাহোক, যুদ্ধশেষে ভবানন্দ বাদশাহ্‌এর সঙ্গে দেখা করার জন্য দিল্লী গেলেন। সেখানে ভবানন্দ জাহাঙ্গীরের কাছে দেবীর মহিমা কীর্তন করাতে বাদশাহ্‌ হিন্দুদের ও তাদের দেবীকে লক্ষ্য করে নানা কটূক্তি করেন এবং ভবানন্দকে কারারুদ্ধ করেন। কারাগারে বসে ভবানন্দ দেবীর স্তব করাতে দেবী সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে অভয় দিয়ে দিল্লী শহরে উৎপাত শুরু করে দিলেন। শেষপর্যন্ত জাহাঙ্গীর ভবানন্দের কাছে হার মানলেন। ভবানন্দকে তিনি 'রাজা' উপাধি দিলেন। 'মজুন্দার' অযোধ্যা, কাশী ইত্যাদি দর্শন করে দেশে ফিরে এলেন। তারপর কিছুদিন রাজ্য ভোগ করে স্বর্গে চলে গেলেন।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' আমরা যে তিনটি কাহিনী পাচ্ছি তার মধ্যে 'বিদ্যাসুন্দর' কাহিনীটি একটু পৃথক ধরণের। কাব্যের গল্পধারার মধ্যে মানসিংহের বিদ্যাসুন্দর কাহিনীটি শোনার ইচ্ছা ছাড়া আর এই গল্পের সঙ্গে মূল-গল্পের কোনো সম্পর্ক নেই। মনে হয়, রাজসভার শ্রোতাদের রুচি অনুসারে কবি এই গল্প 'অন্নদামঙ্গল কাব্যে'র সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। কাব্যখানিকে গতানুগতিকভাবে মঙ্গলকাব্য বলা সঙ্গত হবে না ; কারণ ভাব-বস্তুর দিক থেকে মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে এই কাব্যের প্রকৃতিতে পার্থক্য আছে।

ভারতচন্দ্র নাগরিক কবি। নাগর-ভাব তাঁর কাব্যের অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর পরবর্তীকালের বাঙ্‌লা সাহিত্যে ভারত-চন্দ্রের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়। কবি হিসাবে তখন ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ বিশেষ কেউ নেই। ভারতচন্দ্র সুনিপুণ কথাশিল্পী। কথাকে তিনি ভাবের স্বর্গে নিয়ে যেতে না পারলেও তার সূক্ষ্ম কারুকার্যে ও বিদগ্ধ প্রয়োগে শিক্ষিত সমাজে তিনি সাড়া জাগিয়ে তুলেছিলেন। ভারতচন্দ্রের হাতে বাঙ্‌লা ছন্দ নবরূপ লাভ করে। সংস্কৃত, বাঙ্‌লা, আরবী, ফারসী, হিন্দী প্রভৃতি ভাষাতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তির হেতু তাঁর কাব্যের ভাষাও স্বাতন্ত্র্যলাভ করেছিল। ভাষার প্রসাদগুণ সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। মানসিংহ ও জাহাঙ্গীরের কথোপ-কথন অংশে প্রসঙ্গত তিনি বলেছেন—

মানসিংহ পাতশায় হইল যে বাণী।
উচিত যে আরবী পারসী হিন্দুস্থানী॥

পড়িয়াছি সেই মত বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥
না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥
প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে।
যে হৌক সে হৌক ভাষা—কাব্য রস লয়ে॥

ভাষা ও ছন্দ-কুশলী কবি কাব্যকে রসিয়ে তুলেছেন বটে, কিন্তু সার্থক রস-সৃষ্টি করতে পারেন নি। এও সেই যুগের, বিশেষ করে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার গুণ। আদিরসাশ্রিত কাব্য রচনার মূলে একটি সাময়িক উত্তেজনা থাকতে পারে, কিন্তু প্রাণের রসের সেখানে অভাব থেকে যায়। বিদ্যাসুন্দরের মিলন কাহিনীতে চমৎকারিত্ব রয়েছে বটে, কিন্তু সেটা যে শুধু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়ে থাকছে এটা ভারতচন্দ্র বুঝলেও তার পরিবর্তনের কোনো উপায় তিনি খুঁজে পান নি। তাঁর কাব্য জুড়ে রয়েছে বুদ্ধিগ্রাহ্য ব্যঙ্গোক্তি, ছন্দের সৌকুমার্য, বাক্-বৈদগ্ধ্য এবং কাব্যদেহের সূক্ষ্ম কারুকার্য, কিন্তু মানুষের সংবাদ সেখানে বড়ই অস্পষ্ট। ভারতচন্দ্রের কাব্যের একটিমাত্র অপ্রধান চরিত্রে মানুষের সংবাদ কিছুটা পেয়েছি। এই মানুষটি আমাদের দরিদ্র-সমাজের শুধু নয়, সকল দেশের দরিদ্রশ্রেণীর মনের আকুলতাটুকু প্রকাশ করে ফেলেছে। এই মানুষটি হচ্ছে ঈশ্বরী পাটনী। অন্নদা খেয়া পার হতে যে ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হলেন, 'সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী'। ঈশ্বরী পাটুনী দরিদ্র মানুষ—খেয়া পারাপার করার মাঝি। কাজেই একা একটি নারীকে খেয়া পার করতে তার মনে ভয়। সে তাই কুণ্ঠিতভাবে বলে—

... ...

একা দেখি কুলবধূ—কে বট আপনি॥
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।
ভয় করি কি জানি কে দেবে ফের-ফার॥

তখন অন্নদা নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন—

বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জান ত স্বামীর নাম নাহি লয় নারী॥

তারপর শুরু হল পরিচয় দেবার পালা; ভারতচন্দ্র মুকুন্দরামের অনুকরণে অন্নদার পরিচয় জ্ঞাপন করছেন—

অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন॥
কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥ ইত্যাদি।

এই উক্তি পরোক্ষভাবে শিবের প্রশংসাও বটে, আবার কুলীন-কন্যার বিবাহিত জীবনের দুঃখও বটে। তাই—

পাটনী বলিছে আমি বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল॥

দেবী তাঁর রাঙা চরণ দুখানি রেখেছিলেন নৌকোর সেঁউতির ওপর। তাঁর পদস্পর্শে তা সোনা হ'য়ে গেল। খেয়া পার হয়ে দেবী বললেন—'বর মাগ মনোনীত যাহা চাবে দিব।' তখন—

প্রণমিয়া পাটনী কহিছে জোড়হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে॥

অন্নদামঙ্গল কাব্যের রঙ্গমঞ্চে ঈশ্বরী পাটনী কিছুক্ষণের জন্য আবির্ভূত হয়েছিল। কিন্তু ঐ অল্পসময়ের মধ্যে সে সমস্ত জাতির প্রাণের কথাটি বলে গেছে।

ভারতচন্দ্র যে কাব্য রচনা করেছিলেন তা এমন একটি সময়ে, যে-সময়ে বাঙালীর সামনে আর নতুন কিছু দেখা দিচ্ছে না, পুরাতনকেও আর আঁকড়ে রাখা চলছেনা। মধ্যযুগ চলে যাচ্ছে, নতুন যুগও দেখা দিচ্ছে না। এই বিরাট শূন্যতার ক্ষণে ভারতচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনি নতুন সম্ভাবনা সম্বন্ধে সচেতন না থেকেও হয়ত নিজেরই অজ্ঞাতসারে নতুনের আবির্ভাবের পথকে সুগম করে দিয়েছিলেন। ভারতচন্দ্র মধ্যযুগের শেষ পাদের কবি, অথচ তাঁকে একেবারে পুরোপুরি মধ্যযুগের কবি বলাও সম্ভব নয়। বাঙালীর জীবনে যে দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছিল সে দুর্যোগের পূর্বাভাস ভারতচন্দ্রের কাব্যে স্পষ্টত না থাকলেও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার যে রুচিবিকৃতি কামোদ্দীপক কাব্য রচনা প্রেরণা জুগিয়েছিল সেই বিকৃতির অন্তরালেই আগামীদিনের ট্রাজেডির আভাস ছিল।

তা বলে আমরা একথা বলতে চাইনে যে, বাঙ্‌লা সাহিত্য কেবল ধর্ম-কেন্দ্রিক হয়েই থাকবে। কিন্তু একেবারে যৌনপিপাসার নগ্ন প্রকাশও সাহিত্যের বাহন হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কৃত্রিমতায় জৌলুস আছে বটে কিন্তু তার অর্থগৌরব কতখানি ?

অবশ্যি ভারতচন্দ্রের কবিতায় 'ভাবের গুরুত্ব' কম থাকলেও সেযুগে আর এমন শক্তিধর দ্বিতীয় কোনো কবির সংবাদ পাইনা, যিনি বাঙ্‌লা সাহিত্যকে কৃত্রিমতার আবহাওয়া থেকে মুক্ত করতে পেরেছেন। আমাদের মনে হয় কেবলমাত্র তাঁর পরিপোষক কৃষ্ণচন্দ্রের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য তিনি জেনেশুনেই অনেক সত্যকে বিকৃত করে ফেলেছেন। আমরা ভবানন্দ-উপাখ্যানের কথা পূর্বেই বলেছি। ভারতচন্দ্র দেহত্যাগ করেন ১৭৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর জীবৎকালে পলাশী-প্রান্তরে এতবড়ো একটা যুদ্ধ সংঘটিত হল, বাঙ্‌লার স্বাধীনতা লোপ পেল, কিন্তু কবি এই পটপরিবর্তনের কোনো উল্লেখই করেননি। কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে থেকে এতবড়ো একটি প্রতিভার গতিবেগ রুদ্ধ হয়ে গেল। ইতিহাসের যথাযথ পথকে তিনি অগ্রাহ্য করলেন। তিনি সমসাময়িক যুগের কথা স্পষ্টভাবে না বলে পুরাণ, সংহিতার পুরাতন পথ বেয়েই চলার চেষ্টা করেছেন। কৃষ্ণচন্দ্রকে সন্তুষ্ট করার জন্য ইতিহাসও বিকৃতি থেকে রেহাই পেলো না। একটি অপূর্ব কবিত্ব-শক্তির উন্মেষের পথ হারিয়ে গেল কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার কোলাহলে। বিকারগ্রস্ত মনের খোরাক জোটাতে গিয়ে বলিষ্ঠ কবিত্ব-শক্তিসম্পন্ন ভারতচন্দ্রের মধ্যে যে বিরাট সম্ভাবনা ছিল তার সম্পূর্ণ প্রকাশ আর ঘটল না।

ভারতচন্দ্রের পরে আর যে সব কবিরা কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তাঁদের সাহিত্য-প্রচেষ্টা লক্ষ্য করলে বুঝতে পারি যে, তাঁরাও মুখ্যত ভারতচন্দ্রের এবং অন্যান্য পূর্ববর্তী কবিদের নানা রচনার অনুকরণই করছিলেন। আগামীর ক্ষীণ রক্তিম আভাসও তাতে নেই। তাঁরা বুঝলেন না, ভারতচন্দ্রের শিল্প-চাতুর্যের রহস্য কি! শুধু সেই যুগধর্মানুযায়ী ঝিমিয়ে-পড়া বাঙালীর কানে কামোদ্দীপক সঙ্গীতই শোনালেন। ভারতচন্দ্রের অক্ষম অনুকরণ করতে গিয়ে সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁরা কোনো স্বাক্ষর রেখে যেতে পারেন নি।

ভারতচন্দ্র সমসাময়িক কালের প্রয়োজনকে এড়িয়ে যে পোশাকী সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন তার মূল্যের পরিমাণও কম নয়। তিনি নিজের

অগোচরে আধুনিক কালের রোমান্টিক্ সাহিত্যের সৃষ্টির পথ সুগম করে দিয়েছিলেন।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে এমন অনেকগুলি উক্তি আছে যা আজও আমাদের মুখে মুখে প্রবচনের মতো রয়েছে। যেমন 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন' 'সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর', 'নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে' ইত্যাদি আজও বাঙালীর মুখে মুখে প্রচলিত।

নবাবী আমলের কৃত্রিমতা, আড়ম্বর-ঐশ্বর্য ও রুচির পরিচয় ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে রয়েছে। সেযুগের বিকৃতরুচিবোধ মানব-রসবোধকে উপেক্ষা করে যুগচিত্তের উপস্থিত ক্ষুধা মিটিয়েছিল। শিক্ষিত কবি তাঁর কাব্যে যে বিদগ্ধ নাগরিক মনোভাবকে ফুটিয়ে তুলেছিলেন তা সকল যুগের কবিরই অনুকরণের বিষয়। কিন্তু তা যদি কেবল যৌনপ্রবৃত্তিমূলক বর্ণনায় পর্যবসিত হয়, তাহলে সেটা হবে কবি 'গুণাকরের' অক্ষম অনুকরণ। কারণ কবি রাজসভার প্রয়োজনে যে বিষয়বস্তুকে নিজস্ব শিল্প-চাতুর্যের দ্বারা প্রকাশ করেছিলেন, পরবর্তীকালের লক্ষ্য সেই বিষয়বস্তু হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। লক্ষ্য হবে কবির শিল্পচাতুর্য, তাঁর বাক্‌ভঙ্গীর সরসতা ও প্রকাশভঙ্গীর যথার্থতা। ভারতচন্দ্রের কাব্য পরবর্তীকালের কবিদের কাব্যের আদর্শস্বরূপ ছিল। যাঁরা তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তুকে ছেড়ে কাব্য-রসের অনুসরণ করছিলেন তাঁদের কাব্য রচনা অসার্থক হয়নি। এই দিক থেকে ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতকের বাঙ্‌লা সাহিত্যের অনন্যসাধারণ কবি। পুরানো ধারার শেষ শক্তিমান কবিও বটে।

ভারতচন্দ্রের পরেই এযুগের আর একজন বিখ্যাত কবি হচ্ছেন কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন। রামপ্রসাদের নিবাস ছিল হালিশহরের পাশে কুমারহট্ট গ্রামে। কবি তাঁর কাব্যে বিশদভাবে নিজের বংশপরিচয় দিয়েছেন। রামপ্রসাদ তাঁর পরিপোষক মহারাজ রাজেন্দ্র-শ্রীরাজকিশোরের আদেশে বিদ্যাসুন্দর কাব্য বা কালিকামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। কিন্তু বাঙ্‌লা সাহিত্যে তাঁর পরিচয় কালীবিষয়ক গান রচয়িতা হিসাবে।

ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ দুজনেই কালিকামঙ্গল রচনা করেন। ভারত-চন্দ্রের কাব্যে যে চমৎকারিত্ব আছে রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে তা হয়ত নেই। বর্ণনার দিক থেকে ভারতচন্দ্র অনবদ্য। কিন্তু চরিত্রসৃষ্টির দিক থেকে

রামপ্রসাদ অতুলনীয়। তিনি এমন কতগুলি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন যা মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের বিশেষ কয়েকটি চরিত্র ছাড়া মধ্যযুগের কবিদের রচনাতে তেমন সুলভ নয়। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর কাব্য একেবারে অশ্লীলতাবর্জিত নয়। অন্যান্য কবিদের বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনাতেও এই একই ব্যাপার লক্ষিত হয়। রামপ্রসাদের কালিকামঙ্গলে বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী বর্ণনাই কবির প্রধান লক্ষ্য; কিন্তু বাঙ্‌লাদেশে রামপ্রসাদের পরিচয় কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্যের কবি হিসাবে নয়, তাঁর পরিচয় গীতকার হিসাবে। তাঁর রচিত সঙ্গীতে আধ্যাত্মিকতা যথেষ্ট আছে বটে কিন্তু তার মধ্যে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের দিকও অত্যন্ত সুস্পষ্ট। গানগুলির প্রত্যেক পংক্তিতে তাঁর স্বাভাবিক অনুভূতি, ব্যক্তিচেতনা প্রকাশ পেয়েছে; এবং তাতে দৃঢ় বিশ্বাসের বজ্রনাদও স্পষ্ট শোনা গেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই সাধক কবি সুপ্ত বাঙালীর প্রাণের মাঝে গানের মন্দাকিনী ধারা বইয়ে দিয়েছেন। আমরা তাঁর সঙ্গীতের মাঝে গ্রাম্য সারল্যের মৌলিক প্রকাশ লক্ষ্য করেছি। তাঁর গান আমাদের বাঙ্‌লার মাটি, বাঙ্‌লার জলেরই গান। রামপ্রসাদের গানের মধ্যে লোকসঙ্গীতের প্রভাবও লক্ষিত হয়।

কবি রামপ্রসাদ করালবদনা, ভীষণা কালীকে বাঙালী ঘরের মায়ের মতো করে রূপ দিয়েছেন। মার কাছে যেমন সব আবদারই খাটে, তিনিও তেমনই অবোধ সন্তানের মতো কালীর কাছে আবদার ধরেছেন। রামপ্রসাদের কালী বৈদিক দেবতা নন। কিন্তু তাঁর যে রূপটি কালীকীর্তনে প্রকাশ পেয়েছে সে রূপে তিনি মাতৃভক্ত বাঙালীর নিত্যকালের দেবতা।

রামপ্রসাদের কাল এক ভীষণ অরাজকতার কাল। বিদেশী রাজশক্তির আবির্ভাব, ভারত সম্রাটের কর্মচারীর অত্যাচার-অবিচার দেশের মানুষকে বিহ্বল করে তোলে। দুঃখ এসে জাতির সমগ্র জীবনকে আচ্ছন্ন করল। 'দুর্দিনে যখন নিরাশার ঘনঘটা চারিদিকে আঁধার করিয়া ফেলে, তখন দুঃখবাদ মনকে বিশেষরূপে অধিকার করিয়া বসে; বঙ্গের এই দুঃসময়ে বাঙ্‌লার এই ভক্তি, বাঙ্‌লার কর্ম, বাঙ্‌লার সাধনা এই দুঃখবাদকে আশ্রয় করিয়া বিকাশ পাইয়াছিল।......এই দুঃখবাদ তো আজকালকার নয়।......অষ্টাদশ শতাব্দীতে রামপ্রসাদ এই দুঃখের সুরটি পুনরায় জাগরিত করিলেন। তাঁহার সুরে সুর মিলাইয়া অসংখ্য ফকির, বাউল আবার এই দুঃখবাদের সুরে বঙ্গ

সমাজকে সংসারবিমুখতায় দীক্ষিত করিল।' (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—৺দীনেশ চন্দ্র সেন) রামপ্রসাদের দুঃখবাদে জীবনদেবতার প্রতি স্পষ্ট অভিমান আছে। তাঁর মতে, যত দুঃখই থাকুক না কেন, বিশ্বমায়ের কোলে আশ্রয় নিলে সব দুঃখ কেটে যাবে। এই মা যে তাঁর ঘরের মা। এই মায়ের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'ভয় করিনা মা চোখ রাঙালে'।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ঝিমিয়ে-পড়া বাঙালীর জীবনে রামপ্রসাদ নতুন প্রাণের সন্ধান দিলেন। পলাশীর বিপর্যয়োত্তর বাঙ্‌লার অন্ধকার পথে রামপ্রসাদ চলেছিলেন একা। দেশকে সচেতন করে তোলার জন্য তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—

আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা,
ভূতলে আনিয়ে মাগো যতই করিস লোহা পেটা।
আমি তবু কালী কালী বলে ডাকি, সাবাস আমার বুকের পাটা॥

রামপ্রসাদের কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা রাজসভার বাঙালীর জন্য, কিন্তু তাঁর কালীকীর্তন ও অন্যান্য খণ্ড পদগুলি বাঙালী জনসাধারণের যৌথসম্পদ। এসময়ে যুগপ্রভাবে যে সমস্ত সাহিত্য রচিত হয়েছে তার বেশীর ভাগই কৃত্রিমতায় ভরা। কিন্তু রামপ্রসাদের গীত রচনায় কৃত্রিমতা একেবারে নেই বললেই চলে। বাঙ্‌লার সমাজক্ষেত্র থেকে রামপ্রসাদ তাঁর গানের আধ্যাত্মিক ভাবরস সংগ্রহ করেছিলেন। ভারতচন্দ্রের কাব্যে আছে বিস্ময়কর ও মনোমুগ্ধকর ঝঙ্কার, রামপ্রসাদের গানে আছে প্রাণের আবেগ। একজন নানা ঐশ্বর্যে আড়ম্বরে সাহিত্য-সরস্বতীকে সাজাচ্ছিলেন, আর একজন জীবনের শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ের রসানুভূতিকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন—আপন মনের সহজ ভাষায়। বাঙ্‌লার অব্যবস্থার যুগে রামপ্রসাদের আবির্ভাব একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল।

বিদ্যাসুন্দর ও কালীকীর্তন ছাড়া রামপ্রসাদ কৃষ্ণকীর্তনও রচনা করেছিলেন। বর্ণনার স্বাভাবিকতায় রামপ্রসাদ সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সে-যুগের মানুষ যে গুজব ছড়াতে এখনকার মানুষের চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না তার বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেছেন—

শহরে গুজব উঠে একে একশত।
গল্প ঝাড়ে বড়ই আঠার মেসে যত॥

... ...

হেসে কহে তোমরা শুনেছ ভাই আর।
শুনিলাম এখনি আশ্চর্য সমাচার॥
হাতকাটা একটা মানুষ গেল কয়ে।
চোরের সহিত নাকি ছিল দুটা মেয়ে॥ ইত্যাদি।

রামপ্রসাদের নামে বহু কালীবিষয়ক পদ প্রচলিত আছে। সবগুলি রামপ্রসাদ সেনের রচনা নয় বলেই মনে হয়। দ্বিজ রামপ্রসাদ নামে এক কবির কতগুলি পদ রামপ্রসাদ সেনের নামে প্রচলিত আছে। তবে কুমার-হট্টের কবি রামপ্রসাদও অনেকগুলি পদ রচনা করিয়াছিলেন। অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস নিম্নোক্ত পদগুলি রামপ্রসাদ সেনের রচিত। যেমন,

'কি কাজ রে মন যেয়ে কাশী'।

অথবা

মা আমায় ঘুরাবি কতো,
কলুর চোখ বাঁধা বলদের মতো।

অথবা,

মন তুমি কৃষি কাজ জান না,
এমন মানব জমিন রইল পতিত
আবাদ করলে ফলতো সোনা।

অথবা,

বল মা আমি দাঁড়াই কোথা।
আমার কেহ নাই শঙ্করি হেথা।

অথবা,

এমন দিন কি হবে তারা
যবে তারা তারা তারা বলে তারা বয়ে পড়বে ধারা।

অথবা,

ভবে আসার আশা, কেবল আশা, আসা মাত্র সার হলো।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে রলো॥
মা নিম খাওয়ালে চিনি বলে কথায় কথায় করে ছলো।
ওমা, মিঠার আশে তেতো মুখে সারা দিনটা গেলো॥

অথবা,

গিরি, আমি প্রবোধ দিতে নারি উমারে,
উমা কেঁদে করে অভিমান নাহি খায় খীর ননী সরে। ইত্যাদি।

এই পদগুলির ভাব ও ভাষা বাঙালীর চির-পরিচিত। রামপ্রসাদ শাক্ত-সাহিত্যে আগমনী ও বিজয়া গানের শ্রেষ্ঠ কবি। বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনার পর সম্ভবত কালীবিষয়ক পদ রচনা করে কবির হৃদয় আকুল হয়ে ওঠাতে তিনি বলেছিলেন—'গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হব ব্যস্ত।' বস্তুত বিদ্যাসুন্দর-কাব্য রচনার পর তিনি কালীবিষয়ক পদ ছাড়া অন্য কোনো গ্রন্থ রচনা করেন নি। বাঙ্‌লার শক্তি সাধনা বাঙালীর ঘরের স্নেহশীলা মায়ের স্নেহ-প্রত্যাশার সাধনা। এই মাকে রামপ্রসাদ মা ও কন্যারূপে কল্পনা করে সেই বিশ্ব-মাতাকে নিজ হৃদয়ের আকুলতা জানিয়েছেন। বাঙ্‌লার অন্ধকার পথ দিয়ে তিনি একা চলেছেন গান গেয়ে। কিন্তু সে গান শোনার মতো মানুষ তখন কোথায়? তাই কবিজীবনে জেগেছে দুঃখ। এ দুঃখ নির্বাণবাদী বৌদ্ধ বাউলের দুঃখ নয়—এ দুঃখের অপর নাম অভিমান; এবং এই অভিমান কবির নিজের ওপর, তাঁর দেশবাসীর ওপর। সেদিক থেকে রামপ্রসাদ অভিমানী কবি—অবিস্মরণীয়ও বটে। এযুগে আর যাঁরা কালিকামঙ্গল রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে 'কবীন্দ্র' চক্রবর্তী, কলকাতার কবি রাধাকান্ত মিশ্র, চট্টগ্রামের কবি নিধিরাম আচার্য প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তবে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদই অবিসংবাদিতভাবে এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবি।

এ যুগের মুসলমান লেখকগণ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে মুসলমান কবিদের অনেক রচনার নিদর্শন পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ইস্‌লাম ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক কাব্য রচনা করছেন, কেউ কেউ আবার প্রণয়মূলক গীতি-কবিতা, কাহিনী জাতীয় 'কেচ্ছা' প্রভৃতিও রচনা করছেন। মুসলমান কবিরা বাঙ্‌লা ভাষাকে 'দেশীভাষা' বলে উল্লেখ করেছেন। এই 'দেশী ভাষায়' উত্তরবঙ্গের হায়াৎমামুদ 'হিতজ্ঞান বাণী', (১৭৫৩ খ্রীঃ), 'আম্বিয়াবানী' (১৭৫৮), 'চিত্ত উত্থান', 'জঙ্গনামা' (১৭২৩ খ্রীঃ) প্রভৃতি রচনা করেন। সেযুগের মুসলমান কবিরা 'দেশীভাষার' প্রতি যতখানি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা দেখিয়েছেন বাঙ্‌লা সাহিত্যের পক্ষে তা

যথার্থ গৌরবের বিষয়। 'জঙ্গনামা' 'আমীর হামজার' মতো বিরাট কাব্য লেখা হয়েছে এই বাঙ্‌লা ভাষায়। মুসলমান কবিরা শুধু যে ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতিবিষয়ক কাব্য রচনা করেছেন তা নয়, তাঁরা হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির উপকরণ সামগ্রী নিয়েও কাব্য রচনা করেছেন। আবার অন্যদিকে হিন্দুরাও মুসলমানদের দেখাদেখি 'জঙ্গনামা' প্রভৃতি কাব্য রচনা করেছেন। আগের শতাব্দীতে দেখেছি রোসাঙ, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলের মুসলমান কবিরা ধর্মবিষয়ক ও ধর্মপ্রভাবমুক্ত কাব্য রচনা করেছেন। দু'চার জন পশ্চিমবঙ্গের কবি যে ছিলেননা তা নয়। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে পূর্ববঙ্গ অপেক্ষা পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের মুসলমান কবিদের রচনার নিদর্শন বেশী পাওয়া যায়। তবে পল্লীগাথা পূর্ববঙ্গেই বেশী রচিত হয়েছিল।

এযুগের পশ্চিমবঙ্গের উল্লেখযোগ্য মুসলমান কবি হচ্ছেন গরীবুল্লা (গরীবুল্-লাহ্)। গরীবুল্লা 'আমীর হামজা' কাব্য রচনা শুরু করে শেষ করে যেতে পারেননি। সৈয়দ হামজা নামে আর একজন কবি অসমাপ্ত কাব্যের বাকি অংশ শেষ করেন ১৭৯২-৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। 'আমীর হামজা' মহাভারতের ধরণে লেখা বিরাট একখানি কাব্য। গরীবুল্লার দ্বিতীয় কাব্য হচ্ছে 'ইউসফ-জেলেখা'। এই কাব্য পীর বদরের জবানীতে বড়খাঁ গাজীকে ইউসফ-জেলেখার কাহিনী শোনানো হচ্ছে।

আল্লার দরগায় বারে নোঙাইয়া মাথা।
কহিতে লাগিল ইউসফ-জেলেখার কথা॥

সে যুগের মুসলমান কবিরা শুধু বাঙ্‌লা ভাষাকেই ভালোবাসেননি, অসাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রদর্শন করেছেন। গরীবুল্লা 'ইউসফ-জেলেখা' কাব্যের উপসংহারে বলছেন—

এই গ্রামের বিচে আছে জত জন।
সবাকারে সালামতে রাখ নিরঞ্জন॥
কার নাম জানি কার নাম নাহি জানি।
সবাকারে সালামতে রাখিবে রব্বানি॥
আসরে বসিয়া যত হিন্দু মুসলমান।
সবাকার তরে আল্লা হও নেঘাবান॥

'আমীর হামজা' কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডের লেখক সৈয়দ হামজা 'মনোহর-মধুমালতী,' 'হাতেম তাই', (১৮০৪ খ্রীঃ) 'জৈগুনের পুঁথি' (জৈগুন-হানিফার কেচ্ছা) (১৭৯৭ খ্রীঃ) প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন। 'আমীর হামজার' রচনাকাল সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সৈয়দ-হামজার কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় তাঁর রচনায় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। তখনকার বাঙালী ঘরের কথা, বিশেষ করে মুসলমান ঘর-সংসারের কথা, কাব্যের ভিতর দিয়ে কবি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন।

'জঙ্গ-নামা' কাব্যের বিষয়বস্তু হ'ল হাসান-হুসেন-হানীফের কাহিনী। এই এই কাব্যে কারবালার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই কাহিনী শুধু মুসলমান-দের নয়, হিন্দুদেরও অতি প্রিয় ছিল। চট্টগ্রামের কবি নসরুল্লা খান ও মনসুর অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে 'জঙ্গ-নামা' রচনা করেন। রাধাচরণ গোপ নামে বীরভূম নিবাসী একজন হিন্দুকবিও 'জঙ্গ-নামা' রচনা করেছিলেন।

আরবী-ফারসী প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে যে সব কাহিনী অনূদিত হচ্ছিল, কবিরা যথাসম্ভব সেই কাহিনীগুলিকে একটি স্বাভাবিক দেশীয় রূপ দান করবার চেষ্টা করেছিলেন। "...কারবালার যুদ্ধ, এজিদের কথা প্রভৃতি যেসকল বিষয় দূর দেশাগত, তাহা মুসলমান কবিরা বিদেশাগত অতিথির ন্যায় গৃহের বাহিরের একখানা এক চালায় স্থান দিয়া তৃপ্ত হন নাই, তাঁহারা এমনভাবে সেই সকল অতিথিকে গ্রহণ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের রূপ বদলাইয়া তাঁহারা বাঙালী হইয়া গিয়াছেন— ...।' (৺দীনেশচন্দ্র সেন), কিন্তু বাঙ্‌লা ভাষার প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা সত্ত্বেও এই মুসলমান কবিদের রচনার মাধ্যমে বাঙ্‌লা ভাষা ধীরে ধীরে আরবী ফারসী উর্দু প্রধান হতে থাকে। অনেক সময় অতিরিক্ত বিদেশী শব্দ প্রয়োগ হেতু কাব্যের অর্থোদ্ধার করাও কষ্টকর ছিল। বিশেষ করে 'কেচ্ছা' বা কাহিনীগুলিতে মাত্রাতিরিক্তভাবে বিদেশী শব্দ প্রযুক্ত হওয়াতে বাঙালী পাঠক-সমাজ তাদের সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। নইলে এই কেচ্ছাগুলির মধ্যে যে রসবস্তু রয়েছে তাকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। দৌলত কাজী এবং আলাওল যে 'দেশীভাষাকে' সাহিত্যের বাহনস্বরূপ গ্রহণ করেছিলেন পরবর্তী কালের মুসলমান কবিরা তা থেকে কিছুটা দূরে সরে পড়েছিলেন। তবুও যাই হোক, এসব রচনা বাঙ্‌লা সাহিত্যকে যে কিছুটা উর্বর করেছিল তা স্বীকার করতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গে পীর বড় খাঁ গাজীকে নিয়ে কতগুলি গাজীর গান রচিত হয়েছিল। এই গান বা পাঁচালীর রচয়িতাদের বেশীর ভাগ মুসলমান। আমরা রায়মঙ্গলেও পীর বড় খাঁ গাজীকে পেয়েছি। সেখানে দক্ষিণরায় ও বড় খাঁ গাজীর বিরোধ ও পরে মিলনের কথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু গাজীর গানে বিরোধের কথাই আছে, মিলনের কথা নেই। বরং দক্ষিণরায়ের পরাজয়ের ভিত্তিতেই বড় খাঁ গাজীর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ধরণের কাব্যের মধ্যে শেখ ফয়জুল্লার 'গাজী বিজয়' এবং সৈয়দ হালুমিঞার 'গাজীমঙ্গল কাব্য' এবং আবদুল গফুরের 'কালুগাজী ও চম্পাবতী' কাব্য উল্লেখযোগ্য। শেখ ফয়জুল্লা 'গোরক্ষ বিজয়' এবং 'সত্যপীরের পাঁচালী'ও রচনা করেছিলেন।

চট্টগ্রাম অঞ্চলের কবি জৈন্-উদ্-দীন 'রসুল বিজয়' নামক একখানি কাব্য রচনা করেন। আলীরাজা 'জ্ঞানসাগর' ও 'সিরাজকুলুপ' নামে দুখানি 'যোগ সাধনা' বিষয়ক নিবন্ধ রচনা করেন। ইনিও চট্টগ্রামের অধিবাসী এবং একজন উৎকৃষ্ট পদকর্তা ছিলেন। এছাড়া মুন্‌সি আবদুল আজিজের 'দরবেশ নামা', সফিউদ্দিনের 'জঙ্গনামার পুঁথি' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কাহিনী-কাব্য।

লোক-গাথা বা পল্লীগাথা বাঙ্‌লার অতুলনীয় সম্পদ। এই পল্লীকাব্য-গুলির রচয়িতা হিসাবে মুসলমান কবিদের কাছে বাঙালী অনেকদিক থেকেই ঋণী। 'প্রেম-প্রসঙ্গে ইহারা মনস্তত্ত্বের সুক্ষ্মতম সন্ধান রাখেন এবং এত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মানসিক ভাবের বিশ্লেষণ করিতে সমর্থ যে, অনেক স্থলেই তাঁহারা বৈষ্ণব কবিদের সমকক্ষ। ইহারা সকলেই খাঁটি বাঙালী।' আমরা এ ধরণের কাব্যের কথা পূর্বে আলোচনা করেছি।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে চট্টগ্রামের দৌলৎ উজীর 'লায়লি-মজনু' নামে বিখ্যাত প্রেমমূলক কাব্য রচনা করেন। কবির কাব্যখানি রসোত্তীর্ণ হয়েছে। ইনি ব্রজবুলিতেও অনেকপদ রচনা করেছিলেন। এই ধরণের অন্যান্য রোমান্টিক্ কাব্য বা কবিতার মধ্যে 'কাফেন চোরা', আল্লা হামীদের 'আমীর সওদাগর' ও 'ভেলুয়া সুন্দরী', 'চৌধুরীর লড়াই' 'দেওয়ান মদিনা', 'পরীবানুর হঁঅলা', 'মাণিকতারা', 'নিজাম ডাকাইতের পালা', অন্ধকবি ফৈজুর 'সুরত জামাল ও আধুয়া সুন্দরী', 'দেওয়ান ভাবনা', 'নছর মালুম', 'নূরন্নেহা ও কবরের কথা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই কাব্য বা ছড়াগুলির কোনো কোনোটি উনবিংশ শতাব্দীর রচনাও হতে পারে। অষ্টাদশ থেকে উনবিংশ, এমন কি বিংশ

শতাব্দীর প্রথমভাগেও এই ধরণের কাব্য রচিত হয়েছে। 'চৌধুরীর লড়াই' কাব্যের মুসলমান কবি বলছেন—

মক্কার পুর্বেত বন্দি ঠাকুর জগন্নাথ।
আচার বিচার নাই বাজারে বিকায় ভাত॥
এমন সুধন্য জায়গা জাতি নাহি যায়।
চণ্ডালেতে রাঁধে ভাত ব্রাহ্মণেতে খায়॥

এখানে সাম্প্রদায়িক নোঙ্‌রামির কোনো চিহ্ন নেই। 'নূরন্নেহা ও কবরের কথা' নামক গীতকাব্যের কবি বলেন—

বিছ্‌মিল্লাহ্‌ আর শ্রীবিষ্ণু একই গেয়ান।
দোফাঁক করিয়া দিয়া প্রভু রাম রহ্‌মান॥

এখানে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রীতির বন্ধন স্থাপনের আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে।

মুসলমান কবিরা যুদ্ধ-বর্ণনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন, এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়ে অনেক ছড়া বা খণ্ডকাব্যও রচনা করেছেন। কিন্তু প্রণয়-গাথা রচনাই তাঁদের শ্রেষ্ঠ পরিচয় বহন করে। এখানে 'মজুনা' নামে এক গীতিকাব্যের দুটি চরণ উদ্ধৃত করছি। তা থেকে কবির রোমান্টিক্ দৃষ্টিভঙ্গীর সার্থক পরিচয় পাওয়া যাবে—

মন কুইলার ছাও—ওরে মন কুইলার ছাও।
কোন্নে তুমি চিনি লৈলা—দইনালী বাও॥

[ও গো মন-কোকিলের ছানা—দখিনা হাওয়া তুমি কি করে চিনলে!]

এখানে সার্থক কবিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। এই যে দৃষ্টিভঙ্গী তা শুধু মুসলমান কবির নয়, সমগ্র বাঙালী জাতির হৃদয়াবেগেরই পরিচয়।

ইতিহাসাশ্রিত কাব্য

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মঙ্গলকাব্য, ধর্মবিষয়ক কাব্য ও রোমান্টিক কাব্যগুলির পাশাপাশি সমসাময়িক বা কিছু আগের বাস্তব ঘটনার উপর ভিত্তি করে একধরণের ইতিহাসাশ্রিত আখ্যায়িকা কাব্য গড়ে উঠছিল। কিন্তু এ সব কাব্যে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর বড় অভাব ছিল। অধিকাংশ কবিই ইতিহাসের পটভূমিকায় অলৌকিকত্বের অবতারণাও ঘটিয়েছেন। এ ধরণের রচয়িতাদের

মধ্যে নড়ালের গঙ্গারাম দত্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গঙ্গারাম দত্ত 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' নামে একখানি কাব্য রচনা করেন। তাঁর কাব্যে, বর্গীর হাঙ্গামা, এবং তদ্‌জনিত তখনকার বাঙ্‌লাদেশের অবস্থা ইত্যাদির কথা বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কবি পুরানো পথ ধরেই চলেছেন। ইতিহাসকে হাতে পেয়েও কাব্যকে অলৌকিকত্বের ভারে ক্লিষ্ট করে তুলেছেন। তাঁর কাব্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবতাদের আবির্ভাবও ঘটেছে। গঙ্গারাম দত্ত একখানি রামায়ণও রচনা করেছিলেন।

'মহারাষ্ট্র পুরাণের' মতো উত্তরবঙ্গের রতিরাম দাসের 'দেবীসিংহের অত্যাচার'ও একখানি ইতিহাসাশ্রিত কাব্য। বিজয়কুমার সেন নামে এক কবি ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের পিতা কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের কাশীযাত্রার বিষয়ে 'তীর্থমঙ্গল' নামে তথ্যবহুল একখানি কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যে সে যুগের সমাজের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দী থেকে এ ধরণের রচনা আরও বেড়ে যায়। পরবর্তীকালে 'কান্তনামা', 'সাঁওতাল হাঙ্গামার কথা', 'রাজমালা', 'নয় আনার কবি' প্রভৃতি আখ্যায়িকা-কাব্য রচিত হয়। গদ্যেও এ ধরণের কাহিনী কিছু কিছু রচিত হয়েছিল।

পূর্ববঙ্গ-গীতিকা

পূর্ববঙ্গের ধর্মপ্রভাবমুক্ত প্রণয়মূলক কাব্যের কিছু কিছু আলোচনা করেছি। ৺দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় চন্দ্রকুমার দে, আশুতোষ চৌধুরী প্রভৃতি কয়েকজন বাঙ্‌লা সাহিত্য-রসিক পুঁথিসংগ্রাহকের কাছ থেকে কতকগুলি পূর্ববঙ্গের 'লোকগাথা' পান। অনেকে মনে করেন যে এগুলি খুব প্রাচীন নয়। আমরা জানি লোকের মুখে মুখে এসব প্রণয়-গীতি বহুদিন আগে থেকে চলে আসছিল। পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহ, ঢাকা, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী প্রভৃতি অঞ্চলে এধরণের গীত গাওয়া হত। লেখকদের অধিকাংশই দরিদ্র পল্লীবাসী। গীতিকাগুলির বেশীর ভাগ গল্পই ট্রাজেডি-রসসিক্ত। ময়মনসিংহ-গীতিকার 'মহুয়া,' 'মলুয়া,' 'চন্দ্রাবতী,' এবং পূর্ববঙ্গ-গীতিকার 'আমীর সওদাগর' ও 'ভেলুয়াসুন্দরী' প্রভৃতি কাব্য পল্লীকবিদের বিষাদান্ত কাব্য রচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। সে যুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যে শুভপরিণামান্তক কাহিনীকাব্যের পরিবর্তে এরকম বিষাদান্ত কাহিনীকাব্য মধ্যযুগীয় সাহিত্যকে অপূর্বতা দান করেছে। অষ্টাদশ শতকের

পূর্বের, এবং অষ্টাদশ শতকের ও তার পরের পূর্ববঙ্গের আখ্যায়িকা-কাব্যগুলি নিয়ে এই গীতিকাগুলি সংকলিত হয়েছে। এই কাব্যগুলির মধ্যেই আগামী দিনের প্রণয়-মূলক রোমান্টিক রচনার বীজ নিহিত ছিল।

বাঙ্‌লা সঙ্গীতের একটি দিক

বাঙ্‌লা সাহিত্যের প্রথম থেকেই সঙ্গীতের ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। সঙ্গীত বিশ্বের ভাব প্রকাশের প্রথম অভিব্যক্তি স্বরূপ। বৌদ্ধ দোহা থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সঙ্গীতের গতিবেগ অনিরুদ্ধই রয়েছে। বাঙ্‌লা মঙ্গল-কাব্য প্রভৃতি নানা রাগরাগিণীতে গাওয়া হ'ত। বাঙ্‌লা সঙ্গীতের সার্থক রূপ প্রকাশ পায় বৈষ্ণব পদাবলীতে। এখানে রাগরাগিণীর বিচার মুখ্য নয়, প্রাণের আবেগ ও আকুলতাকে ভাষারূপ দান করাই মধ্যযুগের পদরচয়িতাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। কীর্তন গান মধ্যযুগের একটি বিরাট আবিষ্কার বলা যায়। মধ্যযুগের সঙ্গীতধারাকে মুখ্যত অধ্যাত্ম-সঙ্গীতের ধারা বলতে পারি। তবে অধ্যাত্ম-ধারার সঙ্গে সঙ্গে লোকসঙ্গীতের একটি ধারাও বর্তমান ছিল। প্রাচীন কাল থেকেই পাঁচালী, খেউড় প্রভৃতি গান প্রচলিত ছিল। তরজাগান চৈতন্যদেবের সময়েও প্রচলিত ছিল। এই আর্যা-তরজা, খেউড় অষ্টাদশ শতক, এমনকি, ঊনবিংশ শতকের পরিবর্তনের ধারার মাঝেও পুরোদমে চলছিল। যে সব লোকগাথার কথা উল্লেখ করেছি তাও বাঙ্‌লার পল্লীতে পল্লীতে গীত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে রচিত জয়নারায়ণ ঘোষালের 'করুণানিধান বিলাসে' বিভিন্ন রকমের বাঙ্‌লা গানের নিয়ম-পদ্ধতির একটি তালিকা পাওয়া যায়। তাতে তিনি নানা ঢংএর কীর্তন, তরজা, মালসীগান, প্রভৃতির উল্লেখ করে অন্যান্য রীতির গান সম্বন্ধে বলছেন—

বাইশ আখড়া ছাপ প্রেমে চুরচুর।
গোবিন্দ মঙ্গল জারি গাইছে সুধীর॥
... ...
সাপড়িয়া বাদিয়ার ছাপের লহর।
বাঙ্‌লার নব গান নূতন ঝুমুর॥

অষ্টাদশ শতকে বাঙালীর রাষ্ট্র-জীবনে যে পরিবর্তন দেখা দিল তাতে বাঙ্‌লার পল্লীগীতি ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে আসে এবং নবসৃষ্ট নাগরিক

সমাজের মধ্যে নতুন রকমের গান রচিত হতে থাকে। শারি, জারি, মালসী গান প্রভৃতিও এই নাগরিক সমাজের দৃষ্টি-ভঙ্গীর ধারা প্রভাবিত ও পরিবর্তিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে এধরণের গান 'শহুরে' রূপ পরিগ্রহ করে। কবির লড়াই, ঢপ-কীর্তন প্রভৃতি অষ্টাদশ শতকে প্রচলিত ছিল। 'কবির লড়াই'য়ে খেউড় গানের চরম প্রকাশ দেখেছি। উচ্চাঙ্গের গানকে 'আখড়াই' বলা হ'ত। এই আখড়াই গাওয়া সহজসাধ্য ছিল না বলে তাকে আর একটু সহজ করে নিয়ে 'হাফ-আখড়াই' গানের উদ্ভব হয়। এসব উনবিংশ শতাব্দীর কথা।

অধ্যাত্ম সঙ্গীতের যে ধারার কথা আগে উল্লেখ করেছি, অষ্টাদশ শতকে বৈষ্ণব ধারার পাশাপাশি রামপ্রসাদের শাক্ত-সঙ্গীতে তার চরম সার্থক রূপ দেখতে পাই। রামপ্রসাদের পর দেওয়ান রঘুনাথ রায়, কমলাকান্ত, কালীমির্জা প্রভৃতি এই সঙ্গীতধারাকে আরও সার্থক করে তোলেন। আউল-বাউল-দরবেশ-সাঁইরা প্রহেলিকাময় গানের সৃষ্টি করেছিলেন। সুফিমতাবলম্বী সাধকেরা বৈষ্ণব কবিদের মতো প্রেম-বিহ্বল সঙ্গীত রচনা করেন। এ ধরণের রচয়িতাদের মধ্যে লালন ফকির, মদন বাউল, গঙ্গারাম বাউল প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

বাঙ্‌লার মধ্যযুগের এবং পরের যুগের সঙ্গীতধারা উনবিংশ শতাব্দীর 'শহুরে' সমাজে নব কলেবর নিয়ে দেখা দেয়। প্রাচীন দিন থেকে যে পাঁচালী গান আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল, তার আধ্যাত্মিকতার গুরুভার কমে এসে একটু হালকা ধরণের রঙ্গ-রসিকতাপূর্ণ হয়ে ওঠে।

অন্যদিকে মধ্যযুগ থেকে এক নতুন রকমের গীতাভিনয় সঙ্গীতধারার পাশাপাশি গড়ে উঠে। এই ধরণের অভিনয়ের পদ্ধতিকে বলা হত 'যাত্রা'। দেবদেবীর মহিমা কীর্তনের জন্যেই এ 'যাত্রার' উদ্ভব। পুরানো দিনে 'কৃষ্ণলীলা', 'কালীয়দমন', 'চণ্ডীযাত্রা', 'চৈতন্যযাত্রা' প্রভৃতি অভিনীত হ'ত। এই ধরণের যাত্রার মধ্যে সংলাপ অল্পই থাকত। গানের মাধ্যমেই উত্তর প্রত্যুত্তর চলত। উনবিংশ শতাব্দী থেকে এই যাত্রার রূপ পরিবর্তিত হতে থাকে এবং রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রার অনেক পরিবর্তন দেখা দেয়। তবে এখনও বাঙ্‌লা দেশে থিয়েটার-সিনেমার যুগে যাত্রাভিনয় দেখার আগ্রহ বাঙালীর একটুও কমেনি।

মধ্যযুগের শেষ অধ্যায়

অষ্টাদশ শতকে যখন নানা দুর্যোগের মাঝে বাঙ্‌লা দেশে দেবদেবীর মহিমাগান চলছে, ভারতের অন্যান্য দেশে হিন্দু-মুসলমান কবিরা নিজের দেশ ও জাতির সুখ-দুঃখ-গৌরবের গান গেয়ে চলেছেন। বাঙ্‌লার বাইরে অনেক বীরগাথা রচিত হয়েছে। কিন্তু এদেশে এত ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও নানা সুখ-দুঃখ, লাঞ্ছনা, নিপীড়নের ক্ষণগুলিকে অলৌকিকত্বের মায়া-আবরণে লুকিয়ে রাখার আপ্রাণ প্রয়াস চলেছে। এরকম লুকোচুরি সাহিত্য ও সমাজে বেশীদিন চলে না। তাই কখনও কখনও কোনো কবি হয়ত আকস্মিক-ভাবে রূঢ় সত্যকে প্রকাশ করে ফেলেছেন। আবার কখনও সত্যকে চাপা দিয়ে ভুয়া কল্পনাকে আশ্রয় করে চোখের জলে মেঘের জলে এক করে ফেলেছেন। ক্রমেই দিন এলো ফুরিয়ে, সাহিত্যের আঙিনায় বেজে উঠল বিদায়ের পূরবী, পুরানোর জের টেনে আর চলে না। পলাশীর কামান-গর্জন বাঙালীকে একেবারে বোবা করে দিল। চেষ্টা চলল বিদ্যাসুন্দরের মতো কামোদ্দীপক কাব্য এবং প্রণয়গাথা রচনার। কোচবিহারের উমানাথ লিখলেন রাজপুত্র হীরাধর ও তিন বন্ধুর কথা, কবি সরুফ রচনা করলেন 'দামিনী চরিত্র'। উত্তর বঙ্গের 'নীলার বারমাসী গান'ও এই ধরণের গাথাকাব্য। 'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা' প্রভৃতির অনুবাদ হতে লাগল। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে, হিতোপদেশের অনুবাদ, হিন্দী 'তুতিনামার' অনুবাদ, দ্বিজ-জগন্নাথের 'স-সে-মি-রা'র গল্প প্রভৃতি রচিত হচ্ছে। শিশুদের উপযোগী করে কবিকর্ণের 'ব্যাঙ্গমা-বেঙ্গমীর উপাখ্যান', মদন ঘোষের 'ব্যাঙ্গ কাহিনী' প্রভৃতি রচিত হচ্ছে। এই সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে আঁক কষার পালা (শুভঙ্করের আর্যা)—তাই নিয়েও যদি সাহিত্যরূপ দেওয়া যায়। ন্যায়, স্মৃতি, জ্যোতিষ, আয়ুর্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রের চর্চা চলল। খ্রীষ্টমাহাত্ম্যবিষয়ক কাব্য রচিত হ'ল। কিন্তু সাহিত্যে আগের মতো করে প্রাণ প্রতিষ্ঠা আর করা গেল না।

ইংরেজরা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তন করে। এবং সেই থেকে বাঙ্‌লা সাহিত্যেরও পরিবর্তনের ক্ষণ আরও ঘনিয়ে আসে। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ন্যাথানিয়েল ব্রাসে হ্যালহেডের বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রিত হয়।

রেভারেণ্ড লঙ্-এর উক্তি অনুসারে ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বাঙ্লা বই ছাপানো চলতে থাকে। এই মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাব বাঙ্লা সাহিত্য ও সমাজের একটি আকর্ষণীয় ঘটনা।

ঔপনিবেশিক স্বার্থ প্রতিষ্ঠার জন্য ইংরেজরা এদেশে সব কিছুরই আধা-আধি ব্যবস্থা করল। কিছু দিয়ে এবং অনেকখানি না দিয়ে যদি দেশ শাসন করা যায়, তা হলে স্বার্থ বজায় রাখা সম্ভব হবে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির টোপ ফেলতে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে। বিজিত বিজেতার সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে গ্রহণ করে নিজের ঐতিহ্যকে ভুলে গেলে ঔপনিবেশিক স্বার্থের বুনিয়াদ হবে পাকা—এই ছিল তাদের লক্ষ্য। বড়শী যে গলায় বেঁধেনি তা নয়। অনেক দুঃখের পর সেদিনের গ্লানির অনুশোচনা জেগেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে।

বাঙ্লা গদ্য রচনার সূত্রপাত অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বেই হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের দিন এগিয়ে আসেনি বলে পদ্যই তখন ভাবপ্রকাশের বাহন। অষ্টাদশ শতকে ম্যানুয়েল দ্য আসুম্প্সাঁও 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ' (Creper xastrer Orthbhed) নামে একখানি গদ্য বই রচনা করেন। বইখানি পর্তুগালের লিসবনে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ইনি একখানি শব্দকোষযুক্ত ব্যাকরণও রচনা করেছিলেন।

খ্রীষ্টান মিশনারীরা এদেশে অনেকদিন আগে থেকেই ধর্মপ্রচার করছিলেন। ইংরেজের জয়লাভে তাঁদের প্রচারের আরও সুবিধা হল। শ্রীরামপুরে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের মিশন প্রতিষ্ঠিত হল। এখানেই প্রথম ছাপাখানা স্থাপিত হয়। যেসব ইংরেজ বিলেত থেকে এদেশে শাসন-বিভাগের কর্মচারীর পদ নিয়ে আসত তাদের এই দেশের ভাষার সঙ্গে পরিচিত করাবার জন্য, বাঙ্লা ভাষা শেখাবার জন্য ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হল। কিন্তু সাহিত্য যে সবই পদ্যে লেখা। কাব্য করে ত আর কথা বলা যাবে না। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় গদ্য রচনার আশু প্রয়োজন দেখা দিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুরানো ধারা ক্ষীণ হয়ে এসেছে। এই যুগের রচয়িতারা না গ্রহণ করলেন নতুন দিনের সত্যকে, না পারলেন পুরানোকে আঁকড়ে ধরে থাকতে। নিজেকেও আত্মস্থ করতে পারলেন না, মানুষকেও করলেন না বিশ্বাস, দেবতার উপরও রইল না কোনো নির্ভরতা। এমনি করে ধীরে

ধীরে পুরানো সৌধ বালি চাপা পড়ছিল। তবে শেষ হতে হতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝিতে এসে পড়ল। তার আলোচনা পরের পর্বে আসছে।

ভারতবর্ষের বাইরে বিভিন্ন দেশে যে ভাবে সামাজিক আন্দোলন আলোড়ন গড়ে উঠেছিল, ভারতে সেরকম কিছু গড়ে উঠলেও তার সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনো সংবাদ পাওয়া দুষ্কর। তবে প্রাচীন মঙ্গলকাব্যগুলিতে সমাজ, দেশ এবং কালের কিছুটা সংবাদ পাওয়া যায়।

ইংরেজের সাম্রাজ্য-স্বার্থ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্‌লার সমাজব্যবস্থায় দেখা দিল পরিবর্তন। তখন পুরাতনের জের টানা আর চলে না। ইংরেজ জাতি সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা দূরদর্শী। তারা বুঝল সামাজিক মনকে নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। শাসনযন্ত্রের সঙ্গে তারা নিয়ে এল পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসের সংবাদ। অন্যদিকে মুদ্রাযন্ত্র ঘটালো আকস্মিক পরিবর্তন। শিল্প-বাণিজ্য গেল ইংরেজের হাতে। শক্তিশালী ইংরেজ সমস্ত জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নিজের হাতে নিল। ইংরেজরা এটাও জানত যে, প্রজাপুঞ্জের বিদ্রোহের মাধ্যমে রাজতন্ত্র ও সামন্ত-তন্ত্রের শক্তির পরীক্ষা এরই মধ্যে অনেক দেশেই হয়ে গেছে। এখন মুষ্টিমেয়ের অন্যায় অধিকারের চেয়ে 'মানবাধিকার'ই বড়ো। তাই তারা পুরানো দিনের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে আর উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হচ্ছে না; তবে এও ঠিক যে পুরানো ব্যবস্থাকেই নতুন পরিস্থিতির মাঝে তারা প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছে। ভেঙে-পড়া সামন্ততন্ত্রকে আবার তারা জাগিয়ে তুলল। জমিদারশ্রেণী ইংরেজের 'এজেন্ট' হয়ে চিরাচরিত প্রথায় দরিদ্র প্রজাদের উপর অত্যাচার চালাতে লাগল। ফলে এদেশেও খণ্ড-বিপ্লব দেখা দিয়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দী হচ্ছে পুরানো সাহিত্যধারার ক্ষয়ে আসার যুগ। আবার এ যুগেই আগামী দিনের সম্ভাবনার আভাস রয়েছে। অন্যদিকে উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্‌লার মানুষ একদিকে যেমন পুরানোকে জিইয়ে রাখার চেষ্টা করেছে, তেমনই নতুন চিন্তাধারার আবির্ভাবে পুরাতনের জীর্ণতা ও দীনতাকে নগ্নভাবে প্রকাশ করে নবজীবনের পথে বেরিয়ে পড়তে চাইছে। কেউ কেউ আবার এই দুয়ের দ্বন্দ্বে হাবুডুবু খাচ্ছেন। বিত্তহীন ও দরিদ্র মধ্যবিত্ত

বাঙালী নিজেদের পরিচয় হারিয়ে ফেলেছে। দেশের মানুষ নিজের দেশের সম্পদ থেকে হয়েছে বঞ্চিত। পলাশীর বিপর্যয়ের পর বাঙালীর সামনে রয়েছে শুধু অন্ধকারময় 'পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর' পথ। পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারাকে যাঁরা গ্রহণ করেননি তাঁরা পুরানো পথ ধরে চলতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ সামনে যে যুগ এগিয়ে আসছে, সে যুগের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে 'পেরিয়ে-আসা' যুগের দৃষ্টিভঙ্গীর আর মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। তবুও এটা ঠিক যে এই দৃষ্টিভঙ্গীকে গ্রহণ না করে পুরাতনের পুনরাবৃত্তিতে জাতির আর কোনো বৈভব দেখা দেবে না। বণিক শক্তির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পল্লীকেন্দ্রিক বাঙ্‌লা দেশের পল্লীগুলির অর্থনৈতিক সামাজিক দুর্বলতা উত্তরোত্তর প্রকট হয়ে উঠল। গ্রামগুলি গেল নিঃশেষিত হয়ে। শিল্প-বাণিজ্যসংস্থাগুলিকে কেন্দ্র করে শহর গড়ে উঠল। বাঙ্‌লার সংস্কৃতির ব্যাপক ক্ষেত্র এল সঙ্কুচিত হয়ে। সেই জায়গায় দেখা দিল 'শহুরে কাল্‌চার'। দেখা দিল জীবনের একান্ত প্রয়োজনের ক্ষণগুলি। মানুষ বেরিয়ে পড়ল শান্তির নীড় ছেড়ে বৃহত্তর জীবন-সংগ্রামের ক্ষেত্রে। কোথায় তার জীবনের সার্থকতা, কোথায় নতুন জীবনের বাণী, কি করে জীবনকে সহস্র আঘাতের মাঝেও প্রতিষ্ঠিত করা যায়—এ তাকে জানতে হবে। সবার উপরে যে মানুষ সত্য, সেই মানুষের মহিমা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তারই উপকরণ নিয়ে আসছে উনবিংশ শতাব্দী।

চতুর্থ পর্ব

আধুনিক যুগ

(১৮০০ থেকে–)

১

প্রাচীন ও আধুনিক যুগসন্ধি কাল

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর পলাশীর বিপর্যয়ের পর কয়েকটি বছর বাঙ্‌লা সাহিত্য ও সমাজের অরাজকতার যুগ। সে সময়ের সমাজের বর্ণনা সামান্যই পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের ভিতর দিয়ে সে যুগের কিছুটা পরিচয় দিতে প্রয়াস পেয়েছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ইংরেজের বাঙ্‌লাদেশ জয়, দেশে অরাজকতা, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি সাহিত্য রচনার প্রতিকূল অবস্থাই সৃষ্টি করেছিল। তবে পূর্ববঙ্গের গীতি-কাব্যে এবং কিছু কিছু মঙ্গলকাব্যে হিন্দু-মুসলমান অধ্যুষিত সমাজের কিছুটা পরিচয় পেয়েছি। কোনো কোনো রচনায় প্রজাসাধারণের অসন্তোষের সংবাদও পেয়েছি।

শ্রদ্ধেয় ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাঁর 'সাহিত্যে প্রগতি' নামক গ্রন্থে প্রাক্-আধুনিক যুগে বৈষ্ণব সাহিত্যে ও বৈষ্ণব আন্দোলনে গণ-আন্দোলনের রূপ দৃষ্ট হয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। লেখকরা সাধারণশ্রেণী থেকে উদ্ভূত। পরে অবশ্যি এ আন্দোলন একেবারে আধ্যাত্মিকতায় নিমজ্জিত হয়। অন্যান্য কাব্যের রচয়িতাদের মতো বৈষ্ণব লেখকদের রচনায় রাজা-রাজড়ার গুণকীর্তন নেই। তবে ভাববিভোর মনের সংবেদনশীল প্রকাশ ছাড়া মানুষের সংবাদ সেখানে অস্পষ্ট।

ভারতচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই পুরানো যুগের সাহিত্যের প্রধান ধারা নিঃশেষিত হয়ে আসে। এদিকে পলাশীক্ষেত্রে ইংরেজের হাতে পরাজয়ের ফলে বাঙ্‌লার সমাজ ও সাহিত্যে আকস্মিক পরিবর্তনও এসে যায়। সমাজ-ব্যবস্থায় যে ক্রমপরিবর্তন দেখা দিত ইংরেজ আগমন সে ক্রমে বিপর্যয় ঘটাল। অর্থ-নৈতিক কাঠামো হঠাৎ বদলে গেল। একটা অবস্থা ও ব্যবস্থা থেকে আর একটা পর্যায়ে গিয়ে পৌছানোর পূর্বেই ইংরেজ এলো সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ নিয়ে। তবুও বাঙালী যে অম্‌নিতেই তার বশ্যতা স্বীকার করেনি তার খবর আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরাণী', 'আনন্দমঠ', প্রভৃতি উপন্যাসে পেয়েছি। তা হতে আমরা দেখতে পাই, আগে যেমন ছিল ঠিক তেমনই

আছে। সে সময়ে রাজা, নবাব ও জমিদারদের অত্যাচার চলছে দরিদ্র প্রজাদের উপর, দুর্ভিক্ষ-পীড়িত জনসাধারণের অন্ন-বস্ত্র লুঠে নিচ্ছে শাসক-গোষ্ঠী, আর বিক্ষুব্ধ প্রজাপুঞ্জ লুঠ করছে খাদ্যভাণ্ডার। সময় সময় বিদ্রোহও করছে।

ইংরেজদের আসার পর দেশের অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক সমস্ত ব্যবস্থাই ওলট-পালট হয়ে গেল। দেশের ছোটো খাটো ব্যবসায়ী, শিল্পী-গোষ্ঠী এবং কৃষকদের উপর আঘাত এল সর্বপ্রথম। জমিদাররা রাজস্ব আদায় করছেন প্রজা ঠেঙিয়ে। যাঁরা এই নতুন ব্যবস্থায় খুসি হননি, তাঁরা নিজেদের প্রজাদের নিয়ে ছোটোখাটো যুদ্ধ বাধিয়ে, পরাজিত হয়ে একেবারে নিঃসম্বল হয়ে পড়েন। যাঁরা পলাশী যুদ্ধ থেকে লাভের আশায় ছিলেন তাঁদের ঐ একই অবস্থা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর আগেই ইংরেজরা মিশন প্রতিষ্ঠা করেছে, মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তন করেছে। তারা একদিকে সহানুভূতিশীল শাসনযন্ত্র ব্যবহার শুরু করেছে, অন্যদিকে ঔপনিবেশিক স্বার্থ বজায় রাখবার জন্য, এদেশের দরিদ্র শ্রেণীকে নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজে লাগিয়ে লাভ লুঠবার জন্য নানারকম মিঠে-কড়া ইংরেজি মশলা চালান দিচ্ছে। ইংরেজরা রাজ্য লাভ ক'রে আইন প্রণয়ন করতে লেগে গেল। মুদ্রাযন্ত্রে ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি প্রকাশিত হতে থাকে। ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাঙ্‌লা শেখাবার গদ্য রচনার প্রয়োজন। তার জন্য মুন্সী পণ্ডিত নিযুক্ত হলেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হ'ল।

অন্যদিকে বনেদি রাজবংশগুলি অবসিতপ্রায় হয়ে এসেছে। সাধারণ কৃষকশ্রেণী, তাঁতী প্রভৃতি নিজেদের কুলগত কর্ম পরিত্যাগ করে ইংরেজ সরকারের পাইক-বরকন্দাজ, লেঠেল প্রভৃতির কাজ নিচ্ছে। ইংরেজ আমলে দালালী ব্যবসা করে এবং ইংরেজ-প্রভুর ব্যবসার প্রসার ঘটিয়ে একটি অভিজাতশ্রেণী গড়ে উঠে। এদের বেশীর ভাগই রাজস্ব-আদায়কারী জমিদার। আবার ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কন্‌ট্রাক্‌টার জাতীয় লোকও ছিল। এরা অল্প পয়সায় শিল্প-বাণিজ্যের মালমশলা ও মজুর সংগ্রহ করত। যে অসচ্ছল মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল তারা নিজেদের ভরণপোষণের জন্য নিজেরা রোজগার করত।

কবিওয়ালা

অষ্টাদশ-উনবিংশের যুগসন্ধিতে কবিওয়ালার গান, পাঁচালী ও অন্যান্য সঙ্গীত রচিত হচ্ছিল। কবিগান প্রায় সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই প্রচলিত ছিল। ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের সময় থেকে এ ধরণের গানের বহুল প্রচলন হয়। সে যুগের বড় লোকেরা 'কবির লড়াই' শুনতে ভালোবাসতেন। অনেক সময় তা অশ্লীল 'খেউড়ে'ও পরিণত হত। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই এ ধরণের গান বাঁধতেন। উচ্চ শ্রেণীর কবিওয়ালা কিছু কিছু থাকলেও বেশীর ভাগ কবিওয়ালাই সাধারণ দরিদ্রশ্রেণীর লোক ছিলেন। হরগৌরী, কালী, দেহতত্ত্ববিষয়ক এবং সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে এঁরা গান রচনা করতেন। প্রেমবিষয়ক গান ত ছিলই। কবিগানে দুই দলের মধ্যে গানের প্রতিযোগিতা হ'ত। গানের মাধ্যমে একদল প্রশ্ন করত কোনো বিষয়ে আর এক দল গানের মাধ্যমেই তার উত্তর দিত। কবিওয়ালাদের মধ্যে যাঁরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁদের আলোচনা করছি।

রাম বসু (রামরাম বসু নন) কবিওয়ালাদের মধ্যে বেশ নাম করে ছিলেন। বিশেষ করে তাঁর 'সখী সংবাদ' খুব বিখ্যাত ছিল। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। প্রথমে ইনি ভবানী বেণে, নীলুঠাকুর প্রভৃতির দলে গান বাঁধতেন, পরে নিজে একটি দল গঠন করেন। তাঁর 'তুমি যে কোয়েছ আমায় গিরিরাজ, কতদিন কতকথা। সে কথা আছে শেল সম হৃদয়ে গাঁথা।' ইত্যাদি গান বড়ই মর্মস্পর্শী।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য রামপ্রসাদের মতো শ্যামাবিষয়ক গান রচনা করেন। দেওয়ান রামদুলাল রায় (১৭৮৫-১৮৫১) ত্রিপুরার মহারাজার দেওয়ান ছিলেন। ইনিও শ্যামাবিষয়ক গান রচনা করেন। বর্ধমানের চুপীগ্রাম নিবাসী দেওয়ান রঘুনাথ রায়ও (১৭৫০-১৮৩৬) বিখ্যাত পদকর্তা ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। ইনিও শ্যামাবিষয়ক পদ রচনা করেন।

মৃজা হুসেন আলী ও সৈয়দ জাফর খানও নামকরা কবি। মৃজা হুসেন আলী ত্রিপুরার বরদাখাতের জমিদার ছিলেন।

'এণ্টুনি ফিরিঙ্গী' বিখ্যাত কবিওয়ালা ছিলেন। তিনি ছিলেন

জাতিতে পর্তুগীজ। এক ব্রাহ্মণ রমণীর প্রেমে পড়ে হিন্দু-ভাবাপন্ন হয়ে পড়েন। রাম বসু ও ঠাকুর সিংহের সঙ্গে কবির লড়াইতে এণ্টুনির কবিত্ব শক্তি ও বাক্-চাতুর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ঠাকুর সিংহ এণ্টুনিকে বিদ্রূপ করে বলছেন—

বলহে এণ্টুনি আমি একটি কথা জানতে চাই।
এসে এ দেশে এ বেশে তোমার গায়ে কেন কুর্তি নাই॥

এণ্টুনিও তক্ষুণি উত্তর দিলেন—

এই বাঙ্‌লায় বাঙালীর বেশে আনন্দে আছি।
হয়ে ঠাক্‌রে সিংএর বাপের জামাই, কুর্তি টুপি ছেড়েছি॥

রামবসু একদিন এণ্টুনিকে বিদ্রূপ করে আসরে বললেন—

সাহেব! মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি।
ও তোর পাদ্‌রী সায়েব শুন্‌তে পেলে, গালে দেবে চূণকালি॥

এণ্টুনিও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—

খৃষ্টে আর কৃষ্টে কিছু ভিন্ন নাই রে ভাই।
শুধু নামের ফেরে, মানুষ ফেরে এও কোথা শুনি নাই॥ ইত্যাদি

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্য নিয়ে গান বেঁধেছিলেন গোপাল উড়ে। আদিরসাশ্রিত গান রচনায় ইনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। এঁর দুই শিষ্য—কৈলাস বারুই ও শ্যামলাল মুখোপাধ্যায়। তাঁরা দুজনও গোপাল উড়ের উপযুক্ত সাকরেদ ছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিখ্যাত গীত রচয়িতা হচ্ছেন দাশরথি রায় (১৮০৪-১৮৫৭ খ্রীঃ)। পৈতৃকবাস ছিল বর্ধমানের বাঁদমুড়া গ্রামে। ইনি প্রথমে শাঁকাইতে নীলকুঠির কেরানী ছিলেন। পরে চাকরি ছেড়ে তিনি কবির দলে গান বাঁধতেন। দাশরথির 'প্রভাস চণ্ডী', 'দক্ষযজ্ঞ', 'মানভঞ্জন', 'বিধবা বিবাহ' প্রভৃতি কয়েকটি পালাগান পাওয়া গেছে। পদরচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি কৃষ্ণবিষয়ক পদরচনা করলেও বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিলনা, বৈষ্ণবদের সম্বন্ধে তিনি এক জায়গায় বলছেন—

গৌরাং ঠাকুরের ভক্ত চেংড়া যত অকাল কুষ্মাণ্ড নেড়া—
কি আপদ করেছেন সৃষ্টি হরি।

....

ভজহরি শ্রীনিবাস বিদ্যাপতি নিতাই দাস
শাস্ত্রে ইহাদের অগোচর নাই কিছু।
এক একজন কিবা বিদ্যাবন্ত করেন কিবা সিদ্ধান্ত
বদরিকাকে ব্যাখ্যা করেন কচু॥

শ্যামাবিষয়ক গানে দাশরথির ঐকান্তিক ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শ্যামা-মাকে উদ্দেশ্য করে কবি বলেছেন—

দুর্গে ক'র মা এ দীনের উপায়,
যেন পায়ে স্থান পায়।

এখানে কবির গভীর ভক্তিভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কবি বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। আবার এই ব্যাপারে বিরোধিতা করাতে ঈশ্বর গুপ্তকে বিদ্রূপ করতেও ছাড়েননি। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বলেছেন—

তোমরা ঈশ্বরের দোষ ঘটাবে কিরূপে।
রাখিতে ঈশ্বরের মত হইয়ে ঈশ্বরের দূত
এসেছেন ঈশ্বর বিদ্যাসাগর রূপে॥ ইত্যাদি।

ঈশ্বরগুপ্ত সম্বন্ধে বিদ্রূপ করে বলেছেন—

আমাদের ঈশ্বরগুপ্ত অলপ্পেয়ে,
নারীর রোগ বুঝেনা বৈদ্য হয়ে,
হাতুড়ে বৈদ্যেতে যেমন বিষ দিয়ে দেয় প্রাণে বধি॥

যে যুগ এগিয়ে এসেছে, তার কথা ততটা নেই। পুরানো যুগের ভক্তি এবং নবাবী আমলের অশ্লীলতা, তত্ত্ব গাম্ভীর্যের সঙ্গে স্থূল রকমের হাস্যরস সবই তাঁর কাব্যে আছে। দাশরথির যে পাণ্ডিত্য ছিল তার সার্থক প্রকাশ ঘটার আরও সুযোগ ছিল। দাশরথির রাধাকৃষ্ণবিষয়ক বিখ্যাত পদ 'হৃদি বৃন্দাবনে বাস কর যদি কমলাপতি। ওহে ভক্তি প্রিয়, আমার ভক্তি হবে রাধাসতী' ইত্যাদি আমাদের সম্মুখে বৈষ্ণব ভাবুকের ছবিটি তুলে ধরে। দাশরথির পর যাঁরা বৈষ্ণব গীত রচনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণকান্ত চামার, নীলমণি পাটনী, ভোলা ময়রা, নিত্যানন্দ বৈরাগী, গোজ্‌লা গুঁই, রঘুনাথ তাঁতী প্রভৃতি কবিদের নাম উল্লেখযোগ্য।

হরেকৃষ্ণ দীর্ঘাড়ী বা হরুঠাকুর (১৭৩৮-১৮১৩ খ্রীঃ) বিরহের পদ রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইনি মহারাজ নবকৃষ্ণের গৃহে কবিগান গাইতেন। ফরাস-ডাঙ্গার গোন্দালপাড়া গ্রামের রাসু ও নৃসিংহ দু'ভাই সখীসংবাদ গাইতেন। যজ্ঞেশ্বরী নামে একজন মহিলা কবিও সখীসংবাদ গানের জন্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

ভোলা ময়রা তখনকার দিনে বেশ জনপ্রিয় কবিওয়ালা ছিলেন। অনেকে তাঁকে শিবঠাকুর বলে ব্যঙ্গ করত বলে তিনি বিপক্ষদলের উদ্দেশ্যে বলতেন—

'আমি সে ভোলানাথ নই, আমি সে ভোলানাথ নই।
আমি ময়রা ভোলা, হরুর চেলা, শ্যামবাজারে রই ॥
আমি যদি সে ভোলানাথ হই,
তোরা সবাই, বিল্বদলে আমায় পূজলি কই ॥

কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১৮১০-১৮৮৮ খ্রীঃ) 'রাই উন্মাদিনী' প্রভৃতি পালাগান রচনা করেন। এ ছাড়া তাঁর 'বিচিত্র-বিলাস', 'ভরত-মিলন', 'নন্দ-হরণ' প্রভৃতি পালার উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর 'ওহে তিলেক দাঁড়াও, দাঁড়াও হে, অমন করে যাওয়া উচিত নয়। যে যার স্মরণ লয়, নিঠুর বঁধু, তারে কি বধিতে হয় ॥' অথবা 'অতুল রাতুল কিবা চরণ দুখানি। আল্‌তা পরাত বঁধু কতই বাখানি ॥' ইত্যাদি পদের তুলনা নেই।

রামনিধি গুপ্ত বা রায় বা 'নিধুবাবু' (১৭৪১-১৮৩৪ খ্রীঃ) ইস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কেরানীর কাজ করতেন। বাঙ্‌লাদেশে তখন যে 'আখড়াই' গান প্রচলিত ছিল নিধুবাবু সেই 'আখড়াই' গানকে সর্বজনবোধগম্য সহজ রূপদান করেন। তিনি হিন্দী 'টপ্পা' গানকে ভেঙে বাঙ্‌লা টপ্পা গান রচনা করেন। তাঁর এই গানগুলি 'নিধুবাবুর টপ্পা' নামে বিখ্যাত। তিনি রুচিসঙ্গত প্রেমসঙ্গীতও রচনা করেছিলেন, যেমন—

ভালোবাসবে বল্যে ভালোবাসিনে।
আমার স্বভাব এই, তোমা বই আর জানিনে ॥

অথবা,

তোমার বিরহ সয়ে, বাঁচি যদি দেখা হবে।
আমি মাত্র এই চাই মরি তাহে ক্ষতি নাই,
তুমি আমার সুখে থাক, এ দেহে সকলি সবে ॥

নিধুবাবু জানতেন—

নানা দেশে নানা ভাসা।
বিনে সদেসীয় ভাসে পূরে কি (পুর কে) আসা ॥

ঈশ্বরগুপ্ত মহাশয় কবির দলের জন্য গান বাঁধতেন। তিনি 'সখীসংবাদ' বিষয়ক অনেক গান রচনা করেছেন। নিধুবাবুর সমসাময়িক শ্রীধর কথকও বিখ্যাত গান রচয়িতা ছিলেন। অনেকের মতে নিধুবাবুর নামে প্রচলিত 'ভালবাসবে বল্যে ভালবাসিনে' পদটি তাঁরই রচনা। এ ছাড়া তখনকার দিনে লালু ও নন্দলাল, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য, সাতুরায়, নসাইঠাকুর প্রভৃতি আরও অনেক কবিওয়ালাদের রচনাও পাওয়া যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বানের ছড়া (ঝড় বৃষ্টি নিয়ে), রাস্তার ছড়া, জাগের গান প্রভৃতি গীতও পল্লীকবিদের দ্বারা রচিত হয়েছিল। কবিওয়ালাদের গানের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন সঙ্গীত ও কাব্য ধারার একটা জের তখনও চলছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যাঁরা ভারতচন্দ্র প্রভৃতির অনুকরণে লিখছেন তাঁদের মধ্যে রঘুনন্দন গোস্বামীকৃত 'রামরসায়ণ', 'গীতমালা' (কৃষ্ণলীলা বিষয়ক), রাধামাধবোদয় (রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক), রাধামাধব ঘোষের 'সারাবলী' বা পুরাণ সংগ্রহ, রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের 'দুর্গামঙ্গল' (১৮১৯), 'মাধব মালতী', 'অক্রুর-সংবাদ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই ধারার নামকরা দু'জন কবি হচ্ছেন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও মদনমোহন তর্কালঙ্কার। ঈশ্বরগুপ্ত নতুন যুগের ইঙ্গিত দিয়েছেন তাঁর পরের দিকের রচনায়, কিন্তু প্রথমে হাত পাকিয়েছেন প্রাচীন রীতিতে কাব্য রচনা করে। মদনমোহন তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। ইনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহকর্মী ছিলেন। মদন মোহন 'রস তরঙ্গিণী' ও 'স্বপ্ন বাসবদত্তা' কাব্য রচনা করেন। তাঁর রচনায় ভারতচন্দ্রের প্রভাব যথেষ্ট। বাসবদত্তা কাব্যটি প্রায় ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের ছাঁচে ঢালা।

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের যুগসন্ধিকালে হাস্যরসের কবিতাও অনেক রচিত হয়েছে, তবে সেই হাস্যরসের মধ্যে অশ্লীলতা একটু বেশী ছিল। ভালো কবিতাও দু'চারটি যে ছিল না তেমন নয়। দ্বিজ রামানন্দ 'তামাক-মাহাত্ম্য' বর্ণনা করতে গিয়ে বলছেন—

মা মৈলে যেন গুড়াকু তামাকু পাই। ধুয়া।

উঠি অতি নিশিভোরে হুকাটি লয়িয়া করে
গোয়ালি দুয়ারে দুয়ারে উকুট্যা বেড়াই ছাই ॥ ইত্যাদি।

তখন যে সব সাধন সঙ্গীত রচিত হয়েছিল তার বেশীর ভাগই বাউল গানের পদ্ধতিতে রচনা। এই সঙ্গীত ধারা পরের দিকের বাঙ্‌লার সঙ্গীতকে সমৃদ্ধময় করে তুলেছিল। লালন সাঁই যখন বলেন—

খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কমনে আসে যায়।
ধরতে পারলে মন-বেড়ি দিতেম পাখীর পায় ॥ ইত্যাদি।

তখন মনে হয় এ গান বাঙালী হৃদয়ের চিরকালের গান এবং উত্তরকালের বাঙালী গীত-রচয়িতাদেরও সার্থক পথ-নির্দেশস্বরূপ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও এই বাউল গান রচয়িতাদের প্রভাবকে অস্বীকার করেন নি।

উনবিংশ শতাব্দীর যাত্রা সঙ্গীত রচনায় যাঁরা অগ্রণী ছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রীদাম, সুবল, পরমানন্দ অধিকারী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীর আলোচনার মাঝখানে এঁদের কথা বলে রাখার উদ্দেশ্য এই যে আমরা যে আধুনিক যুগের আলোচনা করতে যাচ্ছি, এঁরা ঠিক সে যুগধর্মী নন। এঁদের কারও কারও রচনায় যে একেবারে আগামীদিনের সংবাদ নেই তা বলছিনা। অন্তত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্বন্ধে একথা সম্পূর্ণ খাটে না। তবে উনবিংশ শতাব্দী যে চিন্তাধারা, যে নূতন আদর্শ নিয়ে দেখা দিল উল্লিখিত লেখকরা সেই আদর্শ থেকে দূরেই ছিলেন। কেউ কেউ কাছে এসেও তাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি।

২

উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা

ইংরেজের রাজ্যলাভের পর বাঙ্‌লার সমাজের পুরানো বুনিয়াদ জীর্ণ হয়ে আসে। বাঙালীর নিজস্ব শিল্প-বাণিজ্য যা ছিল তাও ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে। ইংরেজরা 'একচেটে' ব্যবসায়ের সুযোগ দখল করে বসে। তারা যেমন নিজ স্বার্থের পথ পাকা করে নিচ্ছিল, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে

একটা সংঘর্ষ সৃষ্টি করার চেষ্টাও করছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতাজাত মানবতাবাদ এবং শিল্পোদ্ভূত বিপ্লববাদের ধারাকে তারাই আমাদের দেশে বহন করে নিয়ে আসে। অন্যদিকে বিদেশী পাদ্রীরা খ্রীষ্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারে ব্যস্ত। ইংরেজরা ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন করার চেষ্টা করছে, আবার ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাঙ্‌লা শেখাবার জন্য গদ্য ভাষা ও সাহিত্যের সৃজন প্রয়াসও চলেছে।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে জমিদারি প্রথার পাকা ব্যবস্থা করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত হবার পর আমাদের দেশে একদল লোক নিঃস্ব হয়ে পড়ে। আর জমিদারশ্রেণীর একটা পাকাপাকি স্বার্থের দিকও তখন দেখা দেয়। এর আগেও একদল লোক টাকা-পয়সা রোজগার করে প্রচুর ভূসম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। এঁরা নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখতে তৎপর হয়ে উঠলেন। ফলে দেশের দরিদ্র কৃষক ও অশিক্ষিত নিম্নবিত্তশ্রেণীর জীবন দুঃসহ হয়ে উঠল। এই দুঃসহ দুঃখের উদ্ধত ও বলিষ্ঠ প্রকাশ ঘটল সাঁওতাল বিদ্রোহে, নীল বিদ্রোহে। সাঁওতাল বিদ্রোহ গুরুতর আকার ধারণ করে। কিন্তু সাঁওতালদের কামনা ছিল তাদের পূর্বতন আদিম অবস্থায় ফিরে যাবারই অদম্য কামনা। তবুও স্বাধীন জীবন ফিরে পাওয়ার বাসনার মূল্য অনেকখানি। উত্তরবঙ্গেও কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ জেগে উঠে এবং উনবিংশ শতাব্দীতেই তখনকার মধ্যবিত্ত সমাজের অনেকে এই অসন্তোষ, এই বিক্ষোভের মধ্যে একটা উদ্দীপনাকে অনুভব করেছিলেন। কিন্তু একে সম্পূর্ণভাবে তাঁরা স্বীকার করেন নি।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার পর শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান মিশনারী কেরী, মার্শম্যান প্রভৃতির উদ্যোগে বাঙ্‌লা ভাষার আলোচনা ও রচনা দুইই শুরু হয়। সিভিলিয়ান সাহেবদের জন্য যে সব বাঙ্‌লা গদ্য রচিত হচ্ছিল তার মধ্যে অনেক রচনাই সাহিত্য মূল্য লাভ করেছে।

কেরীর 'কথোপকথন' নামে গদ্য রচনা এই সময় প্রকাশিত হয়। এই একই সময়ে রামরাম বসু 'প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০০ খ্রীঃ) রচনা করেন। রামরাম বসুর রচনায় মৌলিকতার অভাব নেই। ইনি বাইবেল অনুবাদে এবং তার ব্যাখ্যায় মিশনারীদের সহায়তা করেন। রামরাম বসুর আর একখানি গ্রন্থের নাম হচ্ছে 'লিপিমালা' (১৮০২ খ্রীঃ)। অনেকের মতে এই গ্রন্থখানি রাজা রামমোহন সংশোধন করে দিয়েছিলেন।

গোলক শর্মার হিতোপদেশের অনুবাদ ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে চণ্ডীচরণ মুন্‌শীর 'তোতার ইতিহাস' প্রকাশিত হয়। এটিও একখানি অনুবাদ গ্রন্থ। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্র' ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। রাজীবলোচন ইতিহাসকে যথাযথভাবে ব্যবহার করেন নি। যদিও তিনি কিছু কিছু নতুন খবর দেবার চেষ্টা করেছেন তবুও তাঁর রচনায় ইতিহাসকে অবিকৃত রাখেন নি। মাঝে মাঝে অলৌকিকত্বও এসে পড়েছে। তাঁর সিরাজচরিত্র ইংরাজ তোষণমূলকই হয়েছে। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বত্রিশ সিংহাসন'ও ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এইখানি অনুবাদ গ্রন্থ। 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' ও 'রাজাবলী' মৃত্যুঞ্জয়ের দু'খানি উল্লেখযোগ্য রচনা। এ ছাড়া তারাচরণ শিকদার প্রভৃতি আরও অনেক লেখক গদ্য রচনা শুরু করেন। তবে এসময়ের বেশীর ভাগ রচনাই অনুবাদ। মৌলিক রচনার নিদর্শন খুব বেশী নেই।

এ সময়ে অনেক সম্ভ্রান্ত বাঙালীও বাঙ্‌লা সাহিত্য রচনায় আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে রাজা রামমোহন, রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা কালীকৃষ্ণ দেব প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুম তাঁর অক্ষয় কীর্তি।

রাজা রামমোহন রায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রামমোহনের আবির্ভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আমাদের ধর্মের কুসংস্কারাচ্ছন্ন দিক, সংকীর্ণ আচারবিচারের বেড়াজাল, জাতিভেদের দুর্বলতা, সাম্প্রদায়িকতার বীভৎসরূপ তাঁর কাছে ধরা পড়েছিল। ইংরেজ শাসনের অন্ধকারময় দিকটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। ইংরেজ তার ঔপনিবেশিক স্বার্থ পাকাপোক্ত করতে গিয়ে আমাদের বুকে ভাঙন ধরাচ্ছে—এটা বুঝতে পেরে রামমোহন অনুভব করলেন, এখন চাই জাতীয় ঐক্য। রামমোহনের ধর্মবোধে ছিল জাতীয়তাবোধ। একদিকে তিনি দেখাচ্ছেন ইংরাজ-সভ্যতার বলিষ্ঠতা, অন্যদিকে দেখাচ্ছেন আমাদের জাতিগত দুর্বলতা। সঙ্গে সঙ্গে তার নিরসনের চেষ্টাও তাঁর রয়েছে। শিক্ষার প্রসারের জন্য তিনি তৎপর। অন্যদিকে কুসংস্কারগুলো দূর করার জন্য তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহও রয়েছে। পাশ্চাত্য জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি সচেতন এবং সেই

ইতিহাসের ধারা থেকে তিনি এটা অনুভব করেছিলেন যে জাতীয় জীবনে পরিবর্তন অনিবার্য। তিনি সহজ ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ব্রাহ্ম সভা গড়ে তোলেন।

রামমোহন বেদান্ত দর্শন প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত কয়েকটি ব্রহ্ম সঙ্গীতের সঙ্গেও আমাদের পরিচয় ঘটেছে। রামমোহন হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সে সময়ে এ নিয়ে অনেক বাদানুবাদও চলেছিল। সে যুগের অন্যান্য রচনার অনুপাতে রামমোহনের রচনা বেশ প্রাঞ্জল ছিল। যুক্তি প্রয়োগের নৈপুণ্য তাঁর রচনাকে আরও বলিষ্ঠ করে তোলে। মতবাদ প্রতিষ্ঠা ও মত খণ্ডনই শুধু তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য নয়। তাঁর রচনাগুলি সাহিত্য পর্য্যায়ে উন্নীত হয়েছে। রামমোহনের রচনার একটা গুণ এই যে, তাঁর রচনায় অসংযত ভাব কোথাও প্রকাশ পায়নি। এটাও তাঁর যুক্তিবোধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর মতবাদ ও যুক্তিনিষ্ঠার জন্য তাঁকে অনেক কটূক্তি শুনতে হয়েছিল। তার উত্তর দিতে গিয়ে তিনি স্থির মস্তিষ্কের পরিচয়ই দিয়েছিলেন—তার "পথ্যপ্রদান" রচনায় এবং 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' রচনায়। এই সব রচনার মধ্যে তাঁর মননশীলতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এবং শুধু যে যুক্তি দিয়ে তিনি অপরের সংস্কারাচ্ছন্ন মতকে খণ্ডন করছেন না, তার মধ্যে যে হৃদয়বৃত্তিও আছে—একটা মহৎ ঐক্য সাধনের জাগ্রত চেষ্টা যে আছে তাঁর রচনায় তারও নিদর্শন পাই। রামমোহন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে চিন্তাশক্তি এবং ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসলব্ধ যে বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী লাভ করেছিলেন, নানা জাতির উত্থান-পতনের ইতিহাস থেকে যে প্রেরণা লাভ করেছিলেন তা নিয়ে তিনি সেযুগ থেকে অনেকটা এগিয়ে এসেছিলেন। আবার এও দেখতে পাই যে, সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ রাজত্বের কু-শাসনের দিকটা কিছু কিছু বুঝতে পারলেও তার প্রকাশ তাঁর রচনায় দেখতে পাওয়া যায় না। তিনি ইংরেজী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন, ইংরাজ-সভ্যতার উৎকর্ষ সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন এবং আমাদের জাতীয় জীবনকে গ'ড়ে তুলতে হলে তার অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সাহিত্য, দর্শন সম্বন্ধে যে বিশদ জ্ঞান থাকতে হবে তাও তিনি বুঝতেন। রামমোহন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেরও গুণ বর্ণনা করেছেন। মনে হয়, সামাজিক কাঠামো সামন্ততান্ত্রিক থাকার জন্য এবং ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের চক্রান্তজনিত কুফল সরাসরি হৃদয়ঙ্গম না

হওয়ার জন্যই হয়ত এরকম ঘটেছিল। রামমোহন পুরানো অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন বটে, কিন্তু সমসাময়িক সামাজিক অবস্থা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাশক্তির বলিষ্ঠ বিকাশের অনুকূল ছিল না।

পাশ্চাত্ত্য আদর্শ, বিশেষ করে ইংরেজ-সভ্যতার ইতিহাসের পিউরিটান ও তৎপরবর্তী য়্যুনিটেরিয়ান আদর্শ আমাদের সমাজের এক দলের উপর প্রভাব বিস্তার করে। রামমোহন যদিও বা ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন তবুও ইংরাজের উক্ত আদর্শগুলিও তাঁকে অনুপ্রেরণা জোগায়। তাঁর রচনাতেও সেই আদর্শগত প্রভাব দেখতে পাই।

রামমোহনের পরবর্তীকাল

রামমোহনের আবির্ভাবের কিছু পরে অর্থাৎ প্রায় উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে 'ইয়ং বেঙ্গল এসোসিয়েশন' বা নব্য বঙ্গ সমিতি গড়ে ওঠে। তাঁরা আরও এগিয়ে যাবার তাগিদ দেখালেন। এঁদের খাওয়া ইংরেজি, চলা ইংরেজি, সবই ইংরেজিতে। ইংরেজ সরকারের বড়ো চাকরীর জন্যও তাঁদের খুব আগ্রহ। যুক্তিনিষ্ঠা তাঁদের চরিত্রের গুণ হিসাবেই দেখা দেয়। রামমোহনের আদর্শ এবং এই নব্যবঙ্গ সমিতির ভালো ভালো লক্ষণগুলির মিশ্রণে তখন একটা নতুন চিন্তাধারাও দেখা দেয়। ডিরোজিও প্রভৃতির প্রভাবে যে উদ্দামতা বাঙালী যুবকদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল এবং তার পর থেকে পাশ্চাত্ত্যের যে মানব-হিতবাদ, ধ্রুববাদ, সমাজতন্ত্র বিজ্ঞান প্রভৃতির পঠন-পাঠনের ভেতর দিয়ে যে নতুন চিন্তাধারার আবির্ভাব ঘটে, আমাদের বুদ্ধিজীবী সমাজের মননশীলতার বাহন সাহিত্যেও তাঁর বিকাশ ঘটে। এর পরে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে' কেন্দ্র করে এক চিন্তাশীল লেখক-গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে।

পুরানো ভাবধারা সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র থেকে একেবারে লোপ পায়নি। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে মানব ইতিহাসের গতিবেগের দিক সুস্পষ্ট হয়ে উঠে পুরানোর গতিবেগকে ধীরমন্থর করে আনছিল। সাহিত্যও শুধু কাহিনী বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ থাকছেনা। নীতিগর্ভ রচনা, প্রবন্ধ, নাটক, সংবাদপত্র, উপন্যাস, ছোটগল্প, নতুন কাব্য রচিত হচ্ছে। সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে অনেক নাটক, কাব্য প্রভৃতি রচিত হয়েছে। সাহিত্যে পরাধীনতার বেদনাবোধ প্রকাশ পাচ্ছে। সামাজিক ও জাতীয় সমস্যাগুলি সাহিত্যের বিষয়বস্তু হচ্ছে।

এমন কি, কোনো কোনো রচনা রাজার পক্ষে ক্ষতিকর বলে বন্ধ করেও দেওয়া হচ্ছে।

আবার রক্ষণশীল দল প্রাচীন ঐতিহ্যকেই আঁকড়ে থাকতে চেষ্টা করছেন। তাঁরা ইংরেজকে ভালোভাবে গ্রহণ না করলেও এদের সঙ্গে থেকেই আবার পুরানো দিনে ফিরে যাবার চেষ্টা করছেন। যুগ-পরিবর্তনকে তাঁরা স্বীকার করেন না। আর এক শ্রেণীর লোক ইংরেজ-প্রবর্তিত সব রকম ব্যবস্থাতেই বাধা দিতে চেষ্টা করছেন। দেশের লোক যখন নতুন ব্যবস্থায় সায় দিচ্ছে তাদেরও নানাভাবে নাজেহাল করতে ছাড়ছেন না।

এদিকে ইংরেজরা আনছে শোষণের যন্ত্র, দেশকে দান করছে দারিদ্র্য, আর ঔপনিবেশিক উৎপীড়নের বেড়ি পড়াচ্ছে দুপায়ে। সংবাদপত্র বিষয়ে আইন, আটক আইন ইত্যাদি প্রণয়ন করে মানুষের ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণে তারা ব্যস্ত। মানুষের অভিযোগের প্রকাশে দিচ্ছে বাধা। সাহিত্যে তার দৃপ্ত প্রতিবাদ তেমন শোনা যাচ্ছেনা। তবুও কেউ কেউ সেই সময়ের সামাজিক অবস্থা বর্ণনার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। অবশ্যি লেখকদের স্ববিরোধী-মনোভাব ও দ্বন্দ্ব পরিবেশের জন্য অনেক সময় অভ্রান্ত পথের পরিচয় তাঁরা সুস্পষ্টভাবে দিতে পারেননি।

নবজাতীয়তাবোধ, পাশ্চাত্ত্যের যুক্তিবাদ এবং দেশের অর্থনৈতিক দুর্বল ভিত্তি বাঙ্‌লা দেশে মধ্যবিত্ত চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীর একটি দল গ'ড়ে তোলে। এঁদের অনুভূতির প্রকাশ, দুঃখবেদনার প্রকাশ আরও একটু সুস্পষ্ট।

রামমোহন দেশের যে অন্ধকার মুহূর্তে জাতীয় ঐক্যের মহান সত্য উপলব্ধি করেছিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে তা রূপ পেতে থাকে। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের হাতে লাঞ্ছনা, পীড়ন, অত্যাচার এসময় আরও বাড়তে থাকে। শিক্ষিত শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরাধীনতার বেদনাবোধ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেতে থাকে। দরিদ্রশ্রেণীর মধ্যে আগেই অশান্তির ঘূর্ণি দেখা দিয়েছিল। তবে ছোটো খাটো সংঘর্ষ ছাড়া বড় বেশী কিছু এগোয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে নীল, সাঁওতাল, ওহাবী প্রভৃতি যে সব বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং যে সিপাহী বিদ্রোহ সারা ভারতময় ব্যাপক আকার ধারণ করে তার পেছনে দরিদ্র চাষী, তাঁতী প্রভৃতির অসন্তোষ বহ্নিও প্রজ্জলিত হয়ে ওঠে। ওহাবী আন্দোলন কোনো কোনো জায়গায় সাম্প্রদায়িক রূপ

পরিগ্রহ করলেও, বাঙ্‌লা দেশে বিক্ষুব্ধ হিন্দু-মুসলমান দরিদ্র সাধারণের বিদ্রোহাত্মক প্রকাশ হিসাবেই দেখা দেয়। উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের মধ্যে এর সামান্য প্রকাশই আমরা দেখতে পেয়েছি। তখন ব্যাপক প্রকাশে বাধা ছিল ইংরেজ শাসন এবং আমাদের দুর্বলতা। এতদ্‌সত্ত্বেও আমরা উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধাদিতে কিছু কিছু সংবাদ পেয়েছি। নানা দুর্বলতা সত্ত্বেও রাজরোষের ভয় কাটিয়ে দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি অনেকে লিখতে শুরু করেন। রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি জাতীয়তা-বোধ নিয়ে কবিতাও রচনা করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর কাব্য ধারায় বিশেষত্ব দেখা দিল কবি মধুসূদন, রঙ্গলাল, বিহারীলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতির কাব্য রচনায়। প্রাচীন কাব্য রচনার দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটা বদলালো। মধুসূদন 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' লিখলেও তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্য' 'বীরাঙ্গনা কাব্য' প্রভৃতির আদর্শ একেবারে আলাদা। বাঙ্‌লা রোমান্টিক্ লিরিক কবিতার রসঘনরূপ দেখা দিচ্ছে এ যুগে। উপন্যাস, সংবাদপত্র, দেশপ্রেমমূলক নাটক রচনা এযুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠাও এযুগের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি (১৮৫৭ খ্রীঃ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'ল। এর আগেই কয়েকটি স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। স্ত্রী-শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা চলছিল। বাল্যবিবাহ প্রথা বন্ধ করবার জন্য প্রগতিশীল ব্রাহ্মরা আবেদন জানাচ্ছেন। বিধবাবিবাহ প্রচলিত হচ্ছে। রক্ষণশীল দল এসব ব্যাপারে বাধাও দিচ্ছেন। ঈশ্বরগুপ্ত মহাশয় যেমন ব্যঙ্গ-কবিতা মারফত ইংরেজদের বিদ্রূপ করছিলেন, তেমনই নব্যশিক্ষিত প্রগতি-শীল বাঙালীদেরও বিদ্রূপ করছিলেন। নানা মতবিরোধ সত্ত্বেও বুদ্ধিজীবী বাঙালীদের মধ্যে ইংরেজ শাসকসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে একটা বিদ্বেষ দানা বেঁধে উঠছিল। ঔপনিবেশিক কাঠামোতে থেকে যাঁরা ঠেকে শিখছিলেন তাঁদের বিদ্রোহাত্মক কণ্ঠ শোনা গেল উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে।

সংক্ষেপে বলতে গেলে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে রাষ্ট্র-ব্যবস্থার পরিবর্তন, সামাজিক দুর্বলতাকে অতিক্রম করার চেষ্টা, আমাদের দারিদ্র্য প্রভৃতির মধ্যে দিয়েই বাঙ্‌লা সাহিত্য গ'ড়ে উঠছিল। সে সাহিত্য কোথাও খুবই বলিষ্ঠ, কোথাও বা প্রতিক্রিয়াশীল, আবার কোথাও বা 'মধ্যপন্থা-ধর্মী।'

সেই যুগের চিন্তাধারা সামন্ততান্ত্রিক ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ছিল বলেই 'এগিয়ে যাওয়া' মতবাদ 'পিছিয়ে পড়া' ভিটের বাসিন্দাদের মনে জাগিয়েছিল দ্বন্দ্ব। অনেকে উদারনীতির পথ অবলম্বন করেছিলেন। কেউ কেউ জেনে শুনেও দুঃখ দ্বন্দ্বের পথকে এড়িয়ে গেছেন। উনবিংশ শতাব্দী ভাঙনের যুগ নয়, এযুগ জাতির নবজাগরণের, পুনরুত্থানের যুগ। কিন্তু সে উত্থান প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে না, বর্তমান অবস্থার যথার্থ নিরূপণের ভিত্তিতে ক্রমপরিবর্তনের ভেতর দিয়ে ? এই প্রশ্নের উত্তর সেযুগের চিন্তাশীল নায়করা জানতেন, অনেকে পরোক্ষভাবে লিবারেল মন নিয়ে উত্তর দিয়েও গেছেন।

বাঙ্‌লা দেশে যেসব সংবাদপত্র গড়ে ওঠে সেসব সংবাদপত্র ছিল সমাজের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংবাদের বাহন। এই সংবাদপত্রগুলি ইংরেজের শাসন-ব্যবস্থার ভাল ও মন্দ দিক আমাদের সামনে তুলে ধরছে। অনুকূল ও প্রতিকূল নানা মতের সংঘর্ষের সংবাদ দিচ্ছে। মাসিক পত্রিকাগুলি সাহিত্য ও দর্শন প্রভৃতির আলোচনা করছে।

বাঙ্‌লা সাহিত্যে ইতিহাসের স্থান তখন খুব উচ্চে ছিলনা। ভূদেব, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। কিন্তু তাঁদেরও জাতিকে ইতিহাস-সচেতন করে তোলার চেষ্টায় এত ব্যস্ত থাকতে হয়েছে যে একটা পরিকল্পনাই শুধু তাঁরা তুলে ধরতে পেরেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দী থেকে ছোট গল্প রচনা শুরু হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথই ছোট গল্পের সার্থক স্রষ্টা। সমাজের মানুষের দ্রুতগামী জীবনের দিকটা তখন ধরা পড়েছে। ইংরেজি, ফরাসী প্রভৃতি ছোট গল্পের আদর্শে ছোট গল্প রচনা শুরু হচ্ছে। ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবনের দ্বন্দ্ব প্রভৃতি এসব গল্পে দেখানো হচ্ছে।

মানব জীবনের দ্বন্দ্ব প্রথম ধরা পড়েছিল রামমোহনের কাছে। রামমোহন ব্রাহ্মসভা স্থাপন করে বাঙালীকে একটা সার্থক পরিণতির দিকে এগিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। ইয়ং বেঙল দলও তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলেন। নতুন যুক্তিবাদ নিয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি সুধীবৃন্দ এক নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। মতবিরোধের ফলে কেশবচন্দ্র সেন এঁদের কাছ থেকে স'রে গিয়ে নব-বিধান সভা প্রতিষ্ঠা করেন। তখন রক্ষণশীল ব্রাহ্ম ও নব্য-ব্রাহ্ম সমাজের দ্বন্দ্বও দেখা দিয়েছে। ব্রাহ্ম-আন্দোলনের আলোচনায় এই প্রসঙ্গ আলোচিত হবে।

প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল দুই দলই সাহিত্যে নিজ নিজ ভাবনা-ধারণা লিপিবদ্ধ করতে থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয় জীবনের প্রয়োজনের দিক সাহিত্যে তুলে ধরতে চেষ্টা করছেন। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি দেশপ্রেমমূলক কবিতা রচনা করছেন। যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ ম্যাট্‌সিনি, গ্যারিবল্‌ডির জীবনী প্রভৃতি রচনা করছেন। দেশপ্রেমের একটা অনুকূল হাওয়া এই সময়ে দেশের উপর দিয়ে বইছে। মাঝে মাঝে ইংরেজের বিপক্ষ অপেক্ষা মুসলমান-বিরোধী হয়ে উঠছে। এই সব রচনার মধ্যেই আগামী দিনের কল্যাণের বীজ রোপিত হয়েছে।

বিকৃত-রুচির বড় লোকদের কাছে আবর্জনাময় পুরানো জিনিস ছিল অতি মূল্যবান। তাঁরা বিদ্যাসুন্দর পালা শুনছেন। তরজা গান, খেউড় গান না হ'লে তাঁদের চলছেনা।

সংবাদপত্রের প্রভাব

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে বাঙ্‌লা গদ্য রচনা চলেছিল প্রাচীনপন্থীদল সেই গদ্য রচনার বিরুদ্ধতা করেছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য অনুকরণে যখন বাঙ্‌লা দেশে সংবাদপত্রের আবির্ভাব ঘটল তখন বাঙালী গদ্যভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। শ্রীরামপুরের মিশনারীদের, বিশেষ ক'রে কেরীর চেষ্টায় সংবাদপত্রের আবির্ভাব সম্ভাবনা দেখা দেয়। ১৮১৮ সালে দিগ্‌দর্শন ও সমাচার দর্পণ প্রকাশিত হয়। প্রথমখানি মাসিকপত্র এবং দ্বিতীয়খানি সাপ্তাহিকপত্র হিসাবে প্রকাশিত হয়। এরই কাছাকাছি সময়ে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য 'বেঙ্গল গেজেট' বা বাঙাল গেজেটি প্রকাশ করেন। বোধ হয় এটাই বাঙালীর দ্বারা প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র।

সংবাদপত্রের আবির্ভাব বাঙালীকে আত্মসচেতন করে তুলল। সমাজ ও তার নানাসমস্যা প্রভৃতি এই সংবাদপত্রে আলোচিত হয়। বাঙালী তখন থেকে বাইরের দেশ-বিদেশ সম্বন্ধে ভাবতে শুরু করে। আগে সাহিত্য মুখ্যত গুরুগম্ভীর পদ্যেই রচিত হত। কিন্তু সংবাদপত্রের আবির্ভাবে গদ্যের একটা সহজ ও সাবলীলরূপ দেখা দেয়। বাঙ্‌লা গদ্যের যে সহজ রূপটি আজ আমাদের চোখে পড়ে তার প্রস্তুতির মূলে সংবাদপত্রের দান অনেকখানি।

রামমোহন কয়েকটি পুস্তিকা রচনা ছাড়া বেশীর ভাগ প্রবন্ধ সংবাদপত্রেই

লিখতেন। নানা রকম মতবাদের উদ্ভবে নানা সংবাদপত্রও আবির্ভূত হ'তে থাকে। উদার মতাবলম্বী ও গোঁড়া হিন্দুরা নানারকম সংবাদপত্র প্রকাশ করতে থাকেন। এই সময় 'সংবাদ কৌমুদী' (১৮২১) ও 'সমাচার চন্দ্রিকা' (১৮২২) প্রকাশিত হয়। রামমোহন 'সংবাদ কৌমুদীর' সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। 'সমাচার চন্দ্রিকা' তখনকার যুগের রক্ষণশীল প্রাচীন-পন্থী বাঙালীর মুখপত্র ছিল। এর সম্পাদক ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রামমোহনের সঙ্গে তিনি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ধর্মবিষয়ে তর্কবিতর্কে যোগ দিয়েছিলেন। ভবানীচরণ একদিকে বাঙালী বড়লোকদের বিদ্রূপ করছেন, অপরদিকে হিন্দু-রক্ষণশীল সমাজের পক্ষ নিয়ে রামমোহনের সঙ্গে মসী-যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। ভবানী চরণের 'নববাবু বিলাস' সে যুগের একখানি উল্লেখযোগ্য রচনা। এ ছাড়া 'বঙ্গদূত', 'জ্ঞানান্বেষণ' প্রভৃতি সংবাদপত্রও প্রকাশিত হয়। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের দিকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশিত হয়। এই পত্রে গদ্য এবং পদ্য রচনা দুইই থাকত। ঈশ্বরগুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকর' দ্বারা অনেক সাহিত্যিকের সাহিত্য রচনার পথ সুগম করে দিয়েছিলেন। পুরাতন ও নতুন দুই ধারার যথাসম্ভব সামঞ্জস্য রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন ঈশ্বরগুপ্ত মহাশয়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

সে যুগের সংবাদপত্রের ইতিহাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার (১৮৪৩) স্থান অনেক উচ্চে। ইংরেজ আগমনের পর বাঙ্‌লা দেশে ও সমাজে যে ধর্ম-শৈথিল্য প্রভৃতি দেখা দিয়েছিল, যে দুর্বলতা বাঙালীর মৌলিকতাকে বিলোপের পথে নিয়ে যাচ্ছিল, সেই দুর্যোগের মুহূর্তে রামমোহন এসে ঐক্য বোধের আহ্বান জানান। রামমোহনের পরে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রচারের ব্যগ্রতা দেখে দেশকে আত্মস্থ করবার জন্য তখনকার মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে একটা উৎসাহ দেখা দেয়। অক্ষয়কুমার দত্ত এ সময় 'আত্মীয়সভা' প্রতিষ্ঠা করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে থেকে তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপনে ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ করার ব্যাপারে অক্ষয়কুমার তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। বল্‌তে গেলে এই সভার তিনিই ছিলেন কর্ণধার। রামমোহনের আদর্শ ও নব্য বঙ্গ সমিতির যুক্তিবাদ থেকে তিনি এই প্রেরণা লাভ করেন। তখন খ্রীষ্টধর্মের প্রচার খুবই চলেছিল। তার প্রবল জোয়ারের বেগকে ঠেকাবার জন্য এই সভা ও পত্রিকার

বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বিশেষ করে রামমোহন যে সর্বজনীন ধর্মবোধ, যে জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তুলেছিলেন তাকে আরও বলিষ্ঠতর করবার প্রয়োজন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় অনুভব করেন। তাকে সুন্দর ও সার্থক ক'রে গ'ড়ে তোলবার উৎসাহও তাঁদের দুজনেরই ছিল। এই তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকার জীবনকে দরদ দিয়ে দেখার ও জাতীয় জীবনকে প্রকৃতিস্থ করার আগ্রহ, ব্রাহ্ম ও হিন্দু উভয় দলকেই আকৃষ্ট করে। বিশেষ ক'রে তখনকার শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী এই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে আত্মপ্রকাশ করেন। তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকার সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁদের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, রাজনারায়ণ বসু, ঈশ্বরগুপ্ত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা প্রকাশিত হ'ত। সব চাইতে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে, এ পত্রিকায় লেখা বাছাই করার জন্য বিচারক-সমিতি ছিল এবং যেকোনো বিষয় পত্রিকায় প্রকাশ করবার পূর্বে নিজেদের মধ্যে তার আলোচনা ক'রে তবে ছাপানো হ'ত। স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা নিয়েও রচনা থাকত। তত্ত্ববোধিনী সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল একদিকে 'ইয়ং বেঙলের' অতিরিক্ত ইংরেজিয়ানার বিরুদ্ধে প্রচার কার্য চালানো—অপর দিকে হিন্দু-গোঁড়ামির অনিষ্টতার স্বরূপ প্রকাশ করা। তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যুক্তি-প্রবণতা। অক্ষয়কুমার এ বিষয়ে সকলের চেয়ে অগ্রণী ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের মধ্যে মাঝে মাঝে মতের অমিলও ঘট্‌ত। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন "আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়। আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ; আর তিনি খুঁজিতেছেন বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির কি সম্বন্ধ। আকাশ পাতাল প্রভেদ।" এই উক্তি থেকে মনে হয়, তত্ত্ববোধিনীকে কেন্দ্র ক'রে তখন দুটি বিভিন্ন ভাবধারাও প্রবাহিত হচ্ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর বিরুদ্ধ-ভাবধারা সম্বন্ধে আশঙ্কান্বিত হয়েছিলেন। অক্ষয়কুমারের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী, যুক্তিনিষ্ঠা মহর্ষির মতের হয়ত ততটা অনুকূল ছিল না। তত্ত্ববোধিনী সভার অন্যতম সভ্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মধ্যে যুক্তি-নিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবোধও প্রগাঢ়রূপে

দেখা দিয়েছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন আত্মসমাহিত আদর্শ পুরুষ। ধর্মের ভেতর দিয়ে জাতিকে আত্মস্থ করতে গিয়ে ধর্মকে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করে তিনি ভাব সমাধিস্থ হয়ে ছিলেন। তবুও এই ভাবুক জীবনে যে ইংরেজ বিদ্বেষ দেখা দিয়েছিল তা তাঁর জাতীয়তাবোধেরই লক্ষণ বলা যায়। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশের পর ব্রাহ্ম ও হিন্দু মধ্যবিত্তদের, বিশেষ করে কলিকাতা কেন্দ্রিক শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের ভাববৈশিষ্ট্য ও উন্নত মননশীলতার একটি পরিচয় পাওয়া যায়। এই তত্ত্ববোধিনীর প্রভাব তত্ত্ববোধিনী-সভার প্রায় সব সভ্যদের উপরেই অল্পবিস্তর লক্ষিত হয়। ডাঃ রাজেন্দ্র লাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' এই প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। এবং এই ভাবধারার প্রভাব পরবর্তী কালের হিন্দুসংস্কারপূর্ণ সাময়িক পত্রগুলিতেও লক্ষ্য করা যায়। এক কথায় বলতে গেলে তত্ত্ববোধিনী তখনকার নবজাগ্রত বাঙালী সমাজের চিন্তার খোরাক জুটিয়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর লক্ষণ ও ঝোঁক সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে এখানে প্রসঙ্গত কয়েকখানি সংবাদপত্রের উল্লেখ করেছি। পরের দিকে যথারীতি সংবাদপত্রের ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করা যাবে।

ব্রাহ্ম-আন্দোলন

এ সময়ের ব্রাহ্ম-আন্দোলন এবং ব্রাহ্ম-ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে আমাদের কিছু জানা প্রয়োজন। কারণ ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজ ও সাহিত্যে এই আন্দোলনের প্রভাব অনেকখানি। যাঁরা এই আন্দোলনের যাথার্থ উপলব্ধি করে সাহিত্য রচনা করেছেন এবং যাঁরা এই আন্দোলনকে খ্রীষ্টানী ব্যাপার বলে ঠেকাতে গিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন—উভয় দলই সমাজের ভালো-মন্দের দিকে দৃষ্টি রেখে সাহিত্য সৃষ্টি করবার প্রয়াস পেয়েছেন। নানা বাদ-প্রতিবাদ, যুক্তিবিচার করতে গিয়ে উভয় পক্ষই বাঙ্‌লা সাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধি করেছেন। বাঙালীজাতি ধীরে ধীরে যে মুক্তি-কামনা নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল ব্রাহ্ম-আন্দোলন সেই এগিয়ে যাবার পথে অনেকখানি সহায়তা করেছে। রামমোহন থেকে যার শুরু, কেশবচন্দ্রেই তার শেষ হয় নি। রামমোহন থেকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং তারপর ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র—এঁদের

মধ্যে দিয়ে ব্রাহ্ম-আন্দোলন পরিবর্তনের পথ বেয়ে চলেছিল। পরের দিকে এই আন্দোলন বিপ্লবের অগ্নিযুগেরও অনেকখানি সহায়ক হয়।

ব্রাহ্ম-আন্দোলন শুধু নিরাকার পরমব্রহ্মের আনন্দ রূপকে জানবারই আন্দোলন ছিলনা, এই আন্দোলন তখনকার প্রগতিশীল মনের যুক্তি-নিষ্ঠার, জাতীয় সচেতনতার, স্বদেশপ্রেমের আন্দোলন। তাঁরা বুঝেছিলেন বাঙালীর তথা সমগ্র ভারতবাসীর নৈরাশ্যকে ও তদ্‌জনিত দুঃখকে দূর করতে হলে বলিষ্ঠ জীবনাদর্শ স্থাপন একান্ত দরকার। ব্রাহ্ম-ধর্মের মধ্যে সে বলিষ্ঠ ভাবাদর্শটি ছিল।

পাশ্চাত্ত্য ইতিহাস ও জীবনদর্শনের আদর্শে অনুপ্রাণিত রামমোহনের ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথে এসে একটু ভিন্ন পথ অবলম্বন করে। মহর্ষি জাতিবৈষম্য কিছুটা মানতেন। কেশবচন্দ্র প্রভৃতি যুবকেরা বললেন, 'জাতিভেদ মানা চলবেনা'। মতানৈক্য ঘটায় কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর দলের সবাইকে নিয়ে সারা ভারতে ব্রাহ্ম-ধর্ম প্রচার করতে থাকেন। কেশবচন্দ্র যে ধর্ম প্রচার শুরু করেন, তার পেছনে পরোক্ষভাবে স্বাধীনতার প্রেরণাও ছিল। কেশবচন্দ্র হয়ত এসম্বন্ধে ততটা সচেতন ছিলেন না। তিনি পৌত্তলিকতার অসারতা প্রমাণ করছেন। মূর্তি পূজার জায়গায় হয়ত নিরাকার ব্রহ্মের সাধনা চলছে। কেশবচন্দ্র হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, পারসী প্রভৃতি প্রত্যেক জাতির ধর্ম-বিশ্বাসের ভালোটা গ্রহণ করে প্রত্যেক ধর্মের 'একত্ব' প্রমাণে তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। পরের দিকে অবশ্যি তাঁর সঙ্গে তাঁর শিষ্যদের অনেকের মতবিরোধও ঘটে ছিল। কেশবচন্দ্র জাতিভেদ একেবারে তুলে দেন। কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজ হয়েছিল সাধারণের ব্রাহ্মসমাজ। কেশবচন্দ্রের পরে শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দ মোহন বসু প্রভৃতির চেষ্টায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আরও প্রসার ঘটে। কেশবচন্দ্র নিজেকে ঈশ্বর-প্রেরিত বলে মনে করতেন এবং অবতারবাদ ইত্যাদি প্রমাণ করবারও চেষ্টা করতেন।

শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি আরও একটু প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁদের হাতে ব্রাহ্ম ধর্ম ও সমাজের বেশ কিছুটা পরিবর্তন ঘটে। এঁরা আর শুধু জাতিভেদ তুলে দেওয়া নিয়েই রইলেন না, রাজনীতি সম্বন্ধেও তাঁরা সচেতন হয়ে উঠলেন। শিবনাথ, আনন্দমোহন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রভৃতির ঐকান্তিক চেষ্টায় ১৮৭৬ সালে 'ভারত সভা' স্থাপিত হয়। সে যুগে ব্রাহ্ম সমাজ ও ভারত সভার মধ্যে একটা যোগসূত্র ছিল। তখন যাঁরা ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নিতেন তাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করার, জাতিভেদ দূর করার জন্য প্রাণান্ত চেষ্টা করার সংকল্প গ্রহণ করতেন। অস্ত্র চালনা শিক্ষার বিষয়েও সংকল্প গ্রহণের নিয়ম ছিল। এই সংকল্প গ্রহণের মধ্যে মুক্তি-কামী বাঙালী মনের পরিচয় পাই। এঁদের প্রচেষ্টায় ছাত্রসমাজও স্থাপিত হয়। সে যুগে ইংরেজের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এঁরা স্পষ্ট প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। বিংশ শতাব্দীর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন প্রভৃতিতে তাঁরা অগ্রণী ছিলেন এবং তার জন্য তাঁদের যথেষ্ট নিগ্রহও ভোগ করতে হয়েছিল। এঁদের উদারনৈতিক সর্বজাতি-মিলনকামী মনোভাব আরও সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তখনই যখন আনন্দমোহন বসু মহাশয় ব্রিটিশ ভেদনীতির বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানকে এক হ'য়ে দাঁড়াবার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন।

কিন্তু এই ব্রাহ্ম-আন্দোলন তখনকার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে যতখানি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল সাধারণ দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে ততখানি হতে পারেনি। আমরা আগেই বলেছি, অনেকে এই আন্দোলনকে খ্রীষ্টানী ব্যাপার বলে মনে করতেন। গোঁড়া হিন্দুরা তখন যথাসম্ভব ব্রাহ্মদের পরিহার করে চলতেন, এবং তাঁরা বেশী ক'রে 'হিন্দুয়ানীর' দিকে ঝুঁকে পড়েন।

সমাজের সর্বস্তরে ব্রাহ্ম-আন্দোলনের সুস্পষ্ট রূপ ধরা না পড়াতে এই আন্দোলন খুব বেশী দূর এগোতে পারেনি। বরং এই আন্দোলনের গতিবেগ আরও একটু মন্থর হ'ল বিংশ শতাব্দীতে এসে। কারণ তখন যুগচিত্ত আরও আত্মসচেতন হয়ে উঠেছে, এবং ব্রাহ্মধর্মের মূল বক্তব্য তখন হিন্দু সমাজেও সহজভাবে গৃহীত হয়েছে। তখন ধর্মের আবরণে মানুষের জাতীয়তাবোধ জাগাবার প্রয়োজন কমে এসেছে। বাঙ্‌লার মানুষ বুঝতে পেরেছে অতীতের দুর্বলতার স্বরূপটি।

উনবিংশ শতাব্দীতে এদেশে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। নতুন কল্-কারখানা দেখা দেয়। শ্রমিক মজুরের আবির্ভাব ঘটে। চাষীরাও আপন ভাগ্য সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে। ইংরেজ শাসনের আড়ালের চক্রান্তের স্বরূপটি ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে।

জনসাধারণও আগের চাইতে সংগ্রামশীল হয়ে উঠেছে। এই সময়ে ব্রাহ্ম-আন্দোলনের প্রয়োজন কমে আসাতে শুধু একটা ধর্মমত হিসাবেই ব্রাহ্মধর্ম থেকে গেল। তবুও একথা ঠিক, যে সময়ে ব্রাহ্ম-আন্দোলন দেখা দিয়েছিল, সে সময় এই আন্দোলনের একান্ত প্রয়োজন ছিল। এবং জাতির অন্ধকার মুহূর্তে এই ব্রাহ্ম-আন্দোলন তাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। এদিক থেকে ব্রাহ্ম-আন্দোলন, ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের দান অনেকখানি।

আধুনিক কাল

ব্রাহ্ম-আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠার আগেই বাঙ্‌লা সাহিত্যে আধুনিকতার আভাস দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে বাঙালী যখন ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হ'ল, তখন থেকে তার মধ্যে এক নতুন জীবনরসবোধ জেগে ওঠে। ইংরেজি সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বাঙালী অন্তরে এক নতুন সাড়া জাগিয়ে তোলে। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর দেশাত্মবোধ, জাতিপ্রীতি প্রভৃতি ইংরেজ সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হবারই শুভফল।

দেবতার মাহাত্ম্য-কীর্তনই ছিল প্রাচীন যুগের বাঙ্‌লা সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য। এরই ফাঁকে ফাঁকে সে যুগের সমাজ পরিবেশ কিছু কিছু প্রকাশ পেয়েছে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতক থেকে কিছু কিছু রোমান্‌টিক রচনার পরিচয় পাই। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি থেকে সাহিত্যে যে বিকৃতি দেখা দিয়েছিল তার অবসান ঘটল ইংরেজি সাহিত্যের আবির্ভাবে। ইংরেজি সাহিত্য প্রথম ঘটাল মানসিক পরিবর্তন। তারপর নানা সমাজ-সংস্কার চেষ্টার মধ্যে দিয়ে সাহিত্য একটি নতুন রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে।

উনবিংশ শতাব্দীতে নতুন ধ্যান-ধারণার ফলস্বরূপ বাঙ্‌লা উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প, প্রবন্ধ সাহিত্য, কাব্য প্রভৃতি রচিত হতে থাকে। গদ্য সাহিত্যের আবির্ভাব আধুনিক যুগের সাহিত্যের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। মানুষের দৃষ্টি-ভঙ্গীও ধীরে ধীরে যুক্তিপূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত হয়ে ওঠে। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্‌লা গদ্য সাহিত্যের প্রথম পর্বে আমরা সাহিত্য রচয়িতাদের সংস্কারমূলক মনের পরিচয় পাই। তবে সে সব রচনা যে একেবারে সাহিত্য-রস বহির্ভূত একথা জোর করে বলা যায় না। প্রাক্-বঙ্কিমপর্বের গদ্য সাহিত্য আলোচনা করলে তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে।

এযুগের গদ্য রচনা

আলোচ্য কাব্যের লেখকদের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের (১৮২০-১৮৮৬খ্রীঃ) উল্লেখ পূর্বেই করেছি। অক্ষয়কুমার সে যুগের চিন্তাশীল লেখকদের মধ্যে অন্যতম। তিনি প্রায় বারো বৎসর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনা করেন। অক্ষয়কুমার 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (দুই খণ্ড—প্রকাশকাল ১৮৫২, ১৮৫৩), চারুপাঠ (তিন ভাগ, ১৮৫২, ১৮৫৪, ১৮৫৯খ্রীঃ), ধর্মনীতি (১৮৫৬) প্রভৃতি রচনা করেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়,' দুই খণ্ডে (১৮৭০, ১৮৮৩) প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমারের পাণ্ডিত্য খুবই ছিল। কিন্তু তাঁর রচনা মুখ্যত যুক্তিমূলক হওয়াতে তাতে কাব্য-উন্মাদনা তেমন ছিল না। যুক্তিপূর্ণ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং বক্তব্য বিষয়ের সহজ ও অনাড়ম্বর প্রকাশ তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

এ যুগের শ্রেষ্ঠ সমাজসেবী ও সাহিত্য সাধক হচ্ছেন নিত্যস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় (১৮২০-৯১খ্রীঃ)। মানুষ হিসাবে বিদ্যাসাগর মহাশয় ছিলেন অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ, উদার, অনাড়ম্বর, বাইরে কঠোর কিন্তু অন্তরে কোমল। বাঙ্‌লার জীর্ণ সমাজের সংস্কার সাধনে তিনি তৎপর। হিন্দু সমাজের মধ্যে থেকে হিন্দু-আচার পালন করে তিনি হিন্দুধর্ম ও সমাজের যাবতীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন। স্বজাতিপ্রীতি তাঁর চরিত্রের একটি মহৎ গুণ ছিল। সংস্কৃত সাহিত্য ও শাস্ত্রে তাঁর ছিল অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অপর দিকে নতুন ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গেও তিনি যথেষ্ট পরিচিত ছিলেন। বাঙ্‌লার নারীদের বাল্য-বৈধব্য ও বাল্য-বিবাহের বিষময় পরিণাম তাঁর অন্তরকে ব্যথিত করেছিল। এরই প্রতিকারকল্পে তিনি বিধবা-বিবাহের স্বপক্ষে এবং বাল্য-বিবাহ ও বহু-বিবাহের বিরুদ্ধে শত বাধা সত্ত্বেও তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আপন যুক্তি প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর মাতা ভগবতীদেবীর দেবতুল্য চরিত্র তাঁর ওপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল। ঈশ্বরচন্দ্রের দয়া, ভালোবাসা কখনও ছোট বড়োর পার্থক্য মানেনি। বিশেষ করে তত্ত্ববোধিনীর সংস্পর্শে এসে তাঁর মন আরও প্রশস্ততর হয়েছিল। দেশের প্রতি এতখানি ভালোবাসা একমাত্র বিদ্যাসাগরের পক্ষেই সম্ভব ছিল। বাঙালীর শিক্ষার প্রসার সম্বন্ধে, বিশেষ করে স্ত্রীশিক্ষার সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন।

একদিকে তিনি যেমন সমাজসেবা করে গেছেন, সঙ্গে সঙ্গে বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের সংস্কার ব্যাপারেও তিনি অগ্রণী ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ই বাঙলা গদ্য ভাষায় প্রথম স্বর ও ছন্দ সম্বন্ধে সবাইকে সচেতন করে তোলেন। পূর্বে বাঙ্‌লা ভাষা বড়োই জটিল ও আড়ষ্ট ছিল। তিনিই নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে সেই ভাষাকে সাহিত্যের সার্থক বাহন করে তোলেন। 'আলালের ঘরের দুলাল' আলোচনাপ্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা সম্বন্ধে বলেছেন, 'এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের হাতে কিছুটা সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইহাদিগের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত দুর্বোধ্য নহে। বিশেষত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্‌লা গদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাহার পরেও কেহ পারে নাই।' ইংরেজ শাসনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্‌লার সমাজে বিদেশী স্বার্থের যে ধাক্কা এসে জাতীয় ভিত্তিকে নাড়া দিচ্ছিল তিনি তার সম্বন্ধেও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেশীর ভাগ রচনাই অনুবাদমূলক। কিন্তু এই অনুবাদ মৌলিকতার দাবী করতে পারে। বিধবা-বিবাহ ও বহু-বিবাহ বিষয়ক পুস্তিকায় তাঁর দৃঢ় ও বলিষ্ঠ মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

বিদ্যাসাগর প্রথম 'বাসুদেবচরিত' রচনা করেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্তৃপক্ষের মনোমতো না হওয়ায় বইখানি ছাপা হয়নি। তারপর বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭), বাঙ্‌লার ইতিহাস (১৮৪৮), শকুন্তলা (১৮৫৪), কথামালা (১৮৫৬), চরিতাবলী (১৮৫৬), মহাভারতের উপক্রমণিকা (১৮৬০), সীতার বনবাস (১৮৬০), আখ্যানমঞ্জরী (১৮৬৩, ১৮৬৮), ভ্রান্তিবিলাস (১৮৬৯) প্রকাশিত হয়। এছাড়া 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৫৩), 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (দুইখণ্ড ১৮৫৫), 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিৎ কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' (দুইখণ্ড ১৮৭১, ১৮৭৩), প্রভৃতিও রচনা করেছিলেন।

বিদ্যাসাগরের রচনার সব চেয়ে বড়ো গুণ এই, তিনি বিষয়বস্তুর ভাবরূপ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। যখন মহাভারতের উপক্রমণিকা, সীতার বনবাস লিখছেন তখন ভাষার ধ্বনিরূপ যে রকম, শকুন্তলা রচনার সময় তার চেয়ে অনেক সহজ ও সরল ভাষার রূপটি লক্ষিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনুবাদ

সাহিত্যকে আক্ষরিক অনুবাদ বলা সঙ্গত হবেনা, তাকে ভাবানুবাদ বলা যেতে পারে। 'চরিতাবলী' ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট পরিচয়ের সার্থক নিদর্শন। 'ভ্রান্তি বিলাস' Comedy of Errors-এর ভাবানুবাদ।

বিদ্যাসাগরের হাতে যে ভাষা ও সাহিত্য নবজন্মলাভ করল তার প্রভাব রাজনারায়ণ বসু, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতির রচনার মধ্যে বিদ্যমান।

তখনকার রক্ষণশীল দল যে সংস্থা স্থাপিত করেছিল, তার দ্বারা তারা শুধু ব্রাহ্মসমাজ বা ইয়ং বেঙ্গল দলেরই বিরুদ্ধতা করত না, প্রাচীন কুসংস্কারের বিরোধী বিদ্যাসাগর মহাশয়েরও বিরোধিতা করত। বাঙালীর চিন্তার দীনতা ও জীর্ণ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি একা দাঁড়িয়ে বিরুদ্ধ পক্ষের সঙ্গে সংগ্রাম করে গেছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে বলেছেন, 'আমাদের এই অবমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মতো এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল, আমরা বলিতে পারি না। কাকের বাসায় কোকিলে ডিম পাড়িয়া যায়—মানব ইতিহাসের বিধাতা সেইরূপ গোপনে কৌশলে বঙ্গভূমির প্রতি বিদ্যাসাগরকে মানুষ করিবার ভার দিয়াছিলেন।'

'সেইজন্য বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে যেন তাঁহার স্বজাতি—সোদর কেহ ছিল না। এ দেশে তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন।' (চারিত্র পূজা)

এই সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫ খ্রীঃ) বাঙালী সমাজের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অশিক্ষার দুঃখই বাঙালী জীবনের বড়ো দুঃখ ছিল। তখন জনসাধারণের শিক্ষার ব্যাপারে সরকারকে যাঁরা সচেতন করে তোলেন তাঁদের মধ্যে মহর্ষি ছিলেন পুরোভাগে। বিদ্যাসাগরের মতো তিনিও জনশিক্ষা, বিশেষ করে স্ত্রীশিক্ষা, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি নিয়ে 'সমাজোন্নতিবিধায়িনী সুহৃদ্ সমিতি'র মাধ্যমে আন্দোলন করেছিলেন। তাঁর এই সমিতির মধ্যে প্যারীচাঁদ মিত্র, হরিশচন্দ্র মুখার্জি, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, গৌরদাস বসাক, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি দিক্‌পালরা সভ্য হিসাবে ছিলেন। মহর্ষি-প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভা ও

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠাও তাঁর এক মহৎ কীর্তি।

রাজা রামমোহন রায় যে আদর্শে ব্রাহ্ম সভা প্রতিষ্ঠা করে যান মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের লক্ষ্য ছিল সমাজ-ব্যবস্থায় সে আদর্শকে অনুসরণ করার, এবং তিনি তা সার্থকভাবে করেও ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্ম থেকে আলাদা করে দেখেন নি। তাঁর মতে 'হিন্দু-সমাজের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন থাকিয়া যাহাতে হিন্দু রীতিনীতি ব্রাহ্মধর্মের অনুযায়ী হয়, চেষ্টা করিতে হইবে।' ব্রাহ্মধর্মের তত্ত্ব বিষয়ে তাঁর সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের মতবিরোধ হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত কেশবচন্দ্রের প্রতি তাঁর স্নেহ অটুট ছিল।

ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্ম-সমাজের উন্নতিকল্পে মহর্ষিকে লেখনী ধারণ করতে হয়। তিনি ব্রাহ্ম ধর্মগ্রন্থ, আত্মতত্ত্ব বিদ্যা প্রভৃতি রচনা করেন। তাঁর বক্তৃতাগুলি 'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস', 'কলিকাতা ব্রাহ্ম-সমাজের বক্তৃতা', 'ব্রাহ্ম-ধর্মের ব্যাখ্যান' প্রভৃতি নামে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। তাঁর 'আত্ম-জীবনী' গ্রন্থখানি বাঙ্‌লা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। সে যুগে বাঙ্‌লা ভাষার এরকম স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল প্রকাশ খুব কম লেখকের রচনায় পাওয়া গেছে। ভাবগাম্ভীর্য তাঁর রচনার একটি প্রধান গুণ।

এইসঙ্গে 'আলালের ঘরের দুলাল' রচয়িতা প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুরের নাম (১৮১৪-১৮৮৩ খ্রীঃ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্যারীচাঁদ হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং খুব সম্ভবত ডিরোজিও তাঁর সময়ে কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। প্যারীচাঁদ গতানুগতিক ভাষারীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন। এবং ভাষা কি রকম হলে পর সর্বজনগ্রাহ্য হ'তে পারে তার পরীক্ষা হ'ল 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮)। 'বাঙ্‌লা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, '…তিনিই প্রথম ইংরাজী ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূর্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া, স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন।……বাঙ্‌লা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের 'কাদম্বরীর' অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলালের' পর হইতেই বাঙালী লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং

বিষয়ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা, আদর্শ বাঙ্‌লা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। প্যারীচাঁদ মিত্র, আদর্শ বাঙ্‌লা গদ্যের সৃষ্টিকর্তা নহেন, কিন্তু বাঙ্‌লা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁহার প্রধান ও প্রথম কারণ। ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্তি।'

প্যারীচাঁদের রচনার উপকরণ সম্বন্ধে বঙ্কিম বলছেন, '……তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে,—তাহার জন্য ইংরেজী বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্‌লা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্‌লা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি 'আলালের ঘরের দুলাল'।

'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'গ্রন্থে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় 'আলালের' ভাষা সম্বন্ধে বলেন, 'আলালের ঘরের দুলাল বঙ্গসাহিত্যে এক নবযুগ আনয়ন করিল। এই পুস্তকের ভাষার নাম আলালী ভাষা হইল।…এই আলালী ভাষার সৃষ্টি হইতে বঙ্গ সাহিত্যের গতি ফিরিয়া গেল। ভাষা সম্পূর্ণ আলালী রহিল না বটে কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রী হইল না, বঙ্কিমী হইয়া দাঁড়াইল।'

বস্তুত ভাষা ও রচনারীতির দিক থেকে 'আলালের ঘরের দুলালের' মৌলিকতা অনস্বীকার্য। প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলালে' আগামী দিনের উপন্যাসের ইঙ্গিত রয়েছে। গ্রন্থখানির মূল উদ্দেশ্য ছিল নীতিশিক্ষা দেওয়া। কিন্তু তারই ফাঁকে ফাঁকে তিনি কতগুলি type চরিত্র সৃষ্টি করেছেন।

প্যারীচাঁদ 'আলালের ঘরের দুলাল' ছাড়া, 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯), 'রামারঞ্জিকা' (১৮৬০), 'যৎকিঞ্চিৎ' (১৮৬৫), 'অভেদী' (১৮৭১), 'বামা তোষিণী' (১৮৮১) প্রভৃতি গ্রন্থ ও পুস্তিকা রচনা করেন। সাহিত্যের ভাষাকে সর্বজনীনত্ব-দানকল্পে রাধানাথ সিকদার মহাশয়ের সহযোগিতায় তিনি 'মাসিক পত্রিকা' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেন। সব রচনাতে 'আলালী ভাষারীতি' অনুসৃত হয়নি। অভেদী প্রভৃতি ভাষারীতি 'আলালী ভাষা'র চেয়ে বেশ গম্ভীর।

এই সময়ে যুক্তিনিষ্ঠা, জাতীয়তাবোধ এবং বলিষ্ঠ অনুসন্ধিৎসা নিয়ে যাঁরা

বাঙ্‌লা সমাজ ও সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন রাজনারায়ণ বসু মহাশয় তাঁদের অন্যতম। রাজনারায়ণের অধিকসংখ্যক রচনা না থাকলেও তখনকার সময় নিয়ে এবং ব্রাহ্ম আন্দোলন নিয়ে তিনি অনেক প্রবন্ধ রচনা ক'রেছেন। তাঁর 'সেকাল আর একাল' নিবন্ধ সেযুগের একখানি বিখ্যাত রচনা। এছাড়া 'বিবিধপ্রসঙ্গ', 'বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা' প্রভৃতিও তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। ইনি মধুসূদন ও ভূদেবের সহপাঠী ছিলেন। এই ত্রয়ীর বন্ধুত্ব লক্ষ্য করবার বিষয়। দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য সত্ত্বেও তাঁরা তিনজনই তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তখনকার যুগধর্মকে তাঁরা তিনজনই সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, সম্বন্ধে মধু-ভূদেবের মতো রাজনারায়ণেরও গভীর জ্ঞান ছিল। কাল বদলের ঝোড়ো হাওয়ার মুখে এই বন্ধুত্রয়ের একজন খ্রীষ্টান, একজন ব্রাহ্ম আর একজন বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিসম্পন্ন বাইরে গোঁড়া অথচ অন্তরে লিবারেল ব্রাহ্মণ। সেযুগের চিন্তাশীল সাহিত্যসেবী এবং সমাজসেবীদের মধ্যে রাজনারায়ণ অন্যতম। ব্রাহ্ম আন্দোলনের মধ্যে প্রগতির যে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে রাজনারায়ণ তা বুঝতে পেরেছিলেন। তবে ভারতের প্রাচীন গৌরবকেও তিনি শ্রদ্ধার চোখেই দেখেছেন। রাজনারায়ণ একখানি আত্মজীবনী রচনা করেন। এই গ্রন্থখানিতে সে যুগের অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। ইনি ব্রাহ্ম-আন্দোলনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রধান সহযোগী ছিলেন।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১) কলকাতার এক ধনী কায়স্থ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। রাজেন্দ্রলালের পিতা রাজা জনমেজয় মিত্র এবং প্রপিতামহ রাজা পীতাম্বর মিত্র খ্যাতনামা কবি ছিলেন। জনমেজয় 'সংগীত রসার্ণব' প্রভৃতি গ্রন্থ এবং অনেক পদ রচনা করেন। রাজেন্দ্রলাল ডাক্তারী পড়তেন। শেষ পর্যন্ত প্রশ্নপত্র হারিয়ে যাওয়ায় তিনি আর পাশ করতে পারেন নি। এরপর তিনি প্রত্নতত্ত্বের উপর গবেষণা শুরু করেন। তাঁর 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকাটি (১৮৫৩) বাঙ্‌লা সাহিত্য ও সমাজের অতুলনীয় কীর্তি। তাতে ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি আলোচনা থাকত। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'রহস্য সন্দর্ভ' নামে একখানি সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এছাড়া তিনি শিল্পিক দর্শন (১৮৬০), মেবারের রাজেতিবৃত্ত, পত্র কৌমুদী (১৮৬৩) প্রভৃতিও রচনা করেছিলেন।

সে যুগের গুরু-গম্ভীর গদ্য ভাষাকে রাজেন্দ্রলাল লঘু রূপ দান করে তাকে

সরস করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। 'রহস্য সন্দর্ভ' পত্রিকায় তিনি সাহিত্য সমালোচনা শুরু করেন। এই পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' প্রভৃতির সমালোচনা প্রকাশিত হয়। রাজেন্দ্রলালের পাণ্ডিত্য ছিল অপরিসীম। সমাজে এই পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতির যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তিনি এসিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক ও সভাপতি হয়েছিলেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনেরও সভাপতি ছিলেন। বিদেশেও রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি, জার্মান ওরিয়েন্টাল্ সোসাইটি, হাঙ্গেরীর রয়েল একাডেমি অব সায়েন্স্ প্রভৃতি অনেক সংগঠনের সভ্য ছিলেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনস্মৃতিতে রাজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে বলেছেন, 'রাজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন, তিনি একাই একটি সভা, ... কেবল তিনি মননশীল লেখক ছিলেন ইহাই তাঁহার প্রধান গৌরব নহে, তাঁহার মূর্তিতেই তাঁহার মনুষ্যত্ব যেন প্রত্যক্ষ হইত।'

তারাশঙ্কর তর্করত্ন এযুগের একজন উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচয়িতা। ইনি বাণভট্টের সংস্কৃত 'কাদম্বরী' গদ্য কাব্যের ভাবানুবাদ (১৮৫৪) করেন। এছাড়া তিনি জনসনের রাসেলাসেরও (১৮৫৭) বাঙ্‌লা অনুবাদ করেন। তারাশঙ্করের রচনায় বিদ্যাসাগরের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষিত হয়। 'টেলিমেকস' রচয়িতা রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনারীতির দ্বারা প্রভাবিত।

এযুগের আর একজন উল্লেখযোগ্য লেখক হচ্ছেন রামগতি ন্যায়রত্ন। রামগতি 'রোমাবতী' ও 'ইলছোবা' নামে দু'খানি উপন্যাস রচনা করেন। কিন্তু তাঁর খ্যাতি হচ্ছে 'বাঙ্‌লা ভাষা ও বাঙ্‌লা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭২-৭৩) রচনায়। তিনি অনেক স্কুলপাঠ্য বইও রচনা করেন। তাঁর সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে বাঙ্‌লা সাহিত্যের যথার্থ মূল্য নিরূপণ এবং সাহিত্য সমালোচনার প্রয়াস লক্ষণীয়। রামগতির পূর্বে আর দু'খানি বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস রচিত হয়েছিল। একখানি হচ্ছে হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'কবি চরিত' (১৮৬৯) আর একখানি হচ্ছে মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গভাষার ইতিহাস' (১৮৭১)। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ও বাঙ্‌লার কবিওয়ালাদের জীবন চরিত ও তাঁদের রচিত অনেক গীত এবং রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের জীবনী ও তাঁদের অনেক লুপ্তপ্রায় কবিতা প্রকাশ করেছিলেন।

এসময়ে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ 'সোম প্রকাশ পত্রিকা' (১৮৫৮) প্রকাশ করেন। তাঁর এই পত্রিকাতে সেযুগের অনেক শক্তিশালী লেখক নানা বিষয়ে লিখতেন।

এযুগের আর একজন সমাজসেবী ও গদ্য রচয়িতা হচ্ছেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪)। ভূদেব তত্ত্ববোধিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। দেশাত্মবোধ, জাতিপ্রীতি, যুক্তি-প্রবণতা ভূদেবের রচনার প্রধান গুণ। সামাজিক প্রবন্ধ, পারিবারিক প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনার মধ্যে তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ভূদেব যে গদ্য রীতিতে প্রবন্ধাদি রচনা করেছেন তাকে প্রবন্ধের আদর্শ রীতি বলা যেতে পারে। গদ্যকে সাধারণত Language of reason (যুক্তির বাহন) বলা হয়। ভূদেব উক্ত আদর্শেই গদ্য ভাষাকে তাঁর রচনায় প্রয়োগ করেছেন। তিনি সে যুগের যুগধর্ম ধর্ম সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন, এবং তখনকার সমাজের চাহিদা যে কি তাও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। অন্য দিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষা, জীবন ও ধর্মাদর্শের সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন। দেশাত্মবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি স্বদেশ ও স্বজাতির ঐতিহ্যের গৌরব প্রচার করেছেন। হেমচন্দ্রের দেশপ্রেমমূলক কবিতা প্রকাশ করে তিনি বিদেশী সরকারের বিরাগভাজনও হয়েছিলেন। ভূদেব ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙালী কবি মধুসূদন এবং রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সতীর্থ। সেযুগের ব্রাহ্ম-আন্দোলন, ইয়ং বেঙ্গল সোসাইটির আন্দোলন প্রভৃতির সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। কোনো কোনো সমিতির কার্যধারার সঙ্গেও তাঁর যোগ ছিল। অপরদিকে তিনি নিষ্ঠাবান রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ—হিন্দুধর্মের প্রাচীনত্ব এবং তার প্রাচীন সংস্কারকে তিনি পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন। একদিকে তাঁর ভালো লাগছে ইস্‌লামধর্মের সাম্যের আদর্শকে, অন্যদিকে বহু আচার সংস্কার কণ্টকিত হিন্দু 'সনাতন' ধর্মের মহিমা কীর্তন করে চলেছেন। ভূদেবের ভাবাদর্শে যুগ-ধর্মোচিত স্ববিরোধিতা দেখা দিয়েছে। যাকে তিনি সার্থক বলে জানতে পেরেছেন তাকে তিনি সার্থক ও সহজভাবে গ্রহণ করতে পারছেন না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর রচনা সেযুগের গদ্য সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার ক'রে আছে। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল যথাসম্ভব যুক্তিনিষ্ঠ। তাঁর রচনায় ভাষার প্রয়োগ-রীতি লক্ষণীয়। প্রবন্ধের ভাষা এবং আখ্যায়িকার ভাষা ভিন্ন প্রকৃতির ছিল।

প্রথমটিতে অক্ষয়-বিদ্যাসাগর প্রভাব এবং দ্বিতীয়টিতে রোমান্টিক লক্ষণযুক্ত রীতির আভাস লক্ষিত হয়। তাঁর 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৬-৫৭) বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাঙ্‌লা উপন্যাস 'দুর্গেশ নন্দিনী' রচনার পথ অনেকখানি সুগম করেছিল। ঐতিহাসিক ভিত্তিতে রচিত এই গ্রন্থখানিকে মৌলিক রচনার পর্যায়ভুক্ত করা যায়। 'ঐতিহাসিক উপন্যাস'কে যথার্থ উপন্যাস বলা হয়ত ঠিক হবেনা। তবে উপন্যাসের যাবতীয় উপকরণ এর মধ্যে রয়েছে। সে যুগে বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন। শিক্ষার উপরও তাঁর অনেক প্রবন্ধ আছে। এই প্রবন্ধগুলি পরবর্তী কালের প্রবন্ধকারদের রচনার আদর্শস্বরূপ ছিল বললে অযৌক্তিক হবেনা। সার্থক গদ্যরচনায় ভূদেবের কৃতিত্ব অসামান্য। ভূদেব শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৬), ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৮৫৬-৫৭), পুরাবৃত্তসার (১৮৫৮), ইংলণ্ডের ইতিহাস (১৮৬২), রোমের ইতিহাস (১৮৬৩), পুষ্পাঞ্জলি (১৮৭৬), পারিবারিক প্রবন্ধ (১৮৮২), সামাজিক প্রবন্ধ (১৮৯২), আচার প্রবন্ধ (১৮৯৫), বিবিধ প্রবন্ধ (১৮৯৫), স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস (১৮৯৫), বাঙ্‌লার ইতিহাস প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহ উনবিংশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত গদ্য রচয়িতা। তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারে। যুগ-প্রেরণায় তিনিও সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। একহাতেই তিনি মহাভারতের গদ্য অনুবাদ করেন আবার হুতোম প্যাঁচার নক্‌শাও (১৮৬২-৬৩) রচনা করেন। মহাভারতের অনুবাদে বিদ্যাসাগরের প্রভাব লক্ষণীয়। কিন্তু 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' গ্রন্থে তিনি কলকাতা অঞ্চলের কথ্য ভাষাকে সাহিত্য-রূপ দান করতে প্রয়াস পেয়েছেন। নক্সাটিতে সে যুগের বাঙালী সমাজের, বিশেষ করে কলকাতার সমাজের সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজের যথাযথ রূপ চিত্রিত করার ব্যাপারে তাঁর কৃতিত্ব অনেকখানি। মহাভারত ও হুতোম প্যাঁচার নক্সা ছাড়া কালীপ্রসন্ন 'বিক্রমোর্বশী নাটক' (১৮৫৭), 'সাবিত্রী সত্যবান নাটক' (১৮৫৮) 'মালতী মাধব নাটক' (১৮৫৯) প্রভৃতি এবং 'বাবু নাটক' নামে একখানি প্রহসন রচনা করেন। কালীপ্রসন্ন মাত্র তিরিশ বছর বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। আরও কিছুদিন জীবিত থাকলে বাঙলা ভাষা তাঁর হাতে আরও সমৃদ্ধ হ'ত সন্দেহ নেই। ধনীবংশে জন্মগ্রহণ করেও তিনি সেই যুগের

আন্দোলন-মুখর সমাজ ও সাহিত্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলেন। বালক বয়সে কালীপ্রসন্ন বিদ্যোৎসাহিনী সভা স্থাপিত করেন। ঐ সভাতেই কবি মধুসূদন এবং নীল দর্পণের অনুবাদের জন্য রেভারেণ্ড লঙ্‌কে সম্বর্ধনা জানানো হয়। সে যুগের প্রগতিশীল ভাবধারার সঙ্গে তিনি পরিচিত ছিলেন। হুতোম প্যাঁচার নক্সায় তিনি সমাজের নানারকম কুসংস্কার, জীবনের কুৎসিত দুর্বলতা, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিরর্থক সভাসমিতির বাড়াবাড়ি প্রভৃতির প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেছেন। নানা পাল-পার্বণের নামে হিন্দুসমাজে যে নষ্টামি চলত তার কুৎসিত রূপটা তিনি আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। চল্‌তি ভাষার মাধ্যমে তিনি তাঁর বক্তব্য বিষয়কে সর্বসাধারণের বোধগম্য করে তুলেছেন। নক্সাটিতে তাঁর প্রগতিশীল মনের সহজ প্রকাশ লক্ষিত হয়। রক্ষণশীল পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও তিনি অন্তত এই রচনাটিতে সুস্থ ও চলিষ্ণু মনের পরিচয় দিয়েছেন। মহাভারতের গদ্য অনুবাদও তাঁর একটি বিরাট কীর্তি। এই দু'খানি গ্রন্থই বাঙ্‌লা সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে। বিশেষ ক'রে গতানুগতিক হিন্দু-সংস্কার যাঁদের হৃদয়াবেগকে একটা অস্পষ্ট পর্দা দিয়ে ঘিরে রেখেছে তাঁদের চোখে কানে হুতোমের ভাব ও ভাষা একটি সরস ভাব এনে দিলেও সেযুগে মহাভারতের অনুবাদের মতো নক্সাখানি ততটা আকর্ষণীয় হয়নি। তবে এটা ঠিক, কালীপ্রসন্নের বিদ্যোৎসাহিনী সভা এবং সে সভার ভেতর দিয়ে তিনি যে সাহিত্য সেবা করে গেছেন এবং যে কালীপ্রসন্ন নব্যবঙ্গ সমিতির অতিরিক্ত ইংরেজিয়ানা ও রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের দুর্বলতার বিরুদ্ধে হুতোম প্যাঁচার নক্সা রচনা করেছেন—তাঁর জীবনবোধে কোথাও কোথাও যুগধর্মানুযায়ী দ্বন্দ্ব দেখা দিলেও সব দিক থেকে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে, তাঁর প্রচেষ্টা গতিবিমুখী হয়নি; বরং এগিয়ে যাবার পথে অনেকখানি সাহায্য করেছে।

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (১৮৪০-১৯৩২) সে যুগের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত এবং নামকরা গদ্য রচয়িতা। ইনি 'দুরাকাঙ্‌ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' (১৮৫৭-৫৮) নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। অনেক বিদেশী কাহিনীও ইনি বাঙ্‌লায় অনুবাদ করেছিলেন। কৃষ্ণকমলের অনূদিত 'পল বর্জিনিয়া' বালক রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল। ইনি 'বিচারক' নামে একখানা পত্রিকাও প্রকাশ করেন। কৃষ্ণকমল যে সব কাহিনী অনুবাদ করেছিলেন তা বঙ্কিমচন্দ্রের

উপন্যাস রচনার অনেক আগে। টেকচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল', ভূদেবের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস', কৃষ্ণকমলের 'বিদেশী গল্পের অনুবাদ' বঙ্কিমের উপন্যাস রচনায় অনেকখানি সহায়তা করেছিল।

এ সময়ে বর্ধমানের রাজসভাও বাঙ্‌লা সাহিত্য রচয়িতাদের নানাভাবে উৎসাহিত করেছিল। বর্ধমানের মহারাজ মহাতাবচন্দ্রের সময় তাঁর প্রচেষ্টায় ও নির্দেশে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির অনুবাদের সঙ্গে সঙ্গে হাতেম তাই, সেকেন্দর নামা প্রভৃতি ফারসী গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রাক্‌-বঙ্কিম পর্বের গদ্য রচনা বিখ্যাত লেখকদের হাতে পরে সাহিত্যপদবাচ্য হয়ে উঠেছিল। তখন দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনের সামান্যতাকে ছাড়িয়ে গদ্য ভাষা সাহিত্য প্রকাশের বাহন হয়ে উঠল।

এযুগের কাব্য রচনা

এযুগে যেমন গদ্য রচনা বাঙ্‌লা সাহিত্য-ভাণ্ডারকে বহুল পরিমাণে সমৃদ্ধ করে তুলছিল, তেমনই কাব্য রচনা ক্ষেত্রেও ধীরে ধীরে একটা পরিবর্তন দেখা দিচ্ছিল। এই প্রাচীন ও নতুন ধারার অবশ্যম্ভাবী সংঘর্ষও দেখা দিয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবলব্ধ চিন্তাধারা নতুন কাব্যসাহিত্য রচনায় যথেষ্ট সাহায্য করে। প্রাচীন বৈষ্ণব কাব্য ও লৌকিক কাব্যের রীতিতে এযুগেও কাব্য বা খণ্ড কবিতা রচিত হচ্ছিল। গতানুগতিকভাবে রাধামাধব ঘোষের 'গৌরাঙ্গ লীলা', রামচন্দ্র তর্কালঙ্কারের 'দুর্গামঙ্গল' (১৮১৯), 'মাধব-মালতী', 'অক্রুর সংবাদ' প্রভৃতি রচিত হচ্ছে, আবার প্রাচীন সূত্র ধরে ঈশ্বর গুপ্ত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতিও কবিতা লিখেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

ঈশ্বর গুপ্ত মহাশয় অনেক আধ্যাত্মিক, সামাজিক এবং ব্যঙ্গপূর্ণ কবিতা রচনা করেছিলেন। 'সংবাদ প্রভাকর' ছিল তাঁর দ্বারা সম্পাদিত বিখ্যাত সাময়িক পত্রিকা। তিনি 'সংবাদ রত্নাবলী', 'পাষণ্ড পীড়ন', 'সাধু-রঞ্জন' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত 'প্রবোধ প্রভাকর', 'হিতপ্রভাকর', 'বোধেন্দু বিকাশ' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

ঈশ্বরচন্দ্র প্রাচীন যুগের রেশটুকু টানবার চেষ্টা করছেন, আবার উনবিংশ শতাব্দীতে কালান্তরের মুখে এসে দোটানায় পড়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্র তত্ত্ববোধিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। যে পরাধীনতার গ্লানি বাঙালী-জীবনে দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলেছিল, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের অনিষ্টকারী প্রকৃতি বোঝবার সুযোগ দিয়েছিল, ঈশ্বরচন্দ্র তার সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন। তাঁর কাব্যে এই সচেতনতার অভিব্যক্তি তাঁর দেশাত্মবোধক কবিতায়। একদিকে তিনি বিদেশী রাজশক্তিকে নানাভাবে বিদ্রূপ করছেন, অন্যদিকে ইংরেজের অনুকরণকারী বাঙালীদেরও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গে জর্জরিত করছেন। এও যেমন দেখতে পাই তেমনই আবার তাঁর প্রাচীনের প্রতি অসীম দরদ এবং বক্তব্য বিষয়ে স্ববিরোধিতাও লক্ষিত হয়। তবুও তাঁর দেশপ্রেমমূলক কবিতাগুলি তখনকার একদল শিক্ষিত বাঙালীর মনে সাড়া জাগিয়ে তোলে। ঈশ্বরচন্দ্রের রচনা এবং প্রকাশভঙ্গী প্রাচীন; কিন্তু তার ভেতর দিয়ে তিনি আধুনিক ভাবকে প্রয়োগ করতে প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর হাল্‌কাধরণের কবিতাগুলির বেশীর ভাগই হাস্যরস প্রধান ছিল। কিন্তু দেশাত্মবোধের কবিতাগুলির মধ্যে তাঁর দরদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। নিজের দেশ ও সমাজের দুর্বলতাকে চাপা না দিয়ে তিনি তার ভালো দিকটা তাঁর কাব্যে প্রকাশ করেছেন। এখানে তিনি খাঁটি দেশপ্রেমিক। ঈশ্বরচন্দ্র নবযুগের 'নতুন চেতনা' সম্বন্ধে সচেতন, 'পুরানো ধারাকে অতিক্রম করবনা'—এই রকম একটি মনোভাব নিয়েও তিনি সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন সামাজিক প্রয়োজনানুগ ভাবাদর্শ। ঈশ্বরচন্দ্রের এই যে দ্বিধাজড়িত মনোভাব এও সেই যুগের পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। রঙ্গলাল, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতির বেলায়ও এই ব্যাপার ঘটেছিল।

ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে দ্বারকানাথ অধিকারী 'সুধীরঞ্জন', (১৮৫৫) বঙ্কিমচন্দ্র 'ললিতা-মানস' (১৮৫৬) প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

ঈশ্বরচন্দ্রের কবিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'যাহা আদর্শ, যাহা কমনীয়, যাহা আকাঙ্ক্ষিত, তাহা কবির সামগ্রী। কিন্তু যাহা প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাপ্ত, তাহাই বা নয় কেন? তাহাতে কি কিছু রস নাই? কিছু সৌন্দর্য নাই? আছে বই কি। ঈশ্বর গুপ্ত সেই

রসের রসিক। সেই সৌন্দর্যের কবি। যাহা আছে, ঈশ্বর গুপ্ত তাহার কবি। তিনি এই বাঙ্‌লা সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা শহরের কবি। তিনি বাঙ্‌লার গ্রাম্যদেশের কবি। এই সমাজ, এই শহর, এই দেশ বড় কাব্যময়, অন্যে তাহাতে বড় রস পান না……ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য চালের কাঁটায়, রান্নাঘরের ধুঁয়ায়, নাটুরে মাঝির ধ্বজির ঠেলায়, নীলের দাদনে হোটেলের খানায়, পাঁঠার অস্থিস্থিত মজ্জায়। তিনি আনারসে মধুর রস ছাড়া কাব্যরস পান, তপ্‌সে মাছে মৎস্যভাব ছাড়া তপস্বিভাব দেখেন। পাঁটায় বোকাগন্ধ ছাড়া একটু দধীচির গায়ের গন্ধ পান।'

ইংরেজ নারীদের সাহসভরে ব্যঙ্গ করে তিনি বলেন, 'বিড়ালাক্ষী বিধুমুখী মুখে গন্ধ ছোটে', আবার বাঙালী সাহেবদের কটাক্ষ করে বলেন,—

যখন আসবে শমন করবে দমন
কি বোলে তায় বুঝাইবে।
বুঝি হুট্ বোলে বুট পায়ে দিয়ে
চুরট ফুঁকে স্বর্গে যাবে?

বাঙালী মেকি বাবুদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন—

তেড়া হয়ে তুড়ি মেরে, টপ্পাগীত গেয়ে।
গোচে গাচে বাবু হন, পচাশাল চেয়ে॥
কোনরূপে পিত্তি রক্ষা, এঁটোকাঁটা খেয়ে।
শুদ্ধ হ'ন ধেনো গাঙে, বেনোজল খেয়ে॥

ঈশ্বরচন্দ্রের মেকির ওপর রাগ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে এই রাগই তাঁর কাব্যে অশ্লীলতা দোষ ঘটিয়েছিল। এই অশ্লীলতা সেই মেকি জিনিসের উপর রাগের জন্যই। তখনকার সমাজের যা কিছু দুর্বলতা দেখেছেন তার বিরুদ্ধেই তিনি তীব্র ক্রোধের সঙ্গে লেখনী ধারণ করেছিলেন। বাঙ্‌লা সাহিত্যের যুগসন্ধিকালে ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব বাঙালী জীবনের মস্ত বড়ো আশীর্বাদ বলতে হবে। প্রাচীন বাঙ্‌লা সাহিত্যের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে কাব্যের মধ্যে এমন করে আগামী দিনের কথা বলা সত্যিই বিস্ময়কর ব্যাপার। দ্বিধা-জড়িত স্ববিরোধী মনোভাব সত্ত্বেও ঈশ্বর গুপ্ত সেযুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৬-১৮৫৮) 'রসতরঙ্গিণী' এবং 'বাসবদত্তা' নামে দুইখানি কাব্য রচনা করেন। 'রসতরঙ্গিণী' হচ্ছে কতগুলি আদিরসাত্মক

শ্লোকের সরস অনুবাদ। 'বাসবদত্তা' কাব্যখানি একেবারে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের ছাঁচে ঢালা। মদনমোহনও ঈশ্বরগুপ্তের মতো তত্ত্ববোধিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। মদনমোহন সেযুগের একজন পণ্ডিত কবি। সেযুগের নবলব্ধ আদর্শের সঙ্গে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। তবুও সাহিত্য রচনার বেলায় তিনি প্রাচীন পদ্ধতিই অবলম্বন করেছেন।

এসময়ে ইংরেজি কাব্যের কিছু কিছু অনুবাদ হচ্ছিল। 'সুখদ উদ্যান ভ্রষ্ট' নামে মিলটনের 'প্যারাডাইস্ লস্‌টের' একখানি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। রচয়িতার নাম জানা যায়নি। হোমারের নামে প্রচলিত (নিশ্চয় হোমারের নয়) একখানি ব্যঙ্গকাব্য 'ভেক-মূষিকের-যুদ্ধ' নামে বাঙ্‌লায় অনূদিত হয়। এই গ্রন্থের অনুবাদক হচ্ছেন কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় গোল্ড্‌স্মিথের 'ডেজার্টেড্ ভিলেজ্' কাব্যখানি 'পরিত্যক্ত গ্রাম' (১৮৬২) নামে অনুবাদ করেন। হরিমোহন গুপ্ত 'সন্ন্যাসী উপাখ্যান' নামে পার্নেলের (Parnell) হারমিট্ কাব্যের বাঙ্‌লা অনুবাদ করেন। কয়েকখানি বিখ্যাত সংস্কৃত কাব্যও বাঙ্‌লায় অনূদিত হয়। এ ধরণের অনুবাদের মধ্যে 'কুমার সম্ভব', 'ঋতু সংহার', 'মেঘদূত', 'শকুন্তলা' প্রভৃতির অনুবাদ উল্লেখযোগ্য।

অন্যদিকে দেশপ্রেমমূলক বীরত্বব্যঞ্জক আখ্যায়িকা কাব্যও রচিত হচ্ছিল। কাব্যের এই আধুনিক সুরটি প্রথম ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় শোনা গেল। তাঁর কাব্যে এই ভাবাদর্শ সম্পূর্ণ দানা বেঁধে উঠতে পারেনি। ঈশ্বর গুপ্তের প্রচেষ্টা কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় আরও সার্থক হয়ে ওঠে। বাঙ্‌লায় রোমান্‌টিক্ সাহিত্য আগে থেকে রচিত হলেও আধুনিক রোমান্‌টিক্ ধারা রঙ্গলালের লেখনীতেই প্রথম প্রকাশ পায় বলা যেতে পারে। যে পরাধীনতার গ্লানি তখনকার বাঙালী সমাজকে নির্জীব করে রেখেছিল তার বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন রঙ্গলাল। নিজের দেশের কাছে বাইরের ভোগৈশ্বর্য কিছুই নয়—এই দেশাত্মবোধের দ্বারা রঙ্গলাল উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। কবি হিসাবে রঙ্গলাল ছিলেন ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য। তিনি পদ্মিনী উপাখ্যান (১৮৫৮), কর্মদেবী (১৮৬২), শূরসুন্দরী (১৮৬৮), কাঞ্চী কাবেরী (১৮৭৯) প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন। এই রচনাগুলির মধ্যে 'পদ্মিনী উপাখ্যান' বাঙালীর কাছে খুব পরিচিত এবং কাব্য হিসাবেও উৎকৃষ্ট। টডের রাজস্থান থেকে পদ্মিনী

উপাখ্যানের কাহিনী গৃহীত হয়। 'পদ্মিনী উপাখ্যানের' প্রায় সর্বত্রই রঙ্গলালের স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ করে এই কাব্যে সেক্সপীয়র, বায়রণ, টমাস মূর প্রভৃতি বিখ্যাত কবিদের প্রভাবও লক্ষণীয়। রঙ্গলালের 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে' কবিতাটিতে টমাস মূরের Life without Freedom কবিতার প্রভাব রয়েছে। 'কর্মদেবী' কাব্যও রাজপুত ইতিহাস অবলম্বনে রচিত হয়েছে। এভাবে ইতিহাসের কথাকে কাব্যচ্ছলে বলে যাওয়া বাঙ্‌লা সাহিত্যের পক্ষে অভিনব ব্যাপার। 'কর্মদেবী'কাব্যে বীরত্ব এবং শিভ্যাল্‌রীর গৌরবগাথা রচিত হয়েছে। 'শূরসুন্দরী' কাব্যও এই ইতিহাসের ছাঁচেই ঢালা। রাজপুত ইতিহাস অবলম্বনে রঙ্গলাল ভারতের গৌরব গাথা গেয়ে গেছেন। তাঁর কাব্যগুলি মুখ্যত বর্ণনাত্মক। 'কাঞ্চীকাবেরী' কাব্যেও ইতিহাসের ছাপ রয়েছে। কাব্যটি উড়িষ্যার একটি কিংবদন্তীপ্রসূত। উড়িষ্যার রাজা কপিলেন্দ্রদেবের উপপত্নীর গর্ভজাত পুত্র পুরুষোত্তমদেব এই কাব্যের নায়ক। এই কাব্যগুলি ছাড়া রঙ্গলাল কালিদাসের 'কুমারসম্ভবম্‌'-এর বাঙ্‌লা অনুবাদ করেন। প্রায় দুইশত সংস্কৃত উদ্ভট কবিতার বাঙ্‌লা অনুবাদও তিনি করেছিলেন। এই অনুবাদ সংগ্রহের নাম 'নীতিকুসুমাঞ্জলি'।

রঙ্গলাল ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। এই ইংরেজি শিক্ষার ফল হচ্ছে স্বাধীনতার অশান্ত আকাঙ্ক্ষা। এই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার সার্থক সাফল্য সম্বন্ধে বাঙালী ততটা সচেতন ছিল না। রঙ্গলাল নিজে সচেতন থেকেও সংশয়াবিষ্ট মন নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এতদিন ধরে বাঙ্‌লা সাহিত্যে যে প্রাচীন সুরের প্রাধান্য ছিল রঙ্গলাল তার মাঝে নতুন আদর্শে, নতুন সুরে গান গেয়ে উঠলেন। রঙ্গলালের কাব্য ধারার মাঝে আমরা প্রধান যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি তা হচ্ছে তাঁর স্বদেশপ্রেম এবং কাব্যে তদ্‌জনিত দেশাত্মবোধের অভিব্যক্তি। বাঙ্‌লা কাব্য ধারাকে গতানুগতিকতা থেকে মুক্তি দিলেন কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

দীনবন্ধু মিত্র হাস্যরসের কবিতাই বেশী লিখেছেন। কিন্তু তাঁর পরিচয় কবিতা রচয়িতা হিসাবে নয়, তাঁর পরিচয় 'সধবার একাদশীতে', 'নীলদর্পণে'। দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় অনেক কবিতা প্রকাশ করেছিলেন। 'সদ্ভাবশতকের' রচয়িতা কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার এযুগের একজন প্রতিভাশালী কবি।

এঁর 'চিরসুখী জন ভ্রমে কি কখন ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে' ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাগুলি প্রত্যেক বাঙালীর কাছে পরিচিত। কৃষ্ণচন্দ্রের বেশীর ভাগ কবিতাতেই ধর্মজ্ঞান ও নীতিবোধের নিদর্শন পাওয়া যায়।

৩

কবি মধুসূদন

কবি-সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেন মহাত্মা রামমোহন প্রসঙ্গে বলেছেন, 'রামমোহন রায় বাঙ্‌লা ভাষায়, সাহিত্যে, সমাজধর্মে, রাজনীতি ও শিক্ষানীতি ক্ষেত্রে চিরকালের জন্য নিজের প্রভাব মুদ্রিত করিয়া গিয়াছেন।...রামমোহন ইংরাজ, মুসলমান ও প্রাচীন হিন্দু ঋষির পরম রজঃসত্ত্বগুণের সমষ্টি। প্রাচীন ব্রাহ্মণের সরল বেদবেদান্তগামিনী বুদ্ধি এবং ঐ বুদ্ধির বিশ্বগ্রাহিণী উদারতা, ইংরাজের নির্ভীক কর্মতৎপরতা, মুসলমান ও হিব্রু ঋষির অকুণ্ঠিত একেশ্বর-নিষ্ঠা, এই সমস্ত গুণ-সঙ্গমে রামমোহন এসিয়া ও ইয়োরোপের সম্মিলিত ভাবগরিষ্ঠ বীরপুরুষ।......রামমোহন রায় বঙ্গ সাহিত্যের প্রভাত নক্ষত্র,... ব্যাকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া লৌকিক ব্যবহারবিধি, প্রাচীন দর্শন ও উপনিষদ, বেদ-বেদান্তের তথ্যানুসন্ধান, পক্ষাপক্ষতার যুদ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া ভাবভক্তিপূর্ণ গীতিগাথা, সাহিত্যে সমাজে এবং ধর্মে বিশ্বোদার পন্থা নির্ণয়, এই সমস্ত বঙ্গ সাহিত্য ক্ষেত্রে রামমোহনের কর্তব্য।'

রামমোহনই প্রথম পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার শক্তি মূল অর্থ বুঝতে পেরেছিলেন। আমাদের জাতীয় জীবনে কি করে তাকে প্রয়োগ করা যায় তার জন্য তিনি সব সময় সচেষ্ট ছিলেন। কবি-সমালোচক শশাঙ্কমোহনের কথায় 'এই রামমোহনের হৃদয়েই প্রথমে সাহিত্যের শুভ্র আদর্শ সমুদিত হয়। সেই আদর্শের আবির্ভাব ফলে বঙ্গ সাহিত্যে যে ভাব-বিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছে তাহাতে এদেশের সমস্ত প্রাচীন সাহিত্যরীতি বিপর্যস্ত করিয়া দিয়াছে।' বৌদ্ধ ও মুসলমানরা যা পারেনি ইংরেজদের আসার পর তাদের সাহিত্যাদির মাধ্যমে বাঙ্‌লার সাহিত্য ও সমাজের এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা দিল। সাহিত্যের রূপ একেবারে বদলে গেল।

'... এই নব প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যরঙ্গে সর্বপ্রথম আধুনিক আদর্শের প্রতিভা-ভেরী বাজাইয়াছিলেন মধুসূদন দত্ত। কাব্য, নাটক, প্রাকৃত প্রহসন, সনেট, গীতি কবিতা, খণ্ড কবিতা প্রভৃতির ক্ষেত্রে বঙ্গভারতীর এই উদ্ধত প্রতিভা শিশু' হৃদয়ের প্রচণ্ড আবেগে উদ্দাম সঙ্গীত গেয়ে গেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্‌লা কাব্য সাহিত্যে মধুসূদনের আবির্ভাব একটি গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা। তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব শুধু তাঁর কাব্যে নয়, তাঁর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যও তাঁকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে। মধুসূদন বাঙালী—তিনি খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী হয়েও খাঁটি বাঙালী। সাগরদাঁড়ির মধুসূদন বাঙ্‌লার মনোভূমিতে পাশ্চাত্ত্য জীবনদর্শনের ব্যাখ্যাতা। মাইকেল মধুসূদন তাঁর 'মাইকেল'গত ভাবকে 'মধুসূদন'গত কাঠামোতে বাঁধতে চেষ্টা করেছেন। সে যুগের বিদ্রোহী মনের প্রতীক কবি মধুসূদন। রামমোহন-প্রবর্তিত ব্রাহ্ম-আন্দোলন ও তত্ত্ববোধিনীর দ্বারা তার প্রসার সংসাধন, পাশ্চাত্ত্যের যুক্তিপ্রবণতা ও মানবতার আদর্শ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি মধুসূদনকে আত্মসচেতন করে তুলেছিল। তিনি পরাধীনতার ঘৃণ্য পরিণতি সম্বন্ধে সচেতন, ব্যক্তি-জীবনের পরাজয়ে বিক্ষুব্ধ, মুক্ত জীবনের আনন্দ-কল্পনায় বিভোর। জীবনে তিনি চেয়েছেন আনন্দের অকৃপণ প্রকাশ। জীবনের কাম্য কি—এই প্রশ্নের উত্তর-প্রত্যাশায় মধুসূদন নানাপথ ধরে চলে ছিলেন। অভাবের দৈন্য তাঁকে দুঃখ দিলেও পরাজিত করতে পারেনি। বিদেশ থেকে তাঁর বন্ধু গৌরদাস বসাককে এক পত্রে লিখেছিলেন, 'There is no honour to be got in our country without money. If you have money, you are বড়মানুষ; if not, nobody cares you.'

ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলে বাঁধা বাঙালী জোর করে শেকল ছিঁড়তে চায়। এই শেকল ছেঁড়ার মনোভাব জীবনে জাগাল পরাধীনতার বেদনা, দেশপ্রেম ও জাতিপ্রীতি। তিনি গৌরদাসকে লিখেছিলেন—'Come here and you will soon forget that you spring from a subject race··· ·· Everyone whether high or low, will treat you as a man...'। মধুসূদন চেয়েছিলেন জীবনে শান্তি, স্বাতন্ত্র্য ও সন্তুষ্টি। পাশ্চাত্ত্য জগতের ধনতন্ত্রের চরম প্রকাশকে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন।

মধুসূদনের মনের বিদ্রোহ ভাব অন্তরে বাইরে বিরাট রূপান্তর ঘটাল।

মনে মনে তিনি য়ুরোপের জীবনাদর্শে দীক্ষা নিচ্ছেন—বাইরেও ধর্মান্তর গ্রহণ করলেন। জীবনে এই যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন—সাহিত্যেও তা অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন ঘটাল। বাঙ্‌লা সাহিত্য রচনায় পাশ্চাত্ত্য জীবনাদর্শের প্রভাব দেখা দিল। বাঙালীর জীবনধর্মে মধুসূদন বিদেশী আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন।

বাঙ্‌লা সমাজ ও সাহিত্যে মধুসূদনের স্থান নির্দেশপ্রসঙ্গে কবি-সমালোচক শশাঙ্কমোহন বলেছেন, 'বঙ্গ ভাষায় এবং সাহিত্যে মধুসূদনের স্থান নির্দেশ করিতে হইলে বলা যায় যে, মধুসূদন দত্ত নামক একজন বলশালী টিটান (Titan) বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রমিথিয়ুসের মতন, স্বর্গ হইতে সারস্বত প্রতিভার অমর বহ্নিশিখা বাঙালীর জন্য হরণ করিয়া আনিয়া ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ভাগ্যবিধাতার কঠোর দণ্ডগ্রহণ করিতে হইয়াছিল। সমস্ত জীবন দুর্দশার পাষাণ শৈলে আবদ্ধ থাকিয়া মস্তক পাতিয়া অবিশ্রাম অশান্তি অভিসম্পাত গ্রহণ করিয়া......সেই মহাপুরুষ হীনতা স্বীকার করেন নাই, ওই অগ্নির পরিহার করেন নাই। ...মধুসূদনের হৃদয় মেঘের মতো বজ্রাগ্নিপূর্ণ, বারিপূর্ণ এবং ধ্বনিপূর্ণ ছিল ; তিনি সেই অগ্নি, সেই জল এবং সেই ধ্বনি বঙ্গ সাহিত্যে রাখিয়া গিয়াছেন ; সেই মহামেঘের বর্ষণের পরেই বঙ্গদেশ শ্যামল শস্যবৃক্ষে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে ; বুঝি ফল পাকিবার সময় আসিয়াছে।' ভাবাদর্শ ও জীবনবোধ তাঁর যেমনই হোক না কেন নিজের দেশকে তিনি যথার্থ ভালোবেসেছিলেন—ভালোবেসেছিলেন তার জল, বায়ু, মাটি, ফুল ফলকে। তখনকার যুগের রাজনৈতিক সচেতনতার ক্ষীণসঞ্চারের জন্য তাঁর এই দেশপ্রেমের সার্থক ও সম্পূর্ণ প্রকাশ লাভ করতে পারেনি।

মধুসূদনের জীবনে যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল তাকে সার্থক করে তোলবার জন্য তিনি যে পথ বেছে নিয়েছিলেন, তা হয়ত ভুল পথ। নিজের সমাজে অনেক ভুল ত্রুটি ছিল বটে, কিন্তু তার সংস্কারের চেষ্টা না করে মধুসূদন তাকে এড়িয়ে গেলেন। টাকা পয়সার দিক থেকে বড়ো লোক হবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর মিটলনা। সাহিত্যে যে বলিষ্ঠতা প্রকাশ পেয়েছে ব্যক্তিজীবনে তাকে তিনি সফল করে তুলতে পারেননি। ইংরেজি সাহিত্য পাঠ করে তিনি কৈশোরে স্বপ্ন দেখতেন বড়ো কবি হবেন, সাহেব হবেন। এইজন্য তিনি খ্রীষ্টধর্মও গ্রহণ করলেন। এই ধর্মগ্রহণে তাঁর ধর্মবিশ্বাস অপেক্ষা সাহেব হওয়া এবং বিলেত

যাবার স্বপ্নই মুখ্য ছিল। তবে এও সত্য যে, তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ না করলে হয়ত আমরা নতুন যুগের নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত কবি মধুসূদনকে পেতাম না।

মধুসূদনের বিভিন্ন চিঠিপত্র এবং তাঁর জীবনী আলোচনা করে এটা আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি নিজের সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। এই অতিরিক্ত সচেতনতা হেতু মানুষের জীবনকাব্য রচনা করতে গিয়েও তিনি সম্পূর্ণ জীবনকে তুলে ধরতে পারেননি। নিজে হতে যাচ্ছেন সাহেব কবি। ইংরেজী ভাষায় সেই কল্পনাকে রূপ দেবার জন্য Captive Ladie, Visions of the Past প্রভৃতি রচনা শুরু করেন। তখন তিনি বুঝতে পারেননি যে, তার এই ইংরেজ হবার স্বপ্ন শুধু অলীক স্বপ্ন। রচনাগুলি মধুসূদনের রচনা বলে কেউ বিশ্বাস করতে চায়নি। অনেকে ইংরেজের রচনা বলে মনে করেছিলেন। মহাত্মা বেথুনের পরোক্ষ উপদেশে এবং বাঙ্‌লায় নাটকের অভাব দেখে তিনি বাঙ্‌লা সাহিত্য রচনা শুরু করেন।

মধুসূদন, অমিতাচারী, অমিতব্যয়ী, এবং কিছুটা উচ্ছৃঙ্খলও ছিলেন। মনে হয় এসব ত্রুটিও তাঁর স্বপ্নসাধনার ব্যর্থতাপ্রসূত। জীবনকে সার্থকভাবে গ'ড়ে তুলতে গিয়ে বহু চেষ্টা করেও তিনি সার্থক হতে পারেননি। তিনি যে যুগে আবির্ভূত হয়েছিলেন সে যুগও তাঁর জন্য প্রস্তুত ছিলনা। তাই তাঁর সাহিত্যরস শিক্ষিত সমাজেরই একমাত্র গ্রহণীয় ছিল। সবার জন্য তিনি সাহিত্য রচনাও করেননি। তিনি নিজেই বলেছেন, '...for that portion of people, my country man who think as I think, whose minds have been more or less imbued with western ideas and modes of thinking...' —তাদের জন্যই তিনি রচনা করেছেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে ধারণা তাঁর মনকে কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ করে রেখেছিল। মধুসূদন কাব্য, নাটক রচনা করলেন, সনেট রচনা করলেন, জীবনে তিনি যশ চেয়েছিলেন, এবং তা পেয়েওছিলেন। মধুসূদন তাঁর আবাল্যসুহৃদ রাজনারায়ণ বসুকে লিখছেন, 'You may take my word for it, Friend Raj, that I shall come out like a tremendous comet—and no mistake'.—তিনি সত্যিই রক্ষণশীল সমাজ, ব্রাহ্ম আন্দোলন এবং ইয়ং বেঙল আন্দোলনের মাঝে বিরাট ধূমকেতুর মতো

আবির্ভূত হয়েছিলেন। নতুন সাহিত্যাদর্শের আকস্মিক অবতারণায় সবাইকে বিস্মিত করে রেখেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে জাতির আরও অনেক পাবার ছিল। কিন্তু তখনকার সাম্রাজ্যলিপ্সু, স্বার্থোন্মত্ত ইংরেজ এবং 'nobodies of Chorebagan and Barabazar' সম্বন্ধে রাজনৈতিক সচেতনতাজনিত সক্রিয়তার অভাবে সে সম্ভাবনা আভাসেই রয়ে গেল। মধুসূদন ভেবেছিলেন শিক্ষিত ধনীরাই দেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ। নিজেও তাই হবার জন্য জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন কিন্তু সফল হ'তে পারেননি। জীবনের অভাব-বোধের নিরসনের জন্য যে চেতনাবোধের প্রয়োজন সে যুগে শুধু তিনি নন, কারও মধ্যে তা সুস্পষ্টভাবে দেখা দেয়নি।

মধুসূদনের মধ্যে ব্যক্তি-সচেতনতা সুস্পষ্ট, নিজের সম্পূর্ণ প্রকাশের পারিপার্শ্বিক বাধার জন্য একটা চাপা ক্রোধ ও বেদনা আছে তাঁর মধ্যে। সার্থক সুখ ও আনন্দের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে না পেরে নিজেকে যেন একেবারে ভেঙে ফেলতে চাইছেন। বিরাট বাঙ্‌লার সমাজক্ষেত্রে তিনি একা। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রাচীনপন্থী সংস্কৃতজ্ঞরা তাঁর কাছে 'barren rascals —nothing is poetry to them which is not an echo of sans-krit—they have no notion of originality'—অন্যদিকে অতিরিক্ত ইংরেজ ব'নে যাওয়ার দলও তাঁর কাছে 'the poor devils don't know Bengali enough to understand what they read'। দুই দলের কেউই তাঁর কাছে শ্রদ্ধা পায়নি। তিনি নিজে যে প্রচণ্ড উন্মাদনায় নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে পরে বুঝতে পেরেছিলেন আকস্মিক আত্মবিদ্রোহে কোনো স্থায়ী পরিবর্তন সাধিত হ'তে পারেনা। সে উন্মাদনা যাদের মধ্যে দেখেছেন—তাদের তিনি অশ্রদ্ধাই করেছেন। সেযুগের দ্বিধা সংশয়কে অতিক্রম করার প্রচণ্ড ইচ্ছা থাকলেও যুগধর্মের জন্যই সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি। বিশেষ ক'রে তাঁর চিন্তাধারার জন্য বাঙালী ততটা প্রস্তুত ছিলনা। অনেক সময় তাঁর সাহিত্য প্রচেষ্টা অনেকের বিদ্রূপের কারণও হয়েছিল। জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় মেঘনাদ বধ কাব্যের প্যারডি 'ছুছুন্দরী-বধ কাব্য' রচনা করেছিলেন।

মধুসূদন সাহিত্যের গতানুগতিক পথ ছেড়ে নতুন পথ বেয়ে নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যে কাব্য রচনা শুরু করেন। তাঁর কাব্যে আমরা মানুষের সংবাদ পাই। মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণ ও মেঘনাদের মধ্যে তিনি grand

ও fine মানুষকে খুঁজে পান। বিভীষণ তাঁর মতে scoundrel এবং রামায়ণের বানরের দল 'spoil the joke'। মেঘনাদ তাঁরই কল্পনার সার্থক ও বলিষ্ঠ পুরুষ। তিনি তাকে এতই ভালোবেসে ফেলেছিলেন যে মেঘনাদের বধের অংশ রচনার আগে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে লিখলেন, 'I am going to celebrate the death of my favourite Indrajit'. বানরের দল রাক্ষসদের যুদ্ধে পরাজিত করবে এ তিনি সইতে পারেননি। যদিও মাঝে মাঝে তিনি 'দৈব কে খণ্ডাতে পারে' বলে হতাশ হয়েছেন, তবুও দৈব-অনুকম্পাপ্রার্থী রামকেও তিনি সবার অনুকম্পার পাত্র ক'রে তুলেছেন। সাহিত্যের এই দৃষ্টিভঙ্গী পাশ্চাত্ত্যের humanismএর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলস্বরূপ। কবি-সমালোচক শশাঙ্কমোহনের মতে মধুসূদন 'বাঙালীকে অশ্রুত তরফের সঙ্গীত শুনাইয়াছেন। প্রচলিত আচার বিশ্বাস, ছন্দোবন্ধ ভাষা কিম্বা সংস্কৃত ব্যাকরণের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, এই কবি সম্পূর্ণ স্বাধীনতায় নিজের প্রাণাবেগ অবারিত করিয়াছিলেন'। মধুসূদন চেয়েছিলেন—পাশ্চাত্ত্য-সাহিত্যের উপকরণ দিয়ে বাঙ্‌লা সাহিত্যকে সাজাতে। তাঁর কল্পনা তাঁর চিন্তাশক্তিকে জড়তা ও সংস্কারের বন্ধন থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। মেঘনাদ বধ কাব্য প্রসঙ্গে কবি বলেছিলেন '......in the present poem, I mean to give free scope to my inventing powers (such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki......'। কবি প্রাচ্য শিক্ষা-দীক্ষাকে একেবারে মুছে ফেলতে পারেননি, পাশ্চাত্ত্য আদর্শও তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। এই দুইধারার শুভমিশ্রণ ফল মেঘনাদবধকাব্য, বীরাঙ্গনাকাব্য। 'মধুসূদনই নব বঙ্গের কাব্য সাহিত্যে প্রথম পুরুষ প্রাণের দৃষ্টান্ত। ......মধুসূদন প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য সভ্যতার সঙ্গমস্থলেই দণ্ডায়মান। একদিকে, আর্য-সাহিত্যের বাল্মীকি, কালিদাস, ভারবী এবং ভবভূতি, অন্যদিকে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের হোমর, ভার্জিল, ওভীদ্, দান্তে, টাসো, মিলটন, বায়রণ প্রভৃতি প্রাণ-পৌরুষশালী কবিগণের পদতলে বসিয়াই মধুসূদন কবিদীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহাদের আত্মাপ্রভাবেই মধু-হৃদয় সবলতা এবং ঘনতা, পূর্ণতা এবং প্রকাণ্ডতা লাভ করিয়াছিল।' (বঙ্গবাণী—শশাঙ্কমোহন সেন)

ইংরেজিতে গ্রন্থরচনার পর মধুসূদন 'তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য' (১৮৫৯)

রচনা করেন। এই কাব্যটিতে লিরিকভাব খুব স্পষ্ট। বাঙ্‌লা নাটকের দৈন্য ও প্রয়োজন অনুভব ক'রে এই সময়েই নাটক লিখ্‌তে শুরু করেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে 'শর্মিষ্ঠা' নাটক প্রকাশিত হয়। 'শর্মিষ্ঠা' নাটক রচনার কিছুদিন পর মধুসূদন 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নামে দুইখানি প্রহসন রচনা করেন। মদ খাওয়ার পরিণাম, তথাকথিত আধুনিকতার নামে সামাজিক বর্বরতা, নতুন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নোঙ্‌রামি, ধর্মের আবরণে রক্ষণশীল সমাজের ধিকৃত ও বিকৃত জীবনের স্বরূপ প্রভৃতি সবই এই প্রহসন দুটিতে আছে। সে যুগের সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে মধুসূদন যে সচেতন ছিলেন প্রহসন দুখানি তার সার্থক দৃষ্টান্ত।

'শর্মিষ্ঠা' নাটকে সংস্কৃত নাটক ও কাব্যের প্রভাব যথেষ্ট। আমরা পূর্বেই বলেছি বাঙ্‌লা নাট্য সাহিত্যের দৈন্য দেখে তিনি নাটক রচনা শুরু করেন। শর্মিষ্ঠা নাটকের প্রস্তাবনায় তিনি ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে যা বলেছিলেন তা একমাত্র মধুসূদনই বলতে পারেন। তিনি প্রস্তাবনায় বলছেন—

উঠ, ত্যজ, ঘুমঘোর হইল, হইল ভোর ;
দিনকর প্রাচীতে উদয় ॥
কোথায় বাল্মীকি, ব্যাস কোথা তব কালিদাস
কোথা ভবভূতি মহোদয়।
অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে, বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয় ॥
সুধারস অনাদরে, বিষবারি পান করে,
তাহে হয় তনু, মনঃ ক্ষয়।
মধু কহে, জাগো জাগো বিভুস্থানে এই মাগো,
স্বরসে প্রবৃত্ত হ'ক তব তনয় নিচয় ॥ ইত্যাদি।

শর্মিষ্ঠা নাটকের কাহিনী পুরানো, কিন্তু লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী আধুনিক। ভারতবর্ষের প্রাচীন আদর্শের প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা, কিন্তু যে চোখ দিয়ে তাকে দেখছেন সে একেবারে একালের। নাটকের শিল্পচাতুর্যের দিক থেকেও কিছু কিছু ত্রুটি রয়েছে। নাটকে প্রধান গুণ হ'ল ঘটনাপ্রবাহের গতিবেগ। এই নাটকে তার অভাব লক্ষিত হয়। তবে গঠনের যুগের নাটক হিসাবে শর্মিষ্ঠা নাটকের মূল্য অনেকখানি।

'পদ্মাবতী' নাটককে (১৮৬০) বলা যেতে পারে গ্রীক কাহিনী বস্তুর বাঙ্‌লা সংস্করণ। এই নাটকে হোমারের ইলিয়াডের ট্রোজানরাজ প্রায়ামের পুত্র প্যারিসের নারীর সৌন্দর্যবিচারের কাহিনীর স্পষ্ট ছায়া দেখতে পাই। নারীরাও সবাই দেবীস্থানীয়া। 'পদ্মাবতী' নাটকে কবি অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেছেন। অবশ্যি এর আগে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যেও কাঁচা হাতের অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনা দেখতে পেয়েছি।

'কৃষ্ণকুমারী' নাটক (প্রকাশ—১৮৬১) রাজপুত ইতিহাস অবলম্বনে রচিত। কিন্তু ইতিহাস এখানে যথাযথভাবে রক্ষিত হয়নি। তবে নাটক হিসাবে অন্যান্য নাটক অপেক্ষা কৃষ্ণকুমারী নাটক সার্থকতা লাভ করেছে। এই নাটকে গ্রীক প্রভাব যথেষ্ট। নাটকটির পরিণামে ট্রাজেডি। নাটকটিতে রচয়িতার দেশপ্রীতি, পরাধীনতার বেদনাবোধ সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। মধুসূদন কৃষ্ণকুমারী নাটক রচনায় দক্ষ নাট্যকারের পরিচয় দিয়েছেন। এই নাটকের গতিবেগ নাটকখানিকে অনেকটা স্বাভাবিক রূপ দান করেছে। এই নাটকে বিশুদ্ধ রোমান্টিক আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে humanismএর আভাসও পাওয়া যায়। কৃষ্ণকুমারী নাটককে বাঙ্‌লা নাট্যসাহিত্যের ট্রাজেডি পর্যায়ের প্রথম সার্থক নাটক বলা যেতে পারে। মধুসূদন এই নাটকে গান ছাড়া আর সব কিছুতেই গদ্য ব্যবহার করেছেন। তাঁর নাটকগুলি বিশেষ ভাবে অভিনয়ের উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছিল। তিনি মুসলমানদের কাহিনী নিয়েও নাটক রচনা করতে চেয়েছিলেন এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে কাটিয়ে উঠে তিনি বলেছিলেন—'The prejudice against Muslim names must be given up'। তাঁর শেষ নাটক 'মায়াকানন' তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। মধুসূদন একসঙ্গে অনেকগুলি রচনায় হাত দেন। একই সঙ্গে মেঘনাদ বধ কাব্য (১৮৬১), ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬১) রচনা করা সহজ-সাধ্য ব্যাপার নয়। ১৮৬২ সালে বীরাঙ্গনা কাব্য প্রকাশিত হয়। চার-পাঁচ বছরের মধ্যে তাঁর বেশীর ভাগ রচনা আত্মপ্রকাশ করে। এর অনেকদিন পরে প্রায় ১৮৬৫ সালে ফরাসীদেশের ভার্সাই নগরীতে বসে বাঙ্‌লা সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতাবলী রচনা করেন। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এই কবিতাবলী প্রকাশিত হয়। ১৮৭১ সালে হেক্‌টর বধ (গদ্য রচনা) এবং মায়াকানন নাটক রচিত হয়।

কবি মধুসূদন 'গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত' বলে মেঘনাদ বধ কাব্য রচনা শুরু করেও শেষ পর্যন্ত বীররসাশ্রিত আদর্শ মহাকাব্য ক'রে গড়ে তুলতে পারেননি। 'সমুদ্রতলে কপোতাক্ষের অন্তঃস্রোত তাঁহার কাব্যতরণীর গতি-নির্দেশ করিল, সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া আর হইল না। তরী যখন তীরে আসিয়া লাগিল, তখন দেখা গেল—'সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী'। (আধুনিক বাঙলা সাহিত্য—মোহিত লাল মজুমদার) শেষ পর্যন্ত দেখা গেল মহাকাব্য লিরিক কাব্যের রূপ পরিগ্রহ করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দী মহাকাব্যের যুগ নয়। মেঘনাদ বধ কাব্যের ষষ্ঠ সর্গ শেষ ক'রে বন্ধু রাজনারায়ণকে লিখেছিলেন, 'I never thought I was such a fellow for the Pathetic'. মেঘনাদের মৃত্যুবর্ণনাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন—'Do not be frightened, my dear fellow, I won't trouble my readers with Vira Ras. Let me write a few epiclings and thus acquire a pucca fist.' তাই কাব্যে বীররসের অবতারণা আর ঘটলনা। মাইকেল মধুসূদন একদিকে রামায়ণ, মহাভারত পড়েছেন, অপর দিকে গ্রীক, ইতালীয় প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যও তাঁর পড়া ছিল। প্রাচ্যের স্নিগ্ধ কাব্যমাধুর্য এবং পাশ্চাত্ত্যের বীরাদর্শ—এই উভয় শক্তির মিলনে তাঁর কাব্য এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। পাশ্চাত্ত্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ভাবাদর্শে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। মেঘনাদবধকাব্যে এই ভাব বিদ্যমান। মধুসূদনের সামনে যে সাহিত্য ছিল তা তাঁর রচনার প্রচুর উপকরণ জোগালেও নিজেকেই সাহিত্যের পথ রচনা করতে হয়েছিল। মুক্ত-ছন্দ কাব্য রচনার জন্য তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দ বেছে নেন। 'শব্দের বাহ্যিক মেল বন্ধন' থেকে ছন্দকে উদ্ধার করে, 'হৃদয় ভাবের প্রবাহে' তাকে মুক্তি দেওয়া, এবং ছন্দকে সম্পূর্ণ ভাবানুগ করে প্রবাহিত করা, এই রকম 'সুস্থির শক্তি-প্রচণ্ডতা', এরকম যোগ্যতা, আর কোনো বাঙালীতে আগে দেখা যায়নি। কবি-সমালোচক শশাঙ্কমোহনের মতে 'উহা পশ্চিমের অতলান্ত সমুদ্রেরই দীক্ষা! আধুনিক সাহিত্যের এই Titanic element, এই আবেগ উচ্ছ্বাস, এই পারুষ এবং পৌরুষ, এই হুঙ্কার এবং হাহাকার, ইহা নানাদিকে ভারতবর্ষের শৈলাকাশ দীক্ষিত এবং শান্ত নিষ্ঠ প্রাচীন সভ্যতার অজ্ঞাত।........বিদ্যাসুন্দর কিংবা চণ্ডীকাব্য হইতে মেঘনাদ বধের শিল্পআত্মা মূলেই বিভিন্ন। প্রথম দুইটি বীণা-নিঃসৃত কালোয়াতী সুর; মেঘনাদ অর্গানের সুর। প্যারাডাইস লস্টের ন্যায়

মহাসমুদ্রের ব্রহ্মতালের সহিত স্বতঃ সঙ্গত হইয়াই এই স্বর সমুত্থিত হইতেছে।' তাঁর কাব্যের গল্পটি দেশী কিন্তু রচনা আদর্শ ও চরিত্র চিত্রণে তিনি পাশ্চাত্ত্যের আদর্শই বেশী অনুসরণ করেছেন। বাল্মীকি, বেদব্যাস, কালিদাসের সঙ্গে হোমার, ভার্জিল, দান্তে, ট্যাসো, মিলটন প্রভৃতির প্রভাবও রয়েছে। মধুসূদন বলেছিলেন, 'It is my ambition to engraft the exquisite graces of the Greek mythology into our own'। মেঘনাদ বধ কাব্যের প্রকাশভঙ্গী অনেকটা গ্রীক মহাকাব্যের মতো। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের রোমান্টিসিজম ও হিউম্যানিজমের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে অভিজাত জীবনের যে দৃষ্টিভঙ্গী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যাদর্শ গড়ে তুলছিল মধুসূদনের কাব্যে তারও আভাস পাওয়া যায়। যারা দৈবের বিরুদ্ধে, অদৃষ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে এবং অনিবার্য পরিণাম যে মানুষ নিয়তির কাছে পরাজয় স্বীকার করছে সে মানুষের জন্য কবির অপরিসীম সহানুভূতি ছিল। মেঘনাদ বধ কাব্যের রাম একান্ত দৈবনির্ভরশীল হীনবীর্য অদৃষ্টবাদী মানুষ—অপরদিকে ব্যক্তিচেতনাবোধের প্রতিনিধি হচ্ছেন রাবণ ও মেঘনাদ। মধুসূদনের রাবণ মিলটনের Satan-এর সমগোত্রীয়, এবং হোমারের হেক্টর ও মেঘনাদের মধ্যে আমরা একটি সাদৃশ্য লক্ষ্য করি।

কবির প্রমীলা চরিত্রটি বিদেশী ভাবাদর্শে গঠিত। 'বড়বার পিঠে' এই বীর্যবতী সতী রামকেও ভীতশঙ্কিত করে তুলেছেন। একদিকে তিনি মেঘনাদ-প্রিয়া নারী প্রমীলা, অপরদিকে তিনি প্রচণ্ডতেজা নারী—যিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'আমি কি ডরাই সখি, ভিখারী রাঘবে!' তার সাহস ও বিক্রম বিদেশী আদর্শে গড়া। ট্যাসোর কাব্যের ক্লোরিন্দা চরিত্রের অনেকখানি ছাপ প্রমীলা চরিত্রে লক্ষিত হয়। সীতা চরিত্রে আমরা ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ লক্ষ্য করি। 'Poor Sita' মধুসূদনের কবি কল্পনাকে বড়ই অভিভূত করেছিল। বিভীষণ-পত্নী সরমার মধ্যে কিছুটা হেক্টর-পত্নী আণ্ড্রোমাকির ছায়াপাত ঘটেছে। লক্ষ্মণ চরিত্র সম্বন্ধেও তিনি সচেতন ছিলেন। লক্ষ্মণ-পত্নী উর্মিলা ও মাতা সুমিত্রার প্রতি বাল্মীকি ততটা সহানুভূতি দেখান নি। মধুসূদন যখনই লক্ষ্মণের কথা বলতে গেছেন তখনই হয় 'উর্মিলা বিলাসী' নয়ত 'সৌমিত্রি-কেশরী' বিশেষণে অভিহিত করেছেন। মেঘনাদ হত্যার অংশ ছাড়া লক্ষ্মণ চরিত্র যথাসম্ভব উন্নত আদর্শে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন। মধুসূদন grand

mythology of our ancestors'কে 'full of Poetry' বলেই জানতেন। তারই ওপর তিনি পাশ্চাত্য আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি বন্ধু রাজনারায়ণকে একপত্রে লিখেছিলেন, 'I shall not borrow Greek stories but write, rather, try to write, as a Greek would have done'। মেঘনাদবধ কাব্যের আরম্ভ শোকাকুল রাবণকে দিয়ে আর শেষ মেঘনাদের মৃত্যুতে। আরম্ভেও করুণরসের অবতারণা, শেষেও 'সপ্তদিবানিশি কাঁদিলা বিষাদে'।

'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' রাধাবিরহ বিষয়ক কাব্য। এখানে প্রাচীন বৈষ্ণবরীতিতে কাব্য রচনার প্রভাব রয়েছে। অথচ ভাবপ্রয়োগে তিনি আধুনিক হয়ে উঠেছেন। 'রাধা' চরিত্র তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। তার একটি কারণ এই, নারী চরিত্র অঙ্কনে মধুসূদনের গভীর সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা ছিল। সীতাচরিত্র তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ব্রজাঙ্গনা কাব্যের কবিতাগুলিতে বৈষ্ণব lyricism অপেক্ষা আধুনিক lyricismএর অভিব্যক্তিই বেশী। বৈষ্ণব কবিতার বিরহিণী রাধা ব্রজাঙ্গনা কাব্যের নায়িকা। এই কাব্যের কবিতাগুলি 'about poor old Radha and her বিরহ'। ব্রজাঙ্গনা কাব্যকে রাজনারায়ণ বসুর কাছে লেখা একটি পত্রে মধুসূদন 'রাধার বিরহ' নামেও অভিহিত করেছেন। এই পত্রে তিনি বলেছেন 'রাধার বিরহ' is in the press I feel backward to publish it. কাব্যটি প্রকাশ করার অনিচ্ছা থেকে মনে হয়, নতুন দিনের কবি আর পুরানো দিনে ফিরে যেতে চান না।

'বীরাঙ্গনা কাব্যের' বিষয়বস্তুও প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য থেকে নেওয়া হয়েছে। তবে তার গঠন ও প্রকাশভঙ্গী বিদেশী। 'বীরাঙ্গনার অতি ঔদ্ধত্যযুক্ত নামটাও স্বয়ং ওভীদের (Ovid) Heroic Epistlesএর স্মরণপথেই উপস্থিত।' (বঙ্গবাণী—শশাঙ্কমোহন সেন) বীরাঙ্গনা কাব্যে পাতিত্যের প্রতি সহানুভূতি, সহমর্মিতা, মানবতার আদর্শ প্রভৃতি স্বার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। মানুষের জীবনের দুঃখবেদনা, রোমান্টিক্ কল্পনার সার্থকপ্রকাশ এই বীরাঙ্গনা কাব্যে। মাটির পৃথিবী এবং তার মৃন্ময় সন্তানের করুণ ও অসম্পূর্ণ জীবনালেখ্য এই কাব্যে সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। বীরাঙ্গনা কাব্যের পত্রাবলী অনেকটা dramatic monologueএর ছাঁচে রচিত।

মধুসূদনের সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতাবলী উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা কাব্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ বলা যেতে পারে। তিনি বেশীর ভাগ সনেটই ফরাসী দেশের ভার্সাই নগরীতে বসে রচনা করেন। তাঁর 'সনেটের ঘন-পিনদ্ধ কায়া' মাঝে মাঝে শ্লথবদ্ধ হলেও মধুসূদনের মনের সূক্ষ্মতম ভাবের পরিচয় তার মধ্যে পাওয়া গেছে। এই সনেটের মধ্যে তাঁর দেশাত্মবোধেরও আভাস পাওয়া যায়। বাঙলায়ও যে উৎকৃষ্ট সনেট রচিত হতে পারে, এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। তিনি রাজনারায়ণ বসুকে একপত্রে লিখেছিলেন, 'In my humble opinion, if cultivated by men of genius, our Sonnet in time would rival the Italian. তাঁর পরে রবীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্র নাথ সেন, প্রমথ চৌধুরী, মোহিতলাল মজুমদার প্রভৃতি অনেকেই উৎকৃষ্ট সনেট রচনা করেছেন, কিন্তু বাঙলা সাহিত্যে সার্থক সনেট রচনার দৃষ্টান্ত খুব বেশী নেই। 'আত্মবিলাপ' 'বঙ্গভূমির প্রতি' খণ্ড কবিতা যুগপৎ তাঁর দেশপ্রেম ও আত্মসমালোচনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করে।

মধুসূদনের আবির্ভাব ঘটেছিল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের শোষণ-শাসনের মাঝে। তার মাঝে পড়ে তিনি নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য, সমাজ ও জীবনাদর্শকে তিনি ছোট করতে চান নি, নিজেকেও ছোট করতে চাননি। অথচ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিকে, বিজিত জাতির সমাজ জীবনের ব্যর্থতাকে তিনি রিক্থ হিসাবে পেয়েছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ছিল তাঁর শান্তির কামনা, অথচ সে শান্তি না পাওয়ার দুঃখ নিয়ে একটি বিরাট ব্যক্তিপ্রতিভার তিরোভাব ঘটল। তাঁর কালের বিশেষ কোনো সমর্থন তিনি পাননি। পশ্চিমের দিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ, প্রাচ্যের ভূমিখণ্ডে তিনি দণ্ডায়মান। বিরাট পৃথিবীর উপর থেকেও তিনি নির্বাসিত। বাঙালীর মনোভূমি মধুসূদনকে ধারণ করার পক্ষে নিতান্তই সংকীর্ণ ছিল। কবি চেয়েছিলেন 'Immortal' হতে। তিনি পুরো-দস্তুর সাহেব হতে পারেন নি বটে, কিন্তু Immortal কবি হয়েছিলেন। আগামীদিনের মানুষের জন্য অমর কাব্য রচনা করার অদম্য বাসনা ছিল। 'গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি' এমন কাব্য তিনি রচনা করবেন এই তাঁর মনে সাধ ছিল। তাই তিনি রচনাও করেছেন। বাঙলা-সাহিত্য যতদিন বেঁচে থাকবে, যতদিন বাঙলা সাহিত্যের প্রগতির পথ নিরুদ্ধ

হবেনা ততদিন মধুসূদনের বিরাট ব্যক্তিপ্রতিভার অম্লান দীপশিখা কাব্যরসিক বাঙালীর যাত্রাপথের অন্ধকার দেবে ঘুচিয়ে।

মধুসূদনের সমসাময়িক কালে এবং তার পরেও অনেক কবির আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁদের মধ্যে দুচারজন ব্যতীত অন্যদের রচনার তেমন কিছু সাহিত্য-মূল্য নির্ধারণ করা যায় না। অনেকে মধুসূদনের ব্যর্থ অনুকরণ করেছেন। মেঘনাদ বধ ও বীরাঙ্গনা কাব্য কিছুদিনের জন্য কবিদের অনুকরণের বস্তু হয়ে ওঠে। কিন্তু এসব কবিদের কেউই মধুসূদনের কাব্য-রসের মূল উৎস খুঁজে পাননি। ১৮৬১ সালে দীননাথ ধর 'কংশবিনাশ কাব্য' রচনা করেন। এই কাব্যটি মধুসূদনের ব্যর্থ অনুকরণের নিদর্শন। মধুসূদন বাঙ্‌লাদেশে একবারই আভির্ভূত হয়েছিলেন। যে বিরাট সম্ভাবনা তাঁর মধ্যে ছিল, তাঁর যুগ সে সম্ভাবনার জন্য ততখানি প্রস্তুত ছিলনা। আজ আমরা বুঝতে পারি যে, মধুসূদনের কাব্যের যেমন গতিবেগ অনিরুদ্ধ—মধুসূদনের জীবন-কাব্যও তেমনই যুগে যুগে বাঙালীর হৃদয়ে নতুন রস ও উদ্দীপনার সঞ্চার করবে।

অন্যান্য কবিগণ

মধুসূদনের সমসাময়িক কয়েকজন কবির কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এসব কবিদের মধ্যে 'সুলভ পত্রিকা' সম্পাদক দ্বারকানাথ রায়, রসিক রায়, কাঙাল হরিনাথ, সদ্ভাব শতক রচয়িতা কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, হরিশচন্দ্র মিত্র, রাধামাধব মিত্র, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতা রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়, বনোয়ারীলাল রায়, 'ছন্দঃ কুসুম' কাব্য রচয়িতা ভুবনমোহন রায় চৌধুরী, 'ভারত-ভ্রমণ কাব্য' রচয়িতা চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ভর্তৃহরি কাব্য' রচয়িতা বলদেব পালিত, 'বীরাঙ্গনা পত্রোত্তর কাব্য' রচয়িতা রাজকুমার নন্দী, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চতুর্দশপদী কবিতামালা রচয়িতা রামদাস সেন, রাজকৃষ্ণ রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের প্রায় সবাই হয় মধুসূদন নয়ত রঙ্গলালের পথ ধরে চলেছেন। 'কাঙাল' হরিনাথ (ফিকিরচাঁদ) এবং কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের রচনায় কিছুটা বৈশিষ্ট্য আছে। হরিনাথ অনেক বাউল গান রচনা করেছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার কবিতায় ভারতীয় হিন্দু আদর্শের পাশাপাশি সুফি সাধকদের ভাবাদর্শও প্রকাশ পেয়েছে।

যাঁরা মধুস্থদনের অনুকরণ করছিলেন তাঁদের কাব্যে তাঁর শুধু অক্ষম অনুকরণটাই প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষ করে ছন্দোমুক্তি, ভাবগতিকছন্দের প্রয়োগ, নামধাতুর প্রয়োগ প্রভৃতি ব্যাপারে মধুস্থদনের সমসাময়িক কবিরা মাঝে মাঝে কাব্যে হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি করেছেন। তবে সনেট রচনায় রামদাস সেন ও রাজকৃষ্ণ রায় কিছুটা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। ভুবনমোহন রায় চৌধুরীর 'ছন্দঃ কুসুম' কাব্যে বিভিন্ন ছন্দের আকৃতি ও প্রকৃতির সুন্দর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় গদ্য রচনার জন্যই স্মরণীয়, তবে তিনিও 'যৌবনোদ্যান' প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন।

এসময়ে কয়েকজন মহিলা কবিও বাঙ্‌লা সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বেশীর ভাগ মহিলা কবিরা নিজেদের নাম দিতেন না। তবে চিত্ত বিলাসিনী (১৮৫৬) রচয়িতা কৃষ্ণকামিনী দাসী, অন্নদাসুন্দরী দেবী (অবলা বিলাপ—১৮৭২), ভুবনমোহিনী দেবী (স্বপ্নদর্শনে অভিজ্ঞান—১৮৭৮) নবীনকালী দেবী (শ্মশান ভ্রমণ—১৮৭৯) প্রভৃতি মহিলা কবিরা স্ব-নামে কাব্য রচনা করেছিলেন।

মধুস্থদন বাঙ্‌লা সাহিত্যে যে নতুন প্রেরণার সঞ্চার করেন তার প্রতিক্রিয়া অন্যান্য লেখকদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল। মধুস্থদনের পর থেকে বহু কবির রচনায় কাব্যধারার ক্রমোৎকর্ষ ঘটতে থাকে। অনেক ইংরাজি কাব্যের অনুবাদও হতে থাকে। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের মতো ক্ষমতাশালী লেখকরাও মধুস্থদনের প্রভাবকে অস্বীকার করেননি।

৪

বাঙ্‌লা নাটকের প্রথম যুগ

বাঙ্‌লা নাটকের যে দুর্বলতা দেখে কবি মধুস্থদন নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হন তার কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। নাটক আগেও কিছু রচিত হয়েছিল কিন্তু রঙ্গমঞ্চের অভাবে তার যথার্থ প্রকাশের সুযোগ ঘটেনি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে হেরাসিম লেবেডফ নামে একজন রুশদেশবাসী

এদেশে প্রথম নাটক-অভিনয়ের সূত্রপাত করেন। ইনি ১৭৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দের দিকে Disguise এবং Love is the best Doctor নামে দুইখানি ইংরেজি হাস্যরসের নাটকের বাঙ্‌লা অনুবাদ করিয়ে অভিনয় করান। হেরাসিম লেবেডফ নাটকের জন্য ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর থেকে গানও নিয়েছিলেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্‌লাদেশে নাট্যশালা প্রথম স্থাপন করেন প্রসন্নকুমার ঠাকুর। এই নাট্যশালায় ইংরেজি নাটকই অভিনীত হয়। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসু নিজের বাড়ীতে রঙ্গমঞ্চ তৈয়েরী করে বিদ্যাসুন্দর কাব্যকে নাট্যরূপ দান করে অভিনয় করান। আশুতোষ দেবের বাড়ীতে নন্দকুমার রায়ের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকের' (১২৬২) অভিনয় হয়। রঙ্গমঞ্চ ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকলেও সার্থক নাটকের অভাবে তার অবস্থা খুব শোচনীয় ছিল। প্রথম দিকে বড়োলোকের বাড়ীতে নাটকের অভিনয় হ'ত। সেখানে ভদ্র ও ধনী ব্যক্তিরাই নাটকের অভিনয় দেখার সুযোগ পেতেন। যাত্রা, কবিগান, খেউড় অথবা পাঁচালী গানই তখন সাধারণ বাঙালীর একমাত্র রস আস্বাদনের অবলম্বন ছিল। ইংরেজরা এদেশে পাকাপোক্ত হয়ে বসার পর থেকেই রঙ্গমঞ্চ ও নাটকের প্রসার ঘটে। সামাজিক জীবনের সমস্যাগুলি ধীরে ধীরে নাটকের মধ্যে প্রকাশ পেতে থাকে। ব্রাহ্ম আন্দোলন, 'ইয়ং বেঙল' আন্দোলন, বিধবা-বিবাহ, বাল্য-বিবাহ, বহু-বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক সমস্যা এবং রক্ষণশীল সমাজের গোঁড়া হিন্দুদের নানারকম দলাদলি প্রভৃতির বিষময় পরিণাম প্রভৃতিও বাঙলা নাটকের বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। এ ছাড়া পৌরাণিক, ভক্তিমূলক, ইতিহাসাশ্রিত সামাজিক প্রভৃতি বিষয় অবলম্বন করেও নাটক রচনা শুরু হয়। তবে প্রথমদিকের নাটকের মধ্যে অনুবাদের সংখ্যাই বেশী। তাও বেশীর ভাগ সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ। অবশ্যি ইংরেজী নাটকও কিছু কিছু আছে। সমসাময়িক সমস্যাগুলি নিয়ে দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি নাটক রচনা শুরু করেন। সেযুগের নীলকরদের অত্যাচার, নীল বিদ্রোহ প্রভৃতির পটভূমিকায় দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' রচনা করেন। কি করে রায়ত প্রজাদের মধ্যে বিদ্রোহ-প্রবণতা দেখা দিল তার আভাসও তাঁর নাটকে রয়েছে। প্রথম যুগের নাটকের সাহিত্যিক মূল্য কম থাকলেও নাটকের গঠনের যুগে এদের শ্রেষ্ঠত্ব সংশয়াতীত।

প্রথমযুগের নাটকের প্রাচীনত্বের বিশেষত্ব ছাড়া আর বিশেষ কিছু নেই।

বিশেষ করে তখন বাঙ্‌লা রঙ্গমঞ্চ গ'ড়ে ওঠেনি। তাই নাটকের ভিতর দিয়ে জনসাধারণের কাছে জীবনের বিভিন্ন মহলের পরিচয় জ্ঞাপনের ততখানি সুযোগ ঘটেনি। রঙ্গমঞ্চ মানুষের কাছে প্রত্যক্ষভাবে জীবন ও সমাজকে তুলে ধরে। নাটক অভিনয়-সাপেক্ষ—তার পূর্ণ পরিণতি অভিনেতা, রঙ্গমঞ্চ ও দর্শকের মহাসংযোগে। এই রঙ্গমঞ্চ গ'ড়ে উঠতে এবং নাট্য সাহিত্য বাঙালী জাতির একটা বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক হতে বেশ কিছুটা সময় লেগেছিল।

তবুও রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির সামাজিক আন্দোলন সমাজে যে প্রশ্ন জাগিয়ে তুলেছিল তা নিয়েও অনেকে নাটক রচনা করেন। এছাড়া জাতীয় জীবনে সংবাদপত্র, সাহিত্যে আধুনিকতা, দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতা, বিভিন্ন মতবাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ জীবন-আলেখ্য দেখার আকাঙ্ক্ষায় নাটকের প্রয়োজন অনুভূত হয়।

ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় তাঁর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বহু নাটকের উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে প্রাচীনতম নাটক হচ্ছে প্রবোধচন্দ্রোদয়ের অনুবাদ। এর অনুবাদক হচ্ছেন বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন (অনুবাদ—১৮৩৯-৪০ ; প্রকাশ—১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ)। এই নাটকে গদ্য ও পদ্য দু'য়েরই ব্যবহার আছে। এরপর যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' (১২৫৮ সাল) নাটক। এই নাটক সেক্‌স্‌পীয়রের হেমলেটের অনুসরণে লিখিত। নাটকটিও ট্র্যাজেডি। ভারতীয় নাটক সাধারণত ট্র্যাজেডিতে পরিণতি লাভ করত না। শেষ অবধি তাকে মিলনান্তক, শুভ পরিণামান্তক ক'রে দেখানোর রীতিই ছিল। সাহিত্যে ট্র্যাজেডির আভাস অনেক পর থেকে পাচ্ছি। জীবনের ফল ইচ্ছা আনন্দদায়ক বটে, কিন্তু তার ধারাবাহিকতায় যে দুঃখ, বেদনা, ব্যর্থতা, ভ্রান্তি, দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম প্রভৃতি রয়েছে তাকে সবার সামনে তুলে ধরা নাটকের প্রধান কর্তব্য। যাহোক যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' থেকে দেখছি বিষাদান্ত নাটকের শুরু হচ্ছে। অবশ্য এ বিষাদান্ত নাটকের সার্থক রূপ দেখতে পেয়েছি মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে। এরপর তারাচরণ শীকদার 'ভদ্রার্জুন নাটক' (১৮৫২) রচনা করেন। কাহিনী অংশ মহাভারত থেকে নেওয়া। কাঠামোর দিক থেকে লেখক যথাসাধ্য ইংরেজি নাটকের আদর্শ অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছেন।

একটা লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই সময়ে সেক্‌স্‌পীয়রের সমাদর

বাঙ্‌লার শিক্ষিত সমাজে বেড়েছিল। তখন সেক্‌স্‌পীয়রের নাটক অবলম্বনে বা তার অনুবাদ ক'রে বহু নাটক রচনার প্রচেষ্টাও দেখতে পাই। কয়েকজন লেখক অনুবাদ ও অনুকরণের ব্যর্থ ও সার্থক চেষ্টা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন হরচন্দ্র ঘোষ (১৮১৭-৮৪)। ইনি 'ভানুমতি চিত্তবিলাস' নামে একখানা নাটক রচনা করেন। এতে সেক্‌স্‌পীয়রের 'মারচেণ্ট্‌ অফ্‌ ভেনিসে'র প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে। এই নাটকখানি তখন খুব আদৃত না হওয়াতে তিনি প্রাচীন ভারতীয় কাহিনী নিয়ে 'কৌরব বিয়োগ' নাটক (১৮৫৮) লেখেন। কিন্তু নাটক হিসাবে এ নাটকও সার্থক হয়নি। তখনকার পাঠক সমাজ তাকে গ্রহণ করে নি। ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের মতে 'উৎকট রচনা-রীতির জন্যই জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে নি। নাটকের অভিনয়ের উপরই ভালোমন্দ ভালোভাবে বিচার করা যায়। তখন নাটকের পঠন-পাঠনই বেশী হ'ত, অথবা কোনো বড়োলোকের প্রাঙ্গনে সামান্য কয়েক-জন ভদ্রলোককে নাটকের অভিনয় দেখানো হ'ত। হরচন্দ্র ঘোষ 'চারু-মুখচিত্তহরা নাটক' (১৮৬৪) নামে একখানি নাটক রচনা করেন। এটি সেক্‌স্‌পীয়রের 'রোমিও জুলিয়েটের' অনুবাদ। পরে তিনি 'রজতগিরিনন্দিনী' নাটক (১৮৭৪) রচনা করেন। ইংরেজির অনুবাদ হিসাবে এর পর শ্যাম্যাচরণ দাস দত্তের 'অনুতাপিনী নব-কামিনী নাটক' (১২৬৩ সন), সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সুশীলা-বীরসিংহ' নাটক ও চন্দ্রকালী ঘোষের 'কুসুমকুমারী নাটক' উল্লেখযোগ্য। প্রথমটি Rowe-র The Fair Penitent ও বাকীগুলি সেক্‌স্‌পীয়রের Cymbeline নাটকের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ অনুবাদ।

কিন্তু এই যুগের নাট্যকারদের মধ্যে রামনারায়ণ তর্করত্নের ([illegible]-৮৬) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি 'নাটুকে রামনারায়ণ' নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। তখনকার যুগের যে সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল রামনারায়ণের অনেক নাটকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'কুলীন কুলসর্বস্ব নাটকে' কৌলীন্যপ্রথায় দেশের যে দুর্দশা দেখা দিয়েছিল তার বর্ণনা রয়েছে। নাটকের গাঁথুনি দৃঢ় না হলেও তাতে সে যুগের সামাজিক কুপ্রথা বর্ণনার আন্তরিক প্রয়াস দেখতে পাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ও তার দ্বারা প্রভাবিত

বাঙালীর মনে সমাজের অহিতকর প্রথার বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, রামনারায়ণের কোনো কোনো নাটকে তার প্রকাশও দেখতে পাই। তাঁর 'বহু-বিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নব নাটকও' (১৮৬৬) বিদ্যাসাগর প্রভৃতি সমাজসেবীদের তীব্র আন্দোলনের ফল। রামনারায়ণ সেই যুগের সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। তাঁর লেখা প্রহসনের মধ্যেও কিছু কিছু সমসাময়িক সমাজের দোষত্রুটির বর্ণনা আছে। 'উভয় সংকট' প্রহসনে (১৮৬৯) বহুবিবাহের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। তখনকার যুগের শিক্ষিত ব্যক্তিদের কুরুচিপূর্ণ মনোভাবের পরিচয় পাই 'চক্ষুদান' (১২৭৬) নাটকে। এছাড়া 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' ও 'বেণী সংহার নাটক' (১৮৫৬), 'রত্নাবলী নাটক' (১৮৫৮), 'অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক', (১৮৬০) 'মালতীমাধব নাটক' (১৮৬৭), 'কংস বধ' (১৮৭৫) রোমান্টিক্ কাহিনী অবলম্বনে রচিত 'স্বপ্নধন' (১৮৭৩), প্রভৃতি নাটকও তিনি রচনা করেন। নাট্যকার হিসাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রামনারায়ণের বেশ জনপ্রিয়তা ছিল। অবশ্যি বেলগাছিয়া নাট্যশালায় এঁর রত্নাবলী নাটকের অভিনয়-সাফল্য এবং বাঙ্‌লা নাটকের দুর্বলতায় সন্তুষ্ট না হয়ে মধুসূদন নাটক লিখতে শুরু করেন। মধুসূদনের নাটক সম্বন্ধে পূর্বে আলোচনা করেছি।

এরপর আরও কয়েকটি নাটকের উল্লেখ পাই। 'সম্বন্ধ সমাধি নাটক' (১৮৬৭) নামে এক অজ্ঞাতনামা লেখকের নাটকে বাল্য-বিবাহের দোষত্রুটি বর্ণিত হয়েছে। রামনারায়ণের নাটক রচনার আদর্শ তার পরের কোনো কোনো নাট্যকার গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়ের 'বাল্যবিবাহ নাটক', শ্যামাচরণ শ্রীমানীর 'বাল্যোদ্বাহ নাটক', অম্বিকাচরণ বসুর 'কুলীন কায়স্থ নাটক', তারকচন্দ্র চূড়ামণির 'সপত্নী নাটক' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এসব নাটকে গোঁড়া হিন্দুসমাজের নানারকম অন্যায় অত্যাচার, তার নানা প্রথার কুফল প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের পর যখন বাঙ্‌লা দেশে বিধবা-বিবাহ আইন প্রবর্তিত হ'ল তখন তা নিয়েও বহু নাটক রচিত হয়। নাটকগুলি তখনকার বাঙ্‌লা সমাজের সংস্কার সাধনে কিছুটা যে উপকার করেছিল তা স্বীকার করতে হ'বে। এসব নাটকের মধ্যে উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ নাটক' (১৮৫৬), শ্রীশিমুয়েল পীর বক্সএর 'বিধবা বিরহ নাটক' (১৮৫৯), বিহারীলাল নন্দীর 'বিধবা পরিণয়োৎসব'

[illegible] "......his object chiefly was to make an impression, he decided on sacrificing dramatic purity to what he conceived would produce effect" [illegible]

[illegible] "The least lamentable of the effects of the rebellion now raging in Upper India is the check it has given to social improvement." [illegible]

সাধারণ শ্রেণীর সুখদুঃখের প্রকাশ দেখতে পাই। সমাজের যারা অবহেলিত, ঘৃণ্য তাঁদের নিয়ে তিনি নাটকের কাহিনী গ'ড়ে তুলেছেন। তবে এও ঠিক যে, ভালোমানুষ 'বড়োলোক'দের সম্বন্ধে তাঁর একটা সহানুভূতি ছিল। তবুও তাঁর নাটকের নবীনমাধবরা নিজেদের ততটা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি যতটা পেরেছে তোরাপের দল।

সেই যুগের নবাদর্শে ভেসে-যাওয়া জীবনের দিক, শিক্ষিত জীবনে অজীর্ণ শিক্ষার বিষময় পরিণামের দিক তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন তাঁর নাটকে। দীনবন্ধু সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি থেকে আমরা জানতে পাই যে, দীনবন্ধু শুধু মানুষকে দূর থেকে দেখেননি, শুধু মানুষ সম্বন্ধে পরোক্ষ অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় করেননি, তিনি অকুণ্ঠিতচিত্তে এবং ঔৎসুক্য সহকারে মানুষের সঙ্গে মিশেছেন, মানব চরিত্র ও মানবসমাজ সম্বন্ধে তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আহরণ করে তবে নাটক লিখতে বসেছেন। গরীব দুঃখীর দুঃখ-দারিদ্র্য তিনি অনুভব করেছিলেন। বাস্তব-সত্যকে যথাসম্ভব নাটকের ভিতর দিয়ে প্রচার করতে চেয়েছিলেন। উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে নাটককে সম্পূর্ণ সার্থক ক'রে তুলতে পারেন নি। দীনবন্ধু তাঁর নাটকে সমসাময়িক কালের সামাজিক অব্যবস্থা, ঔপনিবেশিক স্বার্থ প্রতিষ্ঠায় জাতীয় জীবনে যে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তার যথাযথ বর্ণনা দিতে চেষ্টা করেছেন। সে যুগের ঘটনাবস্তুকে নাট্য রূপ দানে তাঁর কৃতিত্ব অনেকখানি। দীনবন্ধু সরকারী চাকুরে ছিলেন। পোস্ট্যাল সুপারিনটেন্‌ডেণ্টের কাজ করতে গিয়ে তাঁকে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হ'ত। এবং সেই সুযোগে তিনি নানা মানুষেরও সংস্পর্শে এসেছেন। 'শহুরে' অভিজাতশ্রেণী, প্রাচীন ও নবীন দল, গ্রাম্য চাষা, বর্গাদার, জোতদার, স্বচ্ছল মধ্যবিত্ত প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁর নাটক রচনায় কাজে লেগেছিল। তাঁর 'সধবার একাদশী', 'নীলদর্পণ' নাটকে এই অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। দীনবন্ধু যে সমাজে বাস করতেন সে সমাজে তাঁর সময় বিভিন্ন ভাবাদর্শের হাওয়া বইছিল। কিন্তু রাষ্ট্র-কাঠামো ঔপনিবেশিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তখনকার যুগচেতনার মুখ্য ধারা একটা ঐক্যের দিকে এগিয়ে চলেছিল। ক্রমাগত লাঞ্ছনা পীড়নের ভিতর দিয়ে নিত্য দুর্দশাগ্রস্ত দরিদ্র জীবনের কাছে ঔপনিবেশিক চক্রান্তের কপটতার মুখোস খুলে গেল।

দরিদ্র এবং মধ্যবিত্ত জীবনে শাসন, শোষণ, পরাধীনতার বেদনা ক্রমশ স্পষ্ট হ'য়ে উঠল। ইংরেজি শিক্ষিত সমাজের স্বদেশপ্রীতি, নিজের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেল।

দীনবন্ধুর নাটকে নাট্যকারের সহানুভূতি যেমন দরিদ্র সাধারণের জন্যও ফুটে উঠেছে তেমনি বর্ধিষ্ণু পরিবারের জন্যও দেখা দিয়েছে। ছোটো বড়ো অনেকের মধ্যে তখন বিদেশী শাসক সম্বন্ধে একটা বিরুদ্ধ মনোভাব দেখা দিয়েছে। অথচ ঔপনিবেশিক সমাজের গতানুগতিক বিধান অনুসারে তা যথাযথ রূপ লাভ করতে পারছে না। দ্বিতীয়ত, সমাজে তখন চাকরি করার প্রবল ইচ্ছা জাতীয় আন্দোলনের একটা বাধাস্বরূপ ছিল। আবার অনেকে তখন ইংরেজের গুণগানে মুখর ছিলেন। ধনীদের একটি দলও এই আন্দোলনের প্রতিকূল মনোভাব পোষণ করতেন। একদিকে ঔপনিবেশিক শাসনের অন্যায়কে তাঁরা বুঝতে পারছেন, দেশকে যে এই সম্বন্ধে সচেতন হ'তে হবে এসম্বন্ধেও তাঁরা সচেতন। অপরদিকে রাজশক্তি যে বিভেদনীতির ভিত্তিতে আপন দানব শক্তিকে প্রতিষ্ঠা করছে তার শক্তির নিষ্ঠুরতা সম্বন্ধেও সচেতন। আবার এই শক্তির মাঝে যে অপেক্ষাকৃত বলশালিতা রয়েছে তাকে তাঁরা অন্তরের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও স্বীকার করে নিচ্ছেন। অধিকাংশই জীবিকার জন্য ইংরেজ সরকারের অনুগ্রহপ্রার্থী।

দীনবন্ধু একদিকে প্রজাদের দুঃখও বোঝেন এবং সেই দুঃখের স্পষ্ট প্রকাশ তাঁর নাটকে দেখতে পাই। আবার দেখি তখনকার সমাজের ধনী ব্যক্তি-দের জন্যও তাঁর সহানুভূতি রয়েছে। সমাজের বড়োলোকরাও যে ভালো-মানুষ হতে পারেন তাও তিনি দেখাতে চেয়েছেন। তাঁর 'নীলদর্পণে' নবীন-মাধব প্রভৃতি খুবই অমায়িক ও ভালোমানুষ। তোরাপ প্রভৃতির মুখেও এদের চরিত্রের উন্নততর দিকের প্রতি শ্রদ্ধার স্বীকৃতির দ্বারা বুঝতে পারি যে দীনবন্ধু সচেতনভাবে এদেরই বড়ো করে দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যা সহজ সত্য তাই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর রচনায়। মনে তাঁর যে ইচ্ছা ছিল বাইরে তার প্রকাশ ভিন্ন রূপ অবলম্বন করেছে। নীলকরদের অত্যাচার ও প্রজাদের বিক্ষোভের পটভূমিকায় নাটকখানি রচিত। প্রজা-বিক্ষোভের স্পষ্ট প্রকাশও যেমন দেখতে পাই, তেমনই 'ভালোমানুষ' বড়োলোকদের কথাও নাট্যকার তাঁর নাটকে স্পষ্টভাবে বলেছেন। নানা ঘাত-প্রতিঘাতের

ভেতর দিয়ে ঔপনিবেশিক সমাজে যে গতিশীলতা দেখা দেয় সেযুগে সেই ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতরেই 'এগিয়ে যাওয়া' মনের যতখানি পরিচিতি দেওয়া সম্ভব ততখানি তিনি দিয়েছেন। হয়ত কখনও কখনও তার বেশী পরিচয়ও পাওয়া গেছে, কিন্তু রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব তার সার্থক ক্রম-পরিণতির দিকে যথাযথভাবে যেন এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছিল না।

তবুও একথা সত্য যে, সে যুগের সমাজের বিক্ষোভ, বাঙালী জীবনের পরাধীনতার বেদনাবোধ দীনবন্ধুর রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। সেই যুগের পক্ষে তাঁর নীলদর্পণকে অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল নাটক বলা যায়। দীনবন্ধু প্রথম 'নীলদর্পণং নাম নাটকম্' (১৮৬০) রচনা করেন। নাটকখানিতে তাঁর নিজের নাম ছিল না। লেখক সম্বন্ধে শুধু এই ইঙ্গিত ছিল—'নীলকর-বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজানিকর-ক্ষেমঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভি প্রণীতম্'। পূর্বে যে সব সামাজিক কুসংস্কার নিয়ে নাটক লেখা হয়েছিল সেই আদর্শ থেকে সরে গিয়ে, তিনি ইংরেজ নীলকর ও প্রজাদের সংঘর্ষ নিয়ে নাটক রচনা করেন। তাঁর এই নাটক সারা বাঙ্‌লা দেশে, এমনকি বিলাতেও বেশ আন্দোলন জাগিয়ে তুলেছিল। ইংরেজরা এই নাটকখানিকে খুব ভালো চোখে দেখে নি। এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশের জন্য রেভারেণ্ড লঙ্‌এর জেলও হয়েছিল। নাটকখানির ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন মধুসূদন দত্ত, রেভারেণ্ড লঙ্‌এর নামে প্রকাশিত হয়। দীনবন্ধু নীলকরদের অত্যাচারের প্রতিবাদ জানিয়েছেন, কিন্তু সমগ্র ইংরেজ শাসন ও তার নীতির বিরুদ্ধে তেমন বিশেষ কিছুই বলেন নি। তবে তখনকার অন্যান্য লেখকদের মতো বিভিন্ন আন্দোলন ও বিদ্রোহের বিরুদ্ধে না বলে উপনিবেশের সহানুভূতিশীল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক হিসাবে অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিকারের দাবী ঘোষণা করেছেন। নীলদর্পণের ভূমিকায় তিনি বলছেন—"নীলকর-নিকর-করে নীলদর্পণ অর্পণ করিলাম। এক্ষণে তাঁহারা নিজ নিজ মুখ সন্দর্শন পূর্বক তাঁহাদিগের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা-কলঙ্ক-তিলক বিমোচন করিয়া তৎপরিবর্তে পরোপকার-শ্বেত-চন্দন ধারণ করুন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রমের সাফল্য, নিরাশ্রয় প্রজাব্রজের মঙ্গল এবং বিলাতের মুখ রক্ষা হয়।" দীনবন্ধু তাঁর নাটকে রায়তের দুর্দশা বর্ণনা করতে গিয়ে প্রত্যক্ষভাবে নীলকর ও পরোক্ষভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে বক্তব্য লিপিবদ্ধ

করেছেন। সেই যুগে বুর্জোয়া পটভূমিকায় প্রগতির পক্ষে যতখানি অগ্রসর হওয়া সম্ভব তিনি ততখানি অগ্রসর হয়েছিলেন। দীনবন্ধুরা বুঝতে পেরেছিলেন পরাধীনতার কি বেদনা কিন্তু সাহিত্যে তার সার্থক প্রকাশ ঘটছিল না। এঁরা সিপাহী বিদ্রোহের ব্যাপকতর সম্ভাবনার দিক দেখেও তাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাতে পারেন নি, বিস্ময়ে থমকে গেছেন।

দীনবন্ধু নীলদর্পণে যাদের বিষয়ে বলতে চেয়েছেন সেই তোরাপ, রাইচরণের দল খুবই স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে তাঁর অভিজ্ঞতার ফল সুন্দর হ'য়ে উঠেছে; কারণ সমাজে তোরাপ রাইচরণদেরই জীবনে দারিদ্র্য ও দুঃখের কঠোর নির্মম রূপ দেখা দিয়েছে, তাদের জীবনের সংগ্রামশীলতার প্রকাশ তাই খুবই স্পষ্ট। তবুও এদের সঙ্গে জোতদার নবীনমাধবের একটা বোঝাপড়ার দিকও তিনি দেখাচ্ছেন। তোরাপ বলে, 'ঝে বড় বাবুর জন্যি জাত বাঁচেচে, ঝার হিল্লেয় বসতি কত্তি নেগিচি, ঝে বড় বাবু হাল গোরু বেঁচেয়ে নে ব্যাড়াচ্চে, মিত্যে সাক্ষি দিয়ে সেই বড় বাবুর বাপ্‌কে কয়েদ করে দেব? মুই তা কখনুই পারবো না—জান কবুল!' ইংরেজ শাসনের কদর্যতায়—তাদের এজেন্ট নীলকরদের নিষ্ঠুর অত্যাচারের মুখে যে মানুষগুলো প্রতিবাদ জানাতে চায় তাদের প্রতিনিধি হচ্ছেন স্বয়ং নাট্যকার।

বাঙ্‌লার সমাজের কদর্য নোংরামি নিয়ে এবং ইয়ং বেঙ্গলের অতিরিক্ত ইংরেজিয়ানা ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালীর নিস্ফল উদ্যম ও পরিণামে ব্যর্থতা প্রভৃতি নিয়েও দীনবন্ধু কয়েকখানি নাটক রচনা করেন। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬), লীলাবতী (১৮৬৭), জামাই বারিক (১৮৭২), বিধবার একাদশী প্রভৃতি তার উদাহরণ। 'সধবার একাদশীতে' নিমচাঁদ সে যুগের জীবনে ব্যর্থ-কাম শিক্ষিত বাঙালীর প্রতীক। নিমচাঁদের মতো শিক্ষিতরা তখনকার দিনে ইংরেজি শিক্ষা, মদ খাওয়া প্রভৃতিকে পরস্পরসাপেক্ষ বলেই জীবনে গ্রহণ করেছিল। বিদেশ বণিকরাজের শাসন-মহিমায় (!) এদের জীবন সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি। ঔপনিবেশিক সমাজের মধ্যে থেকে এবং তার প্রভাবে বর্ধিত হ'য়ে এরা হারালো নিজেদের মৌলিকতা। তবুও তারা যথার্থ মানুষের পরিচয় জ্ঞাপনের জন্য উদ্‌গ্রীব। নিমচাঁদ বলে—

"I dare do all that may become a man
Who dares do more, is none."

উনবিংশ শতাব্দীর 'শহুরে' জীবনের ভ্রান্তিময় বিষময় পরিণামের দৃষ্টান্ত নিমচাঁদ। এ ছাড়া দীনবন্ধু নবীন তপস্বিনী (১৮৬৩) ও কমলে কামিনী নাটকও (১৮৭৩) রচনা করেন। দীনবন্ধুর নাটক তখন নাট্যশালার ভিত্তি সুদৃঢ় করে তুলেছিল। তাঁর নাটকগুলি সেযুগের বাঙালীর খুবই প্রিয় ছিল। দীনবন্ধুর নাটকের প্রধান বৈশিষ্ঠ্য হ'ল কৌতুক মিশ্রিত নাট্য রস। তাঁর নাটকের গতিবেগ কোথাও মন্থর হয় নি।

মনোমোহন বসু

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের পর মনোমোহন বসুর (১৮৩১-১৯১২) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যধারায় সাধারণত দুটি বিভিন্ন ধারা লক্ষিত হয়। একটি হচ্ছে সাহিত্যে প্রাচীন আদর্শের অনুসরণ আর একটি হচ্ছে উনবিংশ শতাব্দীর নবলব্ধ চিন্তাধারা। বঙ্কিমোত্তর যুগে শেষোক্ত ধারা সুস্পষ্টভাবে দেখা দেয়। ব্রাহ্ম-আন্দোলন, এবং ইংরেজিশিক্ষাপুষ্ট ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলন যখন রূপ পরিগ্রহ করছে, যখন সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ভিত্তি জীর্ণ হ'য়ে তাতে ফাটল ধরছে তখনও একদল লোক প্রাচীনের মহিমা কীর্তন ক'রে, প্রাচীন পথ ধরেই চলতে চেয়েছেন, আবার তাঁদের মধ্যে অনেকে ইংরেজ রাজশক্তির উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও সচেতন হ'য়ে উঠেছেন। এই ধরণের সাহিত্যিকদের মধ্যে নাট্যকার মনোমোহন বসুও একজন। তিনি সাহিত্য রচনার দিক্‌ থেকে প্রাচীনপন্থীই ছিলেন আবার তখনকার দিনের হিন্দুমেলার মাধ্যমে যে দেশাত্মবোধ জেগে ওঠে তার সঙ্গেও তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

মনোমোহন বসুর বেশীর ভাগ নাটকই পৌরাণিক নাটক। তাঁর রচিত রামাভিষেক নাটক (১৮৬৭) সতী নাটক (১৮৭৩), হরিশ্চন্দ্র নাটক (১৮৭৫), পার্থ পরাজয় (১৮৮১) প্রভৃতি এই পর্যায়ে পড়ে। প্রণয় পরীক্ষা নাটক (১৮৬৯), নাগাশ্রমের অভিনয় (১৮৭৫), আনন্দময় নাটক (১৮৯০) প্রভৃতিকে সামাজিক নাটক পর্যায়ে ফেলা যায়। মনোমোহন নাটকের মাধ্যমে নীতিবোধ, ন্যায়নিষ্ঠা, ধর্মবোধ প্রভৃতি জাতির জীবনে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

মনোমোহন বসুর সময় রঙ্গমঞ্চ মোটামুটিভাবে স্থাপিত হলেও তাঁর

নাটকগুলি সাধারণত যাত্রার দলে অভিনীত হ'ত। মনোমোহন সে যুগের দেশাত্ম-বোধের আন্দোলন আলোড়ন থেকে দূরে ছিলেন না। পরাধীনতার বেদনা-বোধ, বিদেশী রাজশক্তির অন্যায় অবিচারের স্বরূপটি এমনকি তাঁর পৌরাণিক নাটকের মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে।

মনোমোহন বসুর পর উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ে আরও অনেক নাটক রচনা হয়েছিল। সামাজিক, পৌরাণিক যে কোনো একটি বিষয় অবলম্বন করে নাট্যকাররা নাটক রচনা করছিলেন। নাটক রচনায় এবং নাটকের অভিনয় ব্যাপারে পাইকপাড়ার রাজা, শোভাবাজারের রাজা, পাথুরেঘাটা ও জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার প্রভৃতি তখনকার দিনে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

সে যুগে সীতার বনবাস, নল দময়ন্তী, উষানিরুদ্ধ নাটক, মহাশ্বেতা প্রভৃতি অনেক পৌরাণিক নাটক রচিত হয়েছে। নাটকে অলৌকিকত্বের প্রাধান্য ও আধ্যাত্মিকতার বহুল অবতারণা উনবিংশ শতাব্দীর গতিশীলতার মাঝপথে তেমন কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে সে বারবার এগিয়ে গেছে।

এসময়ে দু'একজন মহিলাও নাটক রচনা করেন। কামিনীসুন্দরী দাসী নামে একজন মহিলা 'উর্বশী নাটক' (১৮৬৬), 'উষা নাটক' (১৮৭১) এবং 'রামের অধিবাস' নাটক রচনা করেন।

কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্রও কয়েকখানি পৌরাণিক ও সামাজিক নাটক রচনা করেন। পৌরাণিক নাটকের মধ্যে জানকী নাটক (১৮৬৩), জয়দ্রথ বধ (১৮৬৪), প্রহ্লাদ নাটক (১৮৭২) প্রভৃতি এবং সামাজিক নাটকের মধ্যে বিধবা বিবাহবিষয়ক 'ম্যাও ধরবে কে' (১৮৬২), 'হতভাগ্য শিক্ষক' (১৮৭২) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বঙ্কিমের সহপাঠী নিমাইচাঁদ শীল কাদম্বরী নাটক (১৮৬৪), ধ্রুবচরিত্র (১৮৭২) প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক ছাড়া 'চন্দ্রাবতী নাটক' (১৮৬৭), 'এঁরাই আবার বড়লোক' (১৮৬৯) প্রভৃতি কৌতুক নাট্যও রচনা করেন। 'এঁরাই আবার বড়লোক' নাটকে তখনকার সমাজের শিক্ষিত হঠাৎ-বাবুদের মদ খাওয়া ও স্খলন প্রভৃতির বর্ণনা আছে। চন্দ্রাবতী নাটক রেনলড্স্‌এর লাভস্ অব্ দি হারেম অবলম্বনে রচিত, তারকেশ্বরের মোহন্ত সংক্রান্ত ব্যাপারে তীর্থ মহিমা নাটক (১৮৭৩) নামে একখানি নাটক রচনা করেন।

বেনীমাধব ঘোষ এই সময় সেক্‌সপীয়রের কমেডী অব্‌ এররস্‌ অবলম্বনে ভ্রম কৌতুক (১৮৭৩) নামে একখানা নাটক রচনা করেন। মধুসূদনের রচনার প্রভাব বাংলা সাহিত্যে দেখা যায়। যদিও তাঁর ভাব ও ভাষার সবল অনুকরণ আর হয়নি তবুও মেঘনাদবধ কাব্যের অপূর্ব শিল্পচাতুর্য ও রসমাধুর্য অনেককেই আকৃষ্ট করেছিল। মেঘনাদবধ কাব্য নিয়ে শুধু নাটক নয়, যাত্রাও রচিত হয়েছিল। তার মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের মেঘনাদ বধ নাটক (১৮৬৭), ও হরিশচন্দ্র তর্কালঙ্কারের মেঘনাদ বধ নাটক (১৮৭৭) উল্লেখযোগ্য। টেকচাঁদের 'আলালের ঘরের তুলালের নাট্যরূপ' দেন শ্রীরাখাল মিত্র (১৮৬৯)। কালীপদ ভট্টাচার্য স্কটের লেডি অব্‌ দি লেক অবলম্বনে 'প্রভাবতী নাটক' (১৮৭১) রচনা করেন।

পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের রোমান্টিসিজমের আদর্শ আমাদের এই যুগের সাহিত্যে দেখা দেয়। নাটকেও তার যথেষ্ট নিদর্শন মিলে। দেশবাসীর মনে প্রাচীন শৌর্য বীর্যকেও স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য ইতিহাসপ্রসিদ্ধ কাহিনীগুলি নাটক ও উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসাবে গ্রহণ করা হয়। দেশপ্রেম এবং দেশের ঐতিহ্যের গৌরবকে স্বীকার—নাটকের মাধ্যমে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরার আগ্রহও তখনকার দিনের রচয়িতাদের ছিল। পাশ্চাত্ত্য বুর্জোয়া সাহিত্যের রোমান্টিক ভাবধারা নাটক, উপন্যাস, কাব্যকে বেশ অভিভূত করেছিল। এই সব সাহিত্যে ঔপনিবেশিক সমাজ-ব্যবস্থার মোহ-সংশয় ও গ্লানিবোধের প্রকাশও ঘটেছে। মধুসূদনের সময় যে নাটক রচনা সমাজের ভেতর থেকে মালমসলা নিয়ে এবং পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক যুগের উপকরণ নিয়ে গড়ে উঠেছিল তার মধ্যেও পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার প্রভাব যথেষ্ট ছিল। মধুসূদনের পর থেকে এই ভাবধারা জাতীয়তাবোধের আদর্শে একটি জাতীয় রূপ পেতে থাকে।

উক্ত ধরণের নাটক রচনায় প্রাণেশ্বর দত্তের 'সংযুক্তা স্বয়ম্বর নাটক' (১৮৬৭) উল্লেখযোগ্য। এটি ঐতিহাসিক নাটক। এই নাটক রচনার যুগে বাঙ্‌লার জাতীয়তা আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে। বাঙালীর মনে বিদেশী শাসকের চক্রান্ত ধরা পড়েছে, কিন্তু তাঁরা বিক্ষুব্ধ হলেও তখন নিরুপায়। এই নিরুপায় ভাব তাঁদের রচনায়ও প্রকাশ পেয়েছিল। হিন্দু-মুসলমান অনৈক্য— যা গোড়াতে একটা ধর্ম-কেন্দ্রিক এবং পরে যা রাজনৈতিক রূপ লাভ

করে—তাকেই এঁরা প্রথম সাহিত্যের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করেছেন। দেশের জাতীয় আন্দোলন বা অন্যান্য আন্দোলন সরাসরি সাহিত্যে এসে পড়েনি। তবে তার প্রভাব সাহিত্যের মধ্যে একটা আভাস রেখে গেছে। প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজকে কিছু বলতে সাহস না পেয়ে তখনকার ভগ্নোদ্যম মুসলমানদের উপলক্ষ্য করে তখন কেউ কেউ সাহিত্য রচনা করেন। হিন্দুরা এতদিন মুসলমান নবাবের অধীন ছিল। তৃতীয় দলের আবির্ভাবে মুসলমান রাজশক্তির শাসন থেকে সাময়িকভাবে রেহাই পেল বটে কিন্তু যে ফাঁদে পা বাড়ালো তার জের সামলাতে দেড়শো বছরের ওপর কেটে গেল। কিন্তু তখনকার সমাজে জনসাধারণের সম্মিলিত শক্তির বিরাটত্ব হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদের সংকীর্ণতার যে অনেক উর্ধ্বে এবং এই শক্তি যে-কোনো শোষণের দুরভিসন্ধিকে যে পরাভূত করতে পারে বাঙালী তা তখন সম্পূর্ণভাবে বুঝে উঠতে পারেনি। রামমোহন থেকে শুরু করে দীনবন্ধু পর্যন্ত যাঁরা এই জাতীয় দুর্বলতার স্বরূপ বুঝতে পেরেছিলেন তাঁরা এই সম্বন্ধে তাঁদের বক্তব্য বিষয়কে নানাভাবে প্রকাশ করে গেছেন। ইংরেজদের শোষণনীতি হিন্দু-মুসলমান বিভেদকে আরও বড়ো করে তুলেছিল এবং এই বুনিয়াদের উপরে তারা রচনা করছিল আপন প্রাধান্য। মুসলমানরা পলাশী প্রান্তরে আপন শক্তি-বৈভবকে হারিয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর ঔপনিবেশিক বেড়াজালে প'ড়ে তাঁরাও হাবুডুবু খাচ্ছিলেন। ইংরেজ-প্রভাব হতে দূরে থেকেও জীবিকা উপার্জনের জন্য আবার মুসলমানসম্প্রদায়কে তাদের কাছে আসতে হল। সেই যুগে মুসলমান সমাজের এই মর্যাদাবোধ, এই অভিমানাহত বিক্ষুব্ধ মনোভাব সেযুগের সমষ্টিগত ভাবাদর্শ থেকে তাকে দূরে রেখেছিল। কিন্তু এই হিন্দু-মুসলমান ঐক্য দেখা দিয়েছিল কৃষিজীবী শ্রেণীর মধ্যে। সেখানে তারা এক। একই সুখে দুঃখে তাদের জীবন গড়া। ইংরেজ শাসনের নিষ্ঠুর নিপীড়ন, জমিদারদের নির্মম অত্যাচার তাদের প্রতিদিনের প্রাপ্য ছিল। বাঙ্‌লা দেশ ও সমাজের প্রাণকেন্দ্র যে চাষীরা তাদের সুখদুঃখ বেদনার প্রকাশ তখন শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজে ততটা স্বীকৃতি লাভ করেনি। যে হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষ সমাজের মোড়লদের সুবিধার জন্য, ইংরেজদের রাজ-কার্যের সুবিধার জন্য সৃষ্ট হয়েছিল তার নগ্ন রূপ ও সত্য রূপ যেখানে ধরা পড়ে তারা কোথায়? হয়ত সে যুগের কাছে অত খতিয়ে দেখার আশা

করা ঠিক হবে না। তবুও যে এ বিভেদের ভ্রান্তি ধরা পড়েনি তা নয়। মীর মশারফ হোসেনের বসন্তকুমারী নাটকের (১৮৭৩) প্রস্তাবনায় যখন নট-নটী বলে—

'নটী—বসন্তকুমারী কার রচিত ?

নট—কুষ্টিয়া নিবাসী মীর মশারফ হোসেন রচিত।

নটী—ছি ছি। এমন সভায় মুসলমানের লিখিত নাটকের নাম কোল্লেন ?

নট—কেন ? মুসলমান বলে কি একেবারে অপদস্ত হলো ?

নটী—তা নয়, এ সভায় কি সেই নাটকের অভিনয় ভালো হয় ? হাজার হোক্ মুসলমান।

নট—অমন কথা মুখে আনিও না। ঐ সর্বনেশে কথাতেই ভারতের সর্বনাশ হচ্ছে।'

তখন আমরা একথার কি ইঙ্গিত তা বুঝতে পারি। নাট্যকার যে ভবিষ্যতের আভাস দিয়েছেন এবং সে যুগের উদারদৃষ্টিসম্পন্ন যে মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন তা সর্বকালের জন্যই সতর্কবাণী। সেযুগে বাঙালীর যে চেতনাবোধ জেগেছে তা কখনও সার্থক হ'তে পারে না মিথ্যা বিভেদের ভিতর দিয়ে। মীর মশারফ হোসেন তাঁর 'জমিদারদর্পণ' নাটকে (১৮৭৩) জমিদারদের অত্যাচারের কাহিনী ও লাম্পট্যের যথাযথ বর্ণনা দিতে চেষ্টা করেছেন। প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা তাঁর নাটকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'জমিদারদর্পণ' নাটক নাট্যকারের কল্পনাপ্রসূত নয়। সামন্ততান্ত্রিক ভিত্তিকে টিকিয়ে রাখবার জন্য জমিদারদের অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি ও প্রজার রক্ত শোষণ করে আপনার পরিপুষ্টি সাধন তখনকার বিদেশী প্রভুপদলেহীদের মধ্যে বর্তমান ছিল। 'জমিদারদর্পণে' তখনকার চাষীদের দুরবস্থারও বর্ণনা রয়েছে। লেখকের বাস্তব দৃষ্টি সত্যই প্রশংসার্হ। মীর মশারফ হোসেনের 'জমিদারদর্পণ' নাটকখানিতে রোমান্টিক্ ভাবধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

অন্যান্য নাটক-রচয়িতার মধ্যে মোহম্মদ আবুল করিমের 'জগৎমোহিনী' (১৮৭৫), কাদের আলীর 'মোহিনী প্রেমপাশ' (১৮৮৯), জগদ্বন্ধু ভদ্রের 'দেবলাদেবী' (১৮৭০), 'বিজয়সিংহ', রামকালী ভট্টাচার্যের 'হিন্দু পরিবার' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

নাটক হিসাবে সব নাটক উচ্চশ্রেণীর না হলেও সমাজ সংস্কারের দিকটা কি

নাটক, কি প্রহসনে স্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছে। এরকম নাটকের মধ্যে ব্রাহ্ম ও ব্রাহ্মভাবে-ভাবিতদের বোঝাবার জন্য 'দুর্গোৎসব' নাটক (১৮৬৮—বেহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়) রচিত হয়। এই নাটকে যেমন সমাজের কয়েকটি বিচিত্র চরিত্র চোখের সামনে তুলে ধরা হচ্ছে, তেমনি তখনকার সমাজে হিন্দুমেলা প্রভৃতির ভেতর দিয়ে যে নতুনত্ব এসে পড়ছিল তারও উল্লেখ আছে। জ্ঞানধন বিদ্যালঙ্কারের 'সুধা না গরল' (১৮৭০) নাটকে শিক্ষিত ব্যক্তির মদ খাওয়া ও লাম্পট্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, আবার তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থার উপরেও কটাক্ষপাত করা হয়েছে। বাংলাদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে শুধু আজকে নয় উনবিংশ শতাব্দীতেও যে একটা অভিযোগ ছিল তা এই নাটক থেকে বুঝতে পারি। 'সুধা না গরল' নাটকে বলা হচ্ছে—'যে বেশী মুখস্থ করতে পারে সেই Universityতে shine কর্তে পারে। ওতে solid knowledge-এর এত দরকার নেই। গং মুখস্থ কর্তে পার্লেই পাস্।'—তখনকার শিক্ষা-ব্যবস্থায় ত্রুটি মধ্যবিত্ত জনসাধারণের মনেও প্রতিবাদের সৃষ্টি করেছে। অবশ্য এ বিশ্ববিদ্যালয়ও সেই ইংরেজেরই তৈয়েরী।

সমসাময়িক বিষয় নিয়ে তখন অনেক নাটক লিখিত হয়েছে। বেশীর ভাগ তখনকার হঠাৎ ইংরেজিয়ানার আতিশয্য ও প্রাচীন গোঁড়া মতের বাড়াবাড়ি—দুইই নিয়ে রচিত হয়েছিল। তার মধ্যে নবীন চট্টোপাধ্যায়ের 'বারুণী বিলাস' নাটক (১২৭৪), যদুনাথ তর্করত্নের 'দুর্ভিক্ষ দমন' নাটক, হীরালাল দত্ত ও অন্নদাপ্রসাদ ঘোষের 'কলিকালের গুড়ুক ফোঁকা' নাটক (১৮৭০), দ্বারকানাথ দত্তের 'বাঙ্গালার ভাবীমঙ্গল' (১৮৭১), হরিগোপাল মুখোপাধ্যায়ের 'দারোগা মশাই' (১৮৭২) প্রভৃতির নাম করা যায়।

এই সময়ে থিয়েটারের বহুল প্রচারে যাত্রা একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি। রঙ্গমঞ্চের পাশাপাশি মুক্ত প্রাঙ্গণে যাত্রাও চল্‌ছিল। সাধারণ মানুষের জন্য এই যাত্রাই ছিল নাটকের পরিচয়ের ক্ষেত্র। বিশেষ করে তখনকার রঙ্গমঞ্চের অভিনয় দেখার খরচ এবং রঙ্গমঞ্চ তৈয়েরী করে নাটক অভিনয় করানো যেরকম ব্যয়সাধ্য ব্যাপার ছিল সবার পক্ষে সে সুযোগ ঘটত না। নানারকম সখের দল বেঁধে যাত্রার নিয়মে নাটকগুলির অভিনয় হত। তবে যে নাটক-গুলি তখন লেখা হচ্ছিল, তার অভিনয়ের উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল রঙ্গমঞ্চ। তাই যাত্রার দলে ঐসব নাটকের অভিনয় হওয়া সত্ত্বেও যাত্রার জন্য আলাদা পালাও

লেখা হচ্ছিল। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদির উপাখ্যান এসব যাত্রার খোরাক জুগিয়েছিল। মধুসূদন, বঙ্কিম, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতির রচনাও এসব নাটকে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল।

বাঙ্‌লা সাহিত্যে নাট্যবিভাগে পৌরাণিক, সমসাময়িক, ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু নিয়ে, ইংরেজি নাটকের ভাব অবলম্বনে এবং অনুসরণে এই যুগে বহু নাটক রচিত হয়েছে। ইংরেজি শিক্ষিতদের কাছে সেক্‌স্‌পীয়রের সমাদর খুব বেড়েছে। বাঙ্‌লা নাটক রচনায় ওথেলো, হেমলেট, মারচেন্ট অব ভেনিস্‌, রোমিও জুলিয়েট, ম্যাকবেথ, সিম্বেলিন প্রভৃতির অনুবাদ ও অনুসরণ দেখা দিয়েছে। তখনকার সামাজিক পটভূমিকায় এই নাট্য সাহিত্যের গুরুত্ব যথেষ্ট আছে, এবং যে দেশাত্মবোধ তখন বাঙালীর মনকে সচেতন করে তুলেছে সেই মনকে প্রত্যক্ষানুভূতির সীমায় পৌছে দেবার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। বাকি নাট্যকার ও নাটকের আলোচনা পরে আসছে।

৫

উনবিংশ শতাব্দীঃ দ্বিতীয় পর্যায়

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পর্যায়ের সাহিত্যের আলোচনা শুরু করার পূর্বে বাঙালী সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর কি রূপান্তর ঘটছিল তার কিছুটা আলোচনা করা দরকার। ব্রাহ্ম-আন্দোলন, নব্য বঙ্গ আন্দোলনের ভেতর দিয়ে যে বৈশিষ্ট্য বাঙালী সমাজে দেখা দিয়েছিল তাতে দেশাত্মবোধ ও যুক্তিপ্রবণতা থাকা সত্ত্বেও অতিরিক্ত পাশ্চাত্ত্য অনুকরণহেতু তখন বাঙালীসমাজে একটা প্রতিক্রিয়াও সুস্পষ্ট হয়ে উঠছিল। এর আগে আমরা দেখেছি, বাঙ্‌লার স্বাধীনতা যখন লোপ পেল, তখন থেকে নানাভাবে যে সব বাঙালী ইংরেজ বণিকদের সহায়তায় বড়লোক হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের অনেকেই সমাজে সুস্থ কোন পরিবেশ সৃষ্টি করার পক্ষে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করতে পারেন নি। সাহিত্যে তখন অমার্জিত রুচির একটা ধারাও প্রবাহিত হচ্ছিল। রামমোহনের সময় থেকে যে ভাঙ্গন-প্রতিরোধের প্রয়াস দেখা দিয়েছিল তা থেকে বাঙালীর চিন্তাধারায়ও

একটা পরিবর্তন এসেছিল। এদিকে ইংরেজদের দ্বারা যে শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রসার ঘটছিল তারই সঙ্গে সঙ্গে এবং পাদরীদের ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে (ঔপনিবেশিক দেশে এটাও সাম্রাজ্যবাদীদের একটা অস্ত্র) বাঙালী জীবনে আপন জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে বলিষ্ঠ করে গ'ড়ে তোলবার প্রয়াস তখন দেখা দেয়। একদিকে এলো ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার অনুকরণপ্রীতি, অপর দিকে জাতীয় সংহতির চেষ্টা—এই দুয়ের মধ্য কিন্তু কোনো অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হ'তে পারেনি। বাঙালী জনসাধারণের মধ্যে তখন জেগেছে জাতীয়তাবোধ, তার সামনে রয়েছে স্বাধীনতার আবেগ। শিক্ষিত বাঙালীরা এদিকটা কিছু কিছু অনুভব করে ছিলেন। এঁদের মধ্যে হিন্দু-জাতীয়তাবোধ এবং স্বদেশ প্রেম যুগপৎ প্রকাশ পায়। হিন্দুধর্মের ঐতিহ্যের মহিমাকে তাঁরা প্রচার করতে থাকেন। একদিকে এঁরা বুঝতে পারছেন জনসাধারণের চাহিদা কি, অন্যদিকে তাঁরা রয়েছেন ব্রিটীশ ঔপনিবেশিক শাসনের 'আওতায়,' সামাজিক ভিত্তি তখনও সামন্ততান্ত্রিক ভাবদুষ্ট, আবার জাতীয় প্রয়োজন সম্বন্ধেও তাঁরা সজাগ, এ সব নিয়ে তাঁদের মধ্যে একটা স্ববিরোধিতাও দেখা দিয়েছে। একদিকে জাতিভেদ, বৈষম্যমূলক নীতি, ইংরেজ চক্রান্তের ফলস্বরূপ হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের পারস্পরিক অসহযোগ, ধর্মসংস্কার, বিদেশী রাজশক্তির অত্যাচার, জমিদার ও ধনী ব্যক্তিদের প্রজা নিপীড়ন, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার কুফল, অপর দিকে সমাজের প্রচলিত দুর্বল প্রথার প্রতিকারে বাধা, প্রজাবিক্ষোভে আতঙ্ক, প্রাচীন-পন্থীদের রক্ষণশীলতা প্রভৃতি সব মিলে তখনকার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালী মনের একটা সংশয়পূর্ণ স্ববিরোধী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তখনকার সাহিত্যে। সাহিত্যে ব্যক্তি-সচেতনতা দেখা দিচ্ছে—সমাজের নানা রূপচিত্রও দেখতে পাচ্ছি। তখন যুগচিত্তের চিন্তার গতিশীলতা ও রক্ষণশীলতার দ্বন্দ্বও দেখা দিয়েছে। 'শহুরে' সমাজের হৃদয়াবেগের আলোড়ন আন্দোলনের প্রকাশ এইসময়কার সাহিত্য রচনায় লক্ষিত হয়। ইংরেজিয়ানায় একেবারে নিজের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে যে কিছুই নিজের থাকবেনা, উপরন্তু তাতে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের এদেশে পাকাপোক্ত হয়ে বসার যে খুব সুবিধে হবে —এটা বুঝতে পেরে যাঁরা বাঙ্‌লার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের দিকে নজর দিয়ে লেখনী ধারণ করেন—তাঁদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র অন্যতম। তাঁরা তখন ইংরেজ সভ্যতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছেন। তাঁদের কাছে এই সভ্যতার

প্রকৃত রূপ ধরা পড়েছে। তাঁরা স্পষ্টভাবে সমাজে ইংরেজিয়ানার প্রতিরোধ সৃষ্টি করেন হিন্দু-জাতীয়তাবোধের প্রেরণা নিয়ে।

সিপাহীবিদ্রোহের ব্যর্থতা দেশের মানুষের মনে এক আলোড়ন সৃষ্টি করে। সিপাহীবিদ্রোহ শুরু হবার যে যে উপকরণ সঞ্চিত হয়েছিল তার ভিতর যেমন ভেঙে-পড়া সামন্তশ্রেণীর বিদেশী শক্তির প্রাধান্য অস্বীকারের দিকও ছিল, তেমনি ছিল দরিদ্র চাষীদের এবং উপার্জন-অক্ষম বিত্তহীনদের বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নাগপাশ থেকে মুক্তি পাবার আকুলতা। সমাজের অর্থ-নৈতিক ভিত্তিতে ধরেছে ফাটল। ইংরেজ আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য সাম্রাজ্য বিস্তার করছে, দেশের অর্থ নৈতিক ভিত্তিতেও ভাঙন ধরিয়ে নিজেদের সুবিধা মতো দেশকে ধন-সম্পদের দিক থেকে দুর্বল ক'রে ফেল্‌ছে। দেশের শিল্প মৃত-প্রায়। বিদেশের উপরেই আমাদের নির্ভর করতে হচ্ছে। এই বিক্ষোভই সারা দেশের মধ্যে একটা অশান্তির ঘূর্ণি রূপে দেখা দিল। তখন সামন্ত-নৃপতিদের এবং তাঁতী-জোলা-চাষীদের দৃষ্টিভঙ্গী এক না থাকলেও সামগ্রিকভাবে দেশকে রক্ষা করার, নিজেদের বিদেশী নাগপাশ থেকে মুক্ত করার দুর্দম বাসনা দেখা দিয়েছিল। দেশকে বিদেশীর হাত থেকে উদ্ধার করা এবং সমাজজীবনের সুখ শান্তি লাভ করাই ছিল তাদের কামনা। তাই হৃত-স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য এবং বিদেশীর নাগপাশ থেকে নিজেদের মুক্তি পাবার জন্য নানা দিক থেকে সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যে দিয়ে একটি ব্যাপক বিদ্রোহের সম্ভাবনা দেখা দিল। এ শুধু বাঙ্‌লায় নয়, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সারা ভারতে ব্যাপকতরভাবে দেখা দেয়। এই বিদ্রোহকে যথার্থ জাতীয় বিদ্রোহ বলা যেতে পারে। অনেকে শুধু রাজরাজড়াদের চক্রান্তই দেখেছেন, অনেকে হয়ত এই বিদ্রোহকে পরাজিত মুসলমান-শক্তির শেষ চেষ্টা বলে আখ্যা দিয়েছেন। বিচ্ছিন্নভাবে এই বিদ্রোহকে দেখতে গেলে ভুল হবে। এই বিদ্রোহের বীজ নানাভাবে আমাদের সমাজে ছড়ানো ছিল। হিন্দু মুসলমান একসঙ্গেই এই বিদ্রোহে যোগ দেয়। সিপাহীরা ছাড়া অন্যান্যদের এই বিদ্রোহে যোগ দিতে দেরী হলেও ধীরে ধীরে তারা শেষপর্যন্ত যোগদান করছিল।

ভারতবর্ষে নানা জাতি নানা সম্প্রদায় থাকার ফলে তার সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে একটা দ্বন্দ্ব সব সময়েই ছিল। ইংরেজরা সেই দ্বন্দ্বের সুযোগ গ্রহণ করে। সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে বাংলায় 'চবি মিশ্রিত কার্তুজ' সংক্রান্ত

ব্যাপারটিই বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। পরে সারা ভারতে ইংরেজবিদ্বেষ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সামন্ত নৃপতিদের কেউ কেউ এর মধ্যে যোগ দেন। বিদ্রোহীরা অনেকদূর অগ্রসর হলেও শৃঙ্খলা ও দূরদৃষ্টির অভাবে শেষপর্যন্ত তাঁদের বিদ্রোহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। দুদিকেই প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। বিদ্রোহের ব্যর্থতার কয়েকটি কারণ হচ্ছে, সৈন্যদের একাংশ বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ না দেওয়া, মধ্যবিত্তশ্রেণীর বৃহৎ অংশের সমর্থন না থাকা উপরন্তু বিরুদ্ধাচরণ করা, চাষী ও দরিদ্র নিম্নবিত্তদের বিদ্রোহে অংশ গ্রহণে যথার্থ সুযোগ না পাওয়া, নিজেদের কোথাও সুপ্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা না থাকা, শৃঙ্খলার অভাব ইত্যাদি। সমসাময়িক লেখকদের অনেকেই সিপাহী বিদ্রোহের বিরুদ্ধাচরণও করেছিলেন। এঁদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জেগে উঠলেও ঔপনিবেশিক দেশের বাধানিষেধের মধ্যে তা সার্থকরূপ পরিগ্রহ করতে পারেনি।

সিপাহীবিদ্রোহের কাল থেকে শুরু ক'রে যে সব সাহিত্য রচিত হয়েছে তাতে হিন্দু-জাতীয়তাবোধের প্রকাশই বেশী ঘটেছে। ইংরেজরা বাঙ্‌লা দেশে তাদের শাসননীতির ভিতর দিয়ে বাঙালীকে 'ঘরমুখো' করে তুলছিল। যখন বাঙালী তার শিল্প-সম্পদ, বাণিজ্যসম্পদ একে একে সবই হারাচ্ছে এবং যখন জীবনের প্রতিটি প্রয়োজন মিটাবার জন্য ইংরেজের দ্বারস্থ হ'তে হচ্ছে তখনই স্বাবলম্বী হবার মনোভাব তাদের মধ্যে দেখা দেয়। ইংরেজের কাছে হাত পেতে বসে থাকার দুর্বলতার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন রাজনারায়ণ বসু, মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতি মনীষীরা। হিন্দু-মুসলমান বিভেদের ফল যে ভারতবর্ষে অত্যন্ত বিষময় হ'য়ে দেখা দেবে, তার সম্বন্ধে হুঁশিয়ার করে দিচ্ছেন মীর মশারফ হোসেন প্রভৃতি সাহিত্যিকরা। বাঙালী দেশকে ভালোবাসুক, তার দেশাত্মবোধ জেগে উঠুক —এ আশা ও আকাঙ্ক্ষা উনবিংশ লেখকদের রচনার মধ্যে প্রকাশ পেল।

দেশের আর্থনীতিক ও সামাজিক ভিত্তি, এবং তার উৎপাদনব্যবস্থা প্রভৃতির প্রতিকূল অবস্থা দেখে সমাজের হিন্দু-মুসলমান ছোটো-বড়ো সবার ভেতর একটি বিশেষ মনোভাব ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে। এটি হচ্ছে ইংরেজের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টির মনোভাব। বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের যে ঐক্যবোধের ভিতর দিয়ে জাতির স্বাধীনতা কামনা গ'ড়ে উঠছিল—তার রূপ এই সময়ের নাটক,

সংবাদপত্র, নতুন উপন্যাস ধারা, প্রবন্ধ, সমালোচনা, কাব্য প্রভৃতির ভিতর দিয়েও প্রকাশ পায়। মিল, বেন্থাম, রুশো, ওয়েন, ব্ল্যাং, ক্যাবে, কোঁৎ প্রভৃতির সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতির পাঠন-পাঠনের মাধ্যমে আমাদের দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে একটি নতুন চেতনাবোধ দেখা দেয়। ফরাসী বিপ্লবের ঐতিহ্যও শিক্ষিত বাঙালীর জীবনে প্রেরণা জোগায়। বাঙালীর দেশাত্মবোধ, তার স্বাধীনতা কামনা তখন হিন্দু-শেভিনিজম্‌এ রূপায়িত হ'য়ে দেখা দিচ্ছে। ইংরেজ সরকারের অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে জীবিকা উপার্জন করতে গিয়ে একদিকে তাদের সন্তুষ্ট রাখতে হচ্ছে, অন্যদিকে তাদের নির্লজ্জতার মুখোস খসে পড়তেই তার যথার্থস্বরূপ যখন ধরা পড়ছে তখন তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার প্রবল ইচ্ছাও প্রকাশ পেতে থাকে। সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতায় যখন বাঙালী বুঝতে পারলো যে ইংরেজ বেশ শক্তিশালী—তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গেলে যে শক্তি ও সামার্থ্যের দরকার তা তার নেই,—এদিকে তার শিল্প, বাণিজ্য, দৈনন্দিন জীবনধারণের উপায়টুকু পর্যন্ত ইংরেজের হাতে চলে গেছে—তখন তার নিজের ঘর সম্বন্ধে সচেতনতা আরও বৃদ্ধি পেল। বাঙালীর এই চেতনাবোধ জাতীয়তা-বোধে পরিণত হ'ল। এই জাতীয়তাবোধকে আরও উদ্দীপ্ত ক'রে তোলার জন্য তার সামনে ইতিহাস ও সমাজকে আরও স্পষ্ট করে দেখাবার প্রয়োজন হ'ল। শ্রীমদ্‌ভাগবতগীতা, রামায়ণ, মহাভারত, প্রাচীন হিন্দুযুগ এবং রাজপুতমারাঠা, মোগল-পাঠানদের গল্প ও ইতিহাস, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি সাহিত্যের বিষয়বস্তু হ'ল। নব্য বাঙ্‌লার অতিরিক্ত ইংরেজিয়ানাও সিপাহীবিদ্রোহের পরের দিকের বাঙালীকে তার মৌলিকতা ও ঐতিহ্যের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আরও সচেতন ক'রে তোলে। ইংরেজ আগমনের পর থেকে যে সব ছোটো বড়ো বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে, তার উদ্দেশ্যের বিরাটতা সত্ত্বেও গোড়ার ব্যতিক্রমের জন্য কোনটাই তেমন সার্থকতা লাভ করতে পারে নি। কিন্তু এটা ঠিক কথা যে, সিপাহী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ, ওহাবী আন্দোলন, চাষী বিদ্রোহ প্রভৃতির মধ্যে বাঙ্‌লার ভাবী বিপ্লবের বীজ নিহিত ছিল। সিপাহী বিদ্রোহের পরের সাহিত্যে আমরা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ের চেয়ে আরও 'এগিয়ে যাওয়া' দেশাত্মবোধের লক্ষণ দেখতে পাই। কিন্তু এই দেশাত্মবোধও সীমাবদ্ধ ছিল। সেযুগের অধিকাংশ সাহিত্যিকই সরকারী চাকুরে ছিলেন। নীলদর্পণ, আনন্দমঠ, পলাশীর যুদ্ধ রচয়িতাদের দেশাত্মবোধ তাই

যথার্থ সার্থকভাবে প্রকাশ পেতে পারেনি। তবুও যতটুকু পরিচয় পাওয়া গেছে তাতে তখনকার যুগের ইংরাজি শিক্ষিতদের সাহিত্যসাধনার ভেতর তাঁদের মনের প্রতিক্রিয়ার একটা সুস্পষ্ট রূপ ধরা পড়েছে। বিশেষ করে পাশ্চাত্ত্য বুর্জোয়া-ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত শিক্ষিত বাঙালী সমাজে পাশ্চাত্ত্য স্বাধীনতাবোধ —দেশাত্মবোধের রূপ ধারণ করতে থাকে। তবে যারা এই শিক্ষা ও সংস্কৃতি থেকে দূরে থেকেও এই চেতনাবোধকে বাঁচিয়ে রাখার প্রেরণা যোগাচ্ছিলেন সেই দূরের দরিদ্র চাষী ও বিত্তহীন শ্রেণীর যথার্থ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল তাদের বিক্ষোভের ভেতর। সাহিত্যে তার তেমন স্পষ্ট প্রকাশ না ঘটলেও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনোভাবের কিছুটা প্রকাশ ঘটেছে তাঁদের প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি রচনাতে। তাঁরা পাশ্চাত্ত্য মতবাদের—পাশ্চাত্ত্যের Libertyর আদর্শের ভারতীয়করণ করছেন। ইংরেজ যতই পাকাপোক্ত হয়ে বসছে ততই তাঁরা নিজেদের জীবনে পরাধীনতার বেদনাবোধের প্রতিফলনে সচেতন হয়ে উঠছেন। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে যে সাহিত্য সাধনার পর্ব শুরু তাতে আমরা তৎকালীন এই যুগধর্মের পরিচয় পাই। অথচ এই সাধনার মধ্যে স্ববিরোধিতাও দেখা দিয়েছে। একদিকে গীতার নায়ক শ্রীকৃষ্ণ, ইতিহাসবিশ্রুত পৃথ্বীরাজ, প্রতাপ, শিবজী প্রভৃতির আদর্শ, অন্যদিকে পাশ্চাত্ত্যের রুসো, ওয়াশিংটন, ম্যাৎসিনি প্রভৃতির জীবনাদর্শ—এই সব মিলে সেযুগের শিক্ষিত বাঙালী-সমাজের মধ্যে যে একটা পরিবর্তনের কামনা দেখা দিয়েছিল তা আমরা বুঝতে পারি। এ সময়ের ব্রাহ্মধারাও এই আদর্শের প্রভাবে এসে পড়ে। শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতির চিন্তাধারার ভেতর দিয়ে এই ব্রাহ্মধারা ধীরে ধীরে দেশপ্রীতির রূপ পরিগ্রহ করছিল।

১৮৬০ সালের পর থেকে অনুকূল-প্রতিকূল আবহাওয়ার ভেতর দিয়ে বাঙালী জাতির জীবনধর্ম ও তার লাঞ্ছিত জীবনানুভূতি আধিদৈবিকতা ও আধ্যাত্মিকতার সংশয়ে থেকেও বারবার নতুন পথে জীবনের মুক্তিকে খুঁজেছে। তার একটি উদাহরণ হচ্ছে উপন্যাসের আবির্ভাব। প্রাচীন যুগের জীবনধর্মের সঙ্গে অর্ধ-সম্পর্কিত কাব্য সাহিত্য, তার আধ্যাত্মিক সতর্কবাণী, তার স্বপ্ন-বিলাস প্রভৃতির প্রয়োজন তখন ফুরিয়ে এসেছে। তাই এ যুগে এমন এক ধরণের কাব্য দেখা দেয় যার চেহারা ও বিষয়বস্তু আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। জাতির ইতিহাসে আর্থনীতিক কাঠামোর পরিবর্তনের সময়ে তার শিল্প-বাণিজ্য

প্রভৃতির প্রসারে চিন্তাধারার যে পরিবর্তন দেখা দেয় তার ভেতর দিয়ে সাহিত্যের শিল্প-কাঠামো, তার বক্তব্য বিষয় প্রভৃতিরও রূপান্তর ঘটতে থাকে। তাই দেখি প্রাচীন যুগের সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে যে কল্পনা ও প্রেরণা ছিল, আধুনিক যুগে তা ক্ষীণ হয়ে এসেছে। জাতীয় সংস্কৃতির ওপর, তার সমাজ-ব্যবস্থার ওপর পুরানোর প্রভাব থাকলেও সাহিত্য দৈবমহিমা কীর্তন ছেড়ে মানবমুখী হ'ল। সাহিত্যে আসছে মানুষ, আসছে তার জীবনের নানা সমস্যা। এর সঙ্গে রয়েছে সমাজের অনুশাসন, তার নীতিবোধ, নিয়তিবাদ, আশা-নিরাশার দৈব-অনুকূল বা প্রতিকূল পরিণতি। এদিকে সমাজ তখন যে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে —সে ভিত্তি হিন্দুমুসলমান অধ্যুষিত বাঙ্‌লার বনেদী ভিত্তি—জীবনধর্মবিরোধী ধর্মাচ্ছাদিত ভিত্তি—সমাজের উচ্চশ্রেণীর স্বার্থ বজায় রাখবার জন্য রচিত ব্যবধানের ভিত্তি—আর অন্যদিকে ইংরেজ এসেছে তার ঔপনিবেশিক স্বার্থ নিয়ে। ইংরেজ ত শুধু শোষণ ক'রেই ক্ষান্ত নয়, তারা শোষণ করবার জন্য শিক্ষা, চিকিৎসা, যানবাহন চলাচলের সুবিধা ইত্যাদি করে জাতিকে স্তম্ভিত ও বিস্মিত করে রেখেছিল। এই উদারতা শুধু তার ঔপনিবেশিক স্বার্থসিদ্ধির পথ সুগম করবার জন্য। বিদেশী শাসকরা তাদের নিজেদের সাহিত্যের সঙ্গেও আমাদের পরিচিত করে দিল ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে। পরাধীন দেশে শাসকের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থাকে দেশবাসী যদি নিজের কাজে লাগাতে পারে—তবেই সাম্রাজ্যবাদীর সৃষ্ট-ব্যবস্থা বিপ্লবের পথ সুগম করতে পারে। আমাদের দেশে ইংরেজরা ধীরে ধীরে পরাধীনতার নাগপাশে বাঁধার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সব ব্যবস্থাই করছিল। বাঙ্‌লা দেশের শিক্ষিত সমাজের কাছে এই শোষণ শাসনের দিক সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতির রচনায় তার প্রমাণ পেয়েছি। কিন্তু তাকে যথার্থভাবে ধরিয়ে দিয়ে তার বিরুদ্ধে তখন সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর পক্ষে ততটা সম্ভব হয়নি।

৬

বঙ্কিমচন্দ্র

এই যুগের নানা সমস্যার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য রচনার সূত্রপাত। তাঁর ভাব প্রকাশের বাহন হ'ল উপন্যাস, সংবাদপত্র, প্রবন্ধ। স্বল্পপরিসর সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্কিম ও তাঁর সাহিত্যের সম্পূর্ণ সমালোচনা সম্ভবপর নয়। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে ভালো-মন্দ-মাঝারি নানারকম আলোচনাও হয়েছে। যাঁরা হিন্দু বঙ্কিমকে দেখেছেন, যাঁরা প্রগতিশীল বঙ্কিমকে দেখেছেন, দেশ-প্রেমিক বঙ্কিমকে দেখেছেন, প্রতিক্রিয়াশীল বঙ্কিমকে দেখেছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই বঙ্কিমের স্তুতিনিন্দায় বাঙ্‌লা সাহিত্য পরিপূর্ণ করে রেখেছেন। অনেকে আবার সাহিত্যধারার আলোচনাপ্রসঙ্গে বঙ্কিমের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেননি। আবার যাঁরা বঙ্কিম-প্রশস্তি নিয়ে ব্যস্ত তাঁরা তাঁকে মানুষের সীমার অনেক উর্ধ্বে তুলে ধরেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দানের মূল্য বিচারে এই দুই পক্ষেরই প্রচুর ত্রুটি রয়েছে। তা বলে এর একটা মধ্যপথ অবলম্বন করতে আমরা কখনও বলছি না।

বঙ্কিম-সাহিত্য আলোচনায় তার বিকাশের ধারা এবং বঙ্কিমের দৃষ্টি-ভঙ্গীর নানা দিক, তাঁর দ্বিধা-সংশয়, স্ববিরোধিতা,—অন্যদিকে সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর দান, তাঁর জীবনবোধ, দেশাত্মবোধ প্রভৃতির আলোচনা প্রয়োজন। সমস্ত জাতি তখন যে প্রয়োজন অনুভব করেছিল এবং সে প্রয়োজন মেটাবার জন্য যে উপকরণ দরকার ছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তার অনুশীলন করেছেন। বাঙালীর দরকার ইতিহাসের, নইলে তার দেশাত্মবোধ আরও বলিষ্ঠ হয়ে প্রকাশ পাবে না, তার সমাজবোধ জেগে ওঠার একান্ত প্রয়োজন—তখনকার যুগধর্মানুযায়ী ব্যক্তি-প্রাধান্যের, ব্যক্তি-সচেতনতারও প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্র জাতির এই প্রয়োজনকে অনুভব করেছিলেন। অন্যদিকে সরকারী চাকুরীর প্রভাবে ইংরেজের প্রতিপত্তির এবং ক্ষমতা সম্বন্ধে অতি বিশ্বাসে এবং বিপ্লব সম্বন্ধে সংশয়াবিষ্টতায় তিনি নিজেকে সংগ্রামক্ষেত্র থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। বঙ্কিম কৃষকের শক্তি ও সীমা সম্বন্ধে সচেতন কিন্তু স্পষ্টভাবে বলতে গিয়ে তাঁর বাধছে। ইংরেজে-পদাঙ্কিত বাঙালীপৃষ্ঠ তাঁকে বেদনা দেয় কিন্তু ইংরেজ আসাতে অরাজকতা যে গেছে এ মনোভাবও তাঁর রয়েছে। রুশো প্রুধোঁ ওয়েন,

ব্ল্যাং, ক্যাবে, মিল প্রভৃতির সাম্যমত নিয়ে তিনি আলোচনা করতে গিয়েও হঠাৎ সাম্যের প্রচার বন্ধ করে দেন। জীবনের মুক্তিস্পৃহা সাম্যবাদ সম্বন্ধে তাঁকে উৎসাহিত করে তোলে কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতা তাঁকে বাধা দেয়। য়্যুরোপের যুক্তিবাদ, সমাজতন্ত্র, মানবিকতাবাদ, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, ভারতের প্রাচীন হিন্দুত্বের গৌরব, ধর্মনিষ্ঠা, স্বাজাত্যবোধ প্রভৃতি তাঁর সাহিত্যের সামগ্রিক প্রচেষ্টায় যেমন দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে তেমনই নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তাও করেছে। জাতি রয়েছে সামন্ততান্ত্রিক আর্থ-নীতিক কাঠামোর ওপর—তার ওপর এসে পড়ল বিদেশাগত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ঔপনিবেশিক স্বার্থপ্রণোদিত আর্থনীতিক ব্যবস্থা। বঙ্কিম এই ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে সমাজ ও সামাজিক জীবনের যে সমস্যাগুলি দেখছেন সেগুলি আরও ব্যাপকতর। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাই, মুসলমান রাজশক্তির অত্যাচার এক সময় দরিদ্র জনসাধারণকে বিক্ষুব্ধ করেছিল। ধর্মের প্রতিযোগিতায় হিন্দুদের বেশ কিছুটা দুর্ভোগও হয়েছিল। ইংরেজের হাতে মুসলমান নৃপতির পরাজয়ে স্বার্থলোভী হিন্দু ধনীশ্রেণী বেশ উৎসাহ বোধ করছিল। ধর্মবৈষম্যজাত এই ভেদবুদ্ধি বঙ্কিমকেও কিছুটা যে প্রভাবিত করেনি তা নয়। উপন্যাস রচনায় যেখানে তিনি দেশপ্রেম ও জাতীয়তা-বোধের মহান উদ্দেশ্যকে তুলে ধরতে চেয়েছেন সেখানে শাসিত ও শাসকের রূপাঙ্কনে হিন্দু-মুসলমানের (বিশেষ করে মোগল) পারস্পরিক দ্বন্দ্বই অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এর কারণ এও হতে পারে যে, সরাসরি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যা বলতে পারলেন না সেই কথাগুলি বলার একান্ত প্রয়োজনবোধে শাসক-শাসিতের স্বরূপ প্রকাশ করতে গিয়ে মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব-বিরোধকেই তিনি অবলম্বন করেছেন।

বাঙ্‌লা সাহিত্যে ভাব প্রকাশের নতুন ভঙ্গীর অবতারণায় বঙ্কিমচন্দ্র নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন। তাঁর উপন্যাস, প্রবন্ধ ও সমালোচনা সাহিত্য তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচিতি, সমাজের যথাযথ রূপাঙ্কন, এবং সাহিত্যের মাধ্যমে ঘটনাবহুল মানবজীবনের প্রকাশ, রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা মানব জীবন পর্যালোচনা এবং তাতে ভাব-বৈচিত্র্য সম্পাদন, স্বজাতি ও স্বদেশ সম্বন্ধে সচেতনার প্রবর্তন, সাহিত্যকে সর্বজনীন ও সর্বকালীন রূপ দান প্রভৃতি বঙ্কিমচন্দ্রের বিরাট ও সার্থক সাহিত্য প্রয়াস।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের রোমান্টিসিজম্ পুরানো পথ বেয়ে চলেনি। পুরানো সাহিত্যধারার রোমান্টিসিজম্ একান্তভাবে বাস্তববিমুখী ছিল এবং কল্পনার আতিশয্য ছিল সেখানে বেশী। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্ত্যের যে রোমান্টিসিজমের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটল তাতেও কল্পনার আতিশয্য ছিল বটে, কিন্তু সে কল্পনা কিছুটা বাস্তব-ঘেঁষা। বাঙ্‌লা সাহিত্যে এই পাশ্চাত্ত্য-রোমান্টিসিজমের প্রভাব উনবিংশ শতকের কাব্য ও উপন্যাসে দেখা দেয়। উপন্যাসে দেখতে পাই যে, ঔপন্যাসিকের সৃজনী-প্রতিভা একটি বিশেষ আদর্শকে ভাবালুতার মধ্যে দিয়ে গ্রহণ করতে চাইছে। সাহিত্যে ঐতিহাসিক ও রোমান্টিক্ দুটি ভিন্ন ধারা হলেও ঐতিহাসিক উপন্যাসে এই রোমান্টিসিজম্ ইতিহাসের যুগবৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠতে পারে। কাব্যের চেয়ে উপন্যাসেই রোমান্টিক্ লক্ষণ বেশী। কবি সমালোচক মোহিতলাল বলেছেন, 'ইংরেজী সাহিত্যের সংঘাতজনিত এই নবীন চেতনা সর্বপ্রথমে আমাদের সাহিত্যে যেখানে পরিপূর্ণ গৌরবে প্রোজ্জ্বল প্রভায় প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করিল, তাহা পদ্য নয়—গদ্য, কাব্য নয়—উপন্যাস। এযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ রোমান্টিক লেখক—বঙ্কিমচন্দ্র; তাঁহার উপন্যাসগুলিই এযুগের শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কাব্য, রোমান্টিক কল্পনার সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন।' রোমান্টিক সাহিত্যে থাকে জীবনের সুখ-দুঃখ বেদনার আদর্শ পরিকল্পনা। কবি-সমালোচক মোহিতলালের মতে 'রোমান্টিক কল্পনায় আকাঙ্ক্ষা যেমন অপরিমিত, তেমনই তাহাতে তৃপ্তি নাই। অসীম আকাঙ্ক্ষার অসীম অপরিতৃপ্তি—বুকভাঙ্গা বেদনা ও নৈরাশ্যের সুর, বিষাদ ব্যাকুলতা, মহৎ জীবনের ট্রাজিডি; আক্ষেপ ও অনুশোচনা—ইহাই রোমান্টিক সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট সুর।' রোমান্টিক সাহিত্যে আত্মভাবের (subjectivism) প্রাধান্যই বেশী। এই দিক থেকে বাস্তবতার সঙ্গে রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গীর বিরোধ খুব বেশী নয়। বাঙ্‌লা সাহিত্যে মুকুন্দরাম থেকে এই রোমান্টিক লক্ষণ দেখা দিলেও বাঙ্‌লা উপন্যাস প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিক সাহিত্যের অনুকরণেই রচিত হয়েছিল।

বঙ্কিমও উপন্যাসের ভিতর দিয়ে এই রোমান্টিসিজমের অবতারণা করেন। তাঁর উপন্যাসে এই রোমান্টিসিজম্ কখনও কখনও অতিরিক্ত মাত্রায়ও প্রকাশ পেয়েছে। বঙ্কিমের পূর্বে রচিত ভূদেবের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস', টেকচাঁদের 'আলালের ঘরের' দুলাল প্রভৃতিকে উপন্যাস বলা হয় বটে, কিন্তু এতে শুধু

উপন্যাসের একটা অস্পষ্ট সম্ভাবনাই আছে, পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস তাদের কখনও বলা যায় না। ভাষা, ভাব ও আঙ্গিকের দিক থেকে বঙ্কিমের উপন্যাসগুলিই সার্থক উপন্যাস।

এর আগে উপন্যাস কেন রচিত হয়নি তার কারণ খুঁজে বের করা খুব কঠিন নয়। ইংরেজ আগমনের পর থেকেই প্রথম এই উপন্যাসের সন্ধান আমরা পাই। বিশেষত সাহিত্যে গদ্য-রীতি প্রবর্তিত হবার আগে প্রচলিত পদ্য-রীতিতে উপন্যাস রচনা সম্ভব নয়। বিশ্বসাহিত্যেও উপন্যাস আধুনিক কালের সৃষ্টি। গদ্য ভাষায় যখন যথারীতি লেখা শুরু হ'ল তখন থেকেই উপন্যাস রচনার সম্ভাবনা দেখা দিল। আমাদের জীবনের নানা সমস্যা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে ইংরেজ আগমনের পর থেকে। গল্পের ভিতর দিয়ে এসব প্রকাশ করার উপযুক্ত form বা কাঠামো পাওয়া গেল—উপন্যাস। ইংরেজি ধরণের রোমান্‌স্ রচনাও এই সঙ্গে আমরা পেলাম।

বঙ্কিমের সাহিত্যে যে ব্যক্তিমতের পরিচয় ঘটে, তা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তির মত। এবং অপর দিকে যে রক্ষণশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়—তাও ঐ ইংরেজিশিক্ষার মাধ্যমে গ'ড়ে ওঠা বলিষ্ঠ যুক্তিনিষ্ঠার জন্যই। নিজের জাতির ও দেশের যা কিছু বৈভব তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় তিনি সচেতন। নিজের দেশের শাস্ত্রমতকে তিনি পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখবার চেষ্টা করলেন। সাহিত্যে যুক্তিনিষ্ঠার অবতারণা থাকলেও হিন্দু সংস্কার তাঁর মধ্যে এত বেশী ছিল যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ, বাল্য-বিবাহ-রোধ আন্দোলন, ব্রাহ্ম-আন্দোলন প্রভৃতির তিনি বিরুদ্ধতা করেছিলেন। সেখানে তিনি বিশেষ কোনো যুক্তি দেখাতে চেষ্টা করেন নি। বঙ্কিম যেমন একদিকে নিজের হিন্দুত্ব বজায় রাখতে চেয়েছেন অপর দিকে চেয়েছেন পাশ্চাত্ত্য যুক্তি-নিষ্ঠাকে বজায় রাখতে। এই দুয়ের সংঘর্ষে বঙ্কিমের রচনায় কোথাও গোঁড়া হিন্দুয়ানী, কোথাও প্রগতিশীলতা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু সব মিলিয়ে বঙ্কিম যে এক জাতি, এক ধর্মের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করছিলেন তা শেষপর্যন্ত তাঁর হিন্দুজাতীয়তাবোধে পরিণতি লাভ করে; এবং হয়ত সে কারণেই সে যুগে অপর ধর্মের প্রতি তাঁর স্বভাবত বিদ্বেষ ভাব দেখা দেয়। হিন্দু ধর্মের নিষ্কাম-ভাব, গীতার সর্বত্যাগী জীবনাদর্শকে তিনি জাতীর জীবনাদর্শরূপে রূপায়িত ক'রে দেখতে চান। তাঁর উপন্যাসে এই ভাবাদর্শ খুবই স্পষ্ট।

উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী জীবনে পরাধীনতার বেদনা, জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেম যতই বেড়ে উঠুক না কেন, শিক্ষিত বাঙালী সমাজে তার আন্দোলন-আলোড়নের দিক সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারেনি। সেযুগের শিক্ষিত বাঙালী পাশ্চাত্ত্য বুর্জোয়া আদর্শে অনুপ্রাণিত হলেও এখানে ইংরেজ-প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা ও আর্থনীতিক ব্যবস্থার মধ্যে অনুরূপ আদর্শ চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করতে পারেনি। আবার এরই সঙ্গে রয়েছে আমাদের অনগ্রসর জীবনের দোলাচল বৃত্তি। তবুও এটা ঠিক যে, নানা আন্দোলনের ভেতর দিয়ে, নানা বিক্ষোভ-বিদ্রোহের ভেতর দিয়ে জাতি একটা উজ্জ্বল সম্ভাবনার পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা অন্তত তার কষ্টিপাথরে নিজের জীবনকে কষে দেখবার যে সুযোগ দিয়েছিল তাতে শুধু জীবন-জিজ্ঞাসা নয়, বহু জীবনের বহুতর সমস্যার দিকও আমাদের সামনে ধরা পড়েছে। বঙ্কিম তাই নিয়ে হিন্দুধর্মকে নতুনভাবে দেখবার চেষ্টা করেন। জাতির শৌর্য-বীর্যের মহিমাকে তুলে ধ'রে তাকে আরও উদ্দীপিত করার চেষ্টা করেন। ইংরেজের দুর্বল অনুকরণকে তিনি ঘৃণার চোখে দেখতেন। 'লোকরহস্য' গ্রন্থে এ নিয়ে তিনি অনুকরণপ্রিয় দুর্বল বাঙালীকে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করেছেন। তিনি বাঙালীকে তার হৃতগৌরব সম্বন্ধে সচেতন করে তোলার চেষ্টা করেছেন। যা পুরানো তাকে অনেক সময় বোঝবার ভুলেই হয়ত মন্দ বলে মনে হয়, কিন্তু সত্যিই হয়ত তা মন্দ নয়—এ তিনি নানা যুক্তির দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন। জাতির ঐতিহ্যের প্রতি এই শ্রদ্ধা, এই দেশপ্রেমের উদ্বোধন, এই বলিষ্ঠ জাতীয়তাবোধ সমগ্রভাবে জাতির জীবনগঠনে অনেকখানি সাহায্য করেছে। দেশের দরিদ্র মধ্যবিত্ত ও চাষীদের সম্বন্ধেও তাঁর সহানুভূতিশীল দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু দূর থেকে দেখার ফলে তাদের দরিদ্র জীবনের ছবিটি ততটা ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। বিশেষত নিষ্কাম হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্য-গৌরব তাঁকে হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনাতেই যতটা অভিভূত করেছিল, বাঙালীর মাতৃভূমি প্রতিষ্ঠার কল্পনাতে ততটা করেনি। তবুও একথা অস্বীকার করলে চলবেন না যে, বঙ্কিম যে দ্বিধা-সংশয়ের মাঝে সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং হিন্দু জাতীয়তাবোধ তাঁকে যে হিন্দুত্বের আদর্শানুরাগী করেছিল তার ওপরও তাঁর মানসলোক এবং জীবনবোধ একটা সংহতিকে চেয়েছিল। তাঁর যেন বারবার একথাই মনে হচ্ছিল যে, বিপ্লবের সময় এখনই নয়। অথচ তখন তিনি আনন্দমঠের বিপ্লবী সঙ্ঘ দেখতে পাচ্ছেন

—দেবীচৌধুরাণীর শক্তিশালী ব্যক্তিত্বকে দেখতে পাচ্ছেন। এসব দেখেও এবং সংগ্রামের প্রত্যক্ষ দিককে বুঝতে পেরেও তিনি তার বিরোধিতা করেছেন। সমাজক্ষেত্রে যেমন তিনি স্ত্রীশিক্ষা, বিধবা-বিবাহ, বহুবিবাহরোধ প্রভৃতি সংস্কারের বিরোধিতা করেছেন—রাজনীতিক্ষেত্রেও কিছু কিছু করেছেন। তিনি ভাবছেন সময় এলে সত্যই জয়ী হবে। ইতিহাস তাঁকে বলছে, যে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, সেই পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে যা সাময়িক যা অন্যায়, অসত্য তার বিলোপ ঘটবে। কিন্তু এর বিলুপ্তি ঘটাতে মানুষের যে কর্মশক্তির প্রয়োজন, যে চেষ্টার প্রয়োজন, কর্মযোগী বঙ্কিম তাকে গীতার মাধ্যমে দেখছেন। তিনি বলেন, নিষ্কাম প্রচেষ্টাতেই জীবনের সার্থক মুক্তি।

ঝিমিয়ে-পড়া আত্মবিস্মৃত বাঙালীকে আত্মসচেতন করে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু সে সচেতনতার জন্য জাতির যে শিক্ষা-দীক্ষার দরকার, তার অত্যন্ত অভাব ছিল। তার সামনে যে ইতিহাস রয়েছে তাও বিকৃত। জাতীয় ইতিহাসকে গৌরবান্বিত করতে গিয়ে (বিশেষ করে হিন্দুর ইতিহাস) ইতিহাসের স্বল্প মালমসলা নিয়ে তিনি রোমান্টিক উপন্যাস গড়ে তুললেন। দেশ ও জাতিকে সচেতন করতে গিয়ে তাঁর হিন্দুসুলভ দৃষ্টিভঙ্গী অপরাপর ধর্মের প্রতি কটাক্ষও হেনেছে। জাতীয়তা যে ধর্ম, ভাষা প্রভৃতির বাধাকে পেরিয়ে গিয়ে এক লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে বঙ্কিম সে জাতীয়তাবোধকে গ্রহণ করেননি। অন্যদিকে সম্ভবত ইংরেজের ওপর ক্ষোভ মেটাতে গিয়ে তিনি সবেমাত্র পরাজিত অভিমানী ক্লান্ত মুসলমান সমাজের প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন। তবে বঙ্কিমের যুগে স্বাজাত্যবোধে উদ্বুদ্ধ ও পরাধীনতার গ্লানিতে ব্যথিত হয়ে এবং ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের নির্মম দিক সম্বন্ধে সচেতন থেকেও যে অস্পষ্ট ও মৃদু প্রতিবাদ ঘোষণা—এবং দেশী ও বিদেশী দৃষ্টিভঙ্গীর দোটানায় যে স্ববিরোধিতা—শুধু যে সম্ভব না, তা নয়, স্বাভাবিকও বটে। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখতে পাবো—যে ভাবে ও যে পরিবেশের ভিতর দিয়ে আমরা এগিয়ে আসছিলাম, তার পরিবর্তনের ক্রম ব্যাহত হয়েছে ইংরেজ আবির্ভাবে। এই যে একটা সময়, যখন হিন্দুমুসলমান উভয় জাতি এক হয়ে মিলে দাঁড়াতে পারতো তাও নষ্ট হ'ল ইংরেজের ভেদনীতিতে। ইংরেজরা সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি সম্বন্ধে যে ভাবে বলছে আমরা সে ভাবেই গ্রহণ করছি। আবার যখন তার বিকৃতি সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে উঠছি তখন তার

প্রতিবাদ করতে সাহস হচ্ছেনা। কারণ যে প্রতিবাদ সম্মিলিত দেশবাসীর পক্ষ থেকে আসতে পারে, তাদের সেই সম্মিলিত শক্তির প্রকাশ এযুগে ততটা ঘটেনি।

বঙ্কিম সমগ্রভাবে দেশ ও জাতির দুর্বলতা কোথায় তা বুঝতে পেরে ছিলেন। তাহলে প্রশ্ন উঠবে, তাঁর প্রকাশভঙ্গীতে বৈপরীত্য কেন? তার উত্তর আগেই দিয়েছি। তবে কি বঙ্কিম প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন? এ প্রশ্ন অবান্তর। সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমের দানের ভিতর দিয়েই দেখতে পাই তিনি জাতিকে পেছনে টানেননি। বরং তাঁর উপন্যাস, প্রবন্ধ, রস রচনা, সমালোচনা সাহিত্য প্রভৃতির ভিতর দিয়ে নতুন ভাষা, নতুন আদর্শ, ব্যক্তি-জীবনের নানা সমস্যা, সামাজিক সমস্যা, রোমান্টিকতার অবতারণা, সবই পেয়েছি। এর সঙ্গে রয়েছে তাঁর নীতিবোধ। সাহিত্য ও সমাজক্ষেত্রে বঙ্কিম জাতির উপদেষ্টা ও শিক্ষক হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছেন। বঙ্কিমের শক্তি মানুষকে পেছনে টানেনি বরং সমস্যাপ্রধান জীবনের প্রশ্নের উত্তর এবং তার চল্‌বার পথের সন্ধান দেবার তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। হয়ত অনেক সময় রোমান্টিকতার আতিশয্যে মানুষগুলিও বাস্তব সীমা অতিক্রম করে গিয়েছে। সমালোচনায় অথবা গম্ভীর বিষয়পূর্ণ প্রবন্ধে মাঝে মাঝে তার সংস্কারবাদীমনের প্রকাশ ঘটেছে কিন্তু এ সত্ত্বেও বঙ্কিমের পরিচয় এখানেই শেষ হয় নাই। বঙ্কিম জাতিকে দিয়েছিলেন স্বদেশমন্ত্র, উপন্যাসের পথ খুলে দিয়ে তিনি জীবনের চলচ্ছবি দেখবার সুযোগ এনে দিলেন বাঙালীকে। এতদিন ধরে জীবনের যে রোমান্টিক দিক সংস্কার চাপা পড়েছিল তাকে তিনি উদ্ধার করলেন, আবিষ্কার করলেন। জাতীয় আন্দোলনের যে ধারা বয়ে চলেছিল—তিনি তার বিশেষ কোনো প্রতিরোধ সৃষ্টি করেননি। তার ধারাকে তিনি নিরীক্ষণ করেছেন। যদি তাঁর রচনা জাতীয়-মনোভাবের প্রতিকূলই হ'ত তাহলে তাঁর উপন্যাস এবং অন্যান্য রচনা আজও বেঁচে থাকতে পারতো না। তিনি চেয়েছিলেন বাঙালীর জাতীয়তাবোধ ও সমাজ-চেতনাকে জাগাতে। বাঙালীর অনৈক্যে তিনি ব্যথিত। কিন্তু তিনি দেশাত্ম-বোধে সচেতন হয়েও ইংরেজ-শক্তি সম্বন্ধে আরও সচেতন। দেশ এবং তার সমাজের একটা পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা তিনি পোষণ করেন কিন্তু প্রকাশে তাঁর অস্পষ্টতা থেকে গেছে। তবে একথা ঠিক, সে যুগে জাতির জন্য

এতখানি চিন্তা, দেশের উন্নতিকল্পে এতটা বলা, বিজিত বাঙালীর বিক্ষুব্ধ মনের এতটা প্রকাশ খুব কম লেখকের মধ্যে পাওয়া যায়। বঙ্কিম জাতির সামনের দিকে এগিয়ে যাবার পথ তৈয়েরী করে দিয়েছিলেন। জাতিকে আত্মসচেতন করে তোলবার জন্য, দেশ ও কাল সম্বন্ধে সচেতন করে তোলবার জন্য যতখানি সে যুগের পক্ষে সম্ভব ও স্বাভাবিক ততখানিই তিনি বলেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টি

পূর্বেই বলেছি, শিক্ষিত বাঙালীর স্বাজাত্য ও জাতীয়তাবোধ তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গীতে একটা পরিবর্তন আনে। লেখাপড়া শিখে রাজপুরুষের কাছে অনুরূপ মর্যাদা না পেয়ে বাঙালীর ভুল ভাঙ্‌তে শুরু করে এবং এই আঘাতে তার সাহিত্যও নতুন রূপ পেতে থাকে। সমাজ জীবনে যথোপযুক্ত মর্যাদা না পাওয়ায় একটা বিক্ষোভও দেখা দিয়েছিল। তাই ইংরেজ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েও শিক্ষিত বাঙালী ধীরে ধীরে আত্মসচেতন হয়ে ওঠে। নিজের হারানো-স্বাধীনতার বেদনা ক্রমশই তার সাহিত্যে প্রকাশ পেতে থাকে। বিদেশীর কাছে সাধারণ দরিদ্র মানুষের যে নিগ্রহ তা বঙ্কিমের চেয়ে দীনবন্ধুর রচনায় আরও স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম ইংরেজিতেই উপন্যাস রচনা শুরু করেন। প্রথম উপন্যাসটির নাম Rajmohan's Wife (রাজমোহনের স্ত্রী) (১৮৬৪)। ইংরেজি উপন্যাসের রোমান্টিকতা তাঁর উপন্যাসেও লক্ষিত হয়। তিনি বিষয়বস্তু সংগ্রহ করেছেন আমাদের ইতিহাস থেকে, আমাদের পারিবারিক জীবন থেকে। এই জন্য রোমান্টিসিজম্ তাঁর উপন্যাসে দেশীয় রূপ পরিগ্রহ করেছে। তাঁর উপন্যাসে একদিকে ইতিহাসের গৌরবময় দিক, হিন্দুশাস্ত্রের নিষ্কাম ও আধ্যাত্মিক দিক, দেশপ্রীতির দিক প্রকাশ পেয়েছে, অন্য দিকে পারিবারিক জীবনের দ্বন্দ্ব-বিরোধ, নীতিবোধের দিকও রয়েছে। বঙ্কিমের এই আইডিয়া-গুলি মুখ্য হয়ে ওঠায় উপন্যাসের কাহিনী বর্ণনায় মানুষ ও অন্যান্য বিষয় অনেকসময় গৌণ হ'য়ে গেছে। উপন্যাসে রোমান্টিকতার আতিশয্য অনেক-ক্ষেত্রে সহজ বাস্তবতাকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেতে দেয়নি।

উপন্যাসের চরিত্রগুলি বাঙালী না হয়ে জীবন্ত আইডিয়া রূপে প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে এক পত্রে লিখেছিলেন

যে তিনি "চন্দ্রশেখর প্রতাপ প্রভৃতি কতকগুলি বড় বড় মানুষ এঁকেছেন (অর্থাৎ তাঁরা সকল দেশীয় সকল জাতীয় লোকই হ'তে পারতেন, তাঁদের মধ্যে জাতি ও দেশ কালের বিশেষ চিহ্ন নেই), কিন্তু বাঙালী আঁকতে পারেননি।" আবার প্রাচীন ইতিহাসের মানুষ নিয়ে তাঁকে যে গল্প লিখতে হয়েছে তাতেও তিনি বাস্তববিমুখী রোমান্টিক মানুষই সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কথায় 'যেখানে পুরাতন বাঙালীর কথা বল্‌তে গিয়েছেন, সেখানে তাঁকে অনেক বানাতে হয়েছে।'

ইংরেজিতে 'রাজমোহন্‌স্ ওয়াইফ্' রচনার পর বঙ্কিমের প্রথম বাঙ্‌লা উপন্যাস হচ্ছে দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫)। ইতিহাসের পটভূমিকায় উপন্যাসে মধ্যযুগীয় দ্বন্দ্ব, শৌর্য, বীর্য, শিভাল্‌রি, প্রতিহিংসা, প্রেম সবই আছে। প্রথম রচনা হিসাবে এই উপন্যাসখানি সার্থক। উপন্যাসের পরিবেশটি হচ্ছে মোগল-পাঠান-রাজপুত-বাঙালী পরিবেশ এবং তার মধ্যে ঐতিহাসিকতার সঙ্গে রোমান্টিকতার ঘন-সংযোগ ঘটেছে। ওসমান চরিত্রের মধ্যে মধ্যযুগীয় বীরাদর্শ লক্ষিত হয়। এই উপন্যাস থেকে দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের ঐশ্বর্য নিয়ে গদ্যরীতিতে গল্প বলার প্রচলন হ'ল। 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের সঙ্গে স্কটের 'আইভান হো' এবং ভূদেবের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' গল্পের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'কপালকুণ্ডলা' রচিত হয়। ক্ষীণ ইতিহাস জুড়ে দিয়ে বঙ্কিম এই উপন্যাসখানিকে কাব্যময় করে তুলেছেন। তৎকালীন সমাজের কুলীন ঘরের বিবাহিতা নারীর সার্থক ও সজীব চরিত্র বঙ্কিম এই উপন্যাসে অঙ্কন করেছেন। শ্যামা এ ধরণের চরিত্রের সার্থক দৃষ্টান্ত। কিন্তু উপন্যাসের মুখ্য বক্তব্য অরণ্যদুহিতা, কাপালিক-প্রতিপালিতা কপালকুণ্ডলাকে নিয়ে। নির্জন অরণ্যবাসিনী, সংসার-অনভিজ্ঞা নারীর জীবনে মানব সমাজ কতখানি প্রভাব বিস্তার করতে পারে তাই নিয়ে আলোচনা করেছেন। মতিবিবি চরিত্রটি ঈর্ষা দ্বন্দ্ব ও ব্যর্থতা নিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কালিদাসের শকুন্তলা, সেক্‌স্‌পীয়রের মিরাণ্ডার সঙ্গে কপালকুণ্ডলার সম্পূর্ণ না হলেও কিছুটা সাদৃশ্য আছে। শিল্পচাতুর্যের দিক থেকে 'কপালকুণ্ডলা' অনবদ্য। উপন্যাসখানিতে গ্রীক ট্রাজেডির প্রভাব আছে। নিয়তির অদৃশ্য লিখন অনিবার্য ট্রাজেডির দিকে উপন্যাসের কাহিনীকে টেনে নিয়ে গেছে।

মৃণালিনী (১৮৬৯) উপন্যাসও ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত হয়েছে। অবশ্যি শেষ-পর্যন্ত ইতিহাস গৌণ হ'য়ে গিয়ে এখানেও সেই প্রাচীন যুগের রোমান্টিক রূপালেখ্যই প্রকাশ পেয়েছে।

বঙ্কিম সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হল ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে। এই বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস, প্রবন্ধ, সাহিত্য সমালোচনা, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতির পরিবেশন শুরু করেন। বাঙ্‌লা সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। বঙ্কিমের পর তাঁর অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, নবপর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ এবং বর্তমান পর্যায়ে কবি মোহিতলাল বঙ্গদর্শনের সম্পাদনা করেছিলেন। এই বঙ্গদর্শনেই বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ' রচনা শুরু হয়। ইতিহাসের পরিবেশ ছেড়ে বঙ্কিম এলেন সমাজ জীবনে—পারিবারিক ক্ষেত্রে। মানুষের জীবনের সহজাত সংস্কারের বাইরে কি করে মানুষ নিজেই জীবনে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি করে, বিবাহিত জীবনের প্রেম ছাড়া দুর্বল, বিকৃত প্রেমের পরিণতি কি ভীষণ বিষময় হ'তে পারে—নগেন্দ্র, সূর্যমুখী, কুন্দ, হীরা, দেবেন্দ্র প্রভৃতির চরিত্র সৃষ্টি করে তা দেখালেন এই বিষবৃক্ষ উপন্যাসে। উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। তখনকার দিনে বিধবা-বিবাহের যে আন্দোলন চলছিল তার দুর্বল দিকটা দেখানোও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। কি করে এবং কেন বিধবা নারী বিবাহিত জীবনে সুখী হ'তে পারে না তার দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা এই উপন্যাসে কুন্দকে পেয়েছি। অপরদিকে অশিক্ষিত নিম্ন-শ্রেণীর বিধবা নারীর জীবনে নীতিবোধের অভাব কি বিপর্যয় ঘটাতে পারে তার পরিচয় আমরা হীরা চরিত্রে পেয়েছি এবং শান্তির সংসার কি করে জীবনে অবৈধ তৃষ্ণার অতিচার গতিতে ভেঙে যায় তারও আভাস এই উপন্যাসে রয়েছে। বিষবৃক্ষ উপন্যাসে নগেন্দ্র, সূর্যমুখী, কুন্দের চাইতে হীরা-দেবেন্দ্রই বেশী জীবন্ত হয়ে উঠেছে। নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর পরিণামে মিলন ঘটলেও কুন্দের শোচনীয় মৃত্যুতে 'বিষবৃক্ষ' ট্রাজেডিতে পরিণত হয়েছে। বহুবিবাহের বিরুদ্ধে বঙ্কিমের দৃঢ় প্রতিবাদ শোনা না গেলেও তিনি উপন্যাসে পরোক্ষভাবে বহু-পত্নীত্বের বিপক্ষে ছিলেন বলেই মনে হয়।

'ইন্দিরা' প্রথমে বড় গল্প হিসাবে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। প্রায় পঞ্চম সংস্করণে (১৮৯৩) এসে এটি উপন্যাস আকারে বর্দ্ধিত হয়। একটি নারীর হারানো স্বামীকে খুঁজে বের করার কাহিনী নিয়ে এই উপন্যাস রচিত

হয়েছে, এবং ইন্দিরাই সমস্ত কাহিনী বলে যাচ্ছে। উপন্যাস হিসাবে ততটা সার্থক না হলেও গল্পের রসবস্তুর তেমন অভাব ঘটেনি।

'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪) জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল একটি বড়ো গল্প। এই গল্পে পুরানো যুগের রোমান্টিক পরিবেশকে তিনি টেনে এনেছেন। এক টুকরো ছেঁড়া চিঠি ও দুটো আংটিকে কেন্দ্র ক'রে দুটি নরনারীজীবন একটি রহস্যঘন পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এতে রহস্যময়তা আছে বটে কিন্তু মানবজীবন-দ্বন্দ্বের বিশেষ কোনো পরিচয় নেই।

বঙ্কিমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'চন্দ্রশেখর' প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে। এখানে তিনি প্রণয়ের দ্বন্দ্ব এবং পাপের বীভৎস পরিণামের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। অভিশপ্ত বাল্যপ্রেম যে সামাজিক সংস্কারের দিক থেকে বিবাহোত্তর জীবনে কিরকম অবৈধ রূপ লাভ করতে পারে তাও বলেছেন। পলাশীর যুদ্ধের কিছু পরে মীর কাশেমের আমলের পরিবেশে উপন্যাসখানি রচিত হয়েছে। এই উপন্যাসে সামন্ততান্ত্রিক যুগের আবহাওয়ায় গ্রামজীবন ও জমিদারজীবন, অপর দিকে ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভক্ষণের এক অরক্ষিত মুহূর্ত—তার ভেতর ব্যক্তিজীবনের যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং তার যে অকল্যাণময় পরিণাম প্রভৃতি রয়েছে, তার আলোচনা করলে দেখি, ঔপন্যাসিক বঙ্কিম এখানে যুগপৎ নীতিবিদ্ ও শিল্পী বঙ্কিম হয়ে উঠেছেন। এই উপন্যাসে পরাধীনতার বেদনাবোধের অস্পষ্ট ইঙ্গিত থাকলেও নিয়তি ও নীতিতত্ত্বের ভারে তা নিতান্তই গৌণ হয়ে গেছে।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে ইংরেজ আগমনের পর বাঙালী তাদের কি চোখে দেখেছিল এবং সেই সঙ্গে বঙ্কিমের নিজেরও কি মনোভাব ছিল তার একটা পরিচয় পেয়েছি। চন্দ্রশেখর দরিদ্র ব্রাহ্মণ কিন্তু মর্যাদাবোধ তার খুব বেশী। অথচ সংসার ও দাম্পত্য জীবনে সে একেবারে ব্যর্থ। শৈবলিনীর পাপের যে প্রায়শ্চিত্ত বঙ্কিম দেখিয়েছেন তাতে রোমান্টিক্ পরিবেশের মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। গল্পের দিক থেকে মীরকাশেম-দলনী প্রসঙ্গ একটু অসঙ্গত এবং গৌণও বটে। এখানে বঙ্কিমের জ্যোতিষতত্ত্বের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়। উপন্যাসখানি শুভপরিণামাত্মক হলেও ট্রাজেডিই তার প্রধান সুর। এ ট্রাজেডি প্রধানত প্রতাপ-শৈবলিনীকে কেন্দ্র করে। এই সঙ্গে মীরকাশেমদলনী এবং পরোক্ষভাবে দাম্পত্যজীবনে ব্যর্থ চন্দ্রশেখরেও এই ট্রাজেডি লক্ষিত হয়।

'রজনী' উপন্যাসখানির (১৮৭৭) শিল্পকৌশল একটু অন্য ধরণের। এও সামাজিক পটভূমিকায় রচিত। তবে অন্ধ নারীর জীবনে কি করে প্রেম সার্থক রূপ লাভ করতে পারে তার একটি সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছেন। বঙ্কিম সাধারণত বিবাহিত জীবনের প্রেমের দ্বন্দ্বই দেখিয়েছেন। কিন্তু দুর্গেশ-নন্দিনীর আয়েষা ও রজনীতে কিছুটা ব্যতিক্রম আছে। হয়ত একজন মুসলমান রমণী এবং আর একজন অন্ধ ও অসহায় বলেই প্রাক্-বিবাহ প্রেম বর্ণনায় বঙ্কিমের আপত্তি ছিল না। এই উপন্যাসটি রচনায় বঙ্কিম Collins-এর The Woman in White এবং Lytton-এর The Last Days of Pompeii-র Nydia চরিত্রের কাছে ঋণী। উপন্যাসটির নায়ক নায়িকারাই উপন্যাসের কাহিনীটি বলে গেছেন। বঙ্কিমের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতির গভীর জ্ঞানের পরিচয় এই উপন্যাসখানিতে পাই। লবঙ্গলতা এই উপন্যাসের হাল ধরে রয়েছে। রজনী-জীবনের যে প্রেম তার অন্ধতা সত্ত্বেও ঘটনা পরম্পরায় ও দ্বন্দ্ব সংঘাতের ভিতর দিয়ে সার্থক পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে পারত, সেখানে শচীন্দ্রনাথকে মাদুলী ধারণ করিয়ে দিয়ে রজনীর প্রতি আকৃষ্ট করায় এবং রজনীকে সাধুর অলৌকিক চিকিৎসায় দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়ায় উপন্যাসের মূল উদ্দেশ্য কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে হয়।

'রাধারাণী' (বঙ্গদর্শন—১৮৭৫ খ্রীঃ) একখানি ছোট রোমান্‌টিক্ উপন্যাস। তাকে বড়ো রোমান্‌টিক্ গল্প বলাই যুক্তিযুক্ত।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রকাশিত হয় ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। সেযুগের বাঙালীদের মধ্যে উপন্যাসখানি বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। এটিও সামাজিক উপন্যাস। একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের বিষাদান্ত ঘটনাবস্তু গড়ে উঠেছে। এখানেও বিধবা নারীজীবনের সমস্যা আছে। বঙ্কিম এই উপন্যাসে সতী স্ত্রী, দ্বিধাজড়িত পুরুষ, নিয়তি, রূপ-মোহ ও সে মোহের অকল্যাণকর পরিণাম সবই দেখিয়েছেন। এখানেও ঔপন্যাসিক বঙ্কিম নীতিবিদ্ হয়ে উঠেছেন। রোহিণীর জীবন ব্যর্থ হ'ল। তার জীবনের পাপের জন্য সে যতটা দায়ী ততটা বা তার বেশী দায়ী তখনকার সমাজ। কিন্তু বঙ্কিম গোড়া থেকেই বিধবা রোহিণীর ক্লেদাক্ত মনের পরিচয় দিয়ে গেছেন। গোবিন্দলাল জীবনে ব্যর্থকাম বা frustrated পুরুষ; নিজের দুর্বলতাকে সে আর কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তাই শেষ পর্যন্ত

গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করে সংসারজীবনের সংগ্রামশীলতাকে এড়িয়ে গেল। রোহিণী চরিত্র অঙ্কনে মাঝে মাঝে বঙ্কিমের সহানুভূতিশীল মনের পরিচয়ও পেয়েছি। আবার পরক্ষণেই নীতির কঠোর শাসন রোহিণীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী করেছে। গোবিন্দলালের রূপতৃষ্ণা মেটার পর বিতৃষ্ণায় মন তার ভরে গেছে। এযে ভালোবাসা নয় তা সে বুঝেছে। কিন্তু ফিরে আসার আর উপায় নেই—তাই রোহিণীকে মরতে হল। কিন্তু তারপরও বঙ্কিম গোবিন্দলালকে আর ঘরে ফিরিয়ে আনতে পারলেন না। বঙ্কিমের যুগের সমাজও ততটা বরদাস্ত করতনা। ভ্রমর একান্তভাবে বাঙালী ঘরের বধূ, স্বামীর প্রতি তার অগাধ বিশ্বাস ও ভালোবাসা। কিন্তু অবিশ্বাস যখন এলো তখন তার মনোভাব সম্পূর্ণ বাঙালী মনোভাব নয়। অভিমান তাকে তিলে তিলে নিঃশেষিত করল। দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়ে গোবিন্দলাল নিরন্তর সংগ্রাম করেছে—কিন্তু জয়ী হতে পারেনি। এই চরিত্রটিতে ব্যক্তি প্রাধান্য লাভ করেছে। কৃষ্ণকান্তের উইল পরিণামে ট্রাজেডি। ভ্রমর, গোবিন্দলাল ও রোহিণী তিনটি চরিত্রই ব্যর্থ হয়ে গেল। ভ্রমর ও রোহিণী মৃত্যুর ভিতর দিয়ে জীবনে শোচনীয় ব্যর্থতার অবসান ঘটাতে পেরেছে, কিন্তু গোবিন্দলাল বেঁচে থেকে প্রতিদিন দগ্ধ হয়েছে। সেদিক থেকে বিচার করলে গোবিন্দলালই উপন্যাসের সর্বাপেক্ষা ট্রাজিক চরিত্র।

'রাজসিংহ' (১৮৮২) ঐতিহাসিক উপন্যাস হলেও সর্বত্র ইতিহাস অক্ষুণ্ণ থাকতে পারেনি। রাজসিংহ উপন্যাসে বঙ্কিম আবার পুরানো ইতিহাসে ফিরে গেলেন। এই ইতিহাসপ্রিয়তার একটি কারণও ছিল। তিনি জানতেন বাঙালী জাতিকে ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত করাতে হবে। ইতিহাস নইলে তার কোনো পরিচয়ই থাকবে না। ভারতের পুরানো দিনের গৌরব ও তার বীর্যবত্তার সঙ্গে পরিচয় না ঘটালে বর্তমান দিনের মানুষ কি করে পথ চলবে? তাই প্রয়োজন তার ইতিহাসের। রাজপুত শৌর্য-বীর্য নিয়ে রচিত রাজসিংহ উপন্যাসখানি বঙ্কিমের মতে যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস, যদিও আমাদের মতে ইতিহাসের মর্যাদা কিছুটা খর্ব হয়েছে। ভারতের ইতিহাসে একদিকে আলমগীর, অপর দিকে রাজসিংহ। মনে হয়, তাঁর আদর্শের দিক থেকে আলমগীর গৌণ। একটা দেশাত্মবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হ'য়ে এবং জাতীয় গৌরব গাথার অবতারণা ঘটিয়ে বঙ্কিম জাতিকে ইতিহাস-সচেতন করতে চেয়েছিলেন।

'আনন্দমঠ' উপন্যাসে (১৮৮২) আমরা বঙ্কিমের দেশপ্রেম ও নিষ্কাম দেশ-সেবার আদর্শ, ধর্মবোধ প্রভৃতির পরিচয় পাই। এখানে উপন্যাসের কাহিনী কিছুটা সত্য হলেও গৌণ,—মুখ্য হল তাঁর আদর্শ—তাঁর পরিকল্পিত সংগঠন বা সংঘ মারফত স্বাধীনতার সংগ্রাম চালানো। এখানে তিনি সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিকায় উপন্যাস রচনা করেছেন। ওই সময়ে বাঙ্‌লা দেশে যে ভীষণ দুভিক্ষ দেখা দিয়েছিল সেই দেশময় দুভিক্ষের অরাজক রূপও বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠে দেখিয়েছেন।

কিন্তু কি করে যে এসব ঘটছে তার যুক্তি বা কারণপরম্পরা দেখাননি, আনন্দমঠের মানুষগুলো তাই মানুষ নয়—কেবল আদর্শ। শান্তি চরিত্র ছাড়া আর কোথাও মাটির মানুষ পাওয়া যায় না। অথচ আনন্দমঠ এমন একটি পটভূমিকায় রচনা যেখানে সত্যিকার দরিদ্র, লাঞ্ছিত. দুভিক্ষপীড়িত মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়। মহেন্দ্র-কল্যাণীর জীবনে এই দুভিক্ষপীড়িত মধ্যবিত্ত বাঙালীর কিছুটা আভাস আছে। আনন্দমঠের সন্ন্যাসীরা সরকারের ধনসম্পদ লুঠ করে আর গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়। কিন্তু সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় তারা লড়াই করেও হেরে যায় উন্নততর শক্তির কাছে। এই উপন্যাসখানি আমাদের জাতীয় আন্দোলনের গোড়ায় যথেষ্ট উৎসাহ ও উদ্দীপনা এনে দিয়েছিল। যাঁরাই তখন ইংরেজের বিরুদ্ধে বিপ্লবাত্মক কিছু করতে গেছেন তাঁদের কাছেই এই উপন্যাসখানি আদর্শস্বরূপ ছিল। মনে হয়, বিশেষ ভাবে হিন্দু বাঙালীদেরই আদর্শস্বরূপ ছিল। কারণ এখানে ইংরেজ শত্রু হলেও বঙ্কিম মুসলমানকেই দেশের শত্রু বলে দেখিয়েছেন, এবং স্পষ্টভাবে সন্ন্যাসীদের দিয়ে ইংরেজদের প্রতি মিত্রভাবও প্রকাশ করেছেন। মুসলমান রাজ-শক্তির পরাজয়ে যেন এ সন্তানদের কাজও ফুরালো। এই মনোভাব 'দেবী চৌধুরাণীতেও' (১৮৮৪) দেখা যায়। ভবানীপাঠক যখন দেখল যে ইংরেজ এসেছে—তখন তার মতে রাজশক্তি প্রজাপুঞ্জের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করেছে, এরা মুসলমানদের মতো আর অরাজকতা বিশৃঙ্খল আনবে না, তখন সে দস্যুবৃত্তি ছেড়ে ধরা দিয়ে হাসিমুখে দ্বীপান্তরে চলে গেল। 'দেবীচৌধুরাণী' প্রফুল্ল হয়ে ব্রজেশ্বরের সংসারে আবার প্রবেশ করল। এবং আরও দুই সপত্নী নিয়ে দিন যাপন করতে লাগল। এখানেও বঙ্কিমের দেশপ্রেম নিষ্কাম ধর্মের আচ্ছাদনে ভারাক্রান্ত হয়েছে। প্রত্যক্ষ শত্রুকে শত্রু বলে তিনি ধরিয়ে

দিচ্ছেন না। 'দেবী' চরিত্রকে প্রথম যখন প্রফুল্ল হিসাবে পাই তখন সে স্বাভাবিক দরিদ্র ঘরের মেয়ে। এই দারিদ্র্য তাকে স্পষ্টবাদিনী করে তুলেছিল। কিন্তু যখন সে নিষ্কামব্রত গ্রহণ করে দেবীচৌধুরাণী হ'ল তখন তার স্বাভাবিকতাও অস্পষ্ট হ'য়ে গেল। 'দেবী'র আড়ালে প্রফুল্ল যেন দেখা দিতে চায় কিন্তু ধর্মাদর্শ তাকে বাধা দেয়। এই দিকটা ছাড়া যেখানে বঙ্কিম পারিবারিক চিত্র এঁকেছেন সেখানেই তার স্বাভাবিক চিত্রাঙ্কনের প্রয়াস পেয়েছেন।

'সীতারাম' উপন্যাসে (১৮৮৭) আমরা কয়েকটি মানুষের পরিচয় পাই। এই উপন্যাসটি ঐতিহাসিক পটভূমিকায় রচিত। কিন্তু এখানেও ইতিহাস গৌণভাবে এসেছে। এখানে স্বাজাত্যবোধ, দেশপ্রেম প্রভৃতি সবই আছে। কিন্তু মানুষের স্খলন পতন কি করে দেশময় অরাজকতা বহন করে আনে তাও যেমন দেখিয়েছেন, তেমনই নীতির কঠোর শাসনকেও তিনি এড়িয়ে যাননি।

সীতারামচরিত্র আলোচনা করলে দেখতে পাই যে, প্রবৃত্তির অন্ধবেগে সে ছুটে চলেছে জীবনের ট্রাজেডির দিকে। একদিকে তার নিজের দেশ ও দেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করার বিরাট দায়িত্ব, অন্যদিকে তার চিত্তবৃত্তির দ্বন্দ্ব এবং কামনা বাসনা কণ্টকিত তৃষ্ণার্ত মন—এ দু'য়ের মধ্যে শেষেরটাই তার জীবনের ট্রাজেডির প্রধান কারণ।

গোবিন্দলাল, অমরনাথ, সীতারাম এরা দোষেগুণে মানুষ। তারা জীবন-সংগ্রামে অদৃশ্য নিয়তির কাছে বারবার হার মানছে। বঙ্কিম তাঁর প্রায় রচনাতেই নিয়তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন। সীতারাম উপন্যাসেও দেখতে পাই, অদৃশ্য নিয়তির এবং ধর্মের বারবার জয়ঘোষণা করা হয়েছে, আর সেখানে মানুষ মেনে নিয়েছে পরাজয়। দেশদ্রোহীর শেষ পরিণাম কি দাঁড়ায় তার দৃষ্টান্ত পাচ্ছি গঙ্গারাম চরিত্রে। কিন্তু সে পরিণতিও একটি ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বারা নির্দিষ্ট। সীতারাম উপন্যাসে বঙ্কিমের আদর্শ আর যাই থাক, উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহ জ্যোতিষতত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণীর অমোঘ নির্দেশেই যেন বিষাদময় পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যোতিষতত্ত্ব ও ভবিষ্যদ্বাণীর উপর অগাধ বিশ্বাস ছিল।

উপন্যাসের ভিতর দিয়ে বঙ্কিম ভারতবর্ষের বিভিন্ন কালের মানুষের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। গল্পের মধ্যে তিনি তাঁর 'আইডিয়া' বা ভাবাদর্শকে এমনভাবে জুড়ে দিয়েছেন যে অনেক উপন্যাস ঘটনাবহুল হয়েও

'আইডিয়া'-মুখ্য হয়ে উঠেছে। অনেক সময় উপন্যাসে 'রোমান্‌সের' আতিশয্য বাস্তব সীমা অতিক্রম করে বহু দূরে চলে গেছে। কিন্তু সে যুগের সাহিত্যক্ষেত্রে যখন ভালো ফসল দেখা দেবার সম্ভাবনা মাত্র দেখা দিয়েছে তখন তিনি যে ভাবাদর্শের অবতারণা করেছিলেন, জাতির জীবনে যে প্রেরণা এনে দিয়েছিলেন, দেশের প্রাচীন ও বর্তমানের গৌরবকে তুলে ধরার যে গুরুভার দায়িত্ব নিয়েছিলেন, উপন্যাসের মাধ্যমে ব্যক্তি-জীবন ও সমাজ-জীবনের স্বরূপটি তুলে ধরে বাঙালীর প্রাণে যে সাড়া জাগিয়েছিলেন, তাতে স্রষ্টা ও পথদ্রষ্টা হিসাবে বাঙ্‌লা সাহিত্যে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অনতিক্রমণীয়। যে সময় একদিকে ব্রাহ্ম-আন্দোলন সমগ্র দেশ ও জাতিকে ঐক্যসূত্রে বাধার চেষ্টা করছিল, সে সময় বঙ্কিম ভারতের ঐতিহ্যগৌরব, প্রাচীন সংস্কৃতির মহিমময় দিক, শৌর্যবীর্যের দিক বাঙালীর সামনে তুলে ধরে তাকে স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত করছিলেন। এই স্বাদেশিকতার আহ্বানে আর যাই থাক না কেন, এটা ঠিক যে, সেকালের শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে তাঁর যুগান্তকারী সাহিত্য বিশেষ প্রেরণা এনে দিয়েছিল।

বঙ্গদর্শন ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রচার' নামে একখানি পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই 'প্রচারে' সীতারাম, ধর্মতত্ত্ব—অনুশীলন, কৃষ্ণচরিত্র প্রভৃতি প্রকাশিত হয়েছিল। উপন্যাস ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫), লোকরহস্য (১৮৭৪), মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত (১৮৮৪) প্রভৃতি রচনা করেন। এই ধরনের রচনাগুলিকে রস-রচনার পর্যায়ে ফেলা যায়। ভাব ও ভাষার সহজ ও সরল প্রকাশ এই রচনাগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কমলাকান্তের দপ্তর De Quiencyর 'Confessions of an Opium Eater' রচনার আদর্শে লেখা। বঙ্কিম তখন সাহিত্যে যে বিশুদ্ধ ও শুভ্র হাস্যরসের অবতারণা করেছিলেন পরের দিকে তার অনুসরণে কয়েকজন লেখকও লিখতে চেষ্টা করেছেন। বঙ্কিম তাঁর রস-রচনাগুলির মাধ্যমে জাতির দুর্বলতা, জীবনের কুশ্রিতা, দুর্বল অনুকরণপ্রিয়তা প্রভৃতি নিয়ে তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন। কিন্তু এই ব্যঙ্গের মধ্যে কোনো ব্যক্তিগত বিদ্বেষ নেই। জাতির ভুলত্রুটি দেখে তাকে শুধরে দিতে গিয়ে মাঝে মাঝে তাঁকে তিক্ত কথাও বলতে হয়েছে। অনেক সময় এই ভুলভ্রান্তি নিয়ে কটু বিদ্রূপও করেছেন। বাঙালীর দুর্বলতার জন্য যেমন তিনি তিরস্কার করেছেন, তেমনই তাকে তিনি সঠিক পথে চলার

নির্দেশও দিয়েছেন। কমলাকান্তের দপ্তরে আফিমখোর কমলাকান্তের আড়ালে থেকে বঙ্কিম সাম্য, দেশপ্রীতি প্রভৃতির আলোচনা করেছেন।

এছাড়া বিজ্ঞানবিষয়ে 'বিজ্ঞান রহস্য' (১৮৭৫) এবং প্রবন্ধসমষ্টি নিয়ে 'বিবিধ প্রবন্ধ'ও (১ম খণ্ড ১৮৮৭ সাল, ২য় খণ্ড ১৮৯২ খ্রীঃ) রচনা করেন। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলিকে সহজবোধ্য করে বলার চেষ্টায় তাঁর কৃতিত্ব আছে। বিবিধ প্রবন্ধে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। বাঙালীকে পাশ্চাত্ত্য মতবাদের সঙ্গে পরিচিত করতে এগুলো ছাড়া তাঁর 'সাম্য'ও (১৮৭৯) একখানি উল্লেখযোগ্য রচনা। পূর্বে 'সাম্য' নামে যে গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাতে 'সাম্য' ছাড়া 'বঙ্গদেশের কৃষক' রচনা অংশও জুড়ে দেওয়া হয়। কৃষকের দুঃখদুর্দশার দিক তাঁর অজানা ছিল না। কিন্তু তাঁর রচনায় এদের কথাও যেমন বলেছেন, তেমনই জমিদারদের কথাও সহানুভূতি নিয়ে বলেছেন। জমিদারদের চেয়ে তাদের কর্মচারীদের অত্যাচারই যে বেশী ছিল সেটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন। জমিদারী-প্রথার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বাঙ্‌লার কৃষক প্রতিনিধি পরাণমণ্ডলকে সমাজের কাছে স্মরণীয় করে রেখেছেন। এই দোটানা ভাব বঙ্কিমের যুগের পক্ষে নিতান্ত অস্বাভাবিক নয়। আলোচ্য যুগটাই স্ববিরোধিতার যুগ। এই স্ববিরোধিতা ছিল বলেই তার নানা গলি ঘুঁজি ঘুরে, নানা বাধা ঠেলে আমরা আজকের দিনে আসতে পেরেছি। তবুও কি আজও এই স্ববিরোধিতার শেষ হয়েছে?

পাশ্চাত্তের মিল, বেন্থাম, কোঁৎ (Comte) প্রভৃতি প'ড়ে যে সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণ এবং যে যুক্তিনিষ্ঠার দ্বারা বঙ্কিম প্রভাবিত হয়েছিলেন, নিজের দেশ ও সমাজ, প্রচলিত সমাজধারা এবং ধর্মবোধে সেই পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রচেষ্টার পরিণতি ধর্মতত্ত্ব—অনুশীলন (১৮৮৮), কৃষ্ণচরিত্র (১৮৮৬, বর্ধিত ২য় সং ১৮৯২) রচনা। তিনি যেমন ধর্মতত্ত্বকে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন তেমনই কৃষ্ণচরিত্রকেও একটি বাস্তব রূপ দেবার, তার অলৌকিক ও অবাস্তব অংশ বাদ দিয়ে তাঁকে আদর্শ ও সম্পূর্ণ মানবরূপে প্রতিষ্ঠিত করে তোলার চেষ্টা করেছেন। এমনি করে বহুকাল প্রচলিত একটি অবতার চরিত্রকে ঐতিহাসিক বুদ্ধি দিয়ে, যুক্তিনিষ্ঠা দিয়ে মানুষ করে দেখাবার দৃঢ় বাসনায় যেভাবে তিনি বহুপ্রচলিত কৃষ্ণ-কাহিনীগুলিকে নির্মমভাবে বাদ দিয়েছেন এবং এই চরিত্রকে যতখানি

Logical (যুক্তিনিষ্ঠ) এবং real (বাস্তব) করবার চেষ্টা করেছেন তাতে তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ প্রগতিশীল মনেরই পরিচয় পাই।

কি উপন্যাসে, কি সাহিত্যসমালোচনায়, কি তত্ত্বালোচনায় বঙ্কিম উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্‌লা সাহিত্যক্ষেত্রে 'একক ও অসঙ্গ' ছিলেন। জাতির প্রয়োজনে তাঁকে বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে অবিরাম লিখতে হয়েছে। যতটা আমাদের প্রয়োজন তার বেশী কিছুই তিনি বলতে যাননি। রচনার সর্বত্রই আমরা বঙ্কিমের অপূর্ব শিল্প-সংযমের পরিচয় পাই। ঔপনিবেশিক সমাজে দ্বিধাজড়িত ও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত দেশপ্রেমিক বাঙালী সাহিত্য সাধকের সার্থক পরিচয় আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে পেয়েছি।

বঙ্কিমের সমসাময়িক ও পরের রচয়িতাগণ

বাঙ্‌লা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস প্রভৃতির অবতারণা ঘটিয়ে সাহিত্যের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। তাঁর সময় থেকে এবং তাঁর পরেও দেশাত্মবোধ এবং পাশ্চাত্ত্য-আদর্শে উদ্বোধিত স্বাধীনতাবোধ শুধু উপন্যাসকে নয়, নাটক ও কাব্যকেও অনেকখানি প্রভাবিত করেছিল। বাঙ্‌লার শিক্ষিত ধনী ও মধ্য-বিত্ত সমাজ তখন নিজেদের পরাধীনতা সম্বন্ধে বেশ সচেতন হয়ে উঠেছেন। দরিদ্র জনসাধারণের অসন্তোষ তখনকার সংঘটিত বিদ্রোহগুলিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু জাতির যে পরাধীনতার বেদনা জেগে উঠেছিল এবং বিদেশী শাসকের শোষণের নিত্য-নতুন কৌশলের দ্বারা যেভাবে তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করা হচ্ছিল, তাতে দেশের শিক্ষিত সমাজও ধীরে ধীরে বিক্ষুব্ধ হ'য়ে ওঠে। এদিকে ঔপনিবেশিক শাসনকৌশল যে ভাবে দেশবাসীকে নিজের ইতিহাস ও সংস্কৃতি থেকে অন্ধকারে টেনে আনবার চেষ্টা করছিল তা থেকে জাতিকে বাঁচাবার জন্য, তাকে নিজের দেশ ও মানুষ, দেশের গৌরবময় ইতিহাস এবং সমাজের নানা সমস্যা ও সেই সমস্যার সমাধানের উপায় সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তোলার প্রয়োজন অনুভূত হয়। কাব্য, উপন্যাস, নাটকে রোমান্টিসিজমের বাহুল্য সত্ত্বেও একটা জাতীয়তাবোধের সূচনা দেখা দেয়। এই জাতীয়তাবোধ সাহিত্যের এক এক স্তরে এক এক ভাবে দেখা দিয়েছে। কোথাও ইতিহাসের পটভূমিকায়, কোথাও শাসকের অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ প্রজাসাধারণের প্রবল বিক্ষোভে, কোথাও ঐক্যবোধের প্রয়োজনীয়তায়

এই নব জাতীয়তাবোধ বিভিন্ন রূপে প্রকাশ ঘটেছে। দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ দাস প্রভৃতির কাব্য, নাটক, উপন্যাস রচনায় আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি। সাহিত্যকে শুধু বিশুদ্ধ রস পরিবেশনের জন্যেই নয়, জাতির কল্যাণে নিজের দেশ, যে সমাজ ও শাসক সম্বন্ধে সচেতন করে তোলার দায়িত্ব নিলেন লেখকরা, সাহিত্য তারও ভাব-প্রকাশের বাহন হ'ল। সবাই যে এই আদর্শে সাহিত্য সৃষ্টি করে সার্থক হয়েছেন তা নয়, তবে তাঁদের আগ্রহ ও প্রচেষ্টা, সহানুভূতি ও ভাবপ্রকাশের সযত্ন প্রয়াস সত্যই প্রশংসনীয়। সে যুগে ব'সে প্রতিদিনকার পরিবর্তন হয়ত অনেকের চোখে পড়েনি, হয়ত ঐতিহাসিক পরিবেশ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন তারা বুঝলেও যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। তবুও তাদের এই যে নিষ্ঠা, এই যে জাতীয়তা-বোধ, এই যে দেশ প্রেম, এই যে মানুষের লাঞ্ছনাকে লাঞ্ছনা বলে জানা—সে যুগের বিচারে প্রগতির পরিপন্থী নয়।

বঙ্কিমের সময় থেকে যাঁরা উপন্যাস রচনা করছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজনের রচনার উল্লেখ করছি। দুয়েকজন ছাড়া বেশীর ভাগ রচয়িতার মধ্যেই বঙ্কিমের প্রভাব স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়ে।

কালীকৃষ্ণ লাহিড়ীর 'রশিনারা' (১৮৬৯) উপন্যাস ভূদেবের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' গল্প অবলম্বনে এবং বঙ্কিমের রীতির অনুসরণে রচিত। এসময় থেকে ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার রেওয়াজ খুব চলেছিল। অবশ্যি সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ রোমান্টিক ও নানা সামাজিক সমস্যা নিয়েও বিভিন্ন উপন্যাস রচিত হ'তে থাকে।

প্রতাপচন্দ্র ঘোষের 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়' (১ম খণ্ড, ১৮৬৯, ২য় খণ্ড, ১৮৮৪) অনেকটা বঙ্কিম প্রভাবমুক্ত। কিন্তু উৎসাহ ও প্রেরণা নিশ্চয়ই বঙ্কিমের রচনা থেকেই পেয়েছেন। ইতিহাস অনুসৃত হ'লেও 'বঙ্গাধিপ-পরাজয়' উপন্যাস হিসাবে খুব সার্থক হয়নি। মীর মশারফ হোসেন 'রত্নবতী' (১৮৬৯) নামে একখানি উপন্যাস রচনা করেন। কিন্তু এ যুগের বঙ্কিম-প্রভাবমুক্ত ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বেশী উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৫-৯১)। শরৎচন্দ্রের পূর্বে বাঙ্‌লার গ্রাম্য সমাজের মধ্যবিত্ত সংসার, তার নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিয়ে সার্থক উপন্যাস রচয়িতাদের মধ্যে তারকনাথ গঙ্গো-

পাধ্যায়ের নাম সর্বাগ্রে করতে হয়। তিনি সাহিত্যের একান্ত রোমান্টিক পরিবেশ থেকে বাস্তব পরিবেশের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস হচ্ছে 'স্বর্ণলতা' (১২৮১, ১৮৭৪ খ্রীঃ)। এ ছাড়া 'হরিষে বিষাদ', 'অদৃষ্ট' প্রভৃতির আখ্যানবস্তু ও বাঙালী সমাজের সাধারণ সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতময় জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। সামাজিক দলাদলি আমাদের গ্রাম্য জীবনে কি যে ভীষণ বিপর্যয় সৃষ্টি করে তারও জীবন্ত ছবি তিনি এঁকেছেন। এদিক থেকে তারকনাথ বঙ্কিমের চেয়ে আরও একটু এগিয়ে এসে সাধারণ বাঙালী সমাজ-জীবনকে খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন। উপন্যাসগুলিতে তাঁর বাস্তব দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়।

বঙ্কিমের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্রও (১৮৩৪-৮৯) উপন্যাস এবং কয়েকটি বড়ো গল্প রচনা করেন। অবশ্যি সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর ভ্রমণ কাহিনী এবং সরস প্রবন্ধাদির জন্যই খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। বঙ্কিমের পর তিনি বঙ্গদর্শনের সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর রচিত 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' ও 'দামিনী'কে উপন্যাস বলা যেতে পারে,—যদিও আঙ্গিকের দিক থেকে তাকে বড়ো গল্প বলাই শ্রেয়। এই রচনাগুলি 'ভ্রমর' পত্রিকায় (১২৮১) প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া ইনি কণ্ঠমালা (১৮৭৭), মাধবীলতা (বঙ্গদর্শন—১২৮৫-৮৭), জাল প্রতাপচাঁদ (১২৮৯ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত) প্রভৃতি রচনা করেন। তাঁর 'পালামৌ' বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। বাঙ্‌লা সাহিত্যে ভ্রমণ কাহিনী হিসাবে পালামৌর একটি বিশেষ স্থান আছে। সঞ্জীবচন্দ্রের রচনার প্রধান গুণ হ'ল—সরসতা ও সারল্য। তাঁর রচনায় একটি দরদী মনের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু নিজে খুব গুরু গম্ভীর সাহিত্য সৃষ্টি করতে বসেননি। নইলে বঙ্কিমের চাইতেও তাঁর প্রকাশভঙ্গী অনিন্দ্যসুন্দর ছিল। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "তাঁহার প্রতিভার ঐশ্বর্য ছিল, কিন্তু গৃহিণীপনা ছিলনা।" যদি থাকত তাহলে ভাবের লালিত্য, এবং ভাষার চমৎকারিত্বের দিক থেকে তিনি বাঙ্‌লা সাহিত্যকে উৎকর্ষের পথে আরও এগিয়ে দিতে পারতেন।

রমেশচন্দ্র দত্ত বঙ্কিমের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে উপন্যাস রচনা আরম্ভ করেন। শুধু উপন্যাস নয়—শাস্ত্র আলোচনা, সাহিত্য আলোচনা প্রভৃতিতে রমেশচন্দ্রের মৌলিক চিন্তাধারার সার্থক পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ঐতি-হাসিক ও সামাজিক দুইরকমের উপন্যাসই রচনা করেন। ঐতিহাসিক

উপন্যাসে ইতিহাসকে বজায় রাখবার ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে শুদ্ধ রোমান্টিসিজমের বাহুল্যের আভাসও পাওয়া যায়। আবার কোনো কোনো জায়গায় উপন্যাসের গল্পের চেয়ে ইতিহাসই প্রাধান্য লাভ করেছে। কিন্তু সেখানে যে 'dry facts of the annalist and the antiquarian'এর ওপর 'creative imagination'এরও প্রয়োজন আছে, রমেশচন্দ্র তার সম্বন্ধে অনবহিত ছিলেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র যে মনোভাব নিয়ে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা আরম্ভ করেন, রমেশচন্দ্রও সে মনোভাবের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসাশ্রিত গল্প বলতে গিয়ে গল্পই বেশী বলেছেন—আর রমেশচন্দ্র ইতিহাসের কথাই বেশী বলেছেন। বাঙালীকে প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন করতে গিয়ে তার এমন কোনো যুগান্তকারী ঘটনা পাওয়া গেল না অথবা পাওয়া সম্ভব হলনা বলে বঙ্কিম যেমন অধিকাংশ বাঙ্‌লা বাইরের ইতিহাসকে অবলম্বন করেছিলেন রমেশচন্দ্রও তাই করেছেন।

তবে ইতিহাস কি ভাবে উপন্যাসে অবিকৃত থাকা উচিত তা তিনি তাঁর উপন্যাসে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় তাঁর দেশপ্রীতি ও জাতীয়তাবোধ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। উপন্যাসে চারণদের গাথার সংযোজনায় তাঁর নিজের দেশের প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাবেরই প্রকাশ পেয়েছে। রমেশচন্দ্র প্রথম 'বঙ্গবিজেতা' নামে (১৮৭৪) ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন। উপন্যাসের পটভূমিকা হচ্ছে আকবরের রাজত্বকাল। তাঁর অন্যান্য রোমান্স্-প্রধান ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার নিদর্শন হচ্ছে মাধবীকঙ্কন (১২৮৪), মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত (১২৮৫), রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা (১২৮৬) প্রভৃতি। মাধবীকঙ্কন শাহজাহানের সময়ের কাহিনী-বস্তু অবলম্বনে রচিত। উপন্যাসখানিকে খাঁটি রোমান্সের পর্যায়ে ফেলা যায়। ঔরংজীব ও শিবজীর ঐতিহাসিক সংঘর্ষের কাহিনী অবলম্বনে 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত' রচিত হয় এবং জাহাঙ্গীরের সময়ের কাহিনী নিয়ে 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' রচিত হয়।

এছাড়া তিনি 'সংসার' (১৮৮২) ও 'সমাজ' (১৮৯৪) নামে দুখানি সামাজিক উপন্যাস রচনা করেন। প্রথমখানিতে বিধবা বিবাহের সমর্থন রয়েছে। দ্বিতীয়খানি প্রথমখানির পাত্রপাত্রীদের জীবন কাহিনীর সম্প্রসারণ। রমেশ

চন্দ্রের রচনায় জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রেম স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি যেন সহানুভূতিশীল মন নিয়ে জাতির দেশপ্রেম জাগিয়ে তোলবার—তাকে তার দেশ ও সমাজ সম্বন্ধে সচেতন করে তোলবার এবং সবার পাশে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে চলবার অনুপ্রেরণায় সাহিত্য রচনা শুরু করেছেন। শুধু উপন্যাসে নয়, সাহিত্য, ইতিহাস, শাস্ত্র-আলোচনাতেও এই ভাব লক্ষিত হয়। রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের সঙ্গে উপন্যাসের কাহিনীর সম্পর্ক বঙ্কিমের ঐতিহাসিক উপন্যাসের কাহিনী অপেক্ষা আরও একটু ঘনিষ্ট। সেদিকে তাঁর উপন্যাসগুলি যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাসধারার প্রায় কাছাকাছি গিয়ে পৌঁচেছে।

এ সময়ের মহিলা ঔপন্যাসিকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্পাদনা, নাটক, কবিতা এবং উপন্যাস রচনায় তাঁর কৃতিত্ব যথেষ্ট। ইনিও ঐতিহাসিক বিশুদ্ধ রোমান্টিক ও সামাজিক উপন্যাস রচনা করেন। স্বর্ণকুমারী দেবী সংযুক্তা-পৃথ্বিরাজ কাহিনী নিয়ে 'দীপনির্ব্বাণ' (১৮৭৬), বহু বিবাহ সমস্যা নিয়ে 'কোরকে কীট', (১৮৭৭), রোমান্সধর্মী 'ছিন্নমুকুল' (১৮৭৯), 'মালতী' (১২৮৬) ও 'কাহাকে ?' (১৮৯৮) ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস, 'বিদ্রোহ' (১৮৯০), 'মিবাররাজ' (১৮৮৭), 'ফুলের মালা' (১৮৯৪) এবং বাঙ্‌লার সমাজের আধুনিকতার সমস্যামূলক 'স্নেহলতা' (১২৯১) প্রভৃতি বহু উপন্যাস রচনা করেন। তাঁর ভাব ও ভাষা অত্যন্ত সহজ, সরস ও মধুর। স্বর্ণকুমারী দেবী অনেক ছোট গল্পও রচনা করেছিলেন। তাঁর কাব্য রচনায় রোমান্টিক্ ভাব খুব প্রবল হ'য়ে উঠেছে। তিনি 'কনে বদল,' 'পাকচক্র,' 'রাজকন্যা' প্রভৃতি কয়েকখানি নাটকও রচনা করেছিলেন।

সিপাহী বিদ্রোহের সময়কে কেন্দ্র করে গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ 'চিত্ত বিনোদিনী' (১৮৭৪।৭৫) উপন্যাস রচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র 'মধুমতী', 'শৈশব সহচরী' প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করেন। পূর্ণচন্দ্রের 'মধুমতীতে' ছোটগল্পের আদর্শ লক্ষিত হয়।

ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তীর 'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসখানিতে (১৮৭৩) তৎকালীন কল্‌কাতার সমাজের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি ও দুর্নীতির কথা বলা হয়েছে। লেখক 'মুরলা' (১৮৮০) উপন্যাসের ভূমিকায় যা বলেছেন তা বেশ আকর্ষণীয়। তিনি বলছেন, 'আমাদিগের দেশীয় আচার-ব্যবহারের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া

বর্তমান-রুচি-উপযোগী একটি চিত্তহারী উপন্যাস রচনা করা অতিশয় দুরূহ জানিয়া, অনেকেই একমাত্র সাময়িক রুচির অনুরোধে ইউরোপীয় প্রথাসকল দেশীয় ঘটনায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন ; কিন্তু এ প্রকার অনুকরণে সত্যের বিশেষ অবমাননা হয় বলিয়া অসামাজিকতা ও অসাময়িকতা দোষ পরিহারে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি।' ঘরের মানুষের প্রতিদিনকার সুখদুঃখ বেদনাবোধের এবং এই দেশের মানুষের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার পরিচয়টুকু তিনি দিতে চান। এটা তাঁর উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু উপন্যাস রচনায় সে উদ্দেশ্য ততখানি সার্থক হয়ে ওঠেনি।

দামোদর মুখোপাধ্যায় বঙ্কিমের উপন্যাসের উপসংহার হিসেবে 'কপাল-কুণ্ডলা'র পরিশিষ্ট 'মৃন্ময়ী' (১৮৭৪), দুর্গেশনন্দিনীর পরিশিষ্ট 'নবাবনন্দিনী বা আয়েষা' রচনা করেছিলেন। তাছাড়া তাঁর 'বিমলা,' 'দুই ভগিনী', 'শান্তি', 'সপত্নী' প্রভৃতি উপন্যাস এবং স্কটের Bride of Lammermoor ও কলিন্‌সের 'Woman in White'এর যথাক্রমে 'কমলকুমারী' এবং 'শুক্লবসনা সুন্দরী' নামে অনুবাদ প্রকাশিত হয়। দামোদরের রচনায় বঙ্কিমের প্রভাব যথেষ্টভাবে বিদ্যমান। মাঝে মাঝে সে রচনা সরসতায় বঙ্কিমের যুগকেও ছাড়িয়ে চলে এসেছে। শিবনাথ শাস্ত্রী 'মেজবৌ' (১৮৭৯), 'যুগান্তর' (১৮৯৫), 'নয়নতারা' (১৮৯৯), 'উমাকান্ত' (মৃত্যুর পর প্রকাশিত) প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করেন। বাঙ্‌লা সাহিত্যে তিনি 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' (১৯০৪) ও 'আত্মচরিত' রচনার জন্য এবং সমাজসংস্কারক হিসাবেই বিশেষভাবে পরিচিত।

অম্বিকাচরণ গুপ্ত সাহিত্য ও ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা ছাড়া 'কমলে-কণ্টক', 'শান্তিরাম', 'কৃষকসন্তান', 'পুরানো কাগজ' প্রভৃতি কয়েকখানি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। কালীপ্রসন্ন দত্ত সিপাহীযুদ্ধের পটভূমিকায় 'বিজয়' (১২৯১) নামে একখানি উপন্যাস রচনা করেন। এতে 'তাঁতিয়া টোপি'র কাহিনী বর্ণিত আছে। তখনকার দিনে সিপাহী বিদ্রোহী সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ কিছু বলতে সাহস না পেলেও অন্তত তার প্রকাণ্ডতা ও প্রচণ্ডতাকে সবাই বিস্ময়-মিশ্রিত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করে নেন। নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত 'পর্বতবাসিনী' (১২৯০), 'লীলা' (১২৯২), 'আরাতামা' প্রভৃতি রোমান্টিক উপন্যাস রচনা করেন। ইনি অনেকগুলি সার্থক ছোট গল্পও রচনা করেছিলেন।

চণ্ডীচরণ সেন এই সময়কার একজন উল্লেখযোগ্য লেখক। তখনকার দিনের সাহিত্যে দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধের যে প্রকাশ আমরা দেখতে পাই চণ্ডীচরণ সেনের রচনা তার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। Uncle Tom's Cabin-এর বাংলা অনুবাদ 'টমকাকার কুটীর' (১২৯১) তাঁকে বাঙ্‌লা সাহিত্যে বহুকাল পরিচিত করে রাখবে। এছাড়া 'মহারাজ নন্দকুমার' (১৮৮৫), 'অযোধ্যার বেগম' (১৮৮৭), 'ঝান্সীর রাণী' (১৮৯৫) প্রভৃতি রচনাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'অযোধ্যার বেগম' প্রভৃতির প্রচার ইংরেজ শাসকরা বন্ধ করে দেয়। ইনি টলস্টয়ের গল্পেরও অনুবাদ করেন। চণ্ডীচরণ ইতিহাসের কাহিনীবস্তু অবলম্বন করেছিলেন। তিনি ইংরেজ আমলের অত্যাচার, নিপীড়নের ইতিহাসকেই গ্রহণ করেন। তাঁর রচনা স্বাদেশিকতার, স্বজাতিপ্রীতির মহিমায় ভূষিত।

বাঙ্‌লার পল্লীজীবন নিয়ে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার কয়েকখানি উপন্যাস রচনা করেন। তার মধ্যে 'শক্তি কানন' (১৮৮৭), 'ফুলজানি' (১৮৯৪), 'বিশ্বনাথ' (১৮৯৬) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শ্রীশচন্দ্রের রচনায় গ্রাম্যজীবনের রোমান্টিকতা, তার শান্ত পরিবেশ সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। মানুষের জীবনের সুখদুঃখ, বেদনাবোধের ছবিই তিনি বিশেষভাবে এঁকেছেন। রবীন্দ্রনাথ শ্রীশচন্দ্রের রচনার খুব অনুরাগী ছিলেন। তিনি একটি পত্রে তাঁকে লিখেছিলেন, 'আপনার লেখা আমার খুব ভালো লাগে। ওর মধ্যে কোন রকম নভেলি মিথ্যা ছায়া নেই।' কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে 'বিরল মিলন হাসি কান্না নিয়ে যে মানব জীবন স্রোতের' ছবিটি তাঁর রচনায় দেখতে চেয়েছিলেন শ্রীশচন্দ্র তার শেষ রক্ষা করতে পারেননি। শ্রীশচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনের' সম্পাদনাও করেছিলেন।

চা বাগানের কুলীদের সমস্যাময় জীবন নিয়ে এসময় থেকে নানারূপ আলোচনার মাধ্যমে কিছু প্রবন্ধ, বড় গল্প, নাটক প্রভৃতি রচিত হয়। তার মধ্যে যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'চা কুলীর আত্মকাহিনী' উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া আরও অনেকে ঐতিহাসিক, সামাজিক, পারিবারিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন। নিছক কাল্পনিক, ইতিহাসাশ্রিত, সামাজিক, নীতিধর্ম-বোধাত্মক বিষয়বস্তুই এঁদের অবলম্বন ছিল। রচনা হিসাবে খুব সার্থক না হলেও এঁদের সাহিত্য ও সমাজকে সমৃদ্ধ করার, দেশের গৌরব প্রতিষ্ঠা

করার, স্বাজাত্যবোধ জাগিয়ে তোলার ঐকান্তিকতা সত্যই প্রশংসনীয়। 'উমা', 'রূপলহরী' রচয়িতা পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বিমাতা না রাক্ষসী', 'পদ্মিনী' প্রভৃতি রচয়িতা হারাণচন্দ্র রক্ষিত, এবং জনপ্রিয় ডিটেকটিভ উপন্যাস রচয়িতা পাঁচকড়ি দে প্রভৃতি এযুগের বিশিষ্ট লেখক ছিলেন।

রস রচনা

এ সময়ে রসাত্মক রচনা এবং প্রবন্ধাদিপূর্ণ গদ্য সাহিত্যেরও আবির্ভাব ঘটে। সে যুগের নব্য বাবুদের ইংরেজিয়ানা, কেরাণী জীবন, কবি জীবন, ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী ব্যক্তির গল্প প্রভৃতি রস-রচনার বিষয়বস্তু হিসাবে দেখা দিয়েছিল। সাহিত্যে Satireও এই সময় থেকে সার্থকভাবে শুরু হয়। এরকম রচয়িতাদের মধ্যে সর্বপ্রথম নাম করতে হয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এঁর 'কল্পতরু' এক ব্যঙ্গমূলক উপন্যাস বলা যেতে পারে। এই উপন্যাসে মুখ্যত ব্রাহ্মধর্মাবলম্বীদের আক্রমণ করা হয়েছে। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর 'মডেল ভগিনী' (১৮৮৬-৮৮), 'চিনিবাস চরিতামৃত' (১৮৯০), 'বাঙালী চরিত' (১২৯২-৯৩) প্রভৃতি ব্যঙ্গ রচনা হলেও পরোক্ষভাবে উপদেশাত্মক। যোগেন্দ্রচন্দ্র 'শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী' নামে একখানি রোমান্টিক উপন্যাসও রচনা করেন। বাঙালীজীবনের ছবি তাঁর উপন্যাসখানিতে সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে। কোন এক অজ্ঞাতনামা লেখকের 'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়' গ্রন্থে বাঙ্‌লা সমাজ ও সাহিত্যের ব্যঙ্গাত্মক আলোচনা আছে। লেখক যে মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্রের প্রতি বেশ বিরূপ ছিলেন তার পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

এ যুগের রূপকথা ও হাস্য কৌতুকপূর্ণ রস-রচনার শ্রেষ্ঠ লেখক হচ্ছেন ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। অদ্ভুত কল্পনা শক্তি ও ভাব প্রকাশের মধুর সারল্য তাঁর রচনাগুলিকে বিশিষ্টতা দান করেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে এরকম রচনা সত্যিই দুর্লভ। তাঁর রচিত 'কঙ্কাবতী' (১২৯৯) উপন্যাসখানি ইংরেজি Alice in Wonderlandএর আদর্শে রচিত। য়ুরোপে হ্যান্‌স্ এ্যাণ্ডারসন যেমন তাঁর রচনায় একটি সম্ভব-অসম্ভব কল্পনাময় রূপকথার রাজ্যের সিংহদ্বার খুলে দিয়েছিলেন ত্রৈলোক্যনাথও তেমনি কঙ্কাবতীতে মধুর হাস্য-কৌতুকের মাধ্যমে একটি অপূর্ব রসাপ্লুত সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। 'কঙ্কাবতী' শিশুপাঠ্য রচনা হিসাবে আজও নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে।

ত্রৈলোক্যনাথ 'ভূত ও মানুষ' নামে একখানি গল্পগ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর ভূতের গল্প পরবর্তীকালে অনেক লেখকের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ হাস্যরসাত্মক গল্প রচয়িতা রাজশেখর বসু মহাশয়ের গল্পেও ত্রৈলোক্যনাথের কিছুটা প্রভাব আছে বলে মনে হয়। এ ছাড়া তিনি 'ফোকলা দিগম্বর', 'মুক্তামালা,' 'ময়না কোথায়!' 'ডমরুচরিত' প্রভৃতি ব্যঙ্গাত্মক রোমান্টিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সার্থক রচনা হচ্ছে কৌতুকরসপূর্ণ গল্পগুলি। ত্রৈলোক্যনাথের রচনায় বঙ্কিমের প্রভাব নেই। এই রচনা একান্তভাবে তাঁরই মৌলিক রচনা। বাঙালী পাঠক-গোষ্ঠীর সহৃদয়তা ও সাহিত্য-ঔৎসুক্যের অভাবে আজ ত্রৈলোক্যনাথের রচনা প্রায় সবাই বিস্মৃত হতে বসেছে।

ছোট গল্পের সূচনা

বাঙ্‌লা সাহিত্যে সার্থক ছোট গল্পের আবির্ভাব রবীন্দ্রনাথের হাতেই ঘটেছে। তাঁর আগে দুয়েকজন ছোট গল্প রচনা করেছেন, তবে এই রচনার আদর্শ রবীন্দ্রনাথ থেকেই প্রবর্তিত হয়। ছোট গল্পের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে, বক্তব্য বিষয়ের রসঘন সংক্ষিপ্ত দিকটি। এতে উপন্যাসের মতো অবাধ গতি-মুক্তির সুযোগ নেই, জীবনের একটি বিশেষ ক্ষণকে অল্পপরিসরে সার্থক করে ফুটিয়ে তোলাই ছোট গল্পের প্রধানতম দায়িত্ব। ছোট গল্পের শেষে একটি sudden jerk বা আকস্মিক ধাক্কা পাঠকের মনকে অভিভূত করে।

উপন্যাসের মতোই ছোট গল্পও আধুনিক কালের সৃষ্টি। প্রাচীন যুগে হয়ত সংস্কৃতগ্রন্থ, বৌদ্ধগ্রন্থে, বাইবেলে ছোট গল্পের কিছুটা আভাস থাকলেও যথার্থ ছোট গল্পের আবির্ভাব খুব বেশী দিনের নয়। য়ুরোপে ব্যাল্‌জাক্‌, মেরিমে, পুশকিন, দোদে, মোপাসাঁ, শেহভ্‌ প্রভৃতির হাতে ছোট গল্প ধীরে ধীরে সার্থক রূপ পেতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে ছোট গল্প সার্থক রূপ লাভ করে।

ছোট গল্পে কল্পনার রঙ্‌ ফলানোর তেমন অবকাশ নেই। বাস্তব অভিজ্ঞতাই ছোট গল্পের প্রধান অবলম্বন। বাঙ্‌লা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের আগে যে সব ছোট গল্প পাই তার কিছু কিছু উপদেশাত্মক গল্প, আর কিছু হচ্ছে উপন্যাস আকারে ছোট গল্প। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয়ের

ভুবনের গল্প, হিতোপদেশের গল্প প্রভৃতি উপদেশাত্মক গল্প। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন, শশিচন্দ্র দত্তের Tales of Yoreএর 'উপন্যাস মালা' নাম দিয়ে অনুবাদ করেন। সঞ্জীবচন্দ্রের 'দামিনীকে' বড়ো গল্পই বলা যায়। এর আগে রামরাম বসুর 'লিপিমালায়,' কেরীর 'ইতিহাস মালায়', মৃত্যুঞ্জয়ের 'প্রবোধ চন্দ্রিকায়' কিছু কিছু ছোট গল্পের দৃষ্টান্ত পাওয়া গেছে। কিন্তু বাঙ্‌লা সাহিত্যে ছোট গল্প একটি বিশেষ ধারা হিসাবে দেখা দিচ্ছে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প থেকে।

অন্যান্য গদ্যরচনা, সাহিত্য সমালোচনা, ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস এবং অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা প্রভৃতিও এযুগে চল্‌তে থাকে। অবশ্য এ ধরনের রচনা আগেও রচিত হয়েছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজ-নারায়ণ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্কিম প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখেছেন, কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির বিষয়ও পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। কেশবচন্দ্রের আচার্যের উপদেশ, সেবকের নিবেদন, জীবন বেদ প্রভৃতি সার্থক গদ্য রচনা। কেশবচন্দ্র 'সুলভ সমাচার' এবং 'নববিধান' নামে দুখানি সংবাদপত্র পরিচালনা করতেন। এই পত্রিকাগুলিতে তাঁর অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এ ধরনের রচয়িতা হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, অক্ষয় সরকার, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রজনীকান্ত গুপ্ত, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যোগীন্দ্রনাথ বসু, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মীর মশারফ হোসেন, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

স্বামী বিবেকানন্দ

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে স্বামী বিবেকানন্দকে আমরা পাচ্ছি। বাঙ্‌লার সমাজজীবনে কার্যোৎসাহ, বলিষ্ঠ চিন্তাশীলতা যাঁরা এনেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিবেকানন্দ অন্যতম। বিবেকানন্দ ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। পাশ্চাত্যের রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, ইতিহাস সম্বন্ধে তার গভীর জ্ঞান ছিল। এবং মানবসমাজের ইতিহাসের ধারার যে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন ঘটবে—সে পরিবর্তন কোন অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক পটভূমিকায় ঘটবে

তাও তিনি তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী দৃষ্টির দ্বারা বুঝতে পেরেছিলেন। স্বামীজি বাঙালী জীবনের পরাধীনতার অপমান, তার হৃতগৌরবের গ্লানি সম্বন্ধে যেমন সচেতন ছিলেন, তেমনি তার দ্বিধাবিভক্ত সমাজ-ব্যবস্থার দুর্বল দিক, তার নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চেষ্ট জীবন সম্বন্ধেও সচেতন ছিলেন। নিজে যেমন নিয়মকে জীবনে কঠোর-ভাবে পালন করতেন তেমনি সবাইকে সেভাবে পালন করাতে চাইতেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের তুলনায় পাশ্চাত্ত্যের কর্মচঞ্চলদিক ও সাম্রাজ্য-লিপ্সার ভোগাতুর দিক—এই দুদিকই তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। আমাদের পুরানো কুসংস্কারপূর্ণ সমাজ-ব্যবস্থা না ভাঙ্‌লে এ জাতির উন্নতি কখনই হবেনা, কখনই সে ঐক্যবোধ নিয়ে সামনে এগিয়ে চলতে পারবেনা—এও যেমন বুঝেছিলেন তেমনই বিভিন্ন দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতির ক্ষেত্রের একমাত্র ঐতিহাসিক পরিবর্তনও যে সংঘটিত হচ্ছে—তাকে শুধু যে তিনি বুঝেছিলেন তা নয়—সাদর আবাহনও জানিয়েছিলেন। কিন্তু এই চিন্তা ও কর্ম-ক্ষমতার মিলন সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত হিন্দু-ভারতের জাতীয় আদর্শ, ত্যাগের আদর্শ প্রভৃতি এসে তাঁর চিন্তাধারায় একটি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। একদিকে 'বর্তমান ভারত', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য', 'পরিব্রাজকে'র রচয়িতা বিবেকানন্দ সেই সঙ্গে আধ্যাত্মিক অনুভূতির দ্বারাপ্রভাবিত সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, একদিকে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায়, সভ্যতায়, ইতিহাসে অনুপ্রাণিত, স্বাজাত্যবোধ ও দেশপ্রীতিতে উদ্বুদ্ধ নরেন্দ্রনাথ—আর জীবনের শেষ মীমাংসার অধ্যাত্মলোক সৃজনেপ্সু স্বামী বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ মর্মে মর্মে অনুভব করেন—'আপনার লোকের একটি রূপ থাকে, তেমন আর কোথাও দেখা যায় না'—(পরিব্রাজক)। 'ভগ্ন মৃন্ময় প্রাচীর জীর্ণাচ্ছাদ, দৃষ্টবংশ কংকাল কুটীরকুল, ইতস্ততঃ শীর্ণদেহ-ছিন্নবসন যুগ-যুগান্তরের নিরাশাব্যঞ্জিতবদন নরনারী, বালক-বালিকা" এই যে ভারতের রূপ—এ রূপ তাঁকে স্বদেশ সম্পর্কে সচেতন ও ব্যথিত করে তোলে। এ শুধু কথার কথা নয়, তিনি যে তাকে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন তা তাঁর রচনায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। স্বাজাত্যগর্বের আরও নিদর্শন পাই তাঁর এই বলিষ্ঠ প্রশ্নে, "তুমি ইউরোপী, কোন্ দেশকে কবে ভাল করেছ? অপেক্ষাকৃত অবনত জাতিকে তোলবার তোমার শক্তি কোথায়? যেখানে দুর্বল জাতি পেয়েছ, তাদের সমূলে উৎপাটন করেছ, তাদের জমিতে তোমরা বাস করছ, তারা একেবারে বিনষ্ট হয়ে গেছে। তোমাদের আমেরিকার ইতিহাস কি?

তোমাদের অস্ট্রেলিয়া, নিউজিলণ্ড, প্যাসিফিক দ্বীপপুঞ্জ, তোমাদের আফ্রিকা?" নিজেদের সভ্যতায় উচ্চাদর্শে গর্ব করে বলেন, "ইউরোপের উদ্দেশ্য—সকলকে নাশ কোরে, আমরা বেঁচে থাকবো। আর্যদের উদ্দেশ্য—সকলকে আমাদের সমান করবো, আমাদের চেয়ে বড় করবো।" 'পরিব্রাজক' বইটিতে স্বামী বিবেকানন্দের পাশ্চাত্ত্য দেশ ও তার ভাবধারা সম্বন্ধে, তার অর্থনীতি ও রাজনীতি, সামাজিক রীতি-নীতি সম্বন্ধে যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাই তা যথার্থই প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী। এখানে তাঁর সেই স্বাজাত্যবোধ ত আছেই, আর আছে বিভিন্ন জাতির রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনযাত্রার সযত্ন বিশ্লেষণ প্রচেষ্টা এবং বর্তমান ও আগামী দিনের জনসাধারণ, কৃষিনীতি, শ্রমজীবীদের প্রতি অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধা। তিনি নিঃস্বার্থ কর্তব্যপরায়ণ শ্রমজীবীদের উদ্দেশ্য করে বলেন,—'ভারতের চির-পদদলিত শ্রমজীবি!—তোমাদের প্রণাম করি।' (পরিব্রাজক) তিনি মার্কিন গণতন্ত্রকে তাঁর শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। অবশ্যি তখনকার মার্কিণ গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো শুধু সাম্রাজ্যবাদী-শোষণের বিপরীত গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানো। তাই তিনি দেখেছিলেন আমেরিকায় 'দুঃখী গরীব স্থান পায়, আশ্রয় পায়; এরাই আমেরিকার মেরুদণ্ড' তিনি জানতেন, 'কোটি কোটি গরীব নীচ যারা, তারাই হচ্ছে প্রাণ।' আর বড় লোক, ধনী প্রভৃতি দেশের বাহার। এই গরীবরাই একদিন নানা বাধা-বিঘ্নকে অতিক্রম করে জীবনের সার্থকতার পথে এগিয়ে যাবে—এটা তিনি মর্মে মর্মে বুঝেছিলেন। কিন্তু তাঁর সন্ন্যাসজীবনের আধ্যাত্মিক অনুভূতি এই বৈজ্ঞানিক চেতনা-বুদ্ধির সঙ্গে মিলে দ্বন্দ্বময় হয়ে উঠেছিল। এই দ্বন্দ্ব, এই পরস্পর-বিরোধী ভাব স্বামী বিবেকানন্দের যুগে খুবই স্বাভাবিক।

দ্বিজেন্দ্রনাথ, রাজকৃষ্ণ প্রভৃতি

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর একদিকে যেমন কবি ছিলেন, তেমনি ছিলেন চিন্তাশীল অনুসন্ধিৎসু দার্শনিক। প্রাচীন ধর্মতত্ত্ব, প্রাচীন ও আধুনিক মেকি ভাবের ভাঁড়ামির বিরুদ্ধেও তিনি অনেক প্রবন্ধ রচনা করেন। 'তত্ত্ববিদ্যা', 'আর্যামি ও সাহেবিয়ানা,' প্রভৃতি রচনাতে তাঁর চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মধর্মের প্রভাবে তাঁর দৃষ্টির আধুনিকতা

এবং সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিকতাও স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্যে, 'মেঘদূতের' কিয়দংশের অনুবাদে ছড়ার ছন্দে রচিত কবিতায় এবং অন্যান্য কবিতায়ও তাঁর মৌলিকতা ও রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বঙ্গদর্শনের পৃষ্ঠায় অনেক গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এই প্রবন্ধের কতগুলি 'নানাপ্রবন্ধ' নামক প্রবন্ধ-পুস্তক রূপে সঙ্কলিত হয়। উক্ত প্রবন্ধগুলিতে স্বদেশ ও স্বজাতির গৌরব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা রয়েছে।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার বঙ্গদর্শনের নিয়মিত লেখক ছিলেন। বঙ্গদর্শনে তাঁর রস-রচনা প্রকাশিত হত। অক্ষয়চন্দ্র 'সাধারণী' (সাপ্তাহিক) ও 'নবজীবন' (মাসিক) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি 'মোতিকুমারী' নামে একখানি উপন্যাসও রচনা করেছিলেন। প্রবন্ধ ও রসরচনাগুলি 'সমাজ সমালোচন', 'রূপক ও রহস্য' প্রভৃতি গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। অক্ষয়চন্দ্র, রাজকৃষ্ণ, চন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি বঙ্কিমের চার পাশে ঘিরে ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর ব্রাহ্ম-আন্দোলনের ধারা ও পাশ্চাত্ত্যশিক্ষাপরিপুষ্ট হিন্দু স্বাজাত্যবোধ ও দেশ-প্রীতির ধারায় এঁরা বঙ্কিমের নেশালিজমের দৃষ্টিভঙ্গীরই ধারক ছিলেন। চন্দ্রনাথ বসু আবার প্রথমে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পরে হিন্দুধর্মের পক্ষ অবলম্বন করে প্রবন্ধাদি রচনা শুরু করেন, শশধর তর্কচূড়ামণিও হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব ও সার্থকতা ব্যাখ্যা করে বক্তৃতামুখ্য প্রবন্ধাদি রচনা করেন। এঁরা দুজনেই ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধতা করার জন্য এবং হিন্দু-ধর্মের গৌরব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চন্দ্রনাথের বেশকিছু দিন মসীযুদ্ধ চলেছিল। চন্দ্রনাথের 'শকুন্তলাতত্ত্ব', 'ফুল ও ফল', 'হিন্দুত্ব', 'পৃথিবীর সুখ দুঃখ' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। চন্দ্রনাথ বসু বাঙ্‌লা সাহিত্য বিষয়ে 'বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি' প্রভৃতি রচনা করেন।

কেশবচন্দ্রের ভ্রাতা কৃষ্ণবিহারী সেন, এবং তাঁর ভক্তদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র সেন, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল প্রভৃতি গদ্যে পদ্যে অনেকগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথ 'চিরঞ্জীব শর্মা' ছদ্মনামে 'বিংশ শতাব্দী', 'গরলে অমৃত' প্রভৃতি উপন্যাস, 'ঈশা চরিতামৃত', 'কেশব চরিত' এবং কয়েকখানি নাটক রচনা করেছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্কিমের পরে দেশাত্মবোধের প্রেরণায় ও পরাধীনতার

বেদনাবোধ নিয়ে যাঁরা সাহিত্য রচনা শুরু করেন তাঁদের মধ্যে রজনীকান্ত গুপ্ত, 'আর্যদর্শন' প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, সত্যচরণ শাস্ত্রীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এসময়ে আমাদের দেশে রাজনৈতিক আলোড়ন-আন্দোলন শুরু হয়েছে। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজে জাতীয় সচেতনতা আগে থেকে দেখা দিলেও এ সময়ে বেশ দানা বেঁধে উঠেছে। এই সচেতনতার ফলস্বরূপ রজনীকান্ত গুপ্ত বিস্তৃতভাবে সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাস রচনা করেন। আর্যদর্শন পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, মিল, ম্যাট্সিনি, গ্যারিবল্ডী, ওয়ালেস প্রভৃতির জীবনী রচনা করেন। সত্যচরণ শাস্ত্রী শিবাজী, প্রতাপাদিত্য, মহারাজা নন্দকুমার প্রভৃতির জীবনী রচনা করেন। এঁরা চেয়েছিলেন এসব জীবনবৃত্তান্ত রচনা করে দেশের শিক্ষিত সমাজকে নিজের দেশের সম্বন্ধে আরও সচেতন করে তুলতে। এঁদের রচনার ওপর তৎকালীন সরকারের কড়া নজর ছিল।

আমাদের দেশের স্মরণীয় মহাত্মা ব্যক্তিদের নিয়ে কিছু জীবনী রচিত হয়। তার ভেতর নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত' (১৮৮১), যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত' (১৮৯৩), বিহারীলাল সরকারের 'বিদ্যাসাগর' (১৮৯৫), চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্যাসাগর' (১৮৯৫) উল্লেখযোগ্য।

বিদ্যাসাগরী রীতিতে গদ্য রচয়িতা হিসাবে বান্ধব পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ঢাকার কালীপ্রসন্ন ঘোষের নাম (১৮৪৩—১৯১০) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর 'প্রভাত চিন্তা', 'নিভৃতচিন্তা', 'নিশীথ চিন্তা', 'ভ্রান্তিবিনোদ', 'ছায়াদর্শন' প্রভৃতি তখনকার দিনে বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। কালীপ্রসন্ন বিখ্যাত বাগ্মী ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন বাঙ্লা ভাষা ও সাহিত্যকে শুচিশুভ্র ও সুন্দর করে তুলবেন। ভাষাকে তিনি যথাসম্ভব শুচিশুভ্র করেও তুলেছিলেন, কিন্তু ভাবসৌন্দর্য ভাষার গুরু-গম্ভীর রূপের সঙ্গে অনুরূপ গাম্ভীর্য লাভ করাতে সবার পক্ষে সহজবোধ্য হয়নি।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 'ভারত মহিলা', 'বেণের মেয়ে' প্রভৃতি রচনা করে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। বিশেষ করে বাঙ্লা সাহিত্যের আদি নিদর্শন 'হাজার বছরের পুরানো বাঙ্লা ভাষায় রচিত "বৌদ্ধগান ও দোহা" আবিষ্কার হরপ্রসাদের অমরকীর্তি।

'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' রচয়িতা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধাদি লেখক ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র বসু এবং বঙ্কিম সাহিত্যের সমালোচক গিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরীও এযুগের উল্লেখযোগ্য উচ্চাঙ্গের প্রবন্ধ-রচয়িতা।

মধুসূদনোত্তর কাব্যধারা

মধুসূদনের সাহিত্য-প্রতিভার কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর যে জীর্ণ সামাজিক অবস্থা, পাশ্চাত্ত্যভাবে অনুপ্রাণিত যে দৃষ্টিভঙ্গী, যে স্বাজাত্য ও দেশাত্মবোধ, রাজনীতিক ও অর্থ-নৈতিক অসমতার যে সচেতনতা তখনকার শিক্ষিত-সমাজে সাহিত্য-স্থষ্টির প্রেরণা জুগিয়েছিল এবং সেই সাহিত্যের ভেতর দিয়ে প্রকাশের আকুলতা, সার্থকতা ও ব্যর্থতা যে-ভাবে পরিণতি লাভ করছিল কাব্যে তার শুরু মধুসূদনে। পুরানো গতানুগতিকতার বেড়াজাল ছিন্ন ক'রে তিনি ত্রুটি-বিচ্যুতিপূর্ণ মানুষ নিয়ে মানুষের মহাকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তারই ধারক ও বাহক হিসাবে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পর্যায়ে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন। কৃষক, সাঁওতাল, সিপাহী বিদ্রোহ প্রভৃতির ভেতর দিয়ে জাতীয় সচেতনতার একটা ধাক্কা বাঙালীর বুকে তখন লেগেছে। সাহিত্যেও তার কিছু কিছু প্রতিফলন আমরা দেখতে পেয়েছি। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ও সমাজের প্রভাব ত আমাদের সাহিত্যে অল্পবিস্তর ছিলই। তার ওপর স্বাধীনতার কামনা, সাম্যের আদর্শ ও সমভ্রাতৃত্ব এবং তার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় চেতনা ও প্রাচীন সুখ শান্তির পুনরুদ্ধারের আকুল আশা, স্বধর্মবোধ প্রভৃতি সব মিলে এঁদের সাহিত্য-রচনার প্রেরণা জুগিয়েছিল। আবার অন্য দিকে যুবরাজ আগমন উপলক্ষে এযুগের কবিরা সুখ-সমৃদ্ধির আশায় উচ্ছ্বসিত হয়ে কবিতাও লিখেছিলেন। কেউ কেউ এ যুবরাজ-প্রশস্তির জন্য পুরস্কারও পেয়েছিলেন। এ সময়ের কাব্যধারার একটা দিকে দেখতে পাই প্রাচীন আদর্শানুযায়ী মহাকাব্য রচনার প্রয়াস এবং মধুসূদন 'বীররসে ভাসি' যে 'মহাগীত' গাইবেন ব'লে ঘোষণা করেছিলেন এযুগের কবিরা সেপথ ধ'রে চলবার চেষ্টা করছিলেন। পৌরাণিক কাব্যের 'হিরো' বা নায়কদের নিয়েই তাঁরা কাব্য রচনা শুরু করেছন। এই কৃত্রিম ক্লাসিক ধারার প্রবর্তনের প্রচেষ্টার পাশাপাশি লিরিকের স্রোতও বইছিল। এমন কি যুগধর্ম অনুসারে

মহাকাব্যের বিরাট তরীও লিরিকধারার দোলায় দোল খেয়ে যাচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব পর্যন্ত দুটো ধারাই পাশাপাশি বর্তমান ছিল। একদিকে হেম-নবীন অপরদিকে অক্ষয় চৌধুরী, বিহারীলাল, সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি উক্ত দু'ধারার প্রতিনিধিস্থানীয় কবি। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রও শেষ পর্যন্ত লিরিকের ভাবধারায় অবগাহন করেছেন। বস্তু-বিস্মৃতি ও ভাবতন্ময়তার আধিক্য সত্ত্বেও এঁদের রচনায় জীবনবোধ ও জাতীয়তাবোধের স্পন্দনধ্বনিও শোনা গেছে। অন্ততঃ হেম-নবীনের রচনার সম্বন্ধে একথা বলা যায়। কিন্তু বিহারীলাল একেবারে আর্টের স্বপ্ন-সরোবরের অবগাহক। 'আর্ট ফর আর্ট্‌স্ সেক্'ই তাঁর কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য। হেম-নবীনের রচনায় মুখ্যত এভাব থাকলেও পূর্বোক্ত সচেতনতার আভাসও রয়েছে।

মধুসূদনের সাহিত্যধারার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে হেম-নবীন যে মহাকাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন তার জন্যে তৎকালীন যুগচিত্ত ততটা প্রস্তুত ছিল না। যুগধর্মও তার তেমন অনুকূল ছিল না। মহাকাব্য রচনার ভিতরে যে বিরাট জাতীয়তাবোধের সম্ভাবনা ছিল তাও সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি, বরং হেমচন্দ্রের বীরবাহু কাব্যে অথবা নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধ কাব্যে দেশপ্রীতি, স্বাজাত্যবোধ আরও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু মধুসূদন যা করেছিলেন, তা আর কেউ করতে পারেন নি।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মধুসূদনের পর কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) মধুসূদনের অনুকরণে কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁর প্রথম কাব্য 'চিন্তাতরঙ্গিণী' ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যের রীতি 'মধু-রীতি' নয়, 'ঈশ্বরচন্দ্র-রঙ্গলাল-রীতি'। তারপর থেকে 'অবোধবন্ধু' ও 'এডুকেশন গেজেটে' নিয়মিত কবিতা লিখতে থাকেন। হেমচন্দ্রের 'বীরবাহু কাব্য' (১৮৬৪) যে একটা পুরা সংঘটিত কোনো কাহিনী তা নয়, দেশের জন্য কিভাবে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন করা যায় এ কাব্যে সেরকম একটি কল্পিত কাহিনীই গ্রহণ করা হয়েছে, বীরবাহু বলে—

এবে সেই দেশমান্যা ভারত বক্ষেতে।
ম্লেচ্ছকুল পদে দলে নিরখি চক্ষেতে॥

এখানে বিদেশী রাজশক্তির প্রতি স্পষ্ট ঘৃণার ভাব প্রকাশ পেয়েছে। 'বীরবাহু কাব্যের' ভাষা ও ছন্দ বেশ পরিপাটিভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

বীরবাহু কাব্যের পর থেকে হেমচন্দ্র অনেক খণ্ড কবিতা রচনা করেন। কবি সমালোচক শশাঙ্কমোহনের মতে 'খণ্ড কবিতাবলী একদিকে কবিহৃদয়ের প্রকৃত ইতিহাস। হেমচন্দ্র সর্বত্র সরল; তাঁহার বাক্যভঙ্গীর মধ্যে কোথাও বক্রতা নাই; সর্বত্র ভিতরের মানুষটিকে স্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে।' সেযুগের জাতীয়-আন্দোলনে তাঁর কবিতা অপূর্ব উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। 'ভারত-সঙ্গীত' কবিতাটি এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত হবার পর ইংরেজ সরকার কবি হেমচন্দ্র এবং পত্রিকার সম্পাদক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের উপর খুবই অসন্তুষ্ট হন।

হেমচন্দ্র সব চেয়ে খ্যাতি লাভ করেন 'বৃত্রসংহার কাব্য' রচনা করে। কাব্যটির প্রথম এগারো সর্গ ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বাকি তেরোটি সর্গ ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যে প্রথমত, হেমচন্দ্র পুরাণ কাহিনীর ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন। দ্বিতীয়ত, কাব্যখানি মহাকাব্যের রীতিতে রচিত হলেও মহাকাব্যের আদর্শ সর্বত্র রক্ষিত হয়নি। নিজস্ব কল্পনা এমনকি পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের ভাবাদর্শও তাতে প্রয়োগ করেছেন। লিরিকের আভাস থাকলেও বৃত্রসংহার কাব্যে তাও যথাযথভাবে প্রকাশ লাভ করতে পারেনি। বোধ হয়, হেমচন্দ্র অমিত্রাক্ষর ছন্দের মূল সুরটি ধরতে পারেননি বলেই তার যুগপৎ গাম্ভীর্য ও সৌকুমার্যের অভাবও থেকে গেছে। ফলে 'বৃত্রসংহার কাব্য' কাব্য হয়েছে কিন্তু মহাকাব্য বা লিরিক কাব্য হয়নি। তবুও এটা ঠিক যে মহাকাব্য রচনায় যাঁরা মধুসূদনের অনুকরণ করতে চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে হেমচন্দ্রই মধুসূদনের সার্থক-অনুসারী কবি। সেযুগে অনেকে 'বৃত্রসংহার কাব্য'কে মেঘনাদবধ কাব্যের চেয়েও উৎকৃষ্ট মহাকাব্য বলতে দ্বিধা করেননি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও 'বৃত্রসংহার কাব্য'কে মেঘনাদবধ কাব্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাব্য বলে মেনে নিয়েছিলেন।

'বৃত্রসংহার কাব্যে' দেবতার চেয়ে অসুররা অপেক্ষাকৃত জীবন্ত। দেব-চরিত্রগুলিতে দেবত্ব অথবা ব্যক্তিত্ব কোনোটাই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়নি। আবার অসুর চরিত্রও তার বলিষ্ঠতা পরিহার ক'রে একেবারে সাধারণ মানুষের শ্রেণীতে এসে পড়েছে। সমগ্র কাব্যে বৃত্র-পত্নী ঐন্দ্রিলাই কিছুটা জীবন্ত হয়ে

প্রকাশ পেয়েছে। 'বৃত্রসংহার কাব্যে' অদৃশ্য নিয়তি কাহিনীর মধ্যে একটা প্রধান অংশ গ্রহণ করেছে। বৃত্রের জীবনে এই নিয়তি যে রূঢ় আঘাত হেনেছে তাই শেষ পর্যন্ত বৃত্রসংহার কাব্য ট্রাজেডি রূপে দেখা দিয়েছে।

বৃত্রসংহারের পর তিনি 'আশাকানন কাব্য' (১৮৭৬) রচনা করেন। এই কাব্যখানিকে কবি নিজে 'সাঙ্গরূপক' নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে এই কাব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে 'মানবজাতির প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি সকলকে প্রত্যক্ষীভূত করা।' আশাকাননের পর তিনি দান্তের Divina Comedia কাব্যের আদর্শে 'ছায়াময়ী' (১৮৮০) কাব্য রচনা করেন।

হেমচন্দ্র এছাড়া 'দশমহাবিদ্যা' (১৮৮২), 'চিত্তবিকাশ' (১৩০৫), প্রভৃতি কাব্য রচনা করেছিলেন। সেক্স্পীয়রের টেম্পেস্‌ট ও রোমিও জুলিয়েটের বাঙ্‌লা অনুবাদ করেছিলেন যথাক্রমে 'নলিনী-বসন্ত' ও 'রোমিও-জুলিয়েত' নামে। হালকা ধরণের কবিতা রচনায়ও তাঁর যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর কাব্যধারার এই পর্যায়ে একটি বিশেষ ব্যাপার লক্ষ্য করার আছে। কবিরা ক্ল্যাসিকাল বা আধুনিক রোমান্টিক যে কোনো ভাবাদর্শে কবিতা রচনা করুন না কেন জাতির পরাধীনতার দুঃখ তাঁদের কবিতায় কোনো না কোনোরূপে প্রকাশ পেয়েছে। জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য অনেকে তেজোদৃপ্ত ভাষায় দেশাত্মবোধক কবিতাও রচনা করেছেন। সেদিক থেকে বিচার করলে হেমচন্দ্রের কৃতিত্ব যথেষ্ট। তখনকার জাতীয় আন্দোলনের সূচনায় হেমচন্দ্রের কবিতা উক্ত আন্দোলনের পথনির্মাণে অনেকখানি সহায়তা করেছিল। তাঁর পূর্বে রঙ্গলাল, মধুসূদনেও এই চেতনাবোধ লক্ষিত হয়। রঙ্গলাল ত দেশাত্মবোধক কয়েকটি কবিতাও রচনা করেছিলেন। হেমচন্দ্রের দেশপ্রেমমূলক কবিতাগুলি পড়লে মনে হয়, পরাধীনতার বেদনাবোধ তখন সমস্ত জাতিকে কিভাবে আকুল করে তুলেছিল তার স্পষ্ট রূপ ধরা পড়ে। সেযুগের কবির পক্ষে এই ভাব অটুট রাখা সব সময় সম্ভব নয়। কারণ হেমচন্দ্র পরেই আবার ভারতবর্ষে যুবরাজ আগমন-বিষয় নিয়ে যুবরাজপ্রশস্তি রচনা করেন। আবার কলকাতায় যখন যুবরাজকে নিয়ে বাড়াবাড়ি দেখা দেয় তাকে ব্যঙ্গ করেও তিনি কবিতা রচনা করেছিলেন। 'বাজিমাৎ' কবিতায় বলছেন—

আমি—স্বদেশবাসী আমায় দেখে লজ্জা হোতে পারে।
বিদেশবাসী রাজার ছেলে লজ্জা কিলো তারে ?

একদিকে ভারতের পরাধীনতার অগৌরবে ব্যথিত কবির উচ্ছ্বসিত কাব্যাবেগ, অন্যদিকে দুর্বল জাতির স্বাধীনতা-সংগ্রামের দীনতা ও ভ্রান্তির প্রতি কটাক্ষ—দুইই তাঁর কবিতায় পাওয়া যায়। নানান দলের দলাদলি যে জাতীয় আন্দোলনের দুর্বলতাই প্রকাশ করে তাকে ইঙ্গিত করে কবি বলেন—

হায় কি হোল দলাদলি বাধলো ঘরে ঘরে।
পার্টি খেলা ঢেউ তুলেছে ভারত-রাজ্য পরে॥

একদিন তিনি যে জাতির অতীত গৌরবে নিজেকে ধন্য মনে করেছেন আজ সেই জাতির মানুষগুলি কেবল বক্তৃতাই করে বেড়াচ্ছে, অথচ কাজের ভেতর দিয়ে তাকে সার্থক করে তোলার কোনো চেষ্টা করেছে না—তাই দেখে তিনি বলেন—

পরের অধীন দাসের জাতি 'নেসন' আবার তারা।
তাদের আবার 'এজিটেসন্'—নরুন উঁচু করা।

কবি শেষ বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু দৃষ্টিশক্তির অভাব তাঁর কবি-প্রতিভাকে ম্লান করতে পারেনি। হেমচন্দ্র অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচনায় সার্থক হতে না পারলেও মিত্রাক্ষর ছন্দে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

নবীনচন্দ্র সেন

কবি নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৬-১৯০৯) মধুসূদনের অনুসরণে কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। যুগধর্মানুযায়ী নবীনচন্দ্রও জাতীয়তাবোধ, এবং দেশপ্রীতির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হ'য়ে কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত। তবে এই নব চেতনাবোধ তাঁর কাব্যে সমভাবে প্রকাশ পেতে পারেনি। তাঁর 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য পড়লে মনে হয়, কবি যেন সিরাজের অন্যায়ের জন্য তাকে কঠোর শাস্তি দিতে চান। কিন্তু সে শাস্তি যে জাতীয় স্বাধীনতা খুইয়ে নয় তা রাণী ভবানীর উক্তি থেকে বুঝতে পারি। সরকারী চাকরি ক'রে যতখানি আইন বাঁচিয়ে বলা যায় ততখানি তিনি বলতে চেষ্টা করেছেন। 'সহৃদয় ইংরাজ', 'সাধু মিরজাফর',

প্রভৃতি উক্তি যে নিশ্চয় প্রশংসাবাচক নয় একথা বাঙালী পাঠককে বুঝিয়ে দিতে হয় না। মৃত্যুকালে মোহনলালের খেদ যেন কবিরই খেদোক্তি। অন্যদিকে ইংরাজের পরাক্রম সম্বন্ধেও তিনি সচেতন। কাজেই তাঁর স্বদেশ-প্রীতি, স্বাধীনতার ব্যাকুল কামনা দ্বন্দ্বের বাধার প্রাচীরে বারবার প্রতিহত হচ্ছে। দ্বন্দ্বভাব কবি কল্পনার প্রসারকে বাধা দিচ্ছে। কবি ইতিহাসের কাঠামোটুকু নিয়ে তাতে নিজের কল্পনাজাল বিস্তার করেছেন। একটা ঐতিহাসিক কাহিনী বর্ণনায় যে কাব্যিক গাম্ভীর্য থাকা দরকার তাকেও তিনি বজায় রাখতে চেষ্টা করেছেন, তবে তার চেয়ে লিরিকভাবই অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে প্রকাশ পেয়েছে।

'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৫) প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্‌লাদেশে একটা সাড়া পড়ে যায়। মোহনলালের খেদোক্তি, পলাশীর যুদ্ধ বর্ণনা তখন লোকের মুখে মুখে। সুকুমার সেন মহাশয় বলেছেন যে, পূর্ববঙ্গেই বিশেষ করে এই কাব্যের সমাদর বেশী ছিল। কথাটা ঠিক নয়। সারা বাঙ্‌লাদেশেই এই কাব্যখানি অপূর্ব সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল। বহু দ্বিধা, সংশয় ও স্ববিরোধী ভাব থাকা সত্ত্বেও পলাশীর যুদ্ধ জাতীয়তার চেতনায় উদ্বুদ্ধ কাব্য রচনার সযত্ন প্রচেষ্টা হিসাবে খুব মূল্যবান। কবি-সমালোচক শশাঙ্কমোহন সেন পলাশীর যুদ্ধকে 'প্রতিভার স্বেচ্ছাদৃপ্ত সঙ্গীত' বলে উল্লেখ করেছেন। শশাঙ্কমোহনের মতে 'নবীনচন্দ্র গঠন-প্রয়াসী কবি ; বায়রণ কিংবা ভল্‌টেয়ারের ন্যায় ধ্বংস-প্রয়াসী নহেন।...পরাধীন দেশের কবি নবীনচন্দ্রে সতর্করুদ্ধ বাষ্পোচ্ছ্বাস পলাশীর যুদ্ধের প্রধান সৌন্দর্য।' এই পলাশীর যুদ্ধের জন্য কবিকে শাসকবর্গের হাতে নির্যাতন ভোগ করতেও হয়েছিল।

নবীনচন্দ্রের ত্রয়ী কাব্য 'রৈবতক' (১৮৮৬), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩) ও 'প্রভাস' (১৮৯৬)। কবির অন্তরে যে আদর্শের আকাঙ্ক্ষা ছিল তাই এই ত্রয়ী কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বন করে নিষ্কাম ধর্ম এবং আর্য-অনার্যের মিলনের মাধ্যমে অখণ্ড হিন্দু জাতির প্রতিষ্ঠার কথা এই তিনটি কাব্যে তিনি বলতে চেয়েছেন। কাব্যের প্রধান চরিত্র শ্রীকৃষ্ণ সার্থক নায়ক বা 'পারফেক্ট্‌ ডিক্‌টেটর'। তিনি একদিকে যেমন শৌর্য বীর্য, পাণ্ডিত্য, প্রেম প্রভৃতির কল্যাণ-মিশ্রণে সার্থক ও বলিষ্ঠ হিন্দু সভ্যতার পত্তন করতে চান— তেমনি ঈর্ষা, দ্বেষ, হানাহানি প্রভৃতি নানা অকল্যাণকর বাধা দূরীভূত

'ভানুমতী' উপন্যাস (১৩০৭), 'আমার জীবন' প্রভৃতি রচনায় তাঁর ভাব ও ভাষার সরসতা ফুটে উঠেছে। 'আমার জীবন' জীবনী-গ্রন্থে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্‌লার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসের অনেক সংবাদ পাওয়া যায়। নবীনচন্দ্রের কবিধর্মের বড়ো গুণ হচ্ছে তাঁর সহৃদয় ও সহিষ্ণু উদার দৃষ্টিভঙ্গী। যে উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তিনি ত্রয়ী কাব্য এবং যিশুখ্রীষ্ট, বুদ্ধদেব ও শ্রীচৈতন্যের মাহাত্ম্য-কীর্তন করেছেন তা সত্যই বিস্ময়কর ব্যাপার।

নবীনচন্দ্রের চরিত্রের ও রচনার বৈশিষ্ট্য দেখাতে গিয়ে শশাঙ্কমোহন বলেছেন, 'নবীনচন্দ্রের আন্তরিক চরিত্র বেগবান, ভাবপ্রবণ, সুখেবিহ্বল, দুঃখে অসহিষ্ণু এবং যুগপৎ অভিমানী ও সরল ছিল।' তাঁর রচনায় 'কোনরূপ নিয়ম সংযম শৃঙ্খলা, বিচার বিতর্ক নাই; সংশোধন প্রসাধন গোপন নাই; প্রবাহের মত তর তর বেগে ছুটিয়াছে··· নবীনচন্দ্রের চিন্তা এবং রচনা সমগতিক ছিল।' উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রস্তুতির ক্ষেত্রে নবীনচন্দ্রের দান অনস্বীকার্য।

বিহারীলাল চক্রবর্তী

কাব্যে, নাটকে, উপন্যাসে ও ছোট গল্প রচনায় রবীন্দ্রনাথকে আমরা পেয়েছি এই যুগ থেকেই। কাব্যে অন্তত চৈতালী-চিত্রা পর্যন্ত, রাজা ও রাণী, বিসর্জন, চিত্রাঙ্গদা, প্রভৃতি নাটকে, বৌঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষি উপন্যাসে এবং ছোটগল্পে রবীন্দ্রনাথ বাঙ্‌লা সাহিত্যে এক নতুন যুগের সূচনা করেন। একদিকে যেমন আমরা মহাকাব্যের উদাত্ত গাম্ভীর্যের অনুকরণে মাইকেলকে পেলাম, কপোতাক্ষীর সুরকে পেলাম, হেম-নবীনের ছন্দে আত্মগত ভাবের প্রচ্ছন্ন সুরধ্বনি যেমন প্রবাহিত হ'ল তেমনই বিশুদ্ধ গীতি-কাব্যের প্রাণধর্ম দেখা দিল কবি বিহারীলালের কাব্যে। বিহারীলাল বিশুদ্ধ আনন্দের পূজারী। আপন অন্তরের গভীরতম কোণে যে ব্যাকুল আরতি চলছিল তারই প্রকাশ ঘটল তাঁর কাব্যে। অনেক সময় মনে হয় তাঁর রচনায় কল্পনার আতিশয্য যেন বেশী। কিন্তু গীতিধর্ম আতিশয্যকে সংযত করতে পারে না, যে বেদনাবোধ কবি-চিত্তকে আকুল করে তুলেছিল তাকে রূপ দিতে গিয়ে কবি সতর্ক বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাব্য সৃষ্টি করেন নি; তাঁর অনুভূতি তাঁকে আবেগের আতিশয্যের পথ দিয়ে সুন্দরের সন্ধানে চালিয়ে নিয়ে গেছে। বিশ্ব

প্রকৃতির লীলাময় সত্তার সঙ্গে কবি একাত্মভাবে মিশে গেছেন। বিশুদ্ধ আর্ট সৃষ্টির প্রেরণায় কবি বিভোর। উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যকুঞ্জে বিশুদ্ধ গীতি-কাব্যের সুর বিহারীলালের কাব্য-বাঁশরীতে বেজে উঠ্‌ল। তাঁর 'সারদামঙ্গল', 'প্রেম-প্রবাহিনী' (১৮৭০), 'বঙ্গসুন্দরী' (১৮৭০), 'নিসর্গ সন্দর্শন' (১৮৭০ প্রকাশ-রচনা ১৮৬৭ খ্রীঃর দিকে), 'সারদামঙ্গল', (১৩৮৬), 'সাধের আসন' প্রভৃতি তার উজ্জ্বল প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে বাঙ্‌লার অনেক কবিই বিহারীলালের লিরিকধর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বাঙ্‌লা সমাজ ও সাহিত্যক্ষেত্রে যখন নূতন দৃষ্টিভঙ্গী, নূতন জীবনবেদ রচনার প্রয়াস চলছে সেই সময় আপন মনে বিহারীলাল তার একতারা বাজিয়ে চলেছেন। তাঁর রচনায় একটি স্বতঃস্ফূর্ততা আছে, হয়ত ছন্দ বা ভাষার নানা রকম ঝকমারি নেই—কিন্তু সমস্ত কাব্যধারা যেন কোন্ বিশেষ লালিত্য গুণে আপন মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছে। বিহারীলালের কাব্যে 'আর্ট ফর আর্টস সেক্'এর আদর্শ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বঙ্গসুন্দরীতে—

একদিন দেব তরুণ তপন
হেরিলেন সুরনদীর জলে
অপরূপ এক কুমারীরতন,
খেলা করে নীল নলিনী দলে।

অথবা সারদামঙ্গলে—

ব্রহ্মার মানস সরে
ফুটে ঢল ঢল করে
নীল জলে মনোহর সুবর্ণ-নলিনী,
পাদপদ্ম রাখি তায়
হাসি হাসি ভাসি যায়
ষোড়শী রূপসী বামা পূর্ণিমা যামিনী। ইত্যাদি

যখন পড়ি তখন তার ভেতর থেকে বিহারীলালের যে ধ্যানী মূর্তি ধরা দেয় সেখানে তিনি বিশুদ্ধ আনন্দের বা আর্টের পূজারী। কিন্তু যুগধর্মকে তিনি অস্বীকার করেন কি ক'রে? তাঁর রচনায় গীতমুখরতা অধিকাংশ স্থান জুড়ে থাকলেও কবি যখন নিসর্গ সন্দর্শনে সমুদ্রকে উদ্দেশ করে বলেন—

'তোমারি হৃদয়ে রাজে ইংলণ্ড দ্বীপ,
হরেছে জগত মন যাহার মাধুরী
শোভে যেন রক্ষকুল উজ্জ্বল প্রদীপ ;
রাবণের মোহিনী কনক লঙ্কাপুরী ॥
এদেশেতে রঘুবীর বেঁচে নাই আর,
তাঁর তেজোলক্ষ্মী তাঁর সঙ্গে তিরোহিতা !
কপটে অনাসে এসে রাক্ষস দুর্বার,
হরিয়াছে আমাদের স্বাধীনতা সীতা।'

এই উক্তির কোথাও অস্পষ্টতা নেই। পরাধীনতার বেদনা কবির এই ছত্রগুলিতে স্পষ্ট বেজে উঠেছে। এখানে তাঁর অন্তরের কথা বাণীরূপ ধরে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর সামাজিক মনের সত্য প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু কবিধর্ম লিরিকের ভাবসলিলে অবগাহন করে এই বাস্তব চেতনাকে দূরে সরিয়ে দিকে চায়। স্পষ্ট করে বলার অদম্য বাসনা জাগলেও বিহারীলালের যুগে সে সময় আসেনি। তাই কবি আবার তাঁর গানের সুর দিলেন বদলে। আবার তিনি গেয়ে উঠ্‌লেন—

দাঁড়ায়ে তোমার তটে হে মহাজলধি,
গাহিতে তোমার গান, এল একি গান
যে জ্বালা অন্তর মাঝে জ্বলে নিরবধি।
কথায় কথায় প্রায় হয় দীপ্যমান।

কবির এই উক্তি থেকে আমরাও বুঝতে পারি যে, ভাবে বিভোর কবির অন্তরের নিত্য যে বেদনা—সে পরাধীনতার বেদনা। আবার বাইরে যে আকুলতা প্রকাশ পাচ্ছে যে কাব্যনির্ঝরের কুলকুল ধ্বনি শোনা যাচ্ছে, তাতে মহান্ আনন্দ লাভের ব্যাকুল সুরই বেজে উঠেছে। কিন্তু অন্তরে বাইরে এই যে বৈপরীত্য এর কারণ নিশ্চয় এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে, কবির স্বাভাবিক বেদনা প্রকাশের গতিপথে বাইরের বাধা অলৌকিক আনন্দের পথাভিমুখী করে দিয়েছে এবং সেই বেদনাবোধই কবির কাব্যকে এত মধুর করে তুলেছে।

বিহারীলালের 'পূর্ণিমা' ও 'অবোধ বন্ধু' (১২৭৩-১২৭৬) নামে দুখানা পত্রিকারও সম্পাদনা করেন। তিনি অনেকগুলি গানও রচনা করেছিলেন।

তাঁর কাব্যগুলি সঙ্গীত হিসাবে গাওয়া যায়। কবিও তাই প্রায় কবিতার প্রথমে রাগ-রাগিণীর নাম, তাল, মান প্রভৃতির উল্লেখ করেছেন।

অক্ষয়চন্দ্র, সুরেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রভৃতি

এ সময়কার কয়েকজন কবির উল্লেখ এখানে করা একান্ত দরকার। বাঙ্‌লা সাহিত্যে অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের নাম খুব কম লোকই জানেন, বলতে কি, অনেকেই জানেন না। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনায় অক্ষয়চন্দ্রের সাহচর্য ও উৎসাহ দানকে কবিগুরু পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ অক্ষয়-চন্দ্রের কথা তাঁর জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করে গেছেন। অক্ষয়চন্দ্র রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সহপাঠী ছিলেন। ছোট কবিতা ও গান তিনি খুব তাড়াতাড়ি লিখতে পারতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যতটা সহজে তিনি রচনা করতেন, অনুরূপ সহজভাবে এবং অকুণ্ঠায় তিনি সেই রচনাগুলি হারিয়েও ফেলতেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'রচনা সম্বন্ধে তাঁহার ক্ষমতার যেমন প্রাচুর্য তেমনি ঔদাসীন্য ছিল।' বাঙ্‌লা সাহিত্যে হয়ত আজও অক্ষয়চন্দ্রের অনেক গান প্রচলিত আছে, কিন্তু রচয়িতাকে কেউ জানে না। অক্ষয়চন্দ্রের 'উদাসিনী কাব্য' ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এটি বিশুদ্ধ রোমান্টিক আখ্যায়িকা-কাব্য। বিদর্ভের রাজ্যচ্যুত রাজা বিজয়, তার কন্যা সরলা ও যুবক সুরেন্দ্র প্রভৃতিকে নিয়ে, বিশেষ করে সরলা ও সুরেন্দ্রের ভালোবাসা ও জীবনের নানা আঘাত-সংঘাতের পর সেই ভালোবাসার সার্থক পরিণতি এই কাব্যের আখ্যান-বস্তু। এই কাব্যে ভারতের দুঃখে কবির বেদনাবোধও প্রকাশ পেয়েছে। হিমালয়কে সম্বোধন ক'রে কবি যখন বলেন—

এত দেখে এত সয়ে একি চমৎকার
সরমে আনত মুখ হ'ল না তোমার।
এই যে ভারত ভূমি বৈজয়ন্ত ধাম,
আজন্ম তোমার পদে রয়েছে শয়ান—
কেমনে পাষাণ! কহ কি চিন্তা চিন্তিয়ে
কি দশা হয়েছে তার না দেখ চাহিয়ে?—

তখন বুঝতে পারি কবি-চিত্তে ভারতের দুঃখ-দুর্দশা কতখানি আঘাত করেছে। 'ভারতের অমানিশা' তাঁর পক্ষে অসহ্য।

এই যুগে অক্ষয়চন্দ্র অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ আর একজন কবিও বাঙ্‌লা কাব্য-সাহিত্যে আপনার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তিনি হচ্ছেন সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। কবি-সমালোচক মোহিতলালমজুমদার মহাশয় 'আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্যে' কবির জীবন ও কাব্য নিয়ে দীর্ঘ ও সার্থক আলোচনা করেছেন। তিনি সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এক জায়গায় বলেছেন—"সুরেন্দ্রনাথের কবিতা শুধু ভাবময় নয়, তাহা চিত্রময়।" তাঁর কাব্যে রোমান্‌টিক লক্ষণও আছে। তিনি বিহারীলালের মতো প্রেমের কবি, কিন্তু প্রেমকে বিহারীলালের মতো মর্ত্যের দুঃখ দ্বন্দ্ব থেকে স্বর্গের আনন্দলোকে পৌঁছে দেননি। আবার অন্যদিকে তিনি ক্লাসিকাল রীতির কবি। ব্রাউনিঙ্‌, সুইনবার্ণ, বায়রণ প্রভৃতির প্রভাবও তাঁর কাব্যে রয়েছে। তাঁর কাব্য-রচনা সম্বন্ধে কবি-সমালোচক মোহিতলাল বলেছেন 'জ্ঞান-গবেষণাকে ভাব-কল্পনার উপরে স্থান দিলেও তিনি কবি--প্রতিভাকেই উৎকৃষ্ট জ্ঞানের মূলাধার বলিয়া জানিতেন। কাব্যচর্চাও এক শ্রেষ্ঠ জ্ঞানযোগ—ইহাও একপ্রকার অধ্যাত্ম সাধনা, ইহা দ্বারা কেবল চিত্তশুদ্ধি নয়, জ্ঞানবৃদ্ধি হয়, ইহাও তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনিও ধ্যান করিতেন —চক্ষু মুদিয়া নয়, চক্ষু খুলিয়া ; কাব্য স্বষ্টি-গ্রন্থের টীকা, উহাই বাস্তব জীবন-যাত্রার উৎকৃষ্ট পাথেয়, উহা চিত্তরঞ্জিনী কল্পনারই একাধিকার নহে—এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যগুলি লিখিয়াছেন।"

সুরেন্দ্রনাথ দীর্ঘজীবী ছিলেন না। ১৮৭৮ সালে মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। এর ভেতর তাঁর কয়েকটি কবিতা এবং 'সবিতা-সুদর্শন' ও 'ফুল্লরা' নামে দুটি কাব্য, এবং 'বর্ষবর্তন' (১৮৭২) প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। কবি কিন্তু তাঁর 'মহিলা কাব্যে'র (১২৭৮) জন্যই বিখ্যাত। এই কাব্য তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। কাব্যের নামকরণ কবি নিজে করেননি। তাঁর ছোট ভাই দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় নামকরণ করেছিলেন। নারীর মাতৃরূপ, জায়ারূপ ও সহোদরারূপের স্তুতিগান এই কাব্যে করা হয়েছে। কবি-সমালোচক মোহিতলাল বলেছেন 'সুরেন্দ্রনাথের মহিলা কাব্যও নারীস্তোত্র মূলক বটে, কিন্তু তাহাতে বিস্ময় অপেক্ষা সজ্ঞান শ্রদ্ধা, কল্পনার রসাবেশ অপেক্ষা বাস্তবের বস্তুপরীক্ষাই অধিক। সুরেন্দ্রনাথ নারীচরিত্রের গূঢ় রহস্য চিন্তা না করিয়া সংসারে ও সমাজে, ইতিহাসে ও লোকব্যবহারে, নারীর নানা গুণের যে প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাই সবিস্তারে নানা দৃষ্টান্ত, উপমা ও

অলঙ্কারে মণ্ডিত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনার ভঙ্গিই মহিলা কাব্যের প্রধান গুণ।' অন্যত্র বলেছেন, 'স্থানে স্থানে প্রেমসম্বন্ধে অতি উচ্চ ও গভীর কবিত্ব প্রকাশ পাইলেও, বৈষ্ণবকবির মত ভাব-গভীর আধ্যাত্মিকতা অথবা পাশ্চাত্ত্য কবিগণের মতো, নর-নারীর হৃদয়-বেদনার অসীম রহস্যের দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হন নাই।' কারণ 'ভোগের বস্তু বলিয়াই নারীর প্রতি অবজ্ঞার ভাব' তাঁর ছিল না। নারী-পূজায় পুরানো কবিদের 'দেহ সম্ভোগের' রসকে তিনি বাদ দেননি। নারী সম্বন্ধে 'মহিলা কাব্যে' এক জায়গায় বলছেন—

লতাপর্ণ-পল্লবে নিকুঞ্জ মনোহর
রচে নর বাসরের ঘর ;
ফুল্লতল্পে কামিনীর ফুল্ল কলেবর
ফুলশরে পুরুষ কাতর !
নর-পশু বনচারী
গৃহস্থ করিল নারী।
ধরা 'পরে করিল রোপণ
সমাজ তরুর বীজ—দম্পতি মিলন।

এখানে নারীজীবনের যে মাধুর্য ফুটে উঠেছে তাকে আবার তিনি সাংখ্য দর্শনের তত্ত্বের ভেতর দিয়েও প্রকাশ করেছেন। নারীকে কবি জীবনের নানা বাস্তব অনুভূতির ভেতর দিয়ে কাব্যময় করে তুলেছেন।

কবি বলছেন—

সংসার তখন ছিল এখন যেমন—
ছিল নর জড়ের প্রকার,
আদি-নারী দিয়া তার সুখ আস্বাদন
বিকশিল বোধ করি তার।
মুসা মিলে সাংখ্য সনে
বুঝ বিচারিয়া মনে,
সুখবোধে দুঃখের সন্ধান—
বিপরীত বিনা কোথা বিপরীত জ্ঞান !

তত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে একটা লিরিকের ব্যঞ্জনা এবং সেই সঙ্গে কাব্য-মাদকতাও

ফুটে উঠেছে। 'মহিলা কাব্যকে' সেই যুগের গতানুগতিকতা-বিমুখী লিরিক কাব্য বলা যায়। সুরেন্দ্রনাথের ব্যক্তিজীবনেও যে ক্ষণিকের বিচ্যুতি ও কবির খেদোক্তির কথা মোহিতলালের সমালোচনা থেকে আমরা জানতে পারি তা থেকেও এই কাব্য রচনার সহজ প্রেরণার উৎস খুঁজে নেওয়া খুব শক্ত নয়।

কবি সুরেন্দ্রনাথ টডের রাজস্থানেরও কিছুটা অনুবাদ করেছিলেন। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর রচিত গদ্য বই 'বিশ্ব রহস্য' প্রকাশিত হয় এবং তাঁর মৃত্যুর পর 'হামির নাটক' (১৮৮১) প্রকাশিত হয়।

সুরেন্দ্রনাথ জ্ঞানের পথ বেয়ে ভাবের ঊর্ধ্বলোকে—কাব্যের উচ্চগ্রামে নিজের স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠা করবার প্রত্যাশী ছিলেন। জ্ঞানমার্গিক ভাব-তন্ময়তা স্ববিরোধী হলেও বাস্তব ভিত্তিতে অধিষ্ঠিত তত্ত্বজিজ্ঞাসু সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে সে যুগে তা সম্ভব হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যধারায় বিহারীলাল সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির মধ্যে আমরা মাইকেলের উদাত্ত গম্ভীর তূর্যনাদ আর শুনতে পাইনে। তাঁদের কাব্যে বেজে উঠল বিশুদ্ধ লিরিকের—আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসের—ভাবে বিভোর বাউলের একতারার সুর। মাইকেল চেয়েছিলেন গতানুগতিকতার নিগড় ভাঙ্‌তে। এই প্রচেষ্টায় তিনি কিছুটা সাফল্যও লাভ করেছিলেন। বীররসকে বীরছন্দে রূপদান করেছেন। তাঁর পরে হেম-নবীনের কাব্যেও এই প্রচেষ্টা চলেছিল কিন্তু ততটা সাফল্য লাভ করেনি। লিরিকের উচ্ছ্বাসে বাঙ্‌লার মধুসূদনোত্তর কাব্য মুখরিত হয়ে উঠল। ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে' কয়েকজনের আলোচনা করেছেন এবং অনেকের নাম উল্লেখ করে গেছেন। কিন্তু ঐ কবিদের মধ্যেও কয়েকজন বলিষ্ঠ সাহিত্যপ্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামী কবিদের কথা বাদ দিলে আরও যে কয়েকজন কবি বাঙ্‌লা সাহিত্যের সেবা ক'রে গেছেন তাঁদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি।

হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখনকার যুগে আখ্যান কাব্য ও খণ্ড কাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির নাম 'চিত্ত মুকুর' (১২৮৫), 'বাসন্তী', 'যোগেশ' (১৮৮১), 'চিন্তা' (১৮৮৭) প্রভৃতি। 'যোগেশ' কাব্যখানি আখ্যায়িকা কাব্য। যোগেশ, নর্মদা, মন্দাকিনীর প্রেমদ্বন্দ্ব ও ট্রাজিড়িতে এই কাব্যের পরিসমাপ্তি। অন্যান্য খণ্ডকবিতায় ঈশানচন্দ্রের

দেশাত্মবোধ এবং যুগধর্মোচিত জাতীয়-অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। ঈশানচন্দ্রের আদর্শ ছিলেন মধুসূদন, নবীনচন্দ্র ও হেমচন্দ্র। ইনি মাত্র একচল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। 'যোগেশ' কাব্য পাঠে মনে হয় নবীনচন্দ্রের মতো Personal element বা আত্ম-সম্পর্ক এই কাব্যেও প্রবল। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যরসে এই কাব্যও রসায়িত হয়ে উঠেছিল।

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬) যদিও সরস গদ্য, গণিত, দর্শনশাস্ত্র রচনার জন্যই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন, তাঁর কাব্য রচনাও বাঙ্‌লা সাহিত্যে বিশিষ্টতা অর্জন করেছে। তার একটি প্রমাণ তাঁর স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্য, এবং 'যৌতুক না কৌতুক' (রবীন্দ্রনাথের বিবাহ উপলক্ষে লেখা)। তিনি হাল্‌কা রসের কবিতা রচনাতেও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন—"আগে বরাবর আমি বাঙ্গালা কবিতা লিখিতাম। কবিতা রচনার দিকে আমার খুব ঝোঁক ছিল ; তার মধ্যে হয়ত হালকা রঙ্গরসের কবিতাও ছিল।' মেঘদূত প্রসঙ্গে তিনি স্মৃতিকথায় যা লিখেছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'সিপাহীযুদ্ধের কিছু পরে আমার মেঘদূত প্রকাশিত হইল।...মেঘদূতে আমার নাম ছিল না।......আমি যখন মেঘদূত লিখি, তখন ও ধরণের বাঙ্গালা কবিতা কেহ লিখিতেন না ; ঈশ্বরগুপ্তের ধরণটাই তখন প্রচলিত ছিল। মাইকেল তখন ইংরাজিতে কবিতা লিখিতেন। একদিন হাইকোর্টে আমার ভগিনীপতি সারদাকে তিনি বলিলেন, 'আমার ধারণা ছিল বাঙ্গালায় ভাল কবিতা রচিত হ'তে পারে না ; মেঘদূত পড়ে দেখছি, সে ধারণা ভুল।' মেঘদূতের অনুবাদ দ্বিজেন্দ্রনাথের কবিত্বের একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।

কুবের আলয় ছাড়ি উত্তরে আমার বাড়ি,
গিয়া তুমি দেখিবে সেথায়।
সম্মুখে বাহির দ্বার বাহার কে দেখে তার ;
ইন্দ্রধনু যেন শোভা পায়।

ভাষার এই সরলতা ও মৌলিকতা দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বাভাবিক কবিত্বশক্তির প্রকাশের পথ অনেকখানি সুগম করে দিয়েছিল। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্য রচিত হয়। এই স্বপ্নপ্রয়াণের রচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে একজায়গায় বলেছেন, 'বড়দাদার কবিকল্পনার এত প্রচুর প্রাণশক্তি

ছিল যে, তাহার যতটা আবশ্যক তাহার চেয়ে ফলাইতেন বেশী।' ডাঃ সুকুমার সেন বলেছেন, 'স্বপ্নপ্রয়াণ আধ্যাত্মিক কাব্যমাত্র নহে, ইহা পুরাপুরি রসাত্মক কাব্য।' এই কাব্যের কিছু কিছু অংশ দ্বিজেন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশ করবার জন্য পাঠান। কবির মতে হয়ত অনেক অংশ ছাপানো হয়নি কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষে' যেন তার অনেকখানি প্রভাব রয়েছে। একথা তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় নিজে বলেছেন। 'স্বপ্নপ্রয়াণের' ছন্দ দ্বিজেন্দ্রনাথের কল্পিত। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কালের অনেক ছন্দেই স্বপ্নপ্রয়াণের ছন্দের সার্থক প্রয়োগ আছে। ভাষা প্রয়োগে বিহারীলালের মতোই দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বাভাবিক সারল্য প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'স্বপ্নপ্রয়াণ যেন একটা রূপকের অপরূপ রাজ-প্রাসাদ.........ইহার মধ্যে কেবল ভাবের প্রাচুর্য নহে, রচনার বিপুল বিচিত্রতা আছে।' স্বপ্নপ্রয়াণের

'ভাবাঞ্জনে অপূর্ব নয়ন লভি
সন্ধ্যাভ্র-গিরি-শিখরে কল্পনারে নিরখিল কবি', ইত্যাদি—

ছন্দভঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের বলাকার ছন্দের পূর্বাভাস পাই। মুক্ত পয়ারের পরিচয়ও এই কাব্যে পেয়েছি। যেমন—

গম্ভীর পাতাল। যথা কালরাত্রি করালবদনা
বিস্তারে একাধিপত্য। শ্বসয়ে অযুত ফণি-ফণা
দিবা নিশি ফাটি রোষে; ঘোর নীল বিবর্ণ অনল
শিখা-সঙ্ঘ আলোড়িয়া দাপাদাপি করে দেশময়
তমোহস্ত এড়াইতে।'

ভাববৈচিত্র্য, ভাষার প্রাঞ্জলতা ও সঙ্গীতমাধুর্য স্বপ্নপ্রয়াণকে অপূর্বতা দান করেছে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ চিত্রকলা ও সঙ্গীতে অনুরাগী ছিলেন। তাঁর পত্রাবলী ও বাঙ্‌লা সাহিত্যে সরল রচনার এক বিশেষ নিদর্শন। তখনকার যুগের ইংরেজি শিক্ষিতদের ইংরেজি-বাঙ্‌লা মেশানো রচনার নিদর্শন তাঁর পত্রাবলীতে পাওয়া যায়। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা একটি চিঠিতে তাঁর এই ধরণের রচনার নিদর্শন পাই। চিঠিতে তিনি লিখছেন—'......আমাদের দেশের লোক এমনি ঘোর অরসিক যে, একটা জিনিস যাহা prima facei ridiculous, সেই ridiculousness তাহাদের চক্ষে আঙুল দিয়া না দেখাইলে তাঁহারা

কোনোমতেই দেখিতে পান না। আবার দেখাইয়া দিলে বলেন 'ও তো জানাই আছে!' না দেখাইয়া দিলে ridiculousকে sublime মনে করিয়া তাহার গোঁড়া admirer হন—এইরূপ উভয় সংকটে আমার মন্তব্য এই যে—দেখাইয়া দেওয়া at any risk is preferable to দেখাইয়া না দেওয়া for প্রবীণতা's sake!' রচনার এই সরসতা লক্ষণীয়। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত এক পত্রে কবি দ্বিজেন্দ্রনাথের নির্ভীক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তার কিছুটা অংশ উদ্ধৃত করা গেল।

'আমার বিশ্বাস এই যে, British Govermentএর pressure বর্তমান অবস্থায় আমাদের মাথার উপর থেকে অপনীত হয়, তবে আমাদের কী যে শোচনীয় দশা হইবে তাহা একমুখে বলা যায় না। এখন এই ঘোরতর দুরবস্থা মধ্যেও যখন আমাদের চক্ষু ফুটিতেছেনা তখন British Governmentএর pressure অন্তর্ধান করিলে—আমাদের দিশী governorরা, অত্যাচারী জমিদারেরা, priest-ridden উচ্চবংশীয়েরা এবং স্বার্থপর ধনাঢ্যেরা যে, হাতে মাথা কাটিবে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। ... এ কথা খুব ঠিক যে, তুমি যেমন লিখেছ, governor ও governedএর মধ্যে gap বাড়ানো অনর্থের মূল—gap কমানো শ্রেয়ের মূল। শেষোক্ত missionএ রবি (রবীন্দ্রনাথ) কতকটা কৃতকার্য হয়েছেন—এবং আশাহুরূপ কৃতকার্য হোন্ ইহা আমার আন্তরিক প্রার্থনা। To be our own master ought to be our sole end and endeavour—এটা বুদ্ধদেবের সর্বপ্রধান উপদেশ, এই উপদেশটি আমরা যে পরিমাণে কার্যে পরিণত করিতে পারিব সেই পরিমাণে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করিব—ইহা বেদবাক্য। গান্ধীর জানা উচিত যে, আমাদের দেশের উচ্চবংশীয় এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা নিম্নশ্রেণীদের প্রতি যেরূপ অবজ্ঞাসূচক নির্দয় ব্যবহার করিয়াছেন এবং এখনো পর্যন্ত করিতে ক্ষান্ত হন নাই—আমাদের সেই পাপের ফল আমরা ভোগ করিতেছি, অতএব charity begins at home। British Government কাজ একটি করেন অতিশয় গর্হিত—সেটা এই যে, আমাদের দেশের যে কোনো লোক দেশের হিতসাধনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন (যেমন তিলক প্রভৃতি)—অমি Government তাঁহার প্রতি খড়্গহস্ত হন—তাই আমি বর্তমান British Governmentএর মর্মান্তিক বিরোধীপক্ষ।' এ ছাড়াও হিন্দু মেলার সময়

তাঁর স্বাধীন চিন্তাধারা, দেশপ্রেমে জাতীয়তাবোধের আদর্শের পরিচয় তাঁর তৎকালীন চিঠিপত্র থেকেই পাই। তিনি বলেছেন, 'আমি চিরকাল স্বদেশী'। কিন্তু এ স্বদেশীয়ানায় 'বিলাতী গন্ধ' তিনি অপছন্দ করেন, তাই স্পষ্টত রঙ্গলাল, রাজনারায়ণের স্বদেশীয়ানাকে তিনি বারো আনা বিলাতি ও চার আনা স্বদেশী বলতে দ্বিধা করেন নি। তাঁতি, কামার, কুমোরদের নিয়ে জাতীয় স্বদেশী মেলা বসাবার ইচ্ছেই ছিল তাঁর বেশী। এই সময়ে তাঁর বিখ্যাত 'মলিন মুখ-চন্দ্রমা ভারত তোমারি' গানখানি রচিত হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথ অনেক ব্রহ্মসঙ্গীতও রচনা করেছিলেন। তিনি ভারতী ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন। এই সব পত্রিকায় তাঁর দর্শনবিষয়ক নানা প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'ত।

কবি দ্বিজেন্দ্রনাথের কথা বলতে গিয়ে তাঁর জীবনের অন্যান্য দিকের কথা বলবার চেষ্টা করেছি। দ্বিজেন্দ্রনাথের অনুজ সত্যেন্দ্রনাথও কবিতা, সঙ্গীত, ও অনুবাদ-কাব্য রচনা করেছিলেন। সেকালের জাতীয় সঙ্গীতের মধ্যে তাঁর রচিত 'মিলে সব ভারত সন্তান, একতান মনপ্রাণ, গাও ভারতের যশোগান' গানখানি বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র 'এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক' বলে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন। এছাড়া তিনি ব্রহ্মসঙ্গীতও রচনা করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ মেঘদূত (১৮৯১) ও গীতার (১৯০৫) অনুবাদ করেন। সেক্‌সপীয়রের সিম্‌বেলিন অবলম্বনে 'সুশীলা-বীরসিংহ' (১৮৬৮) নামে একখানি নাটকও রচনা করেন। ভারতবর্ষে সত্যেন্দ্রনাথই প্রথম ভারতীয় সিভিলিয়ান। তিনি উদারনৈতিক ও প্রগতিপন্থী ছিলেন। সুদীর্ঘকাল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন।

রাজকৃষ্ণ রায় নাটক, উপন্যাস, অনুবাদ সাহিত্য, কবিতা সবই রচনা করেছেন। নাট্যকার হিসাবে রাজকৃষ্ণের বাঙ্‌লা সাহিত্যে যেমন একটা বিশেষ স্থান আছে, কবিতা রচনাতেও সেই বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রয়েছে। আবার 'হিরন্ময়ী', 'কিরণময়ী' প্রভৃতি উপন্যাসও উপযুক্ত খ্যাতি দাবী করতে পারে। কাব্যের রচনাভঙ্গীতে যেমন হেম-নবীনের প্রভাব লক্ষণীয়, তেমনই ভাবের সহজ ব্যঞ্জনাতে তিনি স্বকীয়তা রক্ষা করেছেন। বিশেষ করে নতুন ছন্দের ব্যবহারে তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। তিনি রামায়ণ, মহাভারতের অনুবাদও করেছিলেন। তাঁর 'মোহন্ত-বিলাপ' (১৮৭৪), 'অবসর সরোজিনী'

'ভারতযুবরাজ' (১৮৭৫), 'ভারত গান' (১২৯৫), 'কল্কিপুরাণ' (১২৯৯) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কাব্য। তাঁর কাব্যে মুক্তক ছন্দ ও গদ্য ছন্দের অবতারণাও ঘটেছে। তার গতির ক্ষিপ্রতায় কাব্যের চিত্রপরম্পরা সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কাব্যের স্থানে স্থানে স্বদেশপ্রীতির নিদর্শনও মিলে। পাশ্চাত্ত্য-আদর্শলব্ধ জাতীয়তাবোধ এবং জাতীয় পরাধীনতার মনোবেদনার যুগে রাজকৃষ্ণ রায় সার্থক সাহিত্য সাধক।

এই যুগের আর একজন সার্থকনামা কবি হচ্ছেন আনন্দচন্দ্র মিত্র (১৮৫২-১৯০৩)। বাঙ্‌লা সাহিত্যে আনন্দচন্দ্র 'মিত্রকাব্য' ও 'হেলেনা কাব্যে'র জন্যই প্রসিদ্ধ। কিন্তু এছাড়া তিনি রাজা রামমোহনের জীবনী অবলম্বনে 'ভারতমঙ্গল কাব্য' (১৮৯৪—অংশত প্রকাশিত) রচনা করেছিলেন। আনন্দচন্দ্রের কাব্যরচনার ক্ষিপ্রগতি দোষ বা গুণ হিসেবে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তাঁর 'হেলেনা কাব্য' হোমারের ইলিয়াড্‌ থেকে নেওয়া। রচনাভঙ্গী মধুসূদনেরই মতো। তিনি মুখ্যত মধুসূদনের নির্দেশিত পথ বেয়েই 'হেলেনা কাব্য' রচনা করেছেন। তবে কাব্যে বিভিন্ন ছন্দের অবতারণাও ঘটেছে। রামমোহনের জীবনীমূলক ভারতমঙ্গল কাব্যে কবির দেশাত্মবোধ ও জাতিপ্রীতি স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ভারতমঙ্গলে তিনি বলছেন—

অবজ্ঞেয় বঙ্গবাসী অবনীতে এবে,
হইবে জগৎপূজ্য শৌর্য-বীর্য জ্ঞানে
একদিন ; শুভদিনে উদ্ধারিবে তারা
পরাক্রমে পুণ্যভূমি জননী ভারতে।

আনন্দচন্দ্র কাব্য ছাড়া বহু সঙ্গীত এবং উপন্যাস (রাজকুমারী, ১৮৭৯) রচনা করেছিলেন।

এই সময়ে ব্যঙ্গ কবিতায় জগবন্ধু ভদ্র ও ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন। জগবন্ধু ভদ্র 'মেঘনাদ বধ কাব্যের' প্যারডি 'ছুচ্ছুন্দরী বধ কাব্য' রচনা করেন। এই প্যারডিখানিকে খণ্ডকাব্য বলা যেতে পারে। এঁর স্মরণীয় সাহিত্যসেবা পদাবলী সংগ্রহ। ইনি 'শ্রীগৌরপদ তরঙ্গিণী'র জন্যই সমধিক প্রসিদ্ধ। দেশের দুর্দশা স্মরণে 'ভারতের হীনাবস্থা' নামে একখানি ছোট গ্রন্থও রচনা করেন।

বাঙ্‌লা সাহিত্যে কিন্তু ইন্দ্রনাথই ব্যঙ্গকাব্য রচনার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। তখনকার যুগের দেশসেবা ও দেশোদ্ধারের নামে যে দুর্বলতা বাঙালী-জীবনে প্রকাশ পেয়েছিল তার পরিচয় তাঁর 'ভারত-উদ্ধার' কাব্যে আমরা পাই। বাঙালী এমনিতে দুর্বল,—ঘরেই তার যত বাহাদুরী। ভারত উদ্ধারের ব্রত নিয়েছে সে—ইংরেজকে তাড়াবে, কিন্তু মনে বল নেই। তাই জোর করে সে বলে--

সফল জনম
করিব, ভারতে দিয়া স্বাধীনতা ধন--
বহুদিন অপহৃত হইয়াছে যাহা।

নানা অনুরোধ-উপরোধে যখন স্ত্রী স্বামীকে স্বাধীনতা সংগ্রামে যেতে বাধা দিতে পারলনা তখন স্ত্রী বলে—

নিতান্তই যাবে যদি হৃদয়বল্লভ
... ...
আলুভাতে ভাত তবে দিই চড়াইয়া
খাইয়া যাইবে যুদ্ধে।

ইন্দ্রনাথ ভারত-উদ্ধারের বাড়াবাড়িকে বরদাস্ত করতে পারেননি। তাঁর ব্যঙ্গরচনায় তিক্ততা তেমন ছিলনা। সরসতা ও লঘুতা ইন্দ্রনাথের ব্যঙ্গরচনার প্রধান গুণ।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনার প্রথম যুগে আর যাঁরা কাব্য রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সেন, গোবিন্দচন্দ্র দাস, কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ, বিজয়চন্দ্র মজুমদার রবীন্দ্রনাথের বয়ঃকনিষ্ঠ অক্ষয়কুমার বড়াল, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কামিনী রায়, শশাঙ্কমোহন সেন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কামিনী রায় এবং অক্ষয়কুমার বড়াল রবীন্দ্রনাথের দ্বারা কিছুটা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবি। স্থানে স্থানে কিছুটা রবীন্দ্রপ্রভাব থাকলেও তাঁর নিজস্ব একটা শিল্প-ভঙ্গীও ছিল। কবি-সমালোচক মোহিতলাল দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলেছেন—'তাঁহার প্রতিভা আত্মমুগ্ধ। ......বিহারীলালের ধ্যান ছিল, দেবেন্দ্রনাথের কেবল আরতি।' দেবেন্দ্রনাথের রচনার প্রধান গুণ—সহজতা। তাঁর যা বলবার

তা তিনি সহজেই বলে গেছেন। চিন্তা বা যুক্তির কোনো অবতারণা ঘটান নি। তিনি Emotion-এর মুখে আপনাকে ছেড়ে দিয়েছেন। 'চিন্তা ও বিচার বিশ্লেষহীন কবিপ্রতিভা উচ্চ-নীচ ও সমতল ক্ষেত্রে কল্পনাকে যেন অবন্ধন অবস্থায় ছাড়িয়া দিয়াছে।' বিহারীলাল বা সুরেন্দ্রনাথের মতো তিনিও নারীজীবনের রহস্যময়তার দিক উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছেন। রূপের পূজা তাঁর কাব্যের একটা মূল সুর। সেখানে তিনি রূপ-মদে মাতাল হয়ে উঠেছেন। এই Sensuousness আমাদের প্রাচীন সাহিত্যেও ছিল। আমাদের প্রাচীন ক্লাসিক রীতি এবং পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের রোমান্টিক ভাবোচ্ছ্বাস তাঁর কবিতাকে বর্ণবৈচিত্র্য দান করেছে। সৌন্দর্যকে তিনি ভোগ-রসসিক্ত করে অনুভব করছেন। একদিকে বৈষ্ণব ভাবুকতা, অপরদিকে কাব্যে ভোগরসাবেশ বা Sensuousness দেবেন্দ্রনাথের কাব্য-রচনাকে অপূর্বতা দান করেছে। নারীকে কবি বলছেন—

যাদুকরি, তুই এলি—
অমনি দিলাম ফেলি,
টীকা ভাষ্য,—তোর ওই চক্ষু-দীপিকায়
বিদ্যাপতি, মেঘদূত সব বোঝা যায়।

এইটুকুর মধ্যেই কবির নারীমূর্তি ও তার মিলন-বিরহের অপূর্ব রূপটি ফুটে উঠেছে। প্রকৃতিও তার ঐশ্বর্য দিয়ে কবিতাগুলিকে যেন সার্থক করে তুলেছে। যেমন—

তরুটি ভরিয়া গেছে অশোকে অশোকে
বসেছে জোনাকি-পাঁতি কুসুমে কুসুমে
কবিচিত্ত ভরি গেল মাধুরী-আলোকে,
তুমি সখি তরু হ'তে নেমে এলে ভূমে! (দীপহস্তে যুবতী)

দেবেন্দ্রনাথের কবিত্বশক্তির মৌলিকতা সম্বন্ধে মোহিতলালের ভাষায় বলা যায় 'তিনি স্বাভাবিক ভাবাবেগে আর্টের সংযম অভ্যাস করেন নাই—তাঁহার প্রকৃতিই আর্ট-বিরোধী, অথচ এই প্রকৃতির পূর্ণ শক্তি বলে তিনি এমন সকল শ্লোক রচনা করিয়াছেন যাহা আর্ট হিসাবেও নিখুঁত। তাঁহার কাব্য ও জীবন এক ছিল,...তথ্যের সত্যকে তিনি কখনও গ্রাহ্য করেন নাই...।' তাঁর কাব্যে মাইকেল-বিহারীলালের কাব্য-ঐশ্বর্যের সার্থক মিলন ঘটেছে।

সেই যুগে বসে, সমাজের দুঃখ-দুর্দশার মাঝে থেকে বস্তুনিরপেক্ষ কাব্য-সাধনা বিস্ময়েরই বটে। মোহিতলালের ভাষায় '…দেবেন্দ্রনাথের কল্পনায় ধ্যান ছিল না; নেশার মত্ততা ছিল। 'He ate the laurel and is mad'— একথা তাঁহার সম্বন্ধেই খাটে।'

দেবেন্দ্রনাথের পরে দুঃখ-দারিদ্র্য জর্জরিত ভাওয়ালের স্বভাবকবি গোবিন্দ দাসের নাম (১৮৫৫-১৯১৮) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সারাজীবন অত্যাচারী জমিদারের ও তার কর্মসচিবের লাঞ্ছনা এবং দ্রারিদ্র্যে অসহ্য নিপীড়ন তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল। তার ভেতরও দুঃখের করুণ ভৈরবীতে তাঁর কাব্যবীণাটি বেজে উঠেছিল। এদিক থেকে অভাবগ্রস্ত সমাজের ভেতর থেকে প্রতিনিয়ত অভাবের কুণ্ড জ্বালিয়ে তাঁর যে কাব্য-সাধনা বাঙ্‌লা সাহিত্যের পক্ষে তা এক বিশেষ সম্পদ। কবি 'প্রেম ও ফুল' (১২৯৪), 'কুঙ্কুম' (১২৯৮), 'কস্তুরী' (১৩০২), 'চন্দন' (১৩০৩), 'ফুলরেণু' (১৩০৩), 'বৈজয়ন্তী' (১৩১২), 'মগের মুলুক' (১২৯৯) প্রভৃতি রচনা করেন। গোবিন্দদাসের ছিল প্রবল ও প্রচুর প্রাণশক্তি, শত লাঞ্ছনা নিপীড়ন তাঁর কবিত্ব শক্তিকে ম্রিয়মাণ করতে পারেনি, বরং অত্যাচারীর নির্মমতা তাঁর ভেতর থেকে লাঞ্ছিতের স্পষ্ট প্রকাশ ঘটিয়েছিল। কবির জীবনে যত আঘাত, যত দুঃখ বিভীষিকার মতো এসেছিল তাকে নিজের কবিত্বশক্তির প্রচণ্ডতায় ও আবেগে তিনি ধূলিলুণ্ঠিত করেছেন। স্বাভাবিক কবিত্ব, নিপীড়িতের জন্য বেদনাবোধ, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে ক্ষোভোন্মত্ততা, পরাধীনতার গ্লানিতে তীব্র ঘৃণার ভাব তাঁর কাব্যকে অসামান্য সৌষ্ঠব দান করেছে। প্রকৃতি কবির নিত্য-সহচরী। গোবিন্দ দাস ছিলেন বাঙ্‌লার জনসাধারণের কবি। কবি-সমালোচক শশাঙ্কমোহনের মতে 'গোবিন্দচন্দ্র দাস আধুনিক বঙ্গের বায়রন্‌।' তাঁর রচনার কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। যেমন,

> স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে? এদেশ তোমার নয়;—
> এই যমুনা গঙ্গানদী, তোমার ইহা হত যদি
> পরের পণ্যে, গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয়?
> … … … …
> এই যে ক্ষেত্র শস্য ভরা, তোমার ত নয় একটি ছড়া,
> তোমার হ'লে তাদের দেশে চালান কেন হয়?…'

এক সময় স্বদেশী গান হিসেবে এই গানটি খুবই প্রচলিত ছিল।

নারী রূপের পূজারী হিসেবে তিনি বলেন—'আমি তারে ভালোবাসি অস্থি মাংস সহ।' এখানে দেহসর্বস্ব প্রেমেরই প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর অন্য একটি কবিতায় গ্রাম্যপ্রকৃতির রূপ সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে—

বৈশাখে বিকাল বেলা মেঘে মেঘে করে খেলা
বহিতেছে মৃদু মৃদু শীত সমীরণ!
দয়েল বসিয়া আছে
পশ্চিমে 'কাফিলা' গাছে
ঝুলিছে বাঁশের আগে মুমূর্ষু কিরণ!

ভাওয়ালে থাকাকালীন 'বান্ধব' সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের বিরাগ-ভাজন হয়ে নিতান্ত অযৌক্তিকভাবে গ্রাম থেকে তিনি নির্বাসিত হন। 'নির্বাসিতের আবেদন' কবিতায় তাঁর যে মর্মবেদনা প্রকাশ পেয়েছে তা প্রতিযুগের গৃহহীন সব-হারানো মানুষেরই মর্মবেদনা—

তোমরা বিচার কর জনসাধারণ
এ নহে সামান্য শাস্তি,
এ ভাই যৎপরোনাস্তি,
ফাঁসির পরেই এই চির-নির্বাসন!
বিনা দোষে কেন তবে
এ শাস্তি আমার হবে?
দরিদ্র দুর্বল আমি, এই কি কারণ?

... ...

পিশাচের রাক্ষসের শত অত্যাচারে!
দুর্বল বিচার চায় তোমাদের দ্বারে!

'মগের মুলুক' রচনায় তিনি এই লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে অনেকটা ঝাল মেটাতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধ-পক্ষ ভাওয়ালের ম্যানেজারের উপর তাঁর যে স্বাভাবিক ক্রোধ জেগে উঠেছিল তারই প্রকাশ এই কাব্যখানিতে। বিপর্যস্ত ও ক্ষত বিক্ষত হৃদয়ের দীর্ঘনিশ্বাসের বহ্নি জলে উঠল তাঁর নানা কবিতায়। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও তীব্র বেদনা তখন তাঁর কাব্যের বাহন হয়ে উঠেছে। যেমন—

আমি পরবাসী,

ঘুরছি আমি নানান্ দেশে নানান্ কষ্টে নানান্ ক্লেশে

মন বসে না কোনখানে, পানার মত ভাসি।

অথবা,

ও ভাই বঙ্গবাসী, আমি মর্লে

তোমরা আমার চিতায় দিবে মঠ ?

আজ যে আমি উপাস করি

না খেয়ে শুকায়ে মরি,

হাহাকারে দিবানিশি

ক্ষুধায় করি ছটফট।…

মৃত্যুর পূর্বেও কবি অভাবের তাড়নায় এবং অর্থসংগ্রহের আপ্রাণ চেষ্টায় নিজে একেবারে অর্ধমৃত হয়ে পড়েন। তাই বলেছি বাঙ্‌লা দেশে আর কোনো কবির ভাগ্য এমন বিড়ম্বিত হয় নাই। সারদাচরণ মিত্র, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রভৃতি তাঁকে মৃত্যুর পূর্বে কিছু কিছু অর্থসাহায্য করেছিলেন।

সে যুগে আর একজন কবি ও সাহিত্যিক বিপ্লবী মন নিয়ে ক্ষণিকের জন্য বাঙ্‌লা সাহিত্য আসরে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি হচ্ছেন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (১৮৬১-১৯০৭)। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্‌লা সমাজ ও সাহিত্যে কালীপ্রসন্নের একটি বিশেষ স্থান আছে; কাব্যবিশারদ শুধু কাব্য রচনাতেই ব্যুৎপত্তি লাভ করেনি, তখনকার দিনের স্বদেশী আন্দোলনেও বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং তার জন্য তাঁকে অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয়। ১৮৭৮ সনে প্রকাশিত সমাজ বিষয়ে রচনা 'সভ্যতা সোপানের' জন্য সরকারের কাছে নিগৃহীত হন। সে ব্যাপারে তিনি 'সোম প্রকাশে' 'নির্দোষীর অপরাধ' নামক কবিতায় বলেছিলেন—

ভাবি নাই রাজকুল

এত দূর ভয়াকুল

সত্য বাক্যে রাজ হৃদে ভয়ের সঞ্চার।

… … … … …

স্বাধীন ইংরাজ মতি

বিচিত্র তাহার গতি

দেশী হওয়া বড় দোষ বুঝিলাম সার॥

তিনি যে কতটা স্পষ্টবাদী ছিলেন তা এই কাব্যাংশ থেকে বুঝতে পারি। তিনি রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমলের' প্যারডি 'মিঠে কড়া' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। কালীপ্রসন্ন 'প্রকৃতি', 'এন্টি-খ্রীষ্টিয়ান', 'কস্‌মোপলিটান', 'হিতবাদী' প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদনাও করেন। দেশাচার (১৮৭৯), লুক্রেশিয়া (১৮৭৯), বঙ্গীয় সমালোচক (১৮৮০), চিন্তাকুসুম (১৮৮২), রুচি-বিকার (১৮৯৭) প্রভৃতি কাব্য রচনায় তাঁর সার্থক কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাই। এছাড়া বিদ্যাপতি বঙ্গীয় পদাবলী, প্রসাদ পদাবলী, মাইকেলের ও হেমচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রচনা ও সংকলনগ্রন্থে তাঁর অসাধারণ অধ্যবসায়ের পরিচয় পাই। কালীপ্রসন্ন অনেক স্বদেশী সঙ্গীতও রচনা করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে যে আন্দোলন শুরু হয় কালীপ্রসন্ন তাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তাঁর একটি বিখ্যাত গানের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করলে তাঁর দেশানুরাগের পরিচয় পাওয়া যাবে।

মাগো, যায় যেন জীবন চ'লে,
শুধু জগৎ মাঝে তোমার কাযে
বন্দে মাতরম বলে।
লাল টুপি কি কালো কোর্তা
জুজুর ভয় কি আর চলে?
(আমি) মায়ের সেবায় রইব রত
পাশব বলে দিক জেলে ॥

... ...

আমি ধন্য হব মায়ের জন্য
লাঞ্ছনাদি সহিলে।
ওদের বেত্রাঘাতে কারাগারে
ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলিলে ॥ ইত্যাদি

কাব্যবিশারদ তাঁর নিজের মৃত্যুর পূর্বদিনে যে কবিতা লিখেছিলেন তাতে তাঁর দেশমাতৃকার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি, ভালোবাসা, দেশবাসীর প্রতি গভীর প্রীতি ফুটে উঠেছে—

তোমার মহিমা গাবে, ওমা বঙ্গভূমি!
লাঞ্ছিত তোমার নাম;

দেখে তবু চলিলাম,
এ দীর্ঘ জীবন বৃথা দেখিলে ত তুমি!
এ দুঃখ রহিল মনে
তোমার সন্তান গণে,
না দেখিয়া সমাদৃত—শমন সদনে
যেতে হ'লো—মন সাধ রহিল মা মনে।

'বিদ্যাপতি বঙ্গীয় পদাবলী' সংগ্রহখানির জন্য কালীপ্রসন্ন চিরদিন বাঙালীর স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। দুঃখের বিষয় তাঁর এই সংগ্রহখানি এখন আর পাওয়া যায় না। কালীপ্রসন্নের কবিত্বপ্রতিভা মোলায়েম ছন্দে ধরা দেয়নি, তাতে ঝাঁঝ ছিল। বিশেষ করে পরাধীন দেশের লাঞ্ছিত স্বাধীনতাকামী মন আত্ম-বিভোর লিরিকের মধুর লালিত্যে আপনাকে একেবারে ভাসিয়ে দিতে পারেনি। তাঁর কাব্যে গীতিধর্ম যেমন আছে তেমনই আছে দেশানুরাগের উদ্বেল ও উৎকণ্ঠ ভাব।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪), অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬৫-১৯১৮), কামিনী রায়, (১৮৬৪-১৯৩৩), মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩) প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবি। এঁদের মধ্যে গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর কবিতায় রবীন্দ্রপ্রভাব কিছুটা লক্ষিত হয়।

গিরীন্দ্রমোহিনী কবিতা-হার (১৮৭৩), ভারতকুসুম (১৮৮২), অশ্রুকণা, শিক্ষা (১৩০৩), অর্ঘ্য (১৩০৯) স্বদেশিনী প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন। তাঁর রচনায় একটি সহজ সারল্য ছিল। সুন্দরকে তিনি সুন্দর করেই এঁকেছেন। বলার ভঙ্গিও তাঁর স্বাভাবিক কবিত্বেরই পরিচায়ক। নিম্নোদ্ধৃত রচনাংশটি পড়লে বোঝা যাবে তাঁর রসবোধ কতখানি ছিল।

'একাকিনী আপনার মনে
ধান নাড়ে বসিয়া প্রাঙ্গনে।
শান্ত স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে গ্রাম্য মাঠে গোরু চরে
তরুতলে রাখাল শয়ান;
সরু মোটা রাস্তা দিয়ে পথিক চলছে গেয়ে
মনে পড়ে সেই মিঠে তান।

এখানে যেন Ode to Autumn কবিতার মতো একটা আমেজ এসে পড়েছে।

অক্ষয়কুমার বড়াল রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বয়সে ছোটো হলেও রবীন্দ্র-প্রভাব তাঁর মধ্যে সামান্যই আছে। বরং তাঁর সঙ্গে মিল খুঁজে পাই বিহারীলাল, সুরেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ, গোবিন্দদাসের। এই মিল কাব্যরীতির অনুকরণে নয়—এই মিল আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসের মিল। তবুও তার মধ্যে বিহারীলাল একেবারে ভাবে বিভোর। সুরেন্দ্রনাথ বিভোরতা ও উন্মত্ততায় গা ঢেলে দিয়েছেন, দেবেন্দ্রনাথ বস্তুনিরপেক্ষ রোমান্টিক, গোবিন্দদাসে ভাব ও বস্তুর দ্বন্দ্বে ভাববহ্নিশিখায় কখনও ভৈরবী, কখনও বা দীপকের তান—অক্ষয়কুমারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের লিরিক সঙ্গমে বুদ্ধিবৃত্তির ব্যঞ্জনা এবং সেই সঙ্গে বাস্তব ও আদর্শের দ্বন্দ্বও রয়েছে। অক্ষয়কুমারও নারী ও নারী-প্রেম নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। এবং যদিও তিনি ভাবের ঊর্ধ্ব-লোকে বিচরণ করতে চেয়েছেন তবুও 'তিনি নর-নারীর বাস্তব সম্পর্কের—পুরুষ ও প্রকৃতির দ্বৈত তত্ত্বের—ভাবনা কখন ত্যাগ করিতে পারেন নাই।' অক্ষয়কুমারের রচনায় বাহুল্য দোষ নেই। 'এষা' কাব্যখানিতে তাঁর দুর্লভ কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া তাঁর 'প্রদীপ' (১২৯১), 'কনকাঞ্জলি' (১২৯২), 'ভুল' (১২৯৪), 'শঙ্খ' (১৩১৭) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কাব্য।

'এষা' কাব্যের মুখবন্ধে কবির যে উক্তি তাতে কবিকে ভাবোচ্ছ্বাসমুখর মনে হলেও যেন মাটির ওপর দাঁড়িয়ে মানুষের সুখ দুঃখানুভূতি নিয়ে তিনি বলেছেন—

নহে কল্পনার লীলা—স্বর্গ নরক
বাস্তব জগত এই, মর্মান্তিক ব্যথা।
নহে ছন্দ, ভাব বন্ধ, ছন্দ রসাত্মক,
মানবীর তরে কাঁদি, যাচিনা দেবতা।

তবুও তাঁর বাক্য ভাব ও ছন্দ রসাত্মক হ'য়েই উঠেছে। বাস্তব রস প্রেম-বৈচিত্ত্য ও ভাব-প্রীতি তাঁর রচনাকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের ভাব-দ্বন্দ্ব তাঁর কাব্যে সুস্পষ্ট।

কামিনী রায় তাঁর 'আলো ও ছায়া' (১৮৮৯) কাব্যগ্রন্থের জন্যই বিশেষভাবে

স্মরণীয়। এছাড়া অশোক-সঙ্গীত (১৯১৪) পৌরাণিকী (১৩০৮) প্রভৃতি কাব্যও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর কোনো কোনো কাব্যে রবীন্দ্রপ্রভাব স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। ভাষার সারল্য, ছন্দের সংহত রূপ, ভাবের সহজ প্রকাশ তাঁর কাব্যরচনাকে বিশিষ্টতা দান করেছে। কামিনী রায় নতুন কিছু করতে যান নি। তিনি ক্লাসিকাল ধারাকেই অনুসরণ করে চলেছিলেন। বিহারী-লালের মতো ভাববিভোরতা তাঁর তেমন ছিলনা। তবে কবিতাকে শুধু কাব্যময় লীলাময় ও রূপাশ্রয়ী করেই প্রকাশ করেননি, নানা নীতি, উপদেশ এবং বস্তু-তন্ময়তার ভেতর দিয়েই তার রসরূপটি আঁকতে চেয়েছেন। কামিনী রায়ের রচনা থেকে কয়েকটি উদাহরণ দিলে তাঁর কবি-প্রতিভার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যাবে। যেমন,

গিয়াছে ভাঙ্গিয়া সাধের বীণাটি
ছিঁড়িয়া গিয়াছে মধুর তার,
গিয়াছে শুকায়ে সরস মুকুল;
সকলি গিয়াছে কি আছে আর? ইত্যাদি

এর মধ্যে একটা কাতরতা ফুটে উঠেছে। কবির অনেক কাব্যে ও কবিতায় এই বিরহ-মধুর ভাব লক্ষিত হয়। কামিনী রায়ের রচনায় Personal elementএর ভাব খুব প্রবল।

তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন
শুনে যা আমার আশার কথা,
আমার নয়নের জল রয়েছে নয়নে
প্রাণের তবুও ঘুচেছে ব্যথা।

এখানে বেদনার মাঝেও শান্তিকে কবি খুঁজে পান—আবার অন্যত্র মানবজীবনের একটা সুখেরও তিনি সন্ধান পান—

কার্যক্ষেত্রে অই প্রশস্ত পড়িয়া
সমর অঙ্গন সংসার এই,
যাও বীর বেশে কর গিয়ে রণ;
যে জিনিবে, সুখ লভিবে সেই।
পরের কারণে স্বার্থে দিয়া বলি,
এ জীবন মন সকলি দাও,

তার মত সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।

কবির ব্যক্তিগত জীবনের বেদনানুভূতির ছাপ তাঁর কাব্যে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। গিরীন্দ্রমোহিনী, কামিনী রায়, মানকুমারী বসু প্রভৃতির কবিতায়ও এই 'পার্সনাল' সুর অত্যন্ত প্রবল। যেমন,

হে অনাদি, হে অনন্ত, হারায়ে সন্তান
বিশ্ব হেরি মাতৃহীন।

অথবা,

তুমি শক্তিমান
দিতে পার, নিতে পার,—দিয়াছিলে তাই
অতুল সৌভাগ্য মম। তবু দুঃখ পাই
কেড়ে নিলে ব'লে মোর—হে ঐশ্বর্যবান,
শ্রেষ্ঠ দান তব প্রাণের সন্তান।

কামিনী রায় অনেকগুলি সনেট রচনা করেছিলেন। গঠনভঙ্গী ও ভাবাবেগের দিক থেকে ওঁর রচিত সনেটগুলি অনবদ্য হয়ে উঠেছে। কাব্যও খণ্ডকবিতা ছাড়া অম্বা এবং সিতিমা নাটক এবং ধর্মপুত্র নামে টলস্টয়ের 'গড্ সান' (Godson) গল্পের অনুবাদ করেছিলেন।

কবি মধুসূদনের ভ্রাতুষ্পুত্রী (জেঠতুত ভায়ের মেয়ে) মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩) বাঙ্‌লা মহিলা কবি ও ঊনবিংশ শতাব্দীর গীতিপ্রবণ কাব্য ধারার কবিদের মধ্যে অন্যতম। ইনিও গতানুগতিক ভাব-বিভোরতায় কাব্য রচনা করে গেছেন। মানকুমারী বসু প্রিয়প্রসঙ্গ (১৮৮৪), কাব্য কুসুমাঞ্জলি (১৮৯৩), কণকাঞ্জলি (১৮৯৬), বীর কুমার বধ কাব্য (১৯০৫), বিভূতি (১৯২৪), সোনার সাথী (১৯২৭) প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন। এ ছাড়া 'বনবাসিনী' নামে একখানি উপন্যাস (১৮৮৮), এবং 'পুরাতন ছবি' নামে একখানি আখ্যায়িকাও (১৯৩৬) রচনা করেছিলেন। বীর কুমার বধ কাব্যখানি অমিত্রাক্ষর ছন্দে অভিমন্যু বধ কাহিনীর উপর ভিত্তি ক'রে লেখা। ইনিও গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ও কামিনী রায়ের মতোই অকালে স্বামী হারিয়ে অধিকাংশই বিয়োগবিধুর কবিতা রচনা করেছেন। যেমন,

একা আমি চিরদিন একা,
সে কেন দু'দিন দিল দেখা ?
আঁধারে ছিলাম ভালো
কেন বা জ্বালিল আলো ?
আঁধার বাড়ায় যথা বিজলীর রেখা ;

এই বেদনা থেকে পরম শান্তি লাভের জন্য জীবনদেবতার কাছে করুণ মিনতি জানান—

প্রভো ! ভাঙিও না ভুল,
যে কদিন বেঁচে র'ব,
তোমারে আমারি' ক'ব,
অন্তিমে খুঁজিয়া লব ও চরণ মূল
ভুলে যদি থাকি প্রভো ! ভাঙিও না ভুল।
... ...
ক্ষুদ্র বিশ্ব যায় যাক্,
এ প্রাণ তোমাতে থাক্,
ও চরণ বুকে থাক্ হয়ে বদ্ধমূল।

জীবনের অসহনীয় দুঃখ এবং বিশ্বদেবতার পায়ে আপনাকে উৎসর্গ করে সে দুঃখের দুস্তর সাগর পার হবার নিত্য আকুলতা তাঁর কাব্যকে অপূর্ব মহিমা দান করেছে। অন্যান্য কবিদের মধ্যে কবি মধুসূদনের আদর্শ অনুসরণকারী যোগীন্দ্রনাথ বসুর নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর মহাকাব্য রচনার চেষ্টা 'পৃথ্বীরাজ' (১৩২২) ও 'শিবাজীর' (১৩২৫) মধ্যে দেখতে পাই। কবি নবীনচন্দ্র সেনের আত্মীয় কবিগুণাকর নবীনচন্দ্র দাস মহাশয় রঘুবংশম্ (১৮৯১), কিরাতার্জুনীয়ম্ (১৯০৬) প্রভৃতি কাব্যের অনুবাদ করেন। ইনি 'আকাশ কুসুম কাব্য' নামে একখানা কাব্যও রচনা করেছিলেন। নবীনচন্দ্রের ছিল রচনা ওজঃ গুণসম্পন্ন। অনুবাদে তাঁর কবিশক্তি ও প্রকাশের বলিষ্ঠতার পরিচয় পাওয়া যায়। কবি-গুণাকরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শরচ্চন্দ্র দাসও বাঙ্‌লা ও বাঙালীর সাহিত্য এবং সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে আপন স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় আর্যগাথা (১ম-১৮৮২ এবং ২য়-১৮৯৩), আষাঢ়ে (১৩০৫) হাসির গান (১৩০৭) মন্দ্র (১৩০৯) আলেখ্য (১৩১৪), ত্রিবেণী

(১৩১৯) প্রভৃতি কাব্যও রচনা করেন। দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তেমন নেই। তাঁর হাসির গান বাঙ্‌লা দেশে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গানের মধ্যে যে উদ্দীপন ভাব আছে তা বাঙালী চিত্তকে সহজেই আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু ছন্দের ব্যাপারে তিনি একটু উদাসীন ছিলেন। অনেক সময় তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে ছন্দের বেসামাল গাঁথুনিতে থমকে যেতে হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের 'বঙ্গ আমার জননী আমার', 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা', 'ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে' প্রভৃতি গানগুলি বাঙালীর কাছে বিশেষ পরিচিত।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক ও পরের দিকের অন্যান্য কবিদের মধ্যে বিজয়চন্দ্র মজুমদার, শশাঙ্কমোহন সেন, রজনীকান্ত সেন (কান্ত কবি), নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, নিত্যকৃষ্ণ বসু প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিজয়চন্দ্র কবিতা (১২৯৬), ফুলশর (১৩১১), পঙ্কমালা প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন।

কবি-সমালোচক শশাঙ্কমোহন সিন্ধু সঙ্গীত (১৮৯৫), শৈল সঙ্গীত, সাবিত্রী (১৩১৬), স্বর্গে ও মর্ত্যে (১৩১৯) প্রভৃতি কাব্যও নাটক রচনা করেন। তাঁর রচনায় রবীন্দ্র-প্রভাব নেই। বরং কবি নবীনচন্দ্রের কাব্যধারার ভাব-পুষ্ট ছিল বলা যেতে পারে। তাঁর 'বাণী মন্দির' আলোচনা গ্রন্থ বাঙ্‌লা সাহিত্যের একখানি বিস্ময়কর সম্পদ। লেখকের গভীর অন্তর্দৃষ্টি, তত্ত্বজ্ঞান, রসবোধ, পাণ্ডিত্যের পরিচয় এই গ্রন্থে পাই। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেনশাস্ত্রী মহাশয় তাঁর 'বাঙলার বিস্মৃত কবি' পুস্তিকায় শশাঙ্কমোহনের 'বাণীমন্দির' সম্বন্ধে বলেছেন, 'বাণীমন্দির' তাঁর গভীর অধ্যয়ন ও পরিণত চিন্তার অমৃতময় ফলস্বরূপ। কবি শশাঙ্কমোহন এখানে ভারতীয় সংস্কৃতির একেবারে মর্মমূলে প্রবেশ করেছেন এবং প্রাচ্য দর্শনের মুকুটমণি বেদান্তের সঙ্গে ভারতীয় সাহিত্যের যোগসূত্রটি আবিষ্কার করার প্রয়াস পেয়েছেন'। শশাঙ্কমোহনের 'বঙ্গবাণী' ও 'কবি মধুসূদন' বাঙ্‌লা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচনা গ্রন্থের পর্যায়ে পড়ে। তবে আজ তাঁর রচনা বাঙালী প্রায় ভুলেই গেছে।

নিত্যকৃষ্ণ বসু (১৮৬৫-১৯০০) বাঙ্‌লার সাহিত্যে যেন কিছুদিনের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। মাত্র পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর জীবনে কাব্য রচনার সূত্রপাত মাইকেল মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের কাব্যের প্রভাবে। তবে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবও তাঁর কাব্যে যথেষ্ট আছে।

নিত্যকৃষ্ণ ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের এম-এ। সেক্‌স্‌পীয়র, মিল্‌টন, ওয়ার্ড্‌স্‌-ওয়ার্থ্‌, শেলী, কিট্‌স, কোল্‌রিজ্‌ প্রভৃতির প্রভাবও তাঁর রচনায় বিদ্যমান। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি কাব্য রচনা শুরু করেন। নিত্যকৃষ্ণ পুরানোকে ছেড়ে একেবারে নতুনকে গ্রহণ করেননি। সাধারণ মানুষের জন্য নতুনের প্রয়োজন আছে বটে কিন্তু তা পুরানোকে বাদ দিয়ে নয়।

নিত্যকৃষ্ণ মায়াবিনী (১৮৮৬) কাব্য রচনা করেন। এছাড়া প্রেমের পরীক্ষা (নাটক-১২৯৯) ও ভগিনী (গল্প—১২৯৭ সালে 'সাহিত্যে' প্রকাশিত) রচনা করেন। 'সাহিত্য সেবকের ডায়েরী' নিত্যকৃষ্ণের প্রাঞ্জল গদ্য রচনার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের (১২৬৬-১৩৪৬) খণ্ডকবিতাগুলি 'পুষ্পাঞ্জলি' নামে প্রকাশিত হয়েছে। নবকৃষ্ণের কবিতার প্রভাব কালিদাস রায় কবিশেখর মহাশয়ের কবিতাতেও কিছু কিছু পাওয়া যায়।

বাঙ্‌লার আর একজন কবির উল্লেখ না করলে এ ধারার অনেকটা অপূর্ণ থেকে যাবে। তিনি হলেন কান্তকবি রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০)। ইনি ওকালতি ও সাহিত্য সাধনার দ্বন্দ্বে শেষেরটিকেই জীবনের একমাত্র ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন। রজনীকান্ত বাঙ্‌লা সাহিত্যে সঙ্গীত রচনার জন্যই সমধিক প্রসিদ্ধ। 'বাণী' (১৯০২) ও 'কল্যাণীর' (১৯০৫) জন্য বাঙালী বহুকাল তাঁকে স্মরণ করবে। এছাড়া তিনি 'অমৃত' (১৯১০), 'আনন্দময়ী', 'বিশ্রাম', 'অভয়া', 'সদ্ভাব কুসুম', 'শেষদান' প্রভৃতি কাব্যও রচনা করেন। অনেকগুলি তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়। বঙ্গভঙ্গের পর রজনীকান্ত দেশপ্রেম ও জাতিপ্রীতির মন্ত্রে দিক্ষা গ্রহণ করেন। তখনকার দিনে তাঁর রচিত অনেক গান ও কবিতা বাঙালীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। যেমন—

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই ;
দীন-দুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশী আর সাধ্য নাই।

* * *

পরের জিনিস কিনবো না, যদি
মায়ের ঘরের জিনিস পাই।

অথবা,

আমরা নেহাৎ গরীব, আমরা নেহাৎ ছোট ;
তবু, আজি সাত কোটি ভাই, জেগে ওঠ!
জুড়ে দে ঘরের তাঁত, সাজা দোকান
বিদেশে না যায় ভাই, গোলারি ধান,
আমরা মোটা খাব, ভাইরে, পর'ব মোটা
মাখবনা ল্যাভেণ্ডার, চাইনে 'অটো'। ইত্যাদি॥

'কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমারি রসাল নন্দনে', 'পাতকী বলিয়ে কি গো পায়ে ঠেলা ভালো হয়'প্রভৃতি অনেক গান তখন বাঙ্‌লাদেশকে মাতিয়ে তুলেছিল।

মৃত্যুর পূর্বে কবি 'আমায়, সকল রকমে কাঙাল করেছে, গর্ব করিতে চুর' গানটি রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথকে গানটি পাঠালে পর কবিগুরু তাঁকে যে পত্র লিখেছিলেন তার একটি অংশ উদ্ধৃত করলে কান্তকবির বৈশিষ্ট্য বোঝা যাবে। 'সিদ্ধিদাতা ত আপনার কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই, সমস্তই ত তিনি নিজের হাতে লইয়াছেন—আপনার প্রাণ, আপনার গান, আপনার আনন্দ সমস্ত ত তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে······ঈশ্বর যাঁহাকে রিক্ত করেন, তাঁহাকে কেমন গভীরভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন—আজ আপনার জীবন-সঙ্গীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে ও আপনার ভাষা সঙ্গীত তাহারই প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে।'

কবি রবীন্দ্রনাথের বিরাট কবিপ্রতিভা ছাড়া এযুগে আরও অনেক কবিই কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত করেছিলেন। তাঁরা হয় মধু-হেম-নবীন, নয়ত বিহারীলাল, সুরেন্দ্রনাথ অথবা রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে কাব্য রচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়কৃষ্ণ বসু, দীনেশচরণ বসু, মোজাম্মেল হক্, গোবিন্দচন্দ্র রায়, শশধর রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বাঙ্‌লা সাহিত্য ও সমাজে শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের কবি পরিচয় অপেক্ষা সংস্কারক ও প্রবন্ধকার হিসেবে পরিচয়ই বেশী।

আমরা রবীন্দ্রকাব্যের আলোচনা স্থানান্তরে করব। রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভার উপযুক্ত আলোচনা করতে গেলে বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করতে হয়। যুগ-ধর্মের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের ভাবলোকের যতখানি আলোচনা সম্ভব তার

চেষ্টা করব। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া মধুসূদনোত্তর কাব্যধারার কয়েকজন উল্লেখ-যোগ্য কবির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল। এই পর্যায়ে আমরা দেখেছি মধুসূদন ও বিহারীলালের আদর্শে দীক্ষিত কবিগণ ক্লাসিকাল ও নতুন নীতি-প্রবণ ভাবাদর্শে কাব্য রচনা করে গেছেন। এই দুই ধারার মধ্যেই আধুনিকতার মধুর গম্ভীর স্বর শোনা গিয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর এই আধুনিক ধারার প্রথম কবি মধুসূদন। শশাঙ্কমোহন যথার্থই বলেছেন, 'মধুসূদন প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য সভ্যতার সঙ্গমস্থলে দণ্ডায়মান', মধু-হেম-নবীন একটি আদর্শকে লক্ষ্য করে সার্থক হবার চেষ্টা করলেও যা মধুসূদনে ছিল হেম-নবীনে তা পাওয়া যায় নি। মধুসূদনের যার শুরু মধুসূদনেই তার শেষ। এই ত্রয়ীর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিতে গিয়ে কবি সমালোচক শশাঙ্কমোহন বলেছেন 'মধুসূদন চিত্রকর; অনতিসূক্ষ্ম তুলি সঞ্চালনে তিনি মনোরম চিত্র অঙ্কিত করিয়া তোলেন; উজ্জ্বলতা এবং সহজতায় উহা সর্বাগ্রে চিত্তাকর্ষণ করে। হেমচন্দ্র ভাস্কর; সুদৃঢ় লৌহদণ্ডের সাহায্যে, বাহুবলে তিনি যেন পাষাণগাত্র হইতেই প্রাচী প্রতিমা প্রকটিত করিয়া উহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। নবীনচন্দ্র যাদুকর; সত্য এবং কল্পনার, প্রাকৃত এবং অতিপ্রাকৃত ভাবের সংমিশ্রণে আত্মবিস্মৃত ভাবুকতার তরঙ্গ বৈচিত্র্যে, উজ্জ্বলতায় এবং দ্রুতগতিতে তাঁহার রচনা মনে মোহ উৎপাদন করে।' অপরদিকে বিহারীলাল মুখ্যত এবং পরে সুরেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতির কাব্য রচনার ভেতর দিয়েও প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের 'লিরিকাল্' ভাব উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। কিন্তু এই দুই ধারার ভেতরই আমরা যে বাঙালী মনের সন্ধান পেলাম সে মন সমগ্র বাঙালীরই মন। নিজের অনবধানতা, নিশ্চেষ্টতার জন্য যে আকস্মিক বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে পরাধীনতাকে বরণ ক'রে নিতে হয়েছিল তার জন্য গোড়াতে এই সমাজ ততটা প্রস্তুত না থাকলেও কাব্যধারায় মধুসূদন থেকেই তাহার মোহভঙ্গ হ'তে থাকে। এবং রবীন্দ্রনাথে এসে তার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে। তারপর থেকে নানা দুঃখ দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে বাঙালী তার চেতনা বেদনা বোধকে হারায়নি। বরং তাকে আরও স্পষ্ট ক'রে তুলেছে। সাহিত্যে দুঃখ দৈন্য দারিদ্র্য লাঞ্ছনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রকাশই যে শুধু ঘটেছে তা নয়, আভাসে ইঙ্গিতে একটা নতুনের এবং জীবনের এক অনাগত সার্থকতার কামনার আভাসও তার মধ্যে রয়েছে। বৈষ্ণব ভাবুকতা ও সাংখ্য, বেদান্ত প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য রোমান্টিক মনোভাব এবং বাঙালীর দেশপ্রেম

মিলে এই যুগের কাব্যধারার বিক্ষুব্ধ প্রকাশ ঘটিয়েছে। আমরা পুর্বেই বলেছি যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুধু কাব্য উপন্যাসে নয়—নাটক, সংবাদপত্র, প্রবন্ধ, গান সব কিছুর মধ্যেই এই শৃঙ্খল-ভাঙার বলিষ্ঠ প্রয়াস আছে। সমাজে যেমন একদিকে নানা বৈকল্য ও বিকৃতি দেখা দিয়েছিল, তেমনই তার প্রতিরোধও রচিত হয়েছে বাঙ্‌লা সাহিত্যে। অর্থাৎ এমন একদল চিন্তাশীল, অনুভূতিশীল, বাঙালী ছিলেন যাঁরা বাঙালীর অন্যায় ও ত্রুটির বিরুদ্ধেও দাঁড়িয়েছেন; আবার সাম্রাজ্যবাদের অহৈতুকী লিপ্সার বিরুদ্ধেও নিজেদের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আমরা পরবর্তী পর্বে দ্বিতীয় পর্যায়ের নাটক আলোচনাতে এই মনোভাবেরই পরিচয় পাবো। এই যে সংবেদনশীল সাহিত্যিক মন এ শুধু ঊনবিংশ শতাব্দীর নয়, প্রাচীন কালেও নিপীড়িত অবহেলিত মানুষের কামনা বাসনা নিয়ে সাহিত্যে দেখা দিয়েছে। এই বাঙ্‌লা সাহিত্যই প্রাচীন যুগের সমাজ ও সাহিত্য রূপ বৌদ্ধগান ও দোহা থেকে শুরু করে বিজয়গুপ্ত, মুকুন্দরাম প্রভৃতির রচনার ভেতর দিয়ে আধুনিক যুগে এসে পড়েছে। ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের ধারাও তারই সাক্ষ্য দেয়। পরবর্তী অংশে নাটকের আলোচনাতেও তা লক্ষ্য করা যাবে।

বাঙ্‌লা নাটক—দ্বিতীয় পর্যায়

বাঙ্‌লা নাটকের প্রথম যুগে মধুসূদন, রামনারায়ণ, দীনবন্ধু প্রভৃতির দ্বারা নাটক রচিত হয়েছে বটে; কিন্তু নাটকের অভিনয় ততটা জমে উঠেনি, তার একটি কারণ ছিল রঙ্গমঞ্চের অভাব। তখন সাময়িকভাবে কোনো বড়-লোকের বাড়ীতে হয়ত রঙ্গমঞ্চ তৈয়েরী করে অভিনয় হ'ত। কিন্তু স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ দেখা দেয়নি। নাটকে অভিনেতা, রঙ্গমঞ্চ ও দর্শক এই ত্রয়ীর সংযোগ না ঘটলে নাটকের মূল্য বিচার করা দুষ্কর; অবশ্য যে নাটক শুধু পড়বার জন্যে অর্থাৎ যার অভিনয় না হলেও পড়ে এবং শুনে আনন্দ পাওয়া যায় তার কথা আলাদা। কিন্তু নাটক যেমন 'Copy of life, a mirror of custom, a reflection of truth' (Cecero) তেমনি তা অনুভূতিশীল দর্শক বা শ্রোতা এবং অভিনয় ও অভিনয়ার্থ রঙ্গমঞ্চসাপেক্ষ। রঙ্গমঞ্চকে নাটকের প্রধান অবলম্বন বললে অত্যুক্তি হবেনা। থরনডাইকের মতে, 'The stage affords the first test of a play's emotional appeal, and perhaps

the best test of its dramatic power.' কাজেই রঙ্গমঞ্চ নাটকের অবশ্য প্রয়োজনীয় অঙ্গস্বরূপ। নাটকের নাটকীয় মূল্য বিচার রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয় মাধ্যমেই হতে পারে। পূর্বে আমাদের স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ ছিল না। তাই নাটকের সাধারণ দর্শক তখন পাওয়া সম্ভবও ছিল না। ধনী ও শিক্ষিত সম্প্রদায় যে প্রথম-যুগে নাটকাভিনয় দেখার সুযোগ পেত, তার কারণ হচ্ছে, তাঁরা নিজেদের চেষ্টায় এবং নিজেদের জন্য অর্থব্যয় করে সখের রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত করে নাটকের অভিনয় করাতেন। অবশ্যি বর্তমান পর্যায়েও নাট্যাভিনয় দর্শন ব্যাপারে সাধারণ মানুষের যে খুব একটা সুবিধা হয়েছিল তা বলা যায় না। তবে অনেকটা সহজ হয়ে এসেছিল। আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে এই রঙ্গমঞ্চ তৈয়েরী করে অভিনয় করার আগে থেকেই বারোয়ারী কানাতের তলায় বা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে যাত্রাভিনয়ও চলছিল। বাঙালীর ধর্মভাবুকতা যাত্রার পৌরাণিক ধর্মমূলক নাটকের দিকে বেশ কিছুটা ঝুঁকে পড়েছিল। থিয়েটারেও প্রথম সেই ধর্মাপ্লুত নাটকের অভিনয়ই শুরু হয়। ভারতের প্রাচীন সাহিত্য ও সংস্কৃতি যে নাটকের গৌরবকে বহন করে এনেছে বর্তমান থিয়েটার বা সাধারণ রঙ্গালয়ের যুগে কিন্তু তার গৌরব অপেক্ষাকৃত গৌণ। ইংরেজের আসার পর পাশ্চাত্ত্য প্রভাবে স্থায়ী সাধারণ রঙ্গালয় ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল। রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার পর প্রথম দিকে আমাদের পূর্বোল্লিখিত নাটকের প্রথমযুগের নাটকগুলি অভিনীত হচ্ছিল। তারপর শুরু হয় উপন্যাসকে নাট্যরূপ দানের তোড়জোড়। শেষ পর্যন্ত নাটকের অনুবাদ এবং ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও সামাজিক ঘটনাবস্তু নিয়ে মৌলিক বাঙ্‌লা নাটক রচিত হ'তে থাকে। একটি বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, দু'চার জন বাঙালী মুসলমান ব্যতীত বাঙ্‌লার মুসলমান সমাজের কেউ বড় একটা নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হননি। তার কারণ হয়ত তাঁরা নাটক ও তার অভিনয় তত পছন্দ করতেন না। তাই মুসলমান-শাসনকালে নাটক ও নাটকাভিনয়ের কোনো মূল্যবান ও সার্থক ইতিহাস পাওয়া যায় না,—নাটকাভিনয় তখন উৎকর্ষ লাভ করতেও পারেনি। উনবিংশ শতাব্দীতে কয়েকজন মুসলমান লেখক নাটক রচনা করেছিলেন। তার মধ্যে মীর মশারফ হোসেনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর সম্বন্ধে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাগে যে নাটক ও নাট্যাভিনয়ের কিছুটা উৎকর্ষ

সাধিত হয় তার একমাত্র কারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা। আমরা দেখেছি যে, এই যুগ থেকে বাঙালীর মনোবেদনা, আত্মগ্লানি, দেশাত্মবোধ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষার সংঘর্ষজনিত জাতীয়তাবোধ, ঐক্যবোধ স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সেই সময় সামাজিক দুর্বলতা, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-বিস্মৃতির বিরুদ্ধে সাহিত্য রচনা ও সমাজ সংস্কার শুরু হয়েছিল। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম প্রভৃতির মধ্যে আমরা এই মহৎ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করেছি। সমাজকে তাঁরা এক বৃহৎ লক্ষ্যের দিকে পৌঁছে দেবার জন্য সাহিত্য ও সমাজ-সংস্কারের কাজ অক্লান্তভাবে করে গেছেন। আমাদের সাহিত্যেও জাতির দুর্বলতা এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ভবিষ্যত আশার বক্তব্যটি প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষ করে কলকাতায় হিন্দু মেলার ভেতর দিয়ে যে জাতীয় ভাব ফুটে উঠেছিল তাকে আরও প্রাণবন্ত ও সুস্পষ্ট করে প্রকাশ করার দায়িত্ব ছিল সাহিত্যের, তথা উপন্যাস, নাটক, কাব্য, সঙ্গীত প্রভৃতির। শিক্ষিত জনসাধারণ একটা পথ খুঁজছে জীবনকে সার্থক করে তুলবার। দেশের দরিদ্র বিত্তহীন চাষীদের মধ্যে, বুভুক্ষুদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভের বহ্নি ধূমায়িত হয়ে উঠছে। নীলদর্পণ, জমিদার দর্পণ প্রভৃতি নাটকে তার আভাস আমরা পেয়েছি। রঙ্গমঞ্চের উপর অভিনয়ের ভেতর দিয়ে তা আরও সুস্পষ্ট হয়ে বাঙালীর চোখে ধরা পড়েছিল। বাঙালীর চিত্তবিক্ষোভ, স্বাধীনতা স্পৃহা এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিদ্বেষ বন্ধ করবার জন্য এই সময়ে নাটকাভিনয় সংক্রান্ত বিশেষ আইন প্রবর্তনও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। একদিকে সামাজিক দুর্বলতার জঘন্যতাকে স্পষ্ট ভাবে দেখানো এবং সমাজকে আরও উন্নত করবার জন্যে উপায় উদ্ভাবন, বাঙালীর সংস্কৃতিকে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের নাট্যরস দ্বারা সমৃদ্ধ করে তোলা, অপর দিকে দেশাত্মবোধক, দেশপ্রেমমূলক নাটক পরিবেশন বাঙ্‌লা নাটকের দ্বিতীয় পর্যায়ের বিশেষ লক্ষণ। এই যুগে বাঙালী হিন্দু মুসলমানের মিলিত সমাজ যে আঘাতের পরে জাতীয় জীবনকে আবার নতুন করে ফিরে পাবার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে—এযুগের অনেক নাট্য রচনা ও তার অভিনয় সে পথের কিছুটা সন্ধান দিয়েছিল।

পরাধীন বাঙালীর অন্তর্বেদনা এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচার-অবিচার-জনিত ক্ষোভ প্রকাশ পেল কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতমাতা' (১৮৭৩), হারাণচন্দ্র ঘোষের 'ভারতী দুঃখিনী' (১২৮২), নটেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'এই কি সেই

ভারত' (১২৮২), কুঞ্জবিহারী বসুর 'ভারত অধীন ?' (১২৮১) প্রভৃতিতে কিন্তু এই প্রকাশ ততটা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। কিরণচন্দ্রের রচনায় আমরা দুষ্ট ইংরেজ, সৎ ইংরেজ, 'মহামতি গভর্ণর জেনারেল' প্রভৃতি চরিত্রসৃষ্টির ভেতর দিয়ে 'অন্তর বাহিরের' বিভিন্নতা ও দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করি। ইংরেজের অত্যাচার তখন অন্তরে বিক্ষোভ জাগিয়ে তুলেছে। ইংরেজ যে ভারতবাসীর দুঃখ-বেদনা কেবলই বাড়িয়ে তুলছে তা লেখক অনুভব করেছেন—কিন্তু সব ইংরেজই যে মন্দ নয় এটাও তাঁর বক্তব্যবিষয়। তাঁর ধারণা—রাজা ভালো, রাণী ভালো, কর্মচারীরাই যতো নষ্টের মূল এবং ভারতকে যে দিনদিন দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত করছে তাও ওই কর্মচারীর দল। রাজভক্তির চাইতে ভীতিই এখানে প্রবল, সেও দুর্বলের ওপর প্রবলের অত্যাচারজনিতই বটে। ডাঃ সুকুমার সেন ভারতমাতা নাটকের যে অংশটি উদ্ধৃত করেছেন তাতে সেকালের দ্বিধা-দ্বন্দ্বজড়িত বাঙালীর মনের একটা পরিচয় পাওয়া যায়। ভারত সন্তানগণ ভারতমাতাকে বলছেন—

'মা, আমাদের চারিদিক বন্ধ, কোন্ দিকে যাই মা ? আমাদের চাকরীর পথ বন্ধ, ব্যবসার পথ বন্ধ, বাণিজ্যের পথ বন্ধ, মা কি কোরবো মা ? কেমন করে খাবো মা ?'

এই উক্তি শুধু ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের বাঙালীর নয়, পরেও দরিদ্র বাঙালীর সেই দুরবস্থার বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। তখনকার বাঙালী সমাজে যে সমস্যা তীব্রভাবে দেখা দিয়েছিল, পরেও সেই তীব্রতার অবসান ঘটেনি।

আবার ঠিক এই উক্তির পরেই যখন দ্বিতীয় ভারত সন্তান বলে, 'মা, ইচ্ছে হয় যে, মহারাণীর জন্য যুদ্ধ করেও প্রতিপালিত হই, মা তাও হতে দেয় না'—তখন বুঝি হয়ত বাইরের ঠাটটুকু ঠিক রাখবার জন্য, নয়ত দুর্বলচিত্ততা নিয়ে, রাজতন্ত্রের উপর একটা ভ্রান্তিমূলক বিশ্বাস নিয়ে সেই যুগের বাঙালী অজানা ভবিষ্যতের দিকে ছুটে চলেছে। নয়ত ভারতমাতা যখন তার সন্তানদের বলেন মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে জানাতে তখন ভারতসন্তান নিশ্চয় একথা বলত না, 'মা ! তাঁর কোন দোষ নেই, এই অভাগাদের কান্না, সাগর পার হয়ে তাঁর কাছে ত যেতে পারে না।'

এই যুগে হরলাল রায় এবং মদনমোহন মিত্র নাটক রচনায় প্রসিদ্ধিলাভ করেন। একদিকে দেশাত্মবোধ এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজের নানা অন্যায় ও

দুর্নীতির নাট্যরূপ, অপরদিকে ইংরেজি বা সংস্কৃত নাটকের ছায়া অবলম্বনেও নাটক রচিত হচ্ছিল। হরলাল রায় 'হেমলতা নাটক' (১৮৭৩), 'শত্রু সংহার নাটক' (১৮৭৪), 'বঙ্গের সুখাবসান' (১৮৭৪), 'রুদ্রপাল নাটক' (১৮৭৪), 'কনকপদ্ম' (১৮৭৫) প্রভৃতি নাটক রচনা করেন। 'হেমলতা নাটকে' 'ভারত-ভূমি পরাধীন হবার পূর্বে প্রত্যেক ভারত সন্তান প্রাণত্যাগ করুক'—এই উক্তির মধ্যে অপূর্ব দেশপ্রীতি, বেদনাবোধ জেগে উঠেছে। 'বঙ্গের সুখাবসানে'ও প্রাচীন বাঙ্‌লার স্বাধীনতার এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবনের সুখের অবসানের কথাই বর্ণিত হয়েছে। 'রুদ্রপাল' সেক্‌স্‌পীয়রের 'হেম্‌লেট' নাটকের ভাবানুবাদ বলা যেতে পারে। 'শত্রু সংহার' ও 'কনকপদ্ম' যথাক্রমে 'বেণী সংহার' ও 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্‌' অবলম্বনে রচিত হয়।

মদনমোহন মিত্র 'মনোরমা নাটক' (১৮৭২), 'বৃহন্নলা নাটক' (১৮৭৪) প্রভৃতি রচনা করেন। মনোরমা নাটকে মদ খাওয়া এবং অন্যান্য সামাজিক দুর্নীতির চিত্রণ আছে। মদ খাওয়া ও লাম্পট্য তখনকার 'হঠাৎ বাবু' সম্প্রদায়ের তথাকথিত আভিজাত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্যস্বরূপ ছিল। সাহেবরা মদ খান কাজেই 'হঠাৎ বাবুর' দলও মাতাল হবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে এল ব্যভিচারের জঘন্য মনোবৃত্তি। তখনকার অনেক লেখক এই সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে নাটক উপন্যাস, ব্যঙ্গ রচনা প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখেছিলেন। মদনমোহন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। মদনমোহন 'সমরশায়িনী' (১৮৭৩) নামে এক-খানি ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং 'কবিতা কদম্ব' (১৮৭০), 'পদ্যসোপান' (১৮৭০) প্রভৃতি রচনা করেন। লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রবর্তী ইতিহাসের ঘটনা অবলম্বনে 'নন্দবংশোচ্ছেদ' (১৮৭৩), 'নবাব সেরাজুদ্দৌল্লা' (১৮৭৬) নাটক রচনা করেন।

এসময় জাতীয়তাবোধ ও দেশাত্মবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যারা বাঙালীর সামনে গৌরবময় ঐতিহ্য তুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা যথার্থভাবে ঐতিহাসিক কাহিনীর কাঠামোকে বজায় রাখতে পারেননি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের আলোচনার পর্যায়ের যাঁরা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যাঁদের দান বাঙ্‌লা সাহিত্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় তাঁদের মধ্যে প্রথম জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম (১৮৪৯-১৯২৫) উল্লেখ করতে হয়। জ্যোতিরিন্দ্র-সাহিত্য রচনা

নাটক, সঙ্গীত, কবিতা, প্রবন্ধ ও ফরাসী নাটক ও উপন্যাসের অনুবাদ প্রভৃতিতে ভরপুর। হিন্দুমেলার সময় থেকে জাতীয় ভাবোদ্দীপক কবিতার সন্ধান আমরা পাই। তাঁর 'জাগ জাগ জাগ সবে ভারত সন্তান! মাকে ভুলি কতকাল রহিবে শয়ান' কবিতাটি হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে (১৮৬৮ চৈত্র) পঠিত হয়। স্বদেশবাসীর জীবনে দেশপ্রীতি জাগাবার জন্য তিনি সব সময় সচেষ্ট ছিলেন। হিন্দুমেলার তিনি ছিলেন প্রধান কর্মকর্তাদের একজন। নাটক রচনার সূত্রপাত সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর জীবন-স্মৃতিতে যা বলেছেন তা প্রণিধানযোগ্য। 'হিন্দুমেলার পর হইতে কেবলই আমার মনে হইত—কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্বগাথা ও ভারতের গৌরবকাহিনী কীর্তন করিলে, হয়ত কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে।' তাঁর পুরু-বিক্রম নাটক (১৮৭৪), সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক (১৮৭৫), অশ্রুমতী নাটক (১৮৭৯), স্বপ্নময়ী নাটক (১৮৮২), জুলিয়াস সীজার (অনুবাদ-১৯০৭) প্রভৃতি নাট্যরচনা এই মনোভাবের পরিচায়ক। এ ছাড়া তাঁর আরও মৌলিক এবং অনূদিত নাটকও আছে। নাটক সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে তাঁর যে দেশসেবায় ও সাহিত্যসেবার পরিচায়ক কয়েকটি কর্ম-প্রচেষ্টার উল্লেখ করাও প্রয়োজন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হিন্দুমেলার সঙ্গে যেমন যুক্ত ছিলেন ঠিক তেমনই 'বিদ্বজ্জন সমাগম' (১৮৭৪) নামে এক সাহিত্যিক সম্মেলন নিয়েও মেতে ওঠেন। এই সম্মেলনে তিনি তাঁর রচিত পুরুবিক্রম নাটকের কিছুটা অংশ পাঠ করেছিলেন। আবার আমাদের দেশে তখন স্বাধীনতা কামনায় পাশ্চাত্যের দেশপ্রেমিকদের জীবনীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যাঁরা তখন বিপ্লবী মন নিয়ে ভারত উদ্ধারের উপায় ও পথ খুঁজছিলেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথও তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে 'সঞ্জীবনী সভা' নামে একটি গুপ্ত সভা (secret society) স্থাপন করেন। রাজনারায়ণ বসু তার সভাপতি ছিলেন। নবগোপাল মিত্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি তার সভ্য ছিলেন। এই সভার কথা যাতে বাইরে প্রকাশ না পায় তার জন্যে একে সংকেতে 'হামচুপামূহাফ' বলা হত। ঋগ্বেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি, আর খোলা তলোয়ার এই ছিল তাঁদের ভারত উদ্ধারের শুভ সংকেত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের

অন্তরে যে ভারতকে একান্তভাবে ভারতবাসীর করে তোলার কামনা জেগে উঠেছিল তা তাঁর জাহাজের খোল কিনে স্বদেশী জাহাজ চালাবার ঐকান্তিক ও উদগ্র ইচ্ছায়ও প্রকাশ পেয়েছে। বিদ্যার উন্নতি, বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'সারস্বত সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি এই সভার সভ্য ছিলেন। দেশসেবার, দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলার, বাঙালীকে বীর্যবান করে তোলার ব্যাপারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঐকান্তিকতা অনস্বীকার্য। হয়ত তিনি সার্থকতা লাভ করতে পারেননি। তবুও তাঁর দেশপ্রেম, জাতিপ্রীতি এবং একাগ্রতাকে আমরা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করে নিতে বাধ্য। বাঙ্‌লার সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে গড়ে তোলবার ব্যাপারে তাঁর দান অকিঞ্চিৎকর নয়। দেশাত্মবোধক নাটক ছাড়া তখনকার সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে তিনি কয়েকখানি প্রহসনও রচনা করেন। এর মধ্যে তাঁর মৌলিক রচনা হিসেবে 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' (১৮৭২), এমন কর্ম আর করবনা বা অলীক বাবু (১৮৭৭), হিতে বিপরীত (১৮৯৬) এবং ফরাসী থেকে মলিয়েরের দুইটি কৌতুক নাট্যের অনুবাদ 'হঠাৎ নবাব' (১৮৮৪), এবং 'দায়ে পড়ে দার-গ্রহ' (১৯০২), বাংলা সাহিত্যে বিশেষ স্থান লাভ করেছে। এদিকে অভিজ্ঞান শকুন্তলা (১৮৯৯), উত্তরচরিত (১৯০০), রত্নাবলী (১৯০০), মালতীমাধব (১৯০০), মৃচ্ছকটিক (১৯০১), বিক্রমোর্বশী (১৯০১), মহাবীর চরিত (১৯০১), চণ্ডকৌশিক (১৯০১), বেণীসংহার নাটক (১৯০১), প্রবোধ চন্দ্রোদয় (১৯০২), নাগানন্দ (১৯০২), বিদ্ধশালভঞ্জিকা (১৯০৩), কর্পূরমঞ্জরী (১৯০৪), প্রিয়দর্শিকা (১৯০৪) প্রভৃতি নাটক তিনি বাঙ্‌লায় অনুবাদ করেন। তাঁর রচিত পুনর্বসন্ত (১৮৯৯), বসন্তলীলা (১৯০০), ধ্যানভঙ্গ (১৯০০) প্রভৃতি গীতিনাট্যের পর্যায়ে পড়ে। অন্যান্য রচনার মধ্যে প্রবন্ধ মঞ্জরী (১৯০৫) তাঁর রচিত নানাবিধ প্রবন্ধের সমষ্টি। এছাড়া 'ভারতবর্ষে' (আঁদ্রে শেভ্রিয়োঁ—১৯০৩), ফরাসী প্রসূন (১৯০৪) প্রভৃতি এবং মারাঠী থেকে অনূদিত ঝাঁসির রাণী (১৯০৩), ইংরেজি থেকে অনূদিত এপিক্‌টেটসের উপদেশ (১৯০৭) প্রভৃতি বহু রচনার নিদর্শনও পাই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বিবৃত ও বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' তাঁর সম্বন্ধে একটি তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ। এই সব

রচনা ছাড়া ফরাসী থেকে শোণিত সোপান (১৯২০), অবতার (গতিয়ের—১৯২২), মিলিতোনা (গতিয়ের—১৯২৩), তিলকের মারাঠী গ্রন্থ 'গীতা-রহস্যের' বাঙ্‌লা অনুবাদ করেন। বিভিন্ন মাসিক পত্রের পাতায় তাঁর আরও কতো যে রচনা এখনও রয়েছে তার আর অন্ত নেই। নিজে আবার চিত্রকলায় এবং সঙ্গীতেও পারদর্শী ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে বাঙ্‌লার সংস্কৃতিক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন। মনে তাঁর বঙ্কিমের মতো দেশের জনসাধারণের দেশানুরাগ জাগিয়ে তোলার প্রবল বাসনা ছিল। বঙ্কিম তাঁর কোনো কোনো রচনার অত্যন্ত প্রশংসা করেন প্রশংসা করেন। এই সব নিয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সাহিত্য, তাঁর সেবা এবং কর্মপ্রচেষ্টা বাঙালীর গর্বের বিষয়। তাঁর পুরু-বিক্রম প্রভৃতি নাটকে যে দেশপ্রেমের একটা আভাস আছে তার উল্লেখ পূর্বে করেছি। পুরু-বিক্রম নাটকের বিষয়বস্তু প্রাচীন ভারতের ইতিহাস থেকে নেওয়া। রাজা পুরু ও আলেকজাণ্ডারের কাহিনীকে অবলম্বন করে এই রোমান্টিক নাটক রচিত হয়। বিদেশী রাজাকে (আলেকজাণ্ডার) বাধা দেবার প্রচেষ্টা, আবার তার প্রতি দুর্বলতা দেখানো, প্রেম, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দেশপ্রেম প্রভৃতির ভেতর দিয়ে করুণরসাত্মক পরিণতি লাভ করেছে। পুরু, আলেকজাণ্ডার, তক্ষশীল, অম্বালিকা, ঐলবিলা প্রভৃতি নাটকের প্রধান চরিত্র। দেশদ্রোহিতা শেষ পর্যন্ত জীবনে কতখানি ট্রাজেডি বহন করে আন্‌তে পারে অম্বালিকা চরিত্রের ভেতর দিয়ে তা দেখানো হয়েছে। এ নাটকে স্বদেশী সংগীতও সংযোজিত হয়েছে। নাটকটিকে বীররসপ্রধান নাটক বলা যেতে পারে।

সরোজিনী বা চিতোর আক্রমণ নাটক আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণের কাহিনী নিয়ে পরিকল্পিত। পিতা কর্তৃক ভুলবশত কন্যা হত্যা, ছদ্মবেশে মুসলমানের মন্দিরের আচার্য হওয়া, অন্যায় প্ররোচনায় রাজার নিজ কন্যাকে বলি দিতে স্বীকৃত হওয়া, শেষ পর্যন্ত ভুল ভাঙা, আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণের পর রাজপুত রমণীদের আগুনে ঝাঁপ দেওয়া প্রভৃতি উপকরণ নিয়ে এই নাটকটি রোমান্টিক ভাবপুষ্ট এবং অনিবার্য ট্রাজেডিতে পরিণত হয়েছে। ডাঃ সুকুমার সেন বলেন, 'সরোজিনী নাটকের আখ্যানে প্রাচীন গ্রীক-নাট্যকার Euripides-এর Iphigeneia he en Aulidi নাটকের প্রবল ছায়াপাত হইয়াছে।' হওয়াও অস্বাভাবিক নয়। কারণ তিনি প্রাচীন বীরত্ব-গাথা

নিয়ে দেশবাসীর প্রাণে শৌর্য-বীর্যের প্রেরণা জাগিয়ে তুলতে চান। আর তার জন্য প্রয়োজন শৌর্য-বীর্যপূর্ণ প্রাচীন কাহিনী।

'অশ্রুমতী' নাটকের কাহিনীও কিছুটা ইতিহাসাশ্রিত। অশ্রুমতী প্রতাপ সিংহের কন্যা। সে সেলিমকে ভালোবেসেছিল, কিন্তু তাকে পায়নি শেষ পর্যন্ত। এখানেই অশ্রুমতী জীবনের সবচেয়ে বড়ো ট্রাজেডি। অপর দিকে প্রতাপের দেশপ্রীতি ও জাতিপ্রীতি—যার জন্য মোগল-প্রাসাদে বন্দী নিজ কন্যাকে পর্যন্ত তিনি সহজ করে নিতে পারেন না। এখানেও সেই দেশপ্রেম, জাতিপ্রীতি, স্বধর্মপরায়ণতা আছে, আর রয়েছে প্রেমের বিরোধের অনিবার্য ট্রাজেডি। অশ্রুমতী সেলিমকে ভালোবেসেছিল, মানসিংহের চক্রান্তে সে হয়েছিল মোগল শিবিরে বন্দী। প্রতাপসিংহ তাই অশ্রুমতীকে আত্মহত্যা করতে বলেন। কারণ সে বিজাতীয়ের সংস্পর্শে এসে হয়ত ধর্মচ্যুত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত প্রেম ও কর্তব্যের দ্বন্দ্বে পড়ে অশ্রুমতী যোগিনীর ব্রত গ্রহণ করেন। ইতিহাসের সঙ্গে সামান্য সম্পর্ক থাকলেও এই নাটকটির ঘটনাবস্তুর বেশীর ভাগ লেখকের পরিকল্পিত।

স্বপ্নময়ী নাটকও ইতিহাসের ক্ষীণ সূত্র অবলম্বন করে রচিত হয়েছে। এই নাটকের কাহিনীর কেন্দ্রস্থল বাঙ্‌লাদেশ এবং কাল সপ্তদশ শতাব্দী। এখানেও দেশপ্রেম এবং দেশোদ্ধারের প্রচেষ্টা রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই একটি নারী—যার জীবনে অনিবার্য ট্রাজেডি অদৃষ্টের পথ বেয়ে আসছে। অম্বালিকা, অশ্রুমতী, স্বপ্নময়ী সংসারের নানা দুর্যোগ দুর্বিপাকে আপন আপন হৃদয়ের কামনা বাসনাকে নিঃশেষ করে দিল। পিতৃভক্তি তিনটি নাটকেই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'কিঞ্চিৎ জলযোগে' কেশবচন্দ্রের প্রতি কিছুটা পরোক্ষ কটাক্ষ আছে। সেকালে নব্য ভাব, স্ত্রী-স্বাধীনতার বাড়াবাড়ি, মদ্যপান, ব্রাহ্মদের মধ্যে অতিরিক্ত খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আসক্তির প্রতিও ইঙ্গিত আছে। অবশ্যি এর পরেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজেও স্ত্রী-স্বাধীনতার অত্যন্ত পক্ষপাতী হয়ে ওঠেন। 'অলীকবাবু' প্রহসনে আমাদের সমাজের একদল ব্যক্তির জীবন কিভাবে মিথ্যার জাল বুনে কাটে—তা দেখাতে চেয়েছেন। অন্যান্য রচনার মধ্যে বেশীর ভাগই অনুবাদ। তাতেও তাঁর কৃতিত্ব কম নয়। 'রজতগিরি' নামে ব্রহ্মদেশের কাহিনী নিয়ে বর্মীভাষা থেকে ইংরেজিতে যে অনুবাদ

হয়েছিল—তা থেকে বাঙ্‌লায় অনুবাদ করেছিলেন। তখনকার যুগে স্বদেশ ও সমাজের উন্নতিকল্পে যে সযত্ন প্রচেষ্টা, তা তাঁর কর্মবহুল জীবনে ও সাহিত্যিক জীবনে নানাভাবে দেখা দিয়েছে। তাঁর রচনায় সেকালের বাঙালীর রুচি-বোধের, বিশেষ করে শিক্ষিত সমাজের সংযত রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

অন্যান্য নাট্যকারগণ

এই সময়ের নাট্য-সাহিত্যে যেমন দেশপ্রেমের নিদর্শনস্বরূপ ঐতিহাসিক বা ইতিহাসাশ্রিত নাটক রচিত হচ্ছিল তেমনই পাশাপাশি সামাজিক ত্রুটি-বিচ্যুতি ও নানা সমস্যা নিয়ে সামাজিক নাটকও রচিত হচ্ছিল। এর নিদর্শন আমরা রাজকৃষ্ণ রায়, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকে বিশেষ করে দেখতে পাই। এঁদের সময়ে উপেন্দ্রনাথ দাস নামে একজন নাট্যকারেরও সাক্ষাৎ পেয়েছি। ইনি পাশ্চাত্ত্য কায়দায় 'থ্রিলার' নাটক রচনা শুরু করেন। বেপরোয়া ও বিশৃঙ্খল জীবনকে কেন্দ্র করে রোমান্টিক নাটক সৃষ্টিতে তাঁর কৃতিত্ব আছে।

উপেন্দ্রনাথ দাস সম্বন্ধে শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিতের বক্তব্য থেকে দেখতে পাই যে, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও শৃঙ্খলা কোথাও ছিলনা। আবার জীবনকে সার্থক করে তোলার একটা ব্যর্থ চেষ্টাও ছিল। উপেন্দ্রনাথ বিলাত গিয়েছিলেন। ফিরে এসে বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেননি। একটা বিরাট কিছু করার চেষ্টা তাঁর চরিত্রের স্বাভাবিক দুর্বলতার জন্যই ব্যর্থ হয়ে গেছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে পরাধীনতার বেদনা কী তীব্রভাবে বেজেছিল তার প্রমাণ তাঁর 'শরৎ-সরোজিনী' (১৮৭৪—২য় সং), 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' (১৮৭৫) নাটকে পাই। উপেন্দ্রনাথ দাসের নাটকের অভিনয়ের শুরু থেকেই নাটকাভিনয় সম্পর্কিত বিশেষ আইন প্রবর্তিত হয়। 'শরৎ-সরোজিনী' নাটকের "আমাদের ঘৃণা নাই? গরু গাধার মতো দিবারাত্র শাসিত হচ্ছি, তা কি মনে থাকেনা? পদে পদে ইংরাজদের বিজাতীয় অহঙ্কার দেখেও কি রক্ত ধমনীতে বিদ্যুতের মত ধাবিত হয়না? শরীর উত্তপ্ত হয়না? মনে ধিক্কার জন্মায় না?"—উক্তিতে কবির অন্তর্জ্বালা এবং ইংরেজ-বিরোধ তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এই নাটকে তিনি একদল মুসলমানের উল্লেখ করেছেন—যারা আবার ইংরেজদের হাত থেকে ভারত উদ্ধার করে মুসলমান রাজ্য প্রতিষ্ঠা

করতে চায়। নায়ক শরৎ তাদের যা বলেছিল—'আমাদের দেশের কাপুরুষেরা এখনও স্বাধীনতার জন্য ব্যগ্র হয় নি……আর স্বাধীনতার নামে আপনাদের অধীনতা স্বীকার করতে কেউ সম্মত হবে না।' তাতে হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতারই আভাস পাই। অন্যদিকে দেখতে পাই, শরৎ ইংরেজকে ধরে মেরেছে বটে, কিন্তু সে ক্ষমা চাইতে নারাজ। আত্মসম্মান, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সে বিসর্জন দেবে না। সুরেন্দ্র-বিনোদিনীতেও ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের অত্যাচার, সুরেন্দ্রের অনমনীয় তেজ, ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। তখনকার দিনে বিচারের নামে যে প্রহসন, যে অন্যায়, যে অবিচার দেখাদিত তার বর্ণনাও আছে। এই নাটকের অভিনয়কে ভিত্তি করেই ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে নাটকাভিনয়-সম্পর্কিত আইন চালু হয়। উপেন্দ্রনাথ ও অমৃতলাল বসু এই ব্যাপারে যথেষ্ট নিগৃহীত হন। উপেন্দ্রনাথ 'দাদা ও আমি' নামে এক প্রহসন রচনা করেছিলেন। অতুলকৃষ্ণ মিত্র তাকে ব্যঙ্গ করে 'গাধা ও তুমি' নামে এক প্রহসন রচনা করেন।

প্রমথনাথ মিত্র (১৮৬৫-৮৯) এই সময় 'নগনলিনী' (১৮৭৪) নামে এক রোমান্টিক নাটক এবং 'জয়পাল' নামে (১৮৭৬) ইতিহাসের কাহিনীর ক্ষীণ অনুসরণে একখানি দেশাত্মবোধক নাটক রচনা করেন। সুলতান মামুদ এবং লাহোরের রাজা জয়পালের যুদ্ধের কাহিনী নিয়ে দ্বিতীয় নাটকখানি রচিত। এ ছাড়া তাঁর 'মহাশ্বেতা' (গীতিনাট্য ১৮৭৯), 'শুম্ভসংহার' (১৮৮০) প্রভৃতি নাটক এবং 'সপ্ত সম্বোধন' নামে একটি কাব্যের প্রথম খণ্ড অবধি রচনার নিদর্শন পাওয়া গেছে। 'জয়পাল নাটক' ছাড়া তাঁর অন্যান্য নাটকের সম্বন্ধে তেমন বিশেষ কিছু বলবার নেই। শুধু তাঁর নিজের কথা থেকে জানতে পারি যে, তাঁর 'নগনলিনী' নাটক সে যুগে খুব সমাদর পেয়েছিল, অল্পদিনের মধ্যে দ্বিতীয়বার মুদ্রণের প্রয়োজন হয়।

সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস প্রণেতা রজনীকান্ত গুপ্তের ভ্রাতা উমেশচন্দ্র গুপ্ত 'হেমনলিনী' (১৮৭৪), 'বীরবালা' (১৮৭৫), 'মহারাষ্ট্র কলঙ্ক' (১৮৭৬) নাটক রচনা করেন। 'হেমনলিনী' বিয়োগান্ত নাটক। এতে সেক্সপীয়রের প্রভাব ও তাঁর অনুকরণ আছে। 'বীরবালা' সেল্যুকাস ও চন্দ্রগুপ্তের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। 'মহারাষ্ট্র কলঙ্ক' নাটকে শিবাজী পুত্র শম্ভুজীর চারিত্রিক দুর্বলতা এবং ঔরংজীবের হাতে মৃত্যুর বিষয় বর্ণিত হয়েছে। উমেশচন্দ্রও

তৎকালীন যুগধর্মের প্রভাবকে স্বীকার করেছেন। এই ঐতিহাসিক নাটক রচনা এবং ইতিহাসের পটভূমিকায় জাতীয় চিত্তকে উদ্বুদ্ধ করে তোলার ব্রত তিনিও সেই যুগের অন্যান্য সচেতন সাহিত্য-রচয়িতাদের মতো গ্রহণ করেছিলেন। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিশেষ করে পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষায় স্বাধীনতা-সচেতন হয়ে তখন অনেকে নাটক, কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতি রচনা করেছিলেন। তাঁদের বক্তব্যবিষয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ছিল পরাধীনতার গ্লানি মোচন এবং স্বাধীনতার কামনা। এসময় নাটক শুধু রচিত হচ্ছে না, দর্শকের সামনে অভিনীতও হচ্ছে। এবং দর্শক মনও যাতে নাটকের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে তার একটি পরোক্ষ ইচ্ছাও যে এসব রচনার উদ্দেশ্য ছিলনা তা বলা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর নাটকের দ্বিতীয় পর্যায়ে এত নাটক রচিত হয়েছিল যে, বাঙ্‌লা সাহিত্যে এই পর্যায়ের একটা বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে। এযুগের যুগন্ধর একদিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি, অন্যদিকে রাজকৃষ্ণ রায়, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি। সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা ত ছিলই, সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সমাজ গঠন, জাতিগঠন, দেশপ্রেম, জাতিপ্রীতি গড়ে তোলার একটি মহৎ প্রচেষ্টাও লক্ষিত হয়। বঙ্কিমের উদ্দেশ্য ছিল, জাতিকে ইতিহাস-সচেতনতা গড়ে তোলা, নইলে জাতি বাঁচবে না। আর এই মন্ত্র নিয়ে দেশের প্রাচীন ইতিহাস ও সমাজ চিত্র নাটকে এবং উপন্যাসে রূপায়িত করতে শুরু করলেন—পরের দিকের লেখকরা। আমরা বলছিনা যে প্রত্যেকেই বঙ্কিমের অনুসরণে এই ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। তখনকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা, শাসকবর্গের শোষণনীতি প্রভৃতিই এই ব্রত গ্রহণের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিল। তবুও একথা ঠিক যে, বঙ্কিম এ দেশানুরাগের শুধু স্বপ্নই দেখেননি তাকে তিনি তাঁর প্রবন্ধ উপন্যাসে সার্থক রূপও দিয়েছিলেন। এই অনুরাগেরই আদি রূপ রামমোহন, মাইকেল, বিদ্যাসাগর প্রভৃতিতে আমরা পেয়েছি। এঁরা সংস্কারক—ভবিষ্যত সমাজের পথ নির্মাণান্তর এঁরা পথনির্দেশও দিয়ে গেছেন। আমাদের আলোচ্য যুগে তা আরও সুস্পষ্ট, আরও প্রত্যক্ষ হয়ে দেখা দিয়েছে। তার কারণ আগে যে অত্যাচার নিপীড়ন ধীরে ধীরে চলছিল—এ সময়ে তা অতি নির্লজ্জ রূপ ধারণ করে। তখন বাঙালী জনসাধারণও বহু নির্যাতনের পর যেন ইতিহাসানুগ নিয়মে জেগে উঠছে—তার আগামী সার্থক জীবনের কামনা নিয়ে। একদিকে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা,

অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ—এ দুয়ের বিরুদ্ধে তখন বাঙ্‌লার চিন্তাশীল ব্যক্তি ও সাহিত্যিকদের সংগ্রাম করতে হয়েছে। অবশ্য তাঁরা একাই সংগ্রাম করে যাননি। তাঁদের পাশে, তাঁদের পেছনে, তাঁদের সামনে ছিল বাঙ্‌লার জনসাধারণ—যাঁদের একমাত্র কামনা ছিল সার্থক শান্তিপূর্ণ সমাজজীবন যাপন। এযুগে এমন অনেক নাটক রচিত হয়েছে যার সম্পূর্ণ আলোচনা না হলেও শুধু নামোল্লেখেও তার উদ্দেশ্য কিছুটা বোঝা যায়। এখানে আর একটি কথা বলে রাখা দরকার—বাঙ্‌লার সমাজের যে চাহিদা তখন দেখা দিয়েছিল তা মেটানোও তখনকার লেখকদের এক দায়িত্ব হয়ে উঠেছিল। সে সময় ধর্ম, রাষ্ট্র, সমাজ প্রভৃতির উপর যে প্রতিকূল হাওয়া বইছিল সাধারণের সমক্ষে তারও একটা প্রকাশ দরকার হয়ে পড়েছিল। তাই কোথায় কোন্ ইংরেজ জজ বা ম্যাজিস্ট্রেট দেশবাসীর প্রতি কি অন্যায় বিচার করল, ধর্মের নামে কোথায় ব্যভিচার দিল দেখা, সমাজে আধুনিকতার নামে চরিত্রহীনতা কতটা জঘন্য-রূপে দেখা দিল, তার রূপচিত্র তখনকার নাটকে দেখা দিয়েছিল, আর সঙ্গে সঙ্গে দেশাত্মবোধক নাট্যকাহিনী ত আছেই। এই শতাব্দীর নাটকে যেখানে রাষ্ট্রবিপ্লব, স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রভৃতি দেখানো হচ্ছে সেখানেই হিন্দু-বৌদ্ধ বা হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষই বেশী দেখানো হয়েছে, ইংরেজ-বৈরিতাও কিছু কিছু ছিল। এর একটা কারণ, তখন বাঙালী (হিন্দুরা) ইংরেজের বিরুদ্ধে সাহস করে কিছু বলতে পারছেনা। তাই সাম্প্রদায়িক মনোভাব মনের তীব্র বেদনার প্রচ্ছন্ন প্রকাশ হিসাবেই আমাদের সাহিত্যে কিছু কিছু ধরা দিয়েছিল। অবশ্য মুসলমানরা পরাজিত হয়ে অভিমানভরে চুপ করে থাকায় তাঁদের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগও তখন অন্যেরা কিছুটা পেয়েছিলেন। এই বিদ্বেষের ইঙ্গিত মীর মশারফ হোসেন তাঁর 'জমিদার দর্পণ' নাটকের নট-নটীর উক্তির ভেতর দিয়ে প্রকাশ করেছেন। আমাদের মনে হয় ইংরাজের বিরুদ্ধে যেটা স্পষ্টভাবে বলা যায়নি সেটাই সংকুচিত হয়ে সাম্প্রদায়িক রাস্তা ধরে চলেছিল। কিন্তু তাও সব নাটকে নয়। এই বিদ্বেষ দৃষ্টিভঙ্গীর ভুলের জন্যই বটে। কারণ সামগ্রিকভাবে আমাদের জাতীয় জীবনের দুর্দশার জন্য দায়ী যে নব-আগন্তুক সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ এবং আমাদের আত্মকলহ ও সামাজিক নিন্দনীয় কুসংস্কারের স্তূপীকৃত আবর্জনা তা অনেকেই বুঝেও সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসকবর্গের ভয়ে বুঝতে চাননি। যাঁরা বুঝেছিলেন তাঁরা

দেখতে পেয়েছিলেন হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত বিক্ষোভের সমুন্নত দিকটি। আমরা দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণে', গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলায়' তার পরিচয় পেয়েছি।

শ্রীগোপাল মুখোপাধ্যায় 'বিধবার দাঁতে মিশি' (১৮৭৪) প্রহসনে বাঙালীর মদ খাওয়া ও চারিত্রিক দুর্বলতার উপর ইঙ্গিত করেন। তাঁর 'যৌবনে যোগিনী' (১৮৭৬) নাটকে পৃথ্বীরাজ-মহম্মদ ঘোরীর সংঘর্ষ, হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের বিরোধ ও নানা রকম সামাজিক ও নৈতিক বুদ্ধির বিষয় বর্ণিত আছে। শ্রীগোপাল মুখোপাধ্যায় রচিত 'বীর বরণ' (১২৯০) উপন্যাসেও হিন্দু-বৌদ্ধ বিরোধের চিত্র পাওয়া যায়। ইনি 'রুষীয়া' (১৮৮০), 'সচিত্র রাজস্থান', 'রাজ জীবনী' প্রভৃতি গদ্য গ্রন্থও রচনা করেন।

এছাড়া ইতিহাসের নানা ঘটনাবলীর অথবা সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতার কাহিনী অবলম্বনে যে সব নাটক রচিত হচ্ছিল তার মধ্যে অক্ষয়কুমার চৌধুরীর 'দুর্গাবতী' নাটক (১৮৭৪), গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায়ের 'তারাবাঈ' (১৮৭৪) এবং বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য এই ছদ্মনামে তিনি সেযুগের বাঙালীর উদগ্র সাহেবীয়ানাকে ব্যঙ্গ করে 'একেই বলে বাঙ্গালী সাহেব?' (১৮৭৪) নাটক রচনা করেন।

হরিমোহন ভট্টাচার্যের 'সমরে কামিনী' নাটক (১৮৭৫), মহেন্দ্রলাল বসুর 'চিতোর রাজসতী পদ্মিনী' (১৮৭৫), বরিশালের মনোরঞ্জন গুহের 'ভারত বন্দিনী' (১৮৭৬), গিয়াসুদ্দিন ও রাজা গণেশের কাহিনী নিয়ে 'বঙ্গের পুনরুদ্ধার' (১৮৭৪), সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'হামীর' (১৮৮১), রবীন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু হরিশচন্দ্র হালদারের 'কালাপাহাড়' (১৮৮১) প্রভৃতি দেশানুরাগমূলক নাটক তখন রচিত হয়েছিল।

অন্যান্য নাটকের মধ্যে প্রমথনাথ বসুর হেম্‌লেটের অনুবাদ 'অমরসিংহ' (১৮৭৪), রাধামাধব হালদারের রোমান্টিক নাটক 'চন্দ্রলেখা' (১৮৭৫), পৌরাণিক নাটক 'শৈব্যাসুন্দরী' (১৮৭৬), সমাজের নৈতিক অধঃপতন নিয়ে রচনা তাঁর 'বেশ্যানুরক্তি বিষম বিপত্তি' (১৮৬৩) ও 'এই কলিকাল' (১৮৭৫), এবং তারকেশ্বরের মোহন্তর ব্যভিচার নিয়ে অন্যান্য লেখকের 'মোহন্ত এলোকেশী', 'মোহন্তের কারাবাস' (১৮৭৪), 'ভণ্ড তপস্বী' (১৮৭৪) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য কয়েকখানি নাটক রচিত হয়।

সমাজের নানা দুর্নীতি ও দুর্বলতা নিয়ে কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরীর 'অমরনাথ নাটক' (১৮৭৩), প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'পল্লীগ্রাম দর্পণ' (১৮৭৩), নিমচন্দ্র মিত্রের 'শরৎকুমারী নাটক' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তখনকার দিনে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে যে একটা বিরুদ্ধ মনোভাব দেখা দিয়েছিল তার পরিচয় দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' নাটকে (১২৮০) পাই। তখনকার গোঁড়া রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ যে স্ত্রীশিক্ষা ব্যাপারটি আদৌ ভালো চোখে দেখেনি তার নিদর্শন এই নাটক ছাড়া আরও অনেক প্রবন্ধে পাওয়া যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে চা-কর সাহেবদের যে অত্যাচারে চা-বাগানের কুলীরা ধর্মঘট করেছিল সেই অত্যচারের শুরু চা-বাগানের জন্ম থেকে। নইলে উনবিংশ শতাব্দীর নাটকে এই অত্যাচার এতো স্পষ্টভাবে বর্ণিত হত না। দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের 'চা-কর দর্পণ নাটকে' (১৮৭৫) চা-বাগানের ইংরেজ মালিকদের চা-কুলীদের ওপর অত্যাচারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। তেমনই জেলে কয়েদীদের ওপর যে অত্যাচার হ'ত তা নিয়েও তিনি 'জেল দর্পণ নাটক' (১৮৭৫) রচনা করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা আমাদের বর্তমান যুগের চেয়ে বিশেষ ভালো ছিল না। দরিদ্র মধ্যবিত্ত, বা বিত্তহীন সমাজের দুঃখ-দুর্দশা আজকের দিনে হয়ত আরও তীব্রতর হ'য়ে দেখা দিয়েছে কিন্তু তখনকার যুগেও এই অর্থনৈতিক দুর্দশা তীব্রভাবেই প্রকাশ পেয়েছিল। শুধু এই দুর্দশাই নয়, যারা এই দুর্দশার জন্য দায়ী তাদের স্বরূপও তখনকার সাহিত্যে চিত্রিত হয়েছিল। এই রকম নাটকের নিদর্শন হিসাবে আমরা অজ্ঞাতনামা লেখকের 'কেরানী দর্পণ' (১৮৭৪) এবং ক্ষেত্রপাল চক্রবর্তীর জমিদারের অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে 'হেমচন্দ্র নাটকের' (১৮৭৬) উল্লেখ করতে পারি। 'কেরানী দর্পণে' কেরানী জীবনের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে।

আমাদের সমাজে একদল চিকিৎসক আছেন যাঁরা চিকিৎসার নামে রোগীকে 'যমের দোর' অবধি পৌঁছে দেন—তাদের অর্থগৃধ্নুতা, হটকারিতা নিয়েও তখন নাটক রচিত হচ্ছিল। একজন ডাক্তার 'ডাক্তারবাবু নাটক' (১৮৭৫) রচনা করেন। তাতে ডাক্তাররা কতভাবে নিরীহ জনসাধারণকে যে ঠকাত (এখনও যে এমন নিদর্শন একেবারে নেই তা বলা যায় না) তার বর্ণনা আছে।

এযুগে বিধবা-বিবাহ ও স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্বন্ধে যে একদল রক্ষণশীল বাঙালীর বিরুদ্ধ মনোভাব দেখা দিয়েছিল তার দৃষ্টান্তস্বরূপ বিরাজমোহন চৌধুরীর 'বঙ্গ বিধবা' (১২৮২), 'সরস্বতী পুজা' (১৮৭৫, ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে), অজ্ঞাত-নামা লেখকের 'মেয়ে মন্‌স্টার মিটিং প্রহসন' (১২৮১) প্রভৃতি অনেক নাটকের উল্লেখ করা যায়। তবে এই নাটক সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশ ছাড়া তার বৃহত্তর ক্ষেত্রে বড় বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি। পারিবারিক জীবন নিয়ে যে সব নাটক লেখা হয়েছিল তার মধ্যে 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন' রচয়িতা দুর্গাচরণ রায়ের 'দুঃখ নিশি অবসান' বা 'শৈলবালা' (১২৮৩), কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যেমন দেবা তেম্নি দেবী নাটক' (১৮৭৭), জয়কুমার রায়ের 'এরা আবার সভ্য কিসে' (১৮৭৯), মহেন্দ্র ঘোষালের 'আর্য-সমাজ নাটক' (১৮৮৪), প্রাণকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কেরানী চরিত' (১২৯২) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ সময়ে হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে 'নন্দকুমারের ফাঁসী' (১২৯৩, দ্বি, সং) নাটকখানি রচনা করেন। বাঙালীর ঘরে বাইরে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল তা নিয়েও অনেক নাটক রচিত হয়েছে। আমরা সব নাটকের নাম এখানে আর উল্লেখ করছি না। যাঁরা এসব নাটক ও নাট্যকারের তালিকা সম্বন্ধে উৎসুক তাঁরা ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাসে (২য় খণ্ড) তা পাবেন।

এ সময়ের একজন নাট্যকারের কিছুটা পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ইনি হচ্ছেন অতুলকৃষ্ণ মিত্র (১৮৫৭-১৯১২)। অতুলকৃষ্ণ অল্প বয়স থেকেই রঙ্গালয়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। গীতি-নাট্যকার হিসাবেই তাঁর পরিচয় বেশী। 'রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর' পুস্তকে অপরেশ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অতুলকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলেন, 'অতুলকৃষ্ণ সুকবি ছিলেন। বাঙ্‌লার রঙ্গমঞ্চ তাঁহার নিকট কম ঋণী নহে। তাঁহার রচিত বহু গীতি-নাটিকা রঙ্গমঞ্চে বহুবার আদরের সহিত অভিনীত হইয়াছে এবং সে সব অভিনয়ে কোন দিনই দর্শকের অভাব হয় নাই। ছোট কথায় মর্মস্পর্শী গান তিনি অতি সহজেই বাঁধিতে পারিতেন।' অতুলকৃষ্ণ প্রায় ত্রিশ-বত্রিশখানা নাটক ও প্রহসন রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত 'আদর্শ সতী' (১৮৭৬), সপত্নী (১৮°৮), 'বিজয়া বা প্রতিমা বিসর্জন' (১৮৭৮), 'নন্দ বিদায়' (১৮৮৮), 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না' (১৮৯০), 'ফুল্লরা' (১৮৯৫), 'বাপ্পারাও' (১৯০৫), 'শিরী ফর্‌হাদ'

(১৯০৬), 'লুলিয়া' (১৯০৭) প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছিল। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের দেবীচৌধুরাণী, কপালকুণ্ডলা প্রভৃতি উপন্যাসগুলির নাট্যরূপ দান করেন। এছাড়া তিনি গান এবং কবিতাও অনেক রচনা করেছিলেন। উপেন্দ্রনাথ দাসের 'দাদা ও আমিকে' ব্যঙ্গ করে তাঁর 'গাধা ও তুমি'র রচনার উল্লেখ পুর্বেই করেছি।

যাত্রাগান

এই যুগে রঙ্গমঞ্চের জন্য যেমন নাটক রচিত হচ্ছিল এবং পেশাদারী রঙ্গমঞ্চও গড়ে উঠেছিল, তেমনই পাশাপাশি বাঙ্‌লার প্রাচীন যাত্রা গানও বারোয়ারী কানাতের তলায় বা উন্মুক্ত প্রান্তরে আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছিল। যাত্রার পালাও এ যুগে যথেষ্ট রচিত হয়েছে। বাঙ্‌লার যাত্রার পালাগুলোর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, তার অধিকাংশই পৌরাণিক ধর্মমূলক আখ্যানবস্তু নিয়ে রচিত। সমাজের সাধারণ মানুষের মনকে ধর্মভাব দিয়ে অল্পেই মুগ্ধ করা যায়। আর বিশেষ করে তখন আমাদের ধর্মচেতনা কি ভাবে ব্যাপক ক'রে ছড়িয়ে দেওয়া যায় তার উপায় সবাই খুঁজছিল। যাত্রার পালাগান, নাটক, কবিতা প্রভৃতির ভেতর দিয়ে এরকম ছড়িয়ে দেবার ঐকান্তিক চেষ্টাতে তারই নিদর্শন দেখ্‌তে পাই। তাই বেশীর ভাগ যাত্রার পালা পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে রচিত। আবার দেশানুরাগমূলক ও ঐতিহাসিক নাটকও যে কিছু কিছু রচিত হয়নি তা নয়। যাত্রার পালায় উপদেশাত্মক গানের বাহুল্যও যথেষ্ট থাকে। বাঙ্‌লাদেশে যাত্রার আসর কখনও ফাঁকা যায়নি। তার একটা প্রধান কারণ রঙ্গমঞ্চে নাটকাভিনয় দেখার অর্থসামর্থ্য সবার ছিল না। আর সাধারণ মনকে অভিভূত করবার একটা সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য যাত্রার পালাগুলির মধ্যে ছিল। বর্তমান দিনে যাত্রার নাটক থিয়েটার ও সিনেমার অনুকরণেই বেশীর ভাগ অভিনীত হয়। তাই তার মৌলিকতাও অনেকখানি হারিয়েছে। বাঙ্‌লা সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসের মধ্যযুগ থেকেই এই যাত্রাগানের নিদর্শন পাওয়া যায়। অবশ্যি তখন শুধু গানের ভিতর দিয়ে এবং সেই গানে আখর দিয়ে অভিনয় করা হ'ত। মহাপ্রভুর সময় এবং তারও আগে নট নটীর দ্বারা নাটকাভিনয়ের উল্লেখ আছে। বর্তমানে যাত্রা, কথকতা, কবিগান প্রভৃতি গ্রাম্য সমাজের

গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আজকের নতুন জাতীয়তাবোধের দিনে বাঙালীর এই জাতীয় সংস্কৃতির সম্পদগুলিকে সমাজের সামনে আবার তুলে ধরার শুভ প্রয়াস দেখা দিচ্ছে।

যাত্রার আসরে শুধু যাত্রার জন্য বিশেষ পালা বা নাটকই যে অভিনীত হ'ত তা নয়, রঙ্গমঞ্চের জন্য লিখিত নাটকও অভিনীত হ'ত। প্রাচীন যাত্রার কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তখনকার দিনে ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, কেদার গাঙ্গুলী, মহেশচন্দ্র দাস দে, তিনকড়ি বিশ্বাস, নন্দলাল রায়, ব্রজমোহন রায়, মতিলাল রায় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য নাট্যকাররা যাত্রার পালাগান রচনা করেন। এঁদের নাটকের প্রায় সবই ভক্তিমূলক পৌরাণিক আখ্যানবস্তু নিয়ে লেখা। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতির আখ্যানই বেশী। এছাড়া 'কালাপাহাড়', 'দাক্ষিণাত্য', 'মহম্মদ তোগ্‌লক' ও 'হোসেন গঙ্গু'র কাহিনী-সম্পর্কিত নাটকগুলিই যাত্রাদলে অভিনীত হত। কিন্তু বেশীর ভাগ নাটক ছিল রাম-রাবণের যুদ্ধ, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ, রাজা হরিশ্চন্দ্র-উপাখ্যান, নল-দময়ন্তী উপাখ্যান প্রভৃতি নিয়ে রচিত। যাত্রাগান বাঙ্‌লার একান্ত নিজস্ব সম্পদ। বাঙ্‌লার সংস্কৃতির ইতিহাসে তার একটি বিশেষ স্থান আছে।

কবি রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-৯৪) সম্বন্ধে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। রাজকৃষ্ণ খণ্ড-কবিতা, কাব্য, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি অনেক লিখেছিলেন। ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় বলেছেন,…'রাজকৃষ্ণের মত অমন অবিশ্রান্ত লেখক বাঙ্‌লাদেশে আর বড় কেহ ছিল না। বাঙ্‌লা লিখিয়া জীবিকা-অর্জনে রাজকৃষ্ণই বোধ হয় পথপ্রদর্শক, অবশ্য পাঠ্যপুস্তক লেখকদিগের কথা বাদ দিলে।' রাজকৃষ্ণ পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছিলেন। একদিকে যেমন 'রামের বনবাস', 'তরণীসেন বধ' (১২৯১), 'হরধনু ভঙ্গ', 'নরমেধ-যজ্ঞ', 'লক্ষহীরা', 'মীরাবাঈ' প্রভৃতি রচনা করেছিলেন তেমনি 'লৌহ-কারাগার' (১৮৭৮), 'বনবীর' (১২৯৯) নাটকও রচনা করেছিলেন। তিনি 'ডাক্তার বাবু', 'খোকাবাবু' (১২৯৬) প্রভৃতি প্রহসনও রচনা করেন। রাজকৃষ্ণই বাঙ্‌লায় প্রথম ভঙ্গ-অমিত্রাক্ষর রচনা করেন। গিরিশচন্দ্রের নাটকের অমিল-ছন্দের আদিরূপ রাজকৃষ্ণের রচনায় পাওয়া যায়। তাঁর গদ্যরচনায়ও গীতিপ্রবণতার লক্ষণ বর্তমান। রাজকৃষ্ণের নাটকে যাত্রার মতো গানের

বাহুল্য বেশী। তাঁর নাটক শিক্ষিত সমাজে বিস্ময় সৃষ্টি করতে না পারলেও সাধারণ বাঙালীর চিত্তকে খুবই আকৃষ্ট করেছিল।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

বাঙ্‌লা নাটকের দ্বিতীয় পর্যায়ে নাটক রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয়ের সার্থকতা দেখা দিল গিরিশচন্দ্রের (১৮৪৪-১৯১১) সময় থেকে। গিরিশচন্দ্র বাঙ্‌লা নাটক ও নাট্যাভিনয়ে যুগান্তর এনে দিলেন। নাটকের সত্যকার প্রাণ যে অভিনয়ে, সেই অভিনয়ের সার্থক প্রকাশ ঘটল তাঁর ভেতর দিয়ে। নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের আন্তরিকতাই ছিল বড়ো গুণ। তাঁর নিজের অনুভূতিকে তিনি নাটকে রূপ দিয়েছেন। তাঁর নিজের কথায় 'যেটা feel করেছি, যে সত্য practical life-এ realise করেছি, যা জীবনে মরণে পরম সত্য ব'লে জেনেছি তাই সবার ভিতর বিলিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি।' (গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য —কুমুদবন্ধু সেন)। অবশ্য রঙ্গালয়ের প্রয়োজনেও তাঁকে অনেক সময় নাটক লিখতে হয়েছিল। নাটক যুগোপযোগী না হলে যে দর্শকের মন আকর্ষণ করতে পারে না, এটা গিরিশচন্দ্র ভালো ক'রেই বুঝেছিলেন। যুগচিত্ত কি চায় তা নাট্যকারের মনে রাখতে হবে এবং তারই সঙ্গে সুর মিলিয়ে ভাব-দ্যোতনা যদি ঘটে তবেই রচনা সার্থক হবে। যে নাটক জনসাধারণকে আকৃষ্ট করতে পারে না সে নাটক বেশী দিন টিঁকতে পারে না। গিরিশচন্দ্রের নাট্য রচনার মধ্যে এই সচেতনতা ছিল বলেই তাঁর নাটকগুলি বাঙালী দর্শক সমাজের কাছে এতটা আদর লাভ করেছিল। গিরিশচন্দ্র খাঁটি বাঙালী—সাহিত্যেও তাঁর এই বাঙালীয়ানা প্রকাশ পেয়েছে। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল, কিন্তু পাশ্চাত্ত্যের একান্ত অনুকরণে তাঁর রচনাকে তিনি ভারাক্রান্ত করে তোলেননি। 'ম্যাকবেথ' অনুবাদে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। সেক্‌স্‌পীয়রের কবিধর্মকে ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। বাঙ্‌লা সাহিত্যে আর ওরকম সেক্‌স্‌পীয়রের অনুবাদ হয়নি বললে অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু অনুবাদ বা অনুকরণে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। তাঁর মতে এক দেশের আচার, ব্যবহার, সংস্কার অন্য দেশের সঙ্গে মেলে না। কাজেই নাটকের অনুবাদ বা অনুকরণও ততটা সাফল্য লাভ করতে পারে না। তা বলে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য সংস্কৃতিকে একেবারেই তিনি উড়িয়ে দেননি। 'ভাবের আদান-প্রদানে ভাব

পুষ্ট করে'—একথা তিনি ভালো ভাবেই বুঝেছিলেন। গিরিশচন্দ্রের ঐকান্তিক চেষ্টা ছিল সকল শ্রেণীর দর্শকের জন্য নাটক রচনা। কারণ, তিনি বুঝেছিলেন নাটক সবাইকে আকৃষ্ট করতে না পারলে ব্যর্থ হবে।

রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব যখন ঘটল, তার ঠিক আগে বাঙ্‌লা নাটক ও নাট্যাভিনয়ের বড়ই দুঃসময় গেছে। রঙ্গমঞ্চ যে জাতির একটা বড়ো সম্পদ এটা গিরিশচন্দ্র বুঝেছিলেন। তাই নাটক রচনা, অভিনয়, পরিচালনা প্রভৃতির ভেতর দিয়ে গিরিশচন্দ্র বাঙ্‌লা নাটক ও রঙ্গমঞ্চকে বলিষ্ঠ গতি দান ক'রে গেছেন। নাট্যরচনায় যেমন ভক্তিমূলক, পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, ব্যঙ্গ, গীতি নাটক প্রভৃকি রচনা করেছেন। তেমনি তাঁর অভিনয় ও অভিনেতা সৃষ্টিও বাঙ্‌লা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় ব্যাপার। বাঙালী জাতির পরিচয়ের একটি দিক হচ্ছে এই রঙ্গমঞ্চ। একথা অস্বীকার করলে চলবে না, যে জাতির রঙ্গমঞ্চ নেই তার জাতীয় বৈশিষ্ট্যও অনেকাংশে দুর্বল। গিরিশচন্দ্র বাঙালীর সেই জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে উৎকর্ষের পথে, সার্থকতার পথে নিয়ে গিয়েছিলেন। এই নাটক রচনায় তিনি যে খুব স্বাধীনতা পেয়েছিলেন তা বলা যায় না। যেমন দর্শকের চিত্তবৃত্তির দিকে নজর রাখতেন, তেমনি আবার রঙ্গমঞ্চাধিকারীর খেয়াল-খুসি অনুসারেও তাঁকে নাটক রচনা করতে হ'ত। কিন্তু 'Temper of time' এবং 'Temper of boss'-এর ভাবাবর্তে পড়ে তিনি হাবুডুবু খান্‌নি বরং সসম্মানে পার হ'য়ে গেছেন। রসসৃষ্টি যেখানে মুখ্য উদ্দেশ্য সেখানেও তিনি ঘটনাকে প্রবাহিত করে নিয়ে গেছেন। চরিত্রের বৈশিষ্ট্য রক্ষা এবং তার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ তাঁর নাটকের একটি প্রধান গুণ। শ্রদ্ধেয় আচার্য মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের কথায় 'তাঁহার নাটকগুলিকে চরিত্রপ্রধান বলা যায়।' পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক নাটকে প্রতিষ্ঠিত চরিত্রও জীবন্ত হয়ে উঠ্‌ত। তখনকার পরাধীন বাঙালীর মনোবেদনা 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীর কাসিম' প্রভৃতি নাটকে গিরিশচন্দ্রের করিমচাচা প্রভৃতি কাল্পনিক চরিত্রের উক্তির ভেতর দিয়ে সুন্দর ও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এই অনৈতিহাসিক চরিত্রগুলি বাঙালীর নিত্য দুঃখ-বেদনারই অভিব্যক্তিস্বরূপ।

নাটকে ভাষা প্রয়োগেও তাঁর বৈশিষ্ট্য আছে। বিভিন্ন রকমের চরিত্রের মুখে তিনি ভিন্ন ভিন্ন রকম ভাষা ব্যবহার করেছেন, এবং তাতে নাটকীয় চমৎকারিত্বও প্রকাশ পেয়েছে। 'ভঙ্গ-অমিত্রাক্ষর' ছন্দ যদিও বা

রাজকৃষ্ণ রায় গিরিশচন্দ্রের পূর্বে ব্যবহার করেছিলেন গিরিশচন্দ্রই এই ছন্দ নাটকে সব চাইতে বেশী ব্যবহার করেছেন। বিভিন্ন পরিবেশে নানারকম গানও তিনি রচনা করেছিলেন। তিনি 'আনন্দরহো, (১২৮৮), 'রাবণ বধ' (১২৮৮), 'সীতার বনবাস' (১২৮৮), অবতারমূলক 'চৈতন্য লীলা' (১২৯১—রচনা), 'বুদ্ধদেব চরিত' (১৮৮৭), 'বিল্বমঙ্গল', 'বিষাদ', 'নসীরাম', 'প্রফুল্ল', 'বসন্ত', 'সিরাজদৌলা', 'মীরকাসিম', 'আবুহোসেন', 'জনা', 'মায়াবসান', 'সৎনাম', 'বলিদান', 'শঙ্করাচার্য', (১৩১৬), 'অশোক' (১৯১১), 'তপোবল' এবং 'ভোটমঙ্গল' প্রভৃতি প্রায় আশীখানা নাটক ও প্রহসন রচনা করেন। আর কোন বাঙ্গালী নাট্যকার এতগুলি নাটক রচনা করেন নাই। তাঁর চৈতন্যলীলা, বুদ্ধদেব, বিল্বমঙ্গল, প্রভৃতিকে ভক্তিমূলক মহাপুরুষ-নাটক বলা যেতে পারে। গিরিশচন্দ্রের এই ভক্তিভাব পরমহংসদেবের সান্নিধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। এই ভক্তি রসের প্রাধান্যই তাঁর অনেক নাটকের জনপ্রিয়তার কারণ।

দার্শনিক তত্ত্বকে সরস করে জনসাধারণের উপভোগ্য করে তোলার প্রয়াস গিরিশচন্দ্রের নাট্য রচনাতে পাওয়া যায়। তাঁর বিল্বমঙ্গল, শঙ্করাচার্য প্রভৃতি নাটকে এই তত্ত্বকে সরস করে সাধারণের উপভোগ্য করে তোলার প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়। গিরিশচন্দ্রের প্রত্যক্ষ জীবন দর্শনের ফলে আমরা তাঁর নাটকে একদিকে পতিতের হৃদয় বৃত্তি আবার অন্যদিকে শিক্ষিতের ঘৃণ্য পাশবিক দিকও দেখতে পেয়েছি। মানুষ নিজের চারিত্রিক দুর্বলতার জন্য, আত্ম-প্রত্যয়ের অভাবের জন্য কেমন করে দিশাহারা হয়ে ভেসে যায় তাও তিনি নিজে চোখে দেখে তবে এঁকেছেন। এই চরিত্র অঙ্কন সহৃদয়তা ও সহানুভূতি ছাড়া হয় না। গিরিশচন্দ্রের সেই সহৃদয়তা ও সহানুভূতি ছিল।

তাঁর সামাজিক নাটকে কলকাতার বাইরের কোনো ঘটনা বা পরিবেশকে পাইনি। তিনি কলকাতার মধ্যবিত্ত শিক্ষিত, অশিক্ষিত সমাজ ও তার প্রতিদিনের সুখ দুঃখ, ঈর্ষা দ্বন্দ্ব, দলাদলি প্রভৃতি নিয়ে তাঁর সামাজিক নাটক-গুলি রচনা করেছিলেন। সামাজিক নাটকে, জাল, জুয়াচুরি, শিক্ষিতের পশুপ্রবৃত্তি, ব্যাঙ্ক ফেল, আইন আদালত, মদ্যপান, খুন, মৃত্যু, দারোগা পুলিশ সব-কিছুরই অবতারনা করেছেন। কলকাতার নাগরিক জীবনে প্রতিদিন এসব ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। দারোগা, পুলিশ প্রভৃতির অবতারণা

তখনকার দর্শকের মনে বিস্ময় জাগাবার জন্য করা হয়েছিল। এই দারোগা পুলিশের অবতারনা কালাতিক্রম করে 'বিল্বমঙ্গলে'ও এসে গেছে। গিরিশচন্দ্র যে তাঁর সব নাটকেই সাফল্য লাভ করেছেন একথা বলা যায় না। কোথাও কোথাও নাটকের আখ্যানবস্তু ও চরিত্রগুলি স্বাভাবিকতার গণ্ডী ছাড়িয়ে গেছে। একদিকে রঙ্গালয়ের প্রয়োজন অপর দিকে লেখকের অনুভূতির আবেগ এবং হিন্দুধর্মের নবজাগরণের উদ্দামতা—সব মিলেই তাঁর নাটকের সৃষ্টি। কাজেই প্রয়োজনের তাগিদ যেখানে বেশী সেখানে তত্ত্ব বা রসের সূক্ষ্মানুভূতির সার্থক প্রকাশ ঘটা দুরূহ ব্যাপার। তবে এটা ঠিক যে নাটকের action ও ভাবের গভীরতার পরস্পর সংঘর্ষে নাটকের কৌলীন্য বজায় রাখতে না পারলেও তাঁর নাটকগুলি আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পেরেছে।

বাঙ্‌লা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্রের দানের কথা ভাবতে গেলে রঙ্গমঞ্চ ও রঙ্গালয়ের কথাই সর্বাগ্রে বলতে হয়। বাঙ্‌লার রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে তাঁর স্বাক্ষর চির-উজ্জ্বল থাকবে। রঙ্গমঞ্চকে জাতীয় বৈশিষ্ট্য দান এবং জাতীয় পরিচিতির অঙ্গস্বরূপ রঙ্গমঞ্চের প্রাধান্য ও স্থায়িত্ব তাঁর দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি অক্লান্তভাবে নাট্যাচার্য হিসাবে রঙ্গমঞ্চের সেবা করে গেছেন এবং তার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির নানা উপায় উদ্ভাবনও করে গেছেন। তাঁর শিষ্য ও ভাবশিষ্যরা রঙ্গমঞ্চকে আরও নতুন ও ব্যাপকতর দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা সার্থকতার পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন এবং এখনও করছেন। ভালো বাঙ্‌লা নাটক নেই বলে রঙ্গমঞ্চ প্রায় বন্ধ হবার যখন উপক্রম হয়েছিল, সেই দুঃসময়ে একা নাট্যকার, অভিনেতা, পরিচালক, সংগঠক হিসাবে তিনি দুঃসাহস এবং সাফল্যের সঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

এখানে তাঁর কয়েকখানি নাটকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি। তাঁর সামাজিক নাটকগুলির সাধারণ লক্ষণ সম্বন্ধে পূর্বে উল্লেখ করেছি। এই নাটকগুলি বাঙালীর পারিবারিক জীবন নিয়ে লেখা। এই পারিবারিক জীবনে তিনি ভালো মন্দ বিচারের চাইতেও পাপ-পুণ্য বোধের দিকটাই তিনি বেশী করে দেখাতে চেয়েছেন। তিনি চারিত্রিক দ্বন্দ্ব বা Conflictএর সুস্পষ্ট বিশ্লেষণ বড় একটা করেননি। 'প্রফুল্ল', 'বলিদান' প্রভৃতি সামাজিক নাটক-গুলির আখ্যানবস্তু সব উত্থানপতন, দ্বন্দ্ব, সমাবেশ প্রায় একই রকম। সেই পরিবার, সেই তার দ্বন্দ্বের সূচনা, তারপর বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা এবং

পরিণামে একটা বিরাট বিপর্যয়। 'প্রফুল্ল' নাটকে যোগেশের সাজান বাগান শুকিয়ে যায়। আমরা শুনতে পাই তার মর্মন্তুদ আর্তনাদ—একটা গুমরে ওঠা কান্না। জীবনের দুঃখকে ভোলবার জন্য সে অবিরাম মদ্য পান করে। অপর দিকে শিক্ষিত রমেশ—পশুমন নিয়ে ভাইকে প্রতারণা করবার জন্যে সমাজে কেবল চক্রান্ত করে যাচ্ছে। কাঙালীচরণ, জগমণি প্রভৃতি সংসারের ক্লেদাক্ত আবর্জনাস্বরূপ। আর প্রফুল্ল যেন আত্মত্যাগের প্রতীক। বাড়ীর বড় কর্তা যোগেশ বটে কিন্তু সে গোড়া থেকেই দুর্বল। তার আত্মপ্রত্যয়ের অভাব থেকে গেছে। এই দুর্বলতার উপর রমেশের চক্রান্ত দানা বেঁধে উঠ্‌ছে। রমেশ, কাঙালী, জগমণি—এই ত্রয়ী—এরা পেশাদার দুষমন বা villain, এরা সব সময়েই শান্তির সংসারে আগুন ধরাচ্ছে। কিন্তু যে ঘটনাচক্রের ভিতর দিয়ে প্রফুল্ল নাটক বিপর্যয়ের চরমে গিয়ে পৌঁছাল তা স্বাভাবিক ভাবে এগিয়ে যায়নি। এখানে নাটকের বিস্ময় ও চমৎকারিত্ব উৎপাদনের জন্য এবং নাট্যকারের নিজস্ব ভাবাদর্শ প্রয়োগের জন্য নাটক কিছুটা অস্বাভাবিক পথে পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে। মদ্যপানের পরিণাম, স্বার্থপরতা ও পাশবিকতার ভয়াবহ পরিণতি, আত্মত্যাগের আদর্শ, দুর্বলতার শোচনীয় পরিণতি প্রভৃতির আদর্শকে তিনি এই নাটকে এবং অন্যান্য সামাজিক নাটকেও রূপায়িত করতে চেয়েছেন। কিন্তু এই আদর্শের ভীরে নাটকের গতি কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। সেযুগের কলকাতার মধ্যবিত্ত বাঙালীর পারিবারিক জীবনে ঘাত-প্রতিঘাত, দ্বন্দ্ব-কলহ প্রভৃতি অত্যন্ত দোষনীয় ব্যাপারগুলি তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট করেই দেখিয়েছেন। এই আত্যন্তিক ভাব নাটককে কিছুটা স্বভাব-ভ্রষ্টও করেছে। মানুষ তার পাশবিক বৃত্তির চরিতার্থতায় অমানুষ হয়েছে অর্থাৎ তার স্বাভাবিক মনুষ্যত্ববোধ হারিয়েছে,—এটা প্রকাশ করতে গিয়ে ঠিক যতটা অমানুষ করলে তাকে স্বাভাবিক মনে হতে পারে অর্থাৎ villain হিসাবেও যতটা স্বাভাবিক হতে পারে তার চেয়ে আরও বেশী এবং অত্যন্ত রকম অস্বাভাবিক হয়ে উঠেছে রমেশ, জগমণি প্রভৃতি চরিত্রগুলি। যোগেশের মধ্যে অসাধারণ কিছুই ঘটেনি। যা ঘটেছে তা তার দুর্বলতারই স্বাভাবিক পরিণাম। প্রফুল্ল চরিত্র হঠাৎ শেষের দিকে আত্মত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে। প্রফুল্ল নাটকটি সার্থক ট্রাজেডি হ'তে হ'তে শেষ পর্যন্ত বীভৎস বিপর্যয়ের ভেতর দিয়ে

মেলোড্রামাতে পরিণতি লাভ করেছে। বাঙ্‌লা রঙ্গমঞ্চে এই নাটক বহুদিন ধরে জনপ্রিয়তা অর্জন করে আসছে।

'হারানিধি' (১৮৯০) নাটকেও বিশ্বাস-ঘাতকতা, প্রতারণা প্রভৃতি আছে। তবে এখানে ভাই নয়—বন্ধুই বিশ্বাসঘাতক। 'মায়াবসান' নাটকে আবার ভ্রাতৃবিরোধ এবং আইন আদালত, পারিবারিক দুর্যোগ ইত্যাদি বর্ণিত হয়েছে।

'বলিদান' নাটকে বাঙালী সমাজের, বিশেষ করে হিন্দুসমাজের বিবাহ সমস্যাই একমাত্র বাস্তব সমস্যা। এই নাটকের বিষয়বস্তু অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল। তখনকার দিনে শুধু নয়, আজও কন্যাদায়গ্রস্থ পিতার দুঃখের দুশ্চিন্তা অবসান হয়নি। এই নাটকে গিরিশচন্দ্র খাঁটি বাঙালী ঘরের মেয়েদের শোচনীয় জীবনকেই বিষয়বস্তু করে তুলেছেন। 'শাস্তি কি শান্তি' নাটকটি বিধবা সমস্যা নিয়ে লেখা। এখানে বিধবার জীবনে প্রেম অমার্জনীয় অপরাধ কিনা—বিধবার বিবাহ তার জীবনে কোনো সুখ শান্তি এনে দিতে পারে কিনা তারই আলোচনা হয়েছে। গিরিশচন্দ্র বঙ্কিমের মতোই বিধবার প্রেমকে সহজ ক'রে দেখেন নাই। তাঁর সামাজিক নাটকে মৃত্যুর ছড়াছড়ি দিয়ে নাটকীয় ট্রাজেডির সৃষ্টি করার চেষ্টা দেখতে পাই। কিন্তু ট্র্যাজেডির প্রধান বৈশিষ্ট্য যে মৃত্যুই শুধু নয় এবং মানুষ বেঁচে থেকেও যে ট্রাজেডির প্রধান বিষয়বস্তু হতে পারে—এটা গিরিশচন্দ্র সহজভাবে মেনে নেননি। পারিবারিক জীবন ও তার বিপরীত উচ্ছৃঙ্খল জীবন—নাটকে এ দুয়ের অবতারণা ঘটিয়ে গিরিশচন্দ্র পাপ-পুণ্যের বিচার করেছেন। গিরিশচন্দ্র এখানে একান্তভাবে নাট্যকারই নন, নীতিবিদের ভূমিকাও গ্রহণ করেছেন।

পৌরাণিক ও ভক্তিমূলক নাটকে গিরিশচন্দ্রের প্রকাশ আরও সহজ ও সাবলীল হয়েছে। তার কয়েকটা কারণ আছে। প্রথমত, দেশের জনসাধারণের মনে ধর্মের যে প্রবল ভাব বিদ্যমান—এবং পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে সমাজে যে নীতিবোধ রয়েছে তার বাইরে কিছু বলতে গেলে জনসাধারণকে ততটা আকৃষ্ট করা যাবে না। ইংরেজ আগমনের পরেও বাঙালী স্বাভাবিক ধর্ম ভাবুকতা বা সংস্কার যে কমে যায়নি এবং তাই রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধসাহিত্য, বৈষ্ণব সহজিয়া মত, বীরপূজা প্রভৃতি বাঙালী সমাজের চিন্তাধারার যে রসদ যোগান দিচ্ছে এটা গিরিশচন্দ্র বুঝেছিলেন। দ্বিতীয়ত, পূর্বে আমরা বলেছি যে, গিরিশচন্দ্রের যুগ হিন্দুধর্মের নবজাগরণের যুগ। এযুগে

পরমহংসদেব ও তাঁর উপযুক্ত শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব ঘটেছে। বঙ্কিমও হিন্দুধর্মের নিষ্ক্রিয়তা, নির্জীবতার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছেন। গিরিশচন্দ্রেও এই ভাবাদর্শের কল্যাণমিশ্রণ ঘটেছে। তৃতীয়ত, প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম, দর্শন প্রভৃতিতে তাঁর অসীম শ্রদ্ধা ছিল। অবতার পুরুষের প্রচার এবং বাঙালীর অধ্যাত্ম জীবনকে ভক্তিরসে আপ্লুত করলে জাতি যে ধর্মভ্রষ্ট হবে না, এই ধারণাও তাঁর ছিল। কিন্তু ভক্তিরসের প্রাবল্য এবং পৌরাণিক আখ্যান-বস্তুর পূর্ব-সিদ্ধ ভাব নাটকগুলিকে ভালোমন্দ বিচারের অতীত করে তুলেছে। তবুও তাঁর পৌরাণিক নাটকে ভাষার বিশেষ ছন্দোভঙ্গিতে কিছুটা নতুনত্ব দেখা দিয়েছে। কিন্তু কাহিনীর দিক থেকে বৈচিত্র্য সম্পাদন ত সম্ভব নয়। পৌরাণিক নাটকের গোড়া থেকেই তার শেষটুকুর খবর পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক নাটকে যদিও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চরিত্র ও ঘটনার সমাবেশ তবুও তার মধ্যে কবি কল্পনার দ্বারা বৈচিত্র্য সম্পাদন করা দুঃসাধ্য নয়। আকবর বা শিবাজীর জীবনের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ঘটনাগুলি এবং তাঁদের জীবনের শেষ পরিণতি আমরা জানি। কিন্তু আকবরের চোখের জল, শিবাজীর দীর্ঘশ্বাস—এসব নাট্যকার কল্পনা করে নিতে পারেন। কারণ তাঁরাও দোষগুণে, সুখদুঃখে অসম্পূর্ণ মানুষ ত! ভক্তিমূলক ও পৌরাণিক নাটকে তার সুযোগ সম্ভাবনা কম।

'বুদ্ধদেব', 'চৈতন্যলীলা', 'নিমাইসন্ন্যাস', 'শঙ্করাচার্য', 'বিল্বমঙ্গল' প্রভৃতি এবং 'সীতার বনবাস', 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস', 'সীতা হরণ', 'রাবণ বধ', 'দক্ষযজ্ঞ', 'জনা', 'নল দময়ন্তী' প্রভৃতি যথাক্রমে ভক্তিমূলক, অবতারমূলক ও পৌরাণিক নাটকের পর্যায়ে পড়ে। এখানে গিরিশচন্দ্রের অবতারত্বে বিশ্বাস, ধর্মে বিশ্বাস, প্রাচীন সংস্কৃতির ঐতিহ্যের গৌরবে গৌরবানুভূতির নিদর্শনও মিলে। অবতার তত্ত্বে ভক্তিভাব প্রবল। সেই ভক্তি গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধদেব', 'বিল্বমঙ্গল' প্রভৃতিতে প্রকাশ পেয়েছে। 'বিল্বমঙ্গলে' ভক্তিরসের প্রাবল্য এত বেশী যে নাটকটি মানুষের আলোচনা-সমালোচনার আর অপেক্ষা করে না। এসব নাটকে পাপকেও দেখানো হচ্ছে আর পাপীকেও আধ্যাত্মিক স্তরে অলৌকিকভাবে উন্নীত করে অবশেষে উদ্ধার করা হচ্ছে। পৌরাণিক বা ভক্তিমূলক নাটকে ধর্মভাবের আতিশয্য ততটা ক্ষতিকর নয়—কিন্তু সামাজিক বা ঐতিহাসিক নাটকে তার আতিশয্য ঘটলে নাটকের পক্ষে নিশ্চয়ই

তা ক্ষতিকর হবে। গিরিশচন্দ্রের ধর্মভাব, নীতিবোধ তাঁর প্রায় সব নাটকগুলিকেই অল্প-বিস্তর প্রভাবিত করেছে।

গিরিশচন্দ্রের 'চৈতন্যলীলা', 'বুদ্ধদেব', 'শঙ্কর', 'বিল্বমঙ্গল' প্রভৃতিতে মানবত্বের চেয়ে অবতারত্ব বেশী ফুটে উঠেছে। চৈতন্য ও বুদ্ধদেব চরিত্রে মানবত্বের বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় না। শঙ্করাচার্যেও তাই ; বিল্বমঙ্গলে মানবীয় প্রেম শেষ পর্যন্ত দৈবী মহিমা লাভ করেছে। 'নসীরামে'ও কাম ও প্রেমের সংঘর্ষে প্রেমের জয় ঘোষিত হয়েছে। 'নসীরাম' অবশ্য ইতিহাসাশ্রিত ধর্মমূলক নাটক।

'কালাপাহাড়' যদিও বা ঐতিহাসিক নাটকের পর্যায়ে পড়া উচিত তবুও এই নাটকেও সেই ধর্মভাবের ও ভক্তিভাবের প্রাবল্যই বেশী। পৌরাণিক নাটকের মধ্যে 'জনা' নাটকই নাটকীয় উৎকর্ষ লাভ করেছে। 'জনা' চরিত্রে মানবত্ব বেশী পরিমাণে প্রকাশ পেয়েছে। মাইকেল মধুসূদনের প্রবীর-জননী জনাই তাঁর নাটকে সার্থক রূপ লাভ করেছে। 'জনা' নাটকের পরিণতিও মধুসূদনের পরিকল্পনার দ্বারা প্রভাবিত।

গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে 'সিরাজদৌলা' সমধিক প্রসিদ্ধ। তার পরেই 'মীরকাসিম' ও 'ছত্রপতি শিবাজীর' উল্লেখ করা যায়। পূর্বে তিনি 'আনন্দ-রহো' নামে অতি প্রাকৃত মিশ্রিত এক ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেছিলেন। 'সিরাজদৌলা' নাটকে বাঙ্‌লার শেষ স্বাধীন নবাবের পতন, বাঙ্‌লার স্বাধীনতা লোপ, নবাব দরবারের কলহ, চক্রান্ত প্রভৃতি যথাযথ বর্ণিত হয়েছে। এখানে গিরিশচন্দ্রের মনোভাব করিম চাচার উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে। করিমচাচা এই নাটকে বিবেকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। নাটকটিতে গিরিশচন্দ্রের দেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। 'মীর কাসিম' নাটকও অনুরূপভাবে বর্ণিত হয়েছে। এখানেও পরাধীন বাঙালীর বেদনাবোধ রূপায়িত হয়েছে। এই নাটকে তারা চরিত্র করিমচাচার স্থান পূর্ণ করেছে। ইংরেজ সরকার রাজদ্রোহিতার জন্য বহুকাল যাবৎ এই দুইখানা নাটক এবং 'ছত্রপতি শিবাজী' নাটকখানিও বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। 'সৎনাম' বা 'বৈষ্ণবী' নাটকে ঔরংজীবের বিরুদ্ধে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই নাটকটি অনেকটা বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠের' মতো। একটি সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা লাভের আশা ও ব্যর্থতা এই নাটকের মূল বিষয়।

এছাড়া তাঁর 'চণ্ড', 'অশোক' প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে। অবশ্য 'অশোক' নাটকে ইতিহাস অপেক্ষা ধর্মভাব প্রবল। তাঁর গীতিনাট্য ও প্রহসনের এখানে আর বিস্তৃত আলোচনা করলাম না। তবে বাঙ্‌লা গীতি-নাট্য ও প্রহসনে গিরিশচন্দ্রের সহজ ও সাবলীল প্রকাশভঙ্গী তাঁর উক্ত রচনাগুলিকে সার্থক করে তুলেছে।

গিরিশচন্দ্র দর্শকের মন চিনতেন। তাই নাটকে দর্শকের মনোরঞ্জনে যা যা দরকার তা রাখতেন। গিরিশচন্দ্রের নাটক রচনার আদর্শ ছিলেন সেক্‌স্‌পীয়র এবং বাঙ্‌লার মনোমোহন বসু ও দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতি। নাটক শুধু কাহিনী ও চরিত্রের পরিবেশন নয়, তার দ্বারা জনসাধারণ শিক্ষাও লাভ করবে এই ছিল তাঁর আদর্শ। তাঁর নাটকের মহাপুরুষ চরিত্রগুলি পরমহংস-দেব-চরিত্রের অলৌকিকত্বের দ্বারা প্রভাবিত।

বাঙ্‌লা নাট্য সাহিত্যে ও রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্রের স্থান সর্বাগ্রে বল্‌লে অত্যুক্তি হবে না। রঙ্গমঞ্চের উন্নতির জন্য তাঁর যে ঐকান্তিক প্রয়াস, বাঙ্‌লা নাট্য সাহিত্যের উৎকর্ষ কামনায় তাঁর যে প্রচেষ্টা তার ভেতর দিয়ে জাতীয় জীবনে ও জাতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে তিনি এক নতুন অধ্যায় রচনা করে গেছেন। তাঁকে যে বাঙ্‌লা রঙ্গমঞ্চের জনক বলা হয় তাও অত্যুক্তি নয়। হয়ত নাটকের সর্বত্র তিনি সাফল্য লাভ করেন নি, কিন্তু নাটক-রচনায় তাঁর আন্তরিকতা ও উদ্দেশ্যের মহত্ব অনস্বীকার্য। ধর্মভাব ও ভক্তিভাব তাঁর জীবন ও দৃষ্টিভঙ্গীকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখলেও জাতীয় উন্নতিবিধানে, পাতিত্যের প্রতি সহানুভূতিতে, ভাবের গতিমুখরতায় তাঁর সাহিত্যব্রত ও নটজীবন বাঙালী সমাজে যে প্রাণের নতুন আশা জাগিয়ে তুলেছিল একথা বাঙালী অস্বীকার করতে পারবে না।

অমৃতলাল বসু

গিরিশচন্দ্রের সমসাময়িক এবং গিরিশচন্দ্র দ্বারা অনুপ্রাণিত নাট্যকারদের মধ্যে প্রথমে অমৃতলাল বসুর (১৮৫৩-১৯২৯) উল্লেখ করতে হয়। ইনিও যুগপৎ অভিনেতা ও নাট্যকার। অমৃতলালের নাটকের বড়ো গুণ হচ্ছে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও হাস্যরসের পরিবেশন। আমাদের সমাজের ত্রুটি বিচ্যুতি, ব্যক্তি জীবনের নিন্দনীয় অপরাধকে তিনি তীব্রভাবে কষাঘাত করেছেন। তাঁর

বিবাহ-বিভ্রাট (১২৯১), তাজ্জব ব্যাপার (১২৯৭), খাসদখল (১৩১৮), প্রভৃতি নাটক তার সার্থক দৃষ্টান্ত। তবে পরোক্ষভাবে তাঁর নাটকে শিক্ষাদানের একটা চেষ্টাও আছে। সমাজের চোখে আঙুল দিয়ে দোষ ধরিয়ে দিয়ে তার দুর্বলতার সংশোধন প্রচেষ্টাও তাঁর নাটকগুলিতে আমরা দেখতে পাই। উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজে যে অতিরিক্ত ইংরেজীয়ানা দেখা দিয়েছিল তাকেও তিনি তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন। এই মনোভাব মধুসূদন, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্রের নাটক ও প্রহসনে আমরা লক্ষ্য করেছি। 'বিবাহ-বিভ্রাটে' আধুনিকতার সংস্পর্শে এলে আমাদের নারী-জাতির কি দুর্দশা হবে তা দেখিয়েছেন বিলাসিনী কারফরমা চরিত্রটিতে। মেয়েরা যাচ্ছেন ডিনারে আর স্বামী মসলা পেষে আর রান্না করে। আমাদের বাঙ্‌লার সমাজে তখন যে উগ্র জাতীয় চেতনা, সংগ্রামশীলতা এবং প্রগতিশীলতা দেখা দিয়েছিল অমৃতলাল তাতে সায় দেননি। কিন্তু তখনকার স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গেও তিনি জড়িত ছিলেন। বঙ্গভঙ্গের সময় তিনি সভাসমিতিতে অনেক বক্তৃতাও করেছেন। উপেন্দ্রনাথ দাসের 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নাটক অভিনয়ের জন্য সরকার কর্তৃক নিগৃহীত হওয়ার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কিন্তু তিনি কখনও উগ্রপন্থী ছিলেন না। বরং তাঁকে সংরক্ষণশীল হিন্দু বলা যায়। এই দোটানাভাব তাঁর জীবনের একটা দ্বন্দ্বময়তার পরিচয় দেয়। 'তাজ্জব ব্যাপারে'ও স্ত্রী স্বাধীনতার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর 'চাটুয্যে ও বাড়ুয্যে' (১৮৮৬), 'চোরের উপর বাটপাড়ি' (১২৮২), 'কৃপণের ধন' (১৩০৭) প্রভৃতি বিদেশী নাটকের ছায়া অবলম্বনে রচিত। পৌরাণিক নাটক হিসাবে 'হরিশ্চন্দ্র' ও 'যাজ্ঞসেনী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে অমৃতলাল প্রথম 'হীরকচূর্ণ' নাটক (১৮৭৫) রচনা করেন। অমৃতলালও জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রঙ্গমঞ্চের সেবা করে গেছেন। তাঁর পৌরাণিক নাটক থেকেও প্রহসনগুলিতে নাট্য-বৈশিষ্ট্য বেশী প্রকাশ পেয়েছে। এবং নাটকাভিনয়দ্বারা শুধু দর্শকের মনোরঞ্জন করাই নয়, পরোক্ষ-ভাবে আমাদের সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধেও সচেতন করে তোলার চেষ্টা করেছেন। এদিক থেকে বাঙ্‌লা নাট্য সাহিত্য অমৃতলালের দ্বারা আরও কিছুটা উন্নতির পথে এগিয়ে গেছে।

অমৃতলালের পর বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ও (১৮৪০-১৯০১) অভিনেতা

ও নাট্যকার হিসাবে বাঙ্‌লা সাহিত্য ও সংস্কৃতির আসরে অবতীর্ণ হন। অভিনেতা হিসাবে তাঁর যেমন সুনাম ছিল তেমনি তাঁর রচিত 'দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর' (১৮৮৪) 'মিলন' (১৮৯৪-সামাজিক নাটক), 'রাবণ বধ' (১৮৮২) 'পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ' (১২৯৫) প্রভৃতি নাটকও বাঙ্‌লার রঙ্গমঞ্চে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল

এরপর বাঙ্‌লা নাটক রচনায় যে কয়েক জন নাট্যকার আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭) ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) দুজনই সম-সাময়িক কালের লেখক, দুজনই উচ্চশিক্ষিত। ক্ষীরোদ-প্রসাদ ছিলেন অধ্যাপক আর দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। তখনকার জাতীয়তা আন্দোলন, দেশপ্রেম দুজনকেই উদ্বুদ্ধ করে। কাব্য বা খণ্ড কবিতা রচনা ছাড়া দুজনেই বহু নাটক রচনা করেছেন। গিরিশচন্দ্রের পর অমৃতলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্‌লা নাট্য-সাহিত্যের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কস্বরূপ। পৌরাণিক বা ধর্মমূলক নাটক ছাড়া তাঁরা দেশ-প্রেমোদ্দীপক ঐতিহাসিক ও কিছু সামাজিক নাটক রচনা করেন। ক্ষীরোদ-প্রসাদের 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত', 'রঘুবীর', 'আলমগীর', 'প্রতাপাদিত্য', 'বাঙ্‌লার মসনদ', 'নন্দকুমার', প্রভৃতি এবং দ্বিজেন্দ্রলালের 'দুর্গাদাস', 'নূরজাহান', 'সাজাহান', 'মেবার পতন', 'পরপারে', 'বঙ্গ নারী' প্রভৃতি বাঙালী দর্শকদের কাছে একসময় খুবই সমাদর লাভ করেছিল এবং আজও তাদের মূল্য কিছুমাত্র কমেনি। এছাড়া এঁদের গীতিনাট্য প্রহসনও বাঙালীর বিশেষ প্রিয়। ক্ষীরোদ-প্রসাদের সামাজিক নাটক পাওয়া না গেলেও তিনি অনেক সামাজিক উপন্যাস কিন্তু রচনা করেছিলেন। হাসির গান ও স্বদেশী গানের জন্যই দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙালীর বিশেষ প্রিয়।

ক্ষীরোদপ্রসাদের গীতিনাট্যের মধ্যে 'আলিবাবা' (১৮৯৭), 'জুলিয়া' (১৯০০), 'কিন্নরী' (১৯১৮) প্রভৃতি বাঙালীর বিশেষ পরিচিত এবং রঙ্গমঞ্চেও বিশেষ সাফল্যলাভ করেছে। এসব নাটকের বিষয়বস্তু নিতান্ত হাল্‌কা। গান ও

নৃত্যই এসব নাটকের বিশেষত্ব। এই গীতিনাট্যের পরিচয় গিরিশচন্দ্রের 'আবুহোসেনেও' আমরা পেয়েছি।

ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটকই সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর ঐতিহাসিক নাটকে জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেম যে ভাবে প্রকাশ পেয়েছে তেমন অন্য নাটকে খুব কমই আছে। অবশ্যি এখানে আমরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের নাটকের কথা বলছি না। ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকের মধ্যে জীর্ণপ্রাণ নিষ্ক্রিয় বাঙালীকে জাগিয়ে তোলার ঐকান্তিক কামনা প্রকাশ পেয়েছে। ঐতিহাসিক আখ্যানবস্তু তিনি নাটক রচনার জন্য গ্রহণ করেছেন—আর তাঁর সামনে ছিল পরাধীন দেশের ছবিটি। এদিকে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই যে স্বাধীনতার দুর্জয় কামনা বাঙ্‌লার বুকে প্রচণ্ড রূপ ধারণ করেছিল তারও প্রভাবকে তিনি এড়িয়ে যান নি। তাই ইতিহাসের ঘটনাবস্তুকে অবলম্বন করলেও অনেক সময় জাতির প্রয়োজনবোধে তিনি তাঁর নিজস্ব একটা রূপও দিতে চেয়েছেন। 'আলমগীরে' রাজসিংহ ও আলমগীরের মিলনের দৃশ্যটি অথবা ভীমসিংহের প্রতি আলমগীর ও উদিপুরীর আন্তরিক স্নেহ প্রভৃতির ভেতর দিয়ে অসম্প্রদায়িক মনোভাব যে স্বাধীনতা লাভের জন্য, ঐক্য বিধানের জন্য একান্ত প্রয়োজন, তাকেও তিনি তাঁর নাটকে রূপদান করতে চেয়েছেন। এছাড়া বাঙালীর জন্য বাঙ্‌লার ইতিহাস থেকে তিনি প্রতাপাদিত্যের কাহিনী গ্রহণ ক'রে জাতির পুরানো গৌরবকে তার সামনে তুলে ধরেছিলেন। প্রতাপাদিত্য নাটকে আমরা দেখি ভবানন্দ দেশকে অপরের হাতে তুলে দিচ্ছেন, মানসিংহকে ডেকে আনছেন এবং পরিশেষে বাঙ্‌লার স্বাধীনতা লোপ পাচ্ছে। ভারতচন্দ্র যে ভবানন্দকে অতিমানব করে তুলেছিলেন তার যথার্থ নীচপ্রবৃত্তিপূর্ণ চরিত্র রূপটি ফুটে উঠেছে ক্ষীরোদ-প্রসাদের নাটকে। তারপর প্রতাপের সর্বনাশের আর এক কারণ প্রতাপের ধর্মদ্রোহিতা—সঙ্গে সঙ্গে নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক পিতৃব্যহত্যাও বটে। এখানে ক্ষীরোদপ্রসাদ দৈবশক্তির অমোঘ নিয়মকে দেখাতে চেয়েছেন—প্রতাপের অন্যায় প্রতাপকে ধ্বংসের মুখে নিয়ে গেছে। এখানেই নাটকের স্বাভাবিক ঐতিহাসিক পরিবেশ ও বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তবে লেখকের দেশাত্মবোধ জাগানোর এবং নাটকীয় চমৎকারিত্ব সৃষ্টির মহৎ উদ্দেশ্যকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। হয়ত আরও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রতাপাদিত্য

নাটকের মধ্যে দেশাত্মবোধের স্থূল দিক ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়বে না। কিন্তু ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর যুগসন্ধিতে ইংরাজ শাসন-চক্রে পিষ্ট বাঙালীর এই চেতনাবোধ সত্যই প্রশংসনীয়। আমাদের দেশে রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্ব থেকে যে দেশানুরাগ, স্বাধীনতা কামনা নিয়ে জাতীয়-আন্দোলন দেখা দিয়েছিল তা তখনকার নাটককে অনেকখানি প্রভাবিত করেছিল। ক্ষীরোদপ্রসাদ শুধু ঐতিহাসিক নাটক নয়, ইতিহাসের দু'য়েকটি চরিত্র নিয়ে বা কোন একটি কাহিনীর টুকরো নিয়ে নিজেই বাকিটুকু গেঁথে নিয়েছিলেন। তাঁর 'আহেরিয়া' (১৩২১) বা 'বঙ্গে রাঠোর' (১৩২৪) এই ধরণের নাটক। নাটকের গতির দিক থেকে তার দীর্ঘ সংলাপ বা স্বগতোক্তি অনেক সময় ক্ষতিকর হয়েছে। নিজেও এই ত্রুটি বুঝতে পেরে অভিনয়ের সময় বড়ো বড়ো সংলাপের অনেকখানি বাদ দেবার নির্দেশও তিনি তাঁর নাটকে দিয়েছেন। দ্রুতগতিত্ব নাটকের একটি বড়ো গুণ। শুধু ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকে নয়, তখনকার অনেক নাটকেই এই গতি দ্রুততার বড়ই অভাব ছিল।

তাঁর বিখ্যাত পৌরাণিক নাটকগুলির আলোচনার পূর্বে 'কুমারী' নাটকখানির কিছুটা আলোচনা প্রয়োজন। 'কুমারী' নাট্যকাব্যের (১৮৯৯) ভেতর দিয়ে তিনি আমাদের সমাজের মধ্যে যে জাতিভেদ রয়েছে,—বিশেষ ক'রে ব্রাহ্মণপ্রধান সমাজে ব্রাহ্মণেতর জাতির প্রতি যে অবহেলা রয়েছে, তার কুফল সম্বন্ধে তিনি নির্ভীকভাবে মতামত প্রকাশ করেছেন। আচার্য মন্মথমোহন বসুর ভাষায় "সমাজের শক্তি ফিরাইয়া আনিতে হইলে সর্বাগ্রে অস্পৃশ্যতা-বাদাদি সর্বপ্রকার সামাজিক সংকীর্ণতা পরিহার করিয়া সকলকে সমান অধিকার দিতে হইবে। ইহার ফলে অন্যান্য সামাজিক রোগ আপনা হইতেই বিদূরিত হইবে; কারণ গণশক্তি প্রবল হইলে কোন অত্যাচার, অবিচার বা অনাচার প্রশ্রয় পাইতে পারে না। ক্ষীরোদপ্রসাদ এই কথা বুঝাইয়াছিলেন তাঁহার 'কুমারী' নাটকে।" তখনকার ঘোরতর কুসংস্কারের মধ্যে এরকম প্রগতিশীল মতবাদ বিপ্লবাত্মকই বটে। মনে হয়, তান্ত্রিকের বংশে জন্মেও বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে যুক্তিপ্রধান দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যেই তাঁর এরকম মনোভাব দেখা দিয়েছিল। ক্ষীরোদপ্রসাদের পৌরাণিক ও ধর্মমূলক নাটকগুলির মধ্যে 'ভীষ্ম' (১৯১৩), 'রামানুজ' (১৯১৬), 'নরনারায়ণ' (১৯২৬) প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে

গতানুগতিক পৌরাণিক নাটকের মতো তাঁর নাটকেও নতুন তেমন বিশেষ কিছুই পাওয়া যায় নি। নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহ দর্শকের মনে নতুন কোনো সংবাদ বহন করে আনেনা। অবশ্যি পৌরাণিক এবং ধর্মমূলক নাটকে ভক্তিভাবের প্রাবল্যহেতু দর্শক সমাজ নাটকের আঙ্গিকের প্রতি ততটা সচেতন থাকতে পারেনা। এসত্ত্বেও 'ভীষ্ম' নাটকে 'অম্বা' চরিত্রে নাট্যকার কিছুটা নতুনত্ব দেখাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাও শেষ পর্যন্ত নাটকের দীর্ঘ সংলাপে এবং দৃশ্যগুলির আলগা বাঁধুনিতে সার্থক ও গতিবান হয়ে উঠতে পারেনি। 'নরনারায়ণ' নাটকে কর্ণই মুখ্য চরিত্র এবং এই নাটকের সার্থকচরিত্রও বটে। 'নরনারায়ণের' শ্রীকৃষ্ণ কর্ণ-চরিত্রের চমৎকারিত্বের কাছে ব্যর্থ হয়ে গেছেন। আর এই কাহিনীও সবার আগে থেকেই জানা আছে। কাজেই পাঠক বা দর্শকের নতুন বিশেষ-কিছু পাবার আশা নেই। কিন্তু তখনকার সমাজের দিকে তাকিয়ে, বিশেষ করে হিন্দুর পুনরুত্থানের যুগে যে ধর্মভাবের প্রয়োজন তাঁরা অনুভব করেছিলেন তাকেই প্রাচীন ভারতের ঐশ্বর্যমণ্ডিত যুগ ও তার কাহিনীর ভেতর দিয়ে প্রকাশ করতে হয়েছে। মহাভারতের কাহিনী অংশের সঙ্গে 'নরনারায়ণ' নাটকের কাহিনী অংশের কিছু পার্থক্যও ঘটেছে। এই আদর্শের পাশাপাশি দেশপ্রীতি এবং জাতিপ্রীতিও যে বর্তমান ছিল তাও তাঁর নাটকে আভাস পাই। তাঁর রচিত উপন্যাসের মধ্যে 'গুহামুখে' (১৯২০), 'গুহামধ্যে' (১৯২০) ও 'পতিতার সিদ্ধি' (১৯২৪) প্রভৃতির সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় আছে। এই উপন্যাসগুলির অধিকাংশই সামাজিক উপন্যাস।

বাঙ্‌লা নাটকের দ্বিতীয় পর্যায়ের আর একজন সার্থক নাট্যকার হচ্ছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। দ্বিজেন্দ্রলাল একাধারে নাট্যকার ও সঙ্গীত রচয়িতা, বিশেষ ক'রে, হাসির কবিতা ও হাসির গানের সার্থক রচয়িতা।

দ্বিজেন্দ্রলালও দেশাত্মবোধের বন্যার মুখে এসে দাঁড়ালেন। এই দেশাত্মবোধ গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদকে উদ্বোধিত করেছিল। তাঁরাও জাতীয়তার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে 'সিরাজদৌলা', 'মীরকাশিম', 'ছত্রপতি', 'প্রতাপাদিত্য', 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' প্রভৃতি নাটক রচনা করেন। দ্বিজেন্দ্রলালও 'প্রতাপসিংহ', 'সাজাহান', 'দুর্গাদাস', 'মেবারপতন' প্রভৃতি দেশপ্রেমে উদ্বোধিত হয়েই রচনা করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে বন্ধুবর সাধনকুমার ভট্টাচার্য তাঁর

'নাট্য-সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচারের' প্রথম খণ্ডে বলেছেন, 'দ্বিজেন্দ্রলাল স্বভাবতঃ সংবেদনশীল, জ্ঞানের দিক দিয়া সঞ্চয় তাঁহার পর্যাপ্ত এবং অনুভূতির সূক্ষ্ম গতি-তরঙ্গ পর্যবেক্ষণে তাঁহার আন্বীক্ষণিক পারদর্শিতা। ঐ পারদর্শিতা আসিয়াছিল চিত্তের সংবেদনশীলতা হইতে এবং আংশিকভাবে শেকস্‌পীয়র প্রভৃতি নাট্যকারের নাটক অনুশীলনের ফলে।...দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের সর্বাপেক্ষা অসামান্য বৈশিষ্ট্য—হৃদয়ভাবের ও ব্যক্তিত্বের দ্বান্দ্বিক গতির ভিতর দিয়া নানা ব্যক্তিত্বযুক্ত চরিত্র সৃষ্টি।' কিন্তু তিনি এদিকে বেশী সচেতন থাকতে গিয়ে নাটকের গতিপ্রবাহের একবেণীত্ব বজায় রাখতে পারেননি। দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেই বলেছেন, 'নাটকের মধ্যে অবান্তর বিষয় আনিয়া ফেলিতে পারিবে না।' কিন্তু নিজেই সেই নিয়ম লঙ্ঘন করেছেন। তাঁর নাটকে unity of action-এর অভাব পরিলক্ষিত হয়। তবে একথা ঠিক যে রঙ্গমঞ্চে তাঁর ঐতিহাসিক নাটক এবং 'বিরহ' ইত্যাদি প্রহসনগুলি যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকের ঐতিহাসিকত্বে ডাঃ সুকুমার সেন মহাশয় সন্দেহ প্রকাশ করাতে বন্ধুবর সাধনকুমার ভট্টাচার্য মহাশয় নাট্যকারের ইতিহাস অনুসরণের দিকটাকে অনেকাংশে সমর্থন করেছেন। কিন্তু এও ঠিক যে, তিনি অনেক ক্ষেত্রে ইতিহাস-বহির্ভূত ভাবও প্রকাশ করেছেন এবং সব সময় ইতিহাসকে অনুসরণ করেননি। 'সাজাহান' নাটকে যখন ঔরংজীবের বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে সাজাহান বলেন, 'এরকম কখন ভাবিনি। অভ্যস্তও নই'—তখন একথা সাজাহানের মুখে কি যথার্থ উক্তি বলে মনে হয়? পিতার বিরুদ্ধে, নূরজাহানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা হয়ত বৃদ্ধ বয়সে সাজাহানের মনে নাও থাকতে পারে। তবে যদি নাট্যকার চরিত্র সৃষ্টি করতে গিয়ে এবং সাজাহানের বাৎসল্যপ্রেমের প্রগাঢ় রূপ দেখাতে গিয়ে পুত্রের বিরুদ্ধতা স্নেহশীল পিতাকে কতখানি আঘাত করতে পারে তা দেখাতে চান তাহলে সেটা সাজাহানের স্নেহবৎসল পিতার শ্রেষ্ঠ আদর্শ পরিকল্পনারূপ মেনে নিতে হয়। নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল যে ভাষা প্রয়োগ করেছেন তার সরসতা ও ভাবময়তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নাটকের ভাষার একটা রূপকল্প তিনি তৈয়েরী করেছিলেন। 'সাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'নূরজাহান' প্রভৃতির ভাষায় যেমন তীক্ষ্ণতা আছে তেমনি কাব্যময়তাও রয়েছে। সামাজিক প্রহসন ও কবিতায় যে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ প্রকাশ পেয়েছে তা তাঁর

স্পষ্টবাদিতার লক্ষণ। তিনি তখনকার সমাজের মেরুদণ্ডহীন পাশ্চাত্ত্য অনুকরণে পটু বাঙালী এবং সঙ্গে সঙ্গে গোঁড়া সংকীর্ণচিত্ত বাঙালীর স্বরূপও প্রকাশ করেছেন।

'সাজাহান' ও 'নূরজাহান' নাটক দুখানিরই ট্রাজিডিতে যবনিকা পতন ঘটেছে। সাজাহান ও নূরজাহানের জীবনের ট্রাজেডিই দুই নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়। সাজাহান নাটকে আমরা সাজাহানের জীবন-নাট্যের গোড়া থেকেই তাঁকে পাচ্ছি না। শুরুতেই মমতাজ-বিয়োগ-বিধুর পুত্র-স্নেহান্ধ দুর্বল পিতা সাজাহানকে পাচ্ছি। সম্রাট সাজাহান এখানে পরাজিত, পিতা সাজাহান তাঁর দুর্বলতার কাছে অসহায়। আর রয়েছে ভারত-সিংহাসন-অধিকার-মত্ত, চির-সন্দিগ্ধ, কূটবুদ্ধি-সম্পন্ন ঔরংজীবের চক্রান্ত ও কৃতঘ্নতা। বৃদ্ধ সম্রাট একান্ত নিরুপায়। এখানে নাট্যকার ঐতিহাসিক ঘটনা পরিবেশের মধ্যে সাজাহানের পিতৃহৃদয়ের দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন। ইতিহাসের চরিত্রগুলি নিয়ে নাট্যকারের তুলিকায় তাকে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। এই সমগ্র নাটকটিতে সাজাহানের দুঃখদাহনের ট্রাজেডির স্বরটিই প্রবল। সাজাহানই এই নাটকের প্রধান চরিত্র।

'নূরজাহান' নাটকে নূরজাহানের শের আফগানের সঙ্গে বিবাহিত জীবনের সময় থেকে শুরু করে, নানা আঘাত-সংঘাত, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে ভারত সম্রাজ্ঞী হওয়া এবং নিজের উচ্চ আকাঙ্ক্ষার জন্য অন্তরের মানুষটির অপমৃত্যু ঘটিয়ে নৃশংসতা চরমে উঠে একেবারে উন্মাদগ্রস্তা হওয়ার মধ্যেই নূরজাহান চরিত্রের ট্রাজেডি প্রকাশ পেয়েছে। নারীর প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর চারিত্রিক সুকোমলতা এবং প্রেমনিষ্ঠা। নূরজাহান যেদিন সেই বৈশিষ্ট্য হারালো সেদিন থেকে নূরজাহানের মধ্যে শুধু ক্ষমতালোভী নারীকেই দেখা গেছে, মানবীকে নয়। তার অমানুষিকতা শেষ পর্যন্ত তার কন্যাকেও বিদ্রোহিনী করেছে। কিন্তু নিষ্ঠুরতার চরমটুকু নিশ্চয় নারী-হৃদয় সহজভাবে মেনে নিতে পারে না। তাই নূরজাহান হারালো তার স্বাভাবিক জ্ঞান। শেষ দৃশ্যে উন্মাদগ্রস্তা নূরজাহান—ক্ষমতালোভী গর্বান্ধ নূরজাহানের ব্যর্থতার শোচনীয় ধ্বংসাবশেষ। এখানে সেক্‌সপীয়রের লেডি ম্যাক্‌বেথের চরিত্রের সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য আছে। লেডি ম্যাকবেথও অনেক হত্যা ও রক্তপাতের মধ্যে নিজেকে ধীরস্থির রাখবার গর্ব করেছিল। ম্যাকবেথের দুর্বলতাকে সে বিদ্রূপ করেছিল।

কিন্তু নারীর স্বাভাবিক বৃত্তির বিপরীত ভাব তাকে আর সুস্থ মস্তিষ্কে থাকতে দেয় নাই। উন্মাদিনী লেডি ম্যাকবেথের তখন মনে হয় হাতের রক্তের দাগ সমুদ্রের জলেও মুছবে না। নূরজাহানও তাই। খসরুর প্রাণনাশ, শারিয়ারের চক্ষু উৎপাটন এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ভেতর দিয়ে সে পেল না কিছুই —এক মস্তিষ্ক-বিকৃতি ছাড়া। এই নাটকে ব্যক্তিচরিত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ নাটকের ঐতিহাসিকতার হুবহু অনুসরণের অনেক উর্ধ্বে চলে গেছে।

'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে চাণক্য চরিত্রের বিশ্লেষণই প্রধান বিষয়। কন্যাহারা নিষ্ঠুর প্রতিহিংসাপরায়ণ চাণক্য কন্যাকে ফিরে পেয়ে আবার নিজেকে ফিরে পাচ্ছেন। ভয় দেখিয়ে যে ভক্তি আদায়, তার নাম ভক্তি নয়, ভীতি। কিন্তু নাটকে এই একটি কথাই নাটকের সব নয়। এখানে সেল্যুকাস-আন্টিগোনাস পর্যায়, চন্দ্রগুপ্ত-ছায়া পর্যায়ও রয়েছে। এখানে উদ্দেশ্যও বহুধা-বিভক্ত। মাঝে মাঝে দেশপ্রেমের একটা উদাত্ত গম্ভীর সুরও শোনা যায়। তবুও এই নাটকে চাণক্য, হেলেন প্রভৃতি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের পৌরাণিক নাটকের মধ্যে 'সীতা' নাটকই বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। এটা অনেকটা নাটকের ভঙ্গিতে কাব্য রচনা বলা যেতে পারে।

দ্বিজেন্দ্রলালের দেশাত্মবোধের উৎকৃষ্ট নিদর্শন তাঁর স্বদেশী গানগুলি। 'বঙ্গ আমার জননী আমার', 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা' প্রভৃতি গান আজও বাঙালীর অত্যন্ত প্রিয়। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে 'বন্দে মাতরম্' গানের সঙ্গে এই গানগুলিও গাওয়া হ'ত। তখনকার আন্দোলনের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেও যে জড়িত ছিলেন তার উল্লেখ তাঁর বন্ধু দেবকুমার রায়চৌধুরীকে লিখিত একখানি পত্রে পাওয়া যায়। সেখানে তিনি যা লিখেছেন তা সত্যই কৌতূহলোদ্দীপক :—

'ক্রমাগত transfer (বদলী) আমাকে যথার্থ যেন অস্থির করে তুলেছে। ......আমার বিশ্বাস স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান, আর ঐ প্রতাপসিংহ নাটকই তার মূল। কিন্তু কি বুদ্ধি! এমনি একটু হয়রান করলেই বুঝি আমি অম্‌নি আমার সব মত ও বিশ্বাসকে বর্জন কর্ব।'

এরকম স্পষ্টবাদিতা সত্যই দ্বিজেন্দ্রচরিত্রের একটি বিশেষ গুণ। বাঙ্‌লা সাহিত্যের কবিতা, গান, নাটক সব ক্ষেত্রেই তিনি নিজের বৈশিষ্ট্যের ছাপ রেখে গেছেন।

বাঙ্‌লা নাটকের পূর্ণ আলোচনা এখানে করা হ'ল না। শুধু বিশেষ বিশেষ নাট্যকার ও নাটকগুলির (প্রতিনিধিস্থানীয়ও বটে) সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হ'ল। যাঁরা নাটক ও রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছুক, তাঁরা শ্রীমন্মথমোহন বসুর 'বাঙ্‌লা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ', শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস', শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাঙ্‌লা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস', শ্রীসাধনকুমার ভট্টাচার্যের 'নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার' গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডগুলি, শ্রীঅজিতকুমার ঘোষের 'বাঙ্‌লা নাটকের ইতিহাস' প্রভৃতি গ্রন্থে বিশদভাবে জানতে পাবেন।

নাটকের দ্বিতীয় পর্যায়ে আমাদের উল্লিখিত নাট্যকাররা ছাড়া নাট্যকার ও অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং আরও অনেকে নাটক রচনা করেছেন, এবং সে নাটকগুলি রঙ্গমঞ্চেও অভিনীত হয়েছে। কিন্তু সেযুগের শুধু প্রতিনিধি-স্থানীয় নাট্যকারদের নাটকের আলোচনাপ্রসঙ্গে এটা আমরা বুঝতে পারি যে যেযুগ থেকে বাঙ্‌লা সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতির উন্নতির জন্য নানা দিকের বিস্তার ও উৎকর্ষ ঘটতে থাকে সে সময় থেকে বাঙ্‌লা সাহিত্যের আত্মনির্ভর সৃজনও শুরু হয়। উনবিংশ শতাব্দীর সমাজে যে পরাধীনতা ও অনৈক্যের বেদনাবোধ দেখা দিয়েছিল তা প্রকাশ পেতে থাকে সাহিত্যের ভেতর দিয়ে। বাঙ্‌লা নাটকে তার সুস্পষ্ট প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি। সমাজের চাহিদা ও প্রয়োজন এবং সাহিত্য সৃষ্টি এখানে পরস্পর-বিরোধী হয়নি।

নিজের জাতীয় ইতিহাস এবং তার বর্তমান ও আগামী কাল সম্বন্ধে বাঙালী ক্রমশ সচেতন হয়ে উঠছিল। এই সচেতন করার দায়িত্ব উপন্যাস, কাব্য, প্রবন্ধাদির পাশাপাশি নাটকও গ্রহণ করেছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে যার শুরু বিংশ শতাব্দীতে তা আরও সার্থক হয়ে ওঠে। তখন এত নাটক লেখার মূলেও একদিকে সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলার আগ্রহ, অপর দিকে দেশ ও সমাজের উন্নতি বিধানের সযত্ন প্রয়াস। সমাজ ও দেশহিতৈষণা তখনকার নাটকের একটি বিশেষ গুণ। বিশেষ ক'রে রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে নাটকের জনপ্রিয়তা আরও বেড়ে গেল। উপন্যাস, কাব্য প্রভৃতি সাধারণ অশিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিতের বোঝবার শক্তির বাইরে ছিল। কিন্তু দৃশ্য নাট্যের অভাব ঘুচে যাওয়াতে রঙ্গালয়ের মাধ্যমে এবং অভিনয়ের

সহযোগিতায় সর্বসাধারণের পক্ষে তার রস অনুধাবন করা সহজ হ'ল। আবার রঙ্গালয়ের নাটক দেখবার সুযোগ যাদের ঘটত না তারা যাত্রার মধ্যেও এই জাতীয়-ঐক্য ও দেশপ্রেমমূলক নাটকের অভিনয় দেখবার সুযোগ পেত। এবং সেই কারণেও এযুগের দেশাত্মবোধক, সামাজিক, পৌরাণিক, ধর্ম-মূলক, ঐতিহাসিক নাটকগুলি জনসাধারণের এত প্রিয় হয়ে উঠেছিল।

৯

সংবাদপত্র সাহিত্য

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যায় আলোচনার সময় আমরা সংবাদপত্র সাহিত্যের কিছু উল্লেখ করেছি। বর্তমানে আমরা উনবিংশ শতাব্দীতে সংবাদ পত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ধারা নির্ণয়ের চেষ্টা করব। বাঙ্‌লা গদ্য-সাহিত্য গঠনের যুগে সংবাদপত্রের দান অপরিমেয়। এই সংবাদপত্রগুলির নানা রচনার ভিতর দিয়ে বাঙ্‌লা গদ্য যেমন একটা সুস্থ সবল রূপ লাভ করেছিল তেমনই এই ভাষা বাঙ্‌লাসাহিত্যকে আরও শক্তিশালী করেও তুলেছিল।

সংবাদপত্রের বয়স খুব বেশী নয়। ইংরেজরা যখন এদেশ তাদের অধিকার-ভুক্ত করে নিল তারপর থেকে সংবাদপত্রের আবির্ভাব ঘটে। মোগল আমলে হাতে-লেখা একরকম সংবাদপত্র ছিল। তবে তা সবার পড়ার জন্য ছিলনা, শুধু দরবারের প্রয়োজনে এবং দরবারী বিষয় নিয়েই লেখা হত। বর্তমানে আমরা যে সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের সঙ্গে পরিচিত তার আবির্ভাব ইংরেজ আমল থেকে। সেদিক থেকে উপন্যাস, ছোট গল্পের মতো সংবাদপত্রেরও বয়স দেড়শ' বছরের বেশী হবেনা।

সংবাদপত্রের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে দেশ-বিদেশের সংবাদ বিতরণ করা, সমাজের নানা সুবিধা-অসুবিধা সর্বসমক্ষে উপস্থাপিত করা। যে সব ইংরেজি মাসিক বা সাপ্তাহিক সংবাদপত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে তাতে সংবাদ বিতরণ ছাড়াও গল্প, আলোচনা, কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতিও থাকত। আমাদের সংবাদপত্রগুলিও এই ভাবে কালে কালে সাহিত্যিক মর্যাদা লাভ করতে

থাকে। বিষয়বস্তুর সুষ্ঠু প্রকাশের জন্য গোড়া থেকেই সংবাদপত্রের ভাষার নানা রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে থাকে। সবাই বুঝতে পারে এমন ভাষার অনুশীলন সংবাদপত্রেই সব চেয়ে বেশী হয়েছে। বাঙ্‌লা সংবাদপত্রের গদ্য-রচনা বাঙ্‌লা গদ্য সাহিত্যকে বহুল পরিমাণে আত্মস্থ করেছিল। আজ যে গদ্য ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে আমরা পরিচিত তার অনেকখানি এই সংবাদপত্র থেকেই পাওয়া গেছে। অবশ্যি এটা ঠিক যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঙ্‌লা গদ্য ভাষার সহজ কাব্যময় দিকটা আবিষ্কার করে ভাষাকে সুন্দর ও বলিষ্ঠ ক'রে তোলার পথ সুগম করে দিয়েছিলেন। তিনি গদ্যের যে ছন্দরূপ নির্ণয় করেন তাই এখন বাঙ্‌লা গদ্য ভাষার প্রধান রূপকল্প।

তখনকার দিনে বাঙ্‌লা দেশের প্রায় প্রত্যেক চিন্তাশীল লেখক এবং সমাজ সংস্কারক সংবাদপত্রের সঙ্গে কোনো না কোনো ভাবে জড়িত ছিলেন; অনেকে সংবাদপত্রের সম্পাদনাও করেছিলেন। রামমোহন, অক্ষয়কুমার থেকে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এর ব্যত্যয় ঘটেনি। বর্তমান সময়ে আমরা সংবাদ-পত্রের ভাষার একটা আলাদা রূপ নির্ণয় করবার চেষ্টা করি। অনেক সময় অনেক রচনাকে আমরা 'সাংবাদিকের রচনা' বলে অভিহিত করি। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে এই সংবাদপত্রের ভাষা ও ভাব প্রকাশের রীতিনীতি সাহিত্য রচনার অনেকখানি সুযোগ এনে দিয়েছিল। সংবাদপত্রে নানা বাদ-প্রতিবাদের আলোচনার ভিতর দিয়ে ভাষার কাঠিন্যের আবরণ অনেকখানি খসে পড়েছিল।

নানা অবস্থার ভেতর দিয়ে বাঙ্‌লা গদ্য সাহিত্য এই সংবাদপত্রের ভাষার প্রাঞ্জলতার বৈশিষ্ট্যে উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিল, সংবাদপত্রের সংবাদ পরিবেশনের ভেতর দিয়ে তখনকার বাঙালী সমাজ দেশ-বিদেশকে জানতে পেরেছে। দেশের মানুষের সুখদুঃখ, শাসকবর্গের অত্যাচার, উৎপীড়ন, অবহেলা, সমাজের নানা দুর্নীতি, পল্লীবাসীর দুরবস্থার সংবাদ এই সংবাদপত্রগুলি সর্ব-সাধারণের সমক্ষে বহন করে এনে সবাইকে সমাজ ও দেশ সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তুলেছিল। সংবাদপত্রকে সমসাময়িক ঘটনাবলীর ইতিহাস বলা যেতে পারে। মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাবের পূর্বে সংবাদপত্র বর্তমানকালের মতো আত্মপ্রকাশ করবার সুযোগ পেতনা। মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাবের পর থেকে এবং উত্তরোত্তর বৈজ্ঞানিক পন্থায় নানা উৎকর্ষ ঘটাতে সংবাদপত্রের দ্রুত প্রচলন হয়।

পূর্বে সংবাদ পরিবেশন যে সংবাদপত্রের কাজ ছিল পরে সেই সংবাদপত্র শিক্ষা, ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা, নানা মতের বাদ-প্রতিবাদ, শেষপর্যন্ত সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজনীতি সব-কিছুরই দায়িত্ব গ্রহণ করল। সংবাদপত্র জনমত গঠন করবে এবং জনমত প্রকাশ করবে—এটা বর্তমান যুগের সংবাদপত্রের মুখ্য নীতি বলে বলা হয়। কিন্তু সরকার-পুষ্ট সংবাদপত্র আবার জনমত গ'ড়ে ওঠার প্রতিকূলতাও যে করতে পারে তা ইংরেজ আমলে ভালোভাবেই দেখা গিয়েছিল। ১৮২৩ সালের মুদ্রাযন্ত্র বিষয়ক আইনের বলে ইংরেজ শাসকবর্গ সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনমত গঠন করবার ও প্রকাশ করার পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। সেই আইনের বলে সরকারের অনুমতি ছাড়া সংবাদপত্র প্রকাশ করা যেতনা আর প্রকাশ করবার অনুমতি পেলেও কি কি সংবাদ বা বিষয়ের আলোচনা করা যাবে তাও সরকারই নির্ধারণ করে দেবেন বলে আদেশ জানানো হয়। এই অন্যায় ভাবে কণ্ঠরোধ করার প্রতিবাদে রামমোহন তাঁর সম্পাদিত 'মীরাৎ-উল্-আখ্‌বার' বন্ধ করে দেন। অবশ্যি এর আগে ১৭৯৯ সালে ওয়েলেস্‌লি একবার সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করেন, ১৮১৮ সালে হেষ্টিংস আবার এই সংকোচন আইন অংশতঃ রদ করেন। সংবাদপত্রের উপর ইংরেজ সরকার যে বিশেষ সুপ্রসন্ন ছিল না, এবং স্পষ্ট ও সত্য ভাষণ যে তারা সহ্য করতে পারতনা—এই সংকোচন চেষ্টা তার প্রমাণ। তবুও সাম্রাজ্যবাদী বাধানিষেধের মধ্যেও বাঙ্‌লার সংবাদপত্র নানা দুর্যোগ, কর্তৃপক্ষের নানা ভ্রুকুটির ভেতর দিয়ে যে ভাবে জাতির সেবা, গদ্য সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করেছে তা সত্যই প্রশংসনীয়। কতবার কত সংবাদপত্র শাসকবর্গের খেয়ালখুসিতে বন্ধ হয়েছে —তথাকথিত রাজনৈতিক অপরাধে (?) কত সংবাদপত্রসেবীকে যে নিগৃহীত হ'তে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। আর যেগুলি আপোষ করে টিঁকে ছিল সেগুলি দু'কূল বজায় রাখতে গিয়ে কুলরক্ষা করতে পারেনি।

সংবাদপত্র গদ্য-সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে যে সহায়তা করেছে, ভাষায় প্রাঞ্জলতার ভেতর দিয়ে ভাব প্রকাশের যে সহজ ও সাবলীল পথ রচনা করেছে—সেদিক থেকে বিচার করলে জাতির সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে সংবাদপত্রের দান অনস্বীকার্য। এই সংবাদপত্র প্রবর্তনে শ্রীরামপুর মিশনের মিশনারীরা পথ-প্রদর্শকের দাবী করতে পারেন।

শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত 'দিগ্‌দর্শন' (১৮১৮) বাঙ্‌লার প্রথম সংবাদ পত্র। উক্ত মিশন থেকে একই বছরে 'সমাচারদর্পণ' প্রকাশিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর আলোচনায় এর উল্লেখ করেছি। 'দিগ্‌দর্শন' মাসিক পত্রিকা ছিল। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ক্লার্ক মার্শম্যান। সমাচারদর্পণ কিছুদিন সাপ্তাহিক হিসাবে, পরে সপ্তাহে দুইবার করে প্রকাশিত হত। এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন জে, সি, মার্শম্যান, পরে ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় নামে একজন বাঙালী সম্পাদনা করেছিলেন। 'দিগ্‌দর্শন' মুখ্যত খ্রীষ্টধর্মের উপদেশাবলীতে পরিপূর্ণ থাকত। কিন্তু 'সমাচারদর্পণে' নানা ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক বিষয়বস্তুর অবতারণা থাকত। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের ১৮১৮ সালে প্রকাশিত 'বাঙাল গেজেটির' কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। 'বাঙাল গেজেটি' বাঙালীর দ্বারা পরিচালিত প্রথম সাময়িকপত্র।

এরপর বিশিষ্ট দুখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা হচ্ছে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাচাঁদ দত্ত সম্পাদিত 'সম্বাদ কৌমুদী' (১৮২১) এবং শুধু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সমাচার চন্দ্রিকা।' এই দুটি সাময়িকপত্রের একটু ইতিহাস আছে। 'সম্বাদ কৌমুদীতে' রামমোহন সহমরণের বিরুদ্ধে লিখতে শুরু করেন। তাতে রক্ষণশীল ভবানীচরণ রুষ্ট হন। বিশেষ করে রামমোহন 'সম্বাদ কৌমুদী'র সঙ্গে খুবই ঘনিষ্টভাবে জড়িত ছিলেন। অনেকে রামমোহনকেও অন্যতম সম্পাদক বলে ভাবতেন। শুধু তাই নয়, তারাচাঁদ দত্তের পরিবর্তে ভবানীচরণ ও রামমোহনকে উক্ত পত্রিকার যুগ্ম-সম্পাদক বলে বলাও হয়। রামমোহনের রচনার বিরুদ্ধে বলবার জন্য ভবানীচরণ 'সম্বাদ কৌমুদীর' সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। এদিকে হিন্দুদের একখানি মুখপত্র থাকাও দরকার। তাই রামমোহনের আন্দোলনের বিরুদ্ধে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের প্রতিবাদ জানাবার জন্য 'সমাচার চন্দ্রিকা'র আবির্ভাব। আর ভবানীচরণ হলেন তার সম্পাদক। ভবানীচরণের সঙ্গে রামমোহনের মতভেদের উপর ভিত্তি করে নানা আলোচনা এই পত্রিকায় প্রকাশ পেত। শেষের দিকে ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় এই পত্রিকার সম্পাদক হন। ভবানীচরণ তখনকার দিনে একজন শক্তিশালী লেখক ছিলেন। তাঁর ব্যঙ্গরচনা বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। রামমোহনের সঙ্গে তাঁর নানা সমালোচনা ও প্রতি-সমালোচনার ফলে দুটটি পত্রিকার ভাষাই বেশ সহজবোধ্য হয়েছিল। কৃষ্ণমোহন দাসের 'সম্বাদ

তিমিরনাশক' (১৮২৩) এবং নীলরতন হালদারের 'বঙ্গদূত'ও (১৮২৯) এযুগের উল্লেখযোগ্য পত্রিকা।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকরের' (১৮৩১) কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। 'সংবাদ প্রভাকর' বাঙ্‌লা সংবাদপত্রের ইতিহাসে আর একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে। 'সংবাদ প্রভাকর' থেকেই বাঙ্‌লা সংবাদপত্রে আমরা সাহিত্যিক প্রেরণা পেলাম। 'সংবাদ প্রভাকর' বাঙ্‌লা গদ্য সাহিত্যের বন্ধুর পথকে সহজ ও সমতল করে তুলল। ঈশ্বরচন্দ্র নিজে ছিলেন ক্ষমতাশালী কবি। অন্যদিকে সাময়িকপত্র সম্পাদনায়ও তিনি বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। বাঙ্‌লার কবি ও কবিওয়ালাদের বহু রচনা ও জীবনচরিত সংগ্রহ ক'রে তিনি প্রভাকরে প্রকাশ করেছিলেন। বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতাদের মধ্যে তাঁর নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয় কুমার দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি 'সংবাদ প্রভাকরে'ই প্রথম লেখা শুরু করেন। এই পত্রিকায় যেমন স্বদেশানুরাগের দিকও দেখতে পাই তেমন বিজাতীয় মনোবৃত্তির প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ-প্রকাশক রচনারও সাক্ষাৎ পাই।

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ডিরোজিওর শিক্ষায় দীক্ষিত ইংরেজি-শিক্ষিত নব্য হিন্দু যুবকদের মুখপত্রস্বরূপ 'জ্ঞানান্বেষণ' নামে এক সাপ্তাহিকপত্রও ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকায় রামমোহনের সহমরণ-প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং তাঁর স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে আন্দোলনকে সমর্থন করে প্রবন্ধাদি রচিত হত। রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি এই পত্রিকায় লিখতেন। তখনকার দিনে 'জ্ঞানান্বেষণ' অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল পত্রিকা ছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'সংবাদ রত্নাবলী' নামে এক সাপ্তাহিক পত্রেরও সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকার প্রকাশকাল ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে হরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত 'সংবাদ পূর্ণ চন্দ্রোদয়' এবং ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ দ্বারা পরিচালিত ও সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'সম্বাদ ভাস্কর' দুইখানি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংবাদপত্র।

'সম্বাদ ভাস্করের' সম্পাদক হিসাবে শ্রীনাথ রায়ের নাম আমরা পাই। তিনি নামে মাত্র সম্পাদক ছিলেন। সম্পূর্ণ দায়িত্ব গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের উপরেই ছিল। ১৮৪২ সালে রামগোপাল মাসিক 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' পত্রিকা প্রকাশ

করেন। তাঁরা দেশের দুঃখ লাঘব করবার জন্য এবং দেশের ও জাতির উন্নতি বিধানকল্পে এই পত্রিকার প্রকাশ করেন বলে উল্লেখ করেন। দেশের শিক্ষা, ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষির প্রভৃতির উন্নতিকল্পে দেশের অবস্থা সর্বসাধারণের ও বিশেষ করে ইংরেজ শাসকবর্গের গোচরীভূত করা তাঁদের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। প্যারীচাঁদ মিত্র এই পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

১৮৪২ সালে অক্ষয়কুমার দত্ত ও প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ 'বিদ্যাদর্শন' নামে একখানা মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। 'বিদ্যাদর্শনে' ইতিহাস, সমাজনীতি, বিজ্ঞান, দেশীয় সুনীতি-দুর্নীতি প্রভৃতির আলোচনা থাকতো। ১৮৪৩ সালে প্রকাশ 'তত্ত্ব-বোধিনী' পত্রিকার সম্বন্ধে পূর্বে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই পত্রিকার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্‌লা সংবাদপত্রের ইতিহাসে আর এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে। ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র হলেও এই পত্রিকায় ব্রাহ্মধর্ম ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের আলোচনাও থাকতো। অক্ষয়কুমার দত্তের বিজ্ঞানবিষয়ক আলোচনা, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রাঞ্জল রচনা, দেশের প্রাচীন কুসংস্কারের প্রতিকারে অনেক রচনা প্রকাশ পেত। 'সংবাদ প্রভাকরে' ভাষার যে মুক্তি— 'তত্ত্ববোধিনীতে' তারই ভাবগম্ভীর প্রকাশ। অক্ষয়কুমারের বিজ্ঞান প্রভৃতির প্রবন্ধের ভেতর দিয়ে প্রবন্ধ-সাহিত্যের ভাষা-নির্দেশ পাওয়া গেছে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'তত্ত্ববোধিনীর' সম্পাদনা করেছেন। বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতির রচনা এ পত্রিকায় প্রকাশ পেত। বিদ্যাসাগরের মহাভারতের কিছু অংশ তত্ত্ববোধিনীতে ছাপানো হয়েছিল।

১৮৪৭ সালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' প্রকাশিত হয়। এর পূর্বে ১৮৪৬ সালে ঈশ্বরচন্দ্র 'পাষণ্ড পীড়ন' নামে এক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। আর একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্র হচ্ছে ১৮৫০ সালে মতিলাল চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত মাসিক 'সর্বশুভকরি পত্রিকা'। এ পত্রিকায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহোদয়গণ যথাক্রমে 'বাল্য বিবাহের দোষ' ও 'স্ত্রীশিক্ষা' নামে প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। অল্প-দিনের মধ্যে এ পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৫১ সালে রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত মাসিক 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' বাঙ্‌লা সংবাদপত্রের মধ্যে একখানি

উল্লেখযোগ্য পত্রিকা। পুস্তক সমালোচনা, পুরাবৃত্তের আলোচনা, গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ, উপন্যাস ও আখ্যান প্রভৃতি এই পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি করত। মাইকেল মধুসূদনের তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য এই পত্রিকাতেই আত্মপ্রকাশ করেছিল, 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' সাহিত্য ও সংস্কৃতির সার্থক ধারক ও বাহক ছিল। রাজেন্দ্রলাল 'রহস্য সন্দর্ভ' নামে একখানি পত্রিকার ৬ষ্ঠ খণ্ড অবধি প্রকাশ করেছিলেন।

মহিলাদের জন্য 'মাসিক পত্রিকা' (১৮৫৪) প্রকাশ করেন প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার। এই পত্রিকার রচনার ভাষা বেশ প্রাঞ্জল। প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' এই পত্রিকাতেই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদিত মাসিক 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' (১৮৫৫) একখানি উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্র। এই পত্রিকায় বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য, বিদেশীর শাসনাধীনে ভারতের অবস্থা ও বিধবা বিবাহ বিষয়ে অনেক প্রবন্ধাদি প্রকাশ পেয়েছিল। ১৮৫৬ সালে 'এডুকেশন গেজেট' প্রকাশিত হয়। তখন রেভারেণ্ড ও'ব্রায়ান স্মিথ এর সম্পাদক ছিলেন। কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদক ছিলেন। পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক প্যারীচরণ সরকার এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। সরকার-স্বার্থ-বিরোধী এক লেখার জন্য তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। পরে ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। এটি সরকারী পত্রিকা ছিল। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের প্রকাশিত 'জ্ঞানোদয়' (১২৫৮), দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের 'সোম প্রকাশ' (১৮৫৮), বিহারীলালের সম্পাদনায় 'পূর্ণিমা' (১৮৫৯), ঢাকার হরিশ্চন্দ্র মিত্র সম্পাদিত 'কবিত কুসুমাবলী' (১৮৬০), সদ্ভাবশতকের কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ও পরে গোবিন্দপ্রসাদ রায় সম্পাদিত 'ঢাকা প্রকাশ'(১৮৬১), হরিশ্চন্দ্র মিত্র সম্পাদিত ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'অবকাশ রঞ্জিকা' (১৮৬২), হরিনাথ মজুমদার (কাঙাল হরিনাথ) ও পরে জলধর সেন, প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ও অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়ের সম্পাদনায় 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' (১৮৬৩), যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত 'অবোধ বন্ধু' (১৮৬৩), উমেশচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত নারী সমাজের জন্য প্রকাশিত 'বামা বোধিনী পত্রিকা' (১৮৬৩), বীরেশ্বর পাঁড়ে সম্পাদিত 'সহচরী' (১২৭০), হরিশচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'ঢাকা দর্পণ' (১৮৬৩), ও মাসিক 'কাব্য প্রকাশ' (১৮৬৪) প্রভৃতি বঙ্গদর্শনের আবির্ভাবের

অলঙ্কারের এমনই পরিপূর্ণ যে সেই বিপুল ভাব ও ভাব-গভীরতার আলোচনা স্বল্পপরিসরে সম্ভব নয়।

রবীন্দ্রনাথ শুধু বাঙ্‌লার বা ভারতের নন—তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবি-শিল্পীদের অন্যতম। তাঁর দীর্ঘ আশী বৎসরকাল বাঙ্‌লা-সাহিত্যের ধারা ধরে তিনি আপন উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন। ছেলেবেলা থেকে তিনি ভালোবেসেছেন বাঙ্‌লাদেশকে এবং সেই দেশের মানুষকে। তাঁর আবির্ভাবের পর বহু কবি, বহু ঔপন্যাসিক প্রভৃতি আবির্ভূত হয়েছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মত তাঁদের প্রভাবশালী বিশেষ কোনো ব্যক্তি সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে কোনো স্থায়ী প্রভাব প্রতিষ্ঠা করে যেতে পারেননি। 'বনফুল', 'কবিকাহিনী' থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত তাঁদের যে বিচিত্র পরিবেশ আমরা লক্ষ্য করি তা এক রবীন্দ্রনাথেই শুধু সম্ভব। আগামী দুশো বছরের সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে আগামী দিনের সাহিত্যিকদের জন্য তিনি যে উদার ও প্রশস্ত পথ নির্মাণ করেছেন সে পথ ছেড়ে চলতে আর কোনো দেশ খুঁজে হবে না। এটাও ঠিক যে দুশো বছরের মধ্যে সাহিত্যরচনায় আর কোনো উপকরণের অভাব হবে না,—অভাব হবে শুধু সে প্রাণের প্রতিভার। রবীন্দ্রনাথ থেকেই বাঙ্‌লা সাহিত্যের এক বিশেষ যুগ সৃষ্টি হল—এবং সেই যুগের অবসান আজও এখনও ঘটেনি।

রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন সিপাহী-বিদ্রোহের পর। ছেলেবেলায় বিদ্যালয়ের বাঁধা-ধরা নিয়মের মধ্যে তাঁর মন আটকালো না। তাই 'তিনি সরস্বতী' তাঁকে আপন নিজেই বিদায় দিয়ে দিলেন। অতএব বাড়ী বসে তিনি লেখাপড়া শিখে যেতে লাগলেন বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতিতে। আমরা পূর্বেই বলেছি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে উনবিংশ শতাব্দী যে বিরাট বৈপ্লবিক সম্ভব করে এনেছিল তা বাঙালীর পক্ষে অক্ষয় কীর্তির বস্তু হয়ে রইল। এই উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব। রামমোহনের থেকে যাঁরা সংস্কার-আন্দোলন শুরু হয়। বাঙ্‌লা দেশে ব্রাহ্ম-আন্দোলন, সিপাহীবিদ্রোহ প্রভৃতি আন্দোলন ও বিদ্রোহ, বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহের বিরুদ্ধ বিচার, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি নিয়ে যাঁরা আন্দোলন, হিন্দুমেলা প্রভৃতি এবং নতুন নতুন সাহিত্য-ধারার প্রবর্তনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের

সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। আমাদের যে আধুনিক যুগের সূত্রপাত রামমোহন থেকে,—বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিম প্রভৃতির ধারা বেয়ে রবীন্দ্রনাথে এসে তা সার্থকরূপ লাভ করেছে। কাব্য, নাটক, ছোটগল্প, উপন্যাস, গান, প্রবন্ধ প্রভৃতির দ্বারা বাঙ্‌লা সাহিত্যভাণ্ডারকে তিনি পরিপূর্ণ করে রেখেছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই তাঁর বহু কবিতা, গান, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি রচিত হয়। কাব্যে 'চৈতালী' পর্যন্ত এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত হয়েছে। পোস্ট মাস্টার, ক্ষুধিত পাষাণ, বিচারক, মেঘ ও রৌদ্র, মানভঞ্জন, অতিথি, কাবুলীওয়ালা, ঠাকুর্দা প্রভৃতির মতো ছোট গল্প এই সময়েই রচনা করেছেন। উপন্যাসক্ষেত্রে বউঠাকুরানীর হাট, রাজর্ষি, নাটকে বাল্মীকি প্রতিভা (গীতিনাট্য), কাল মৃগয়া (গীতিনাট্য), নলিনী, মায়ার খেলা (গীতিনাট্য), রাজা ও রানী, বিসর্জন, চিত্রাঙ্গদা, প্রহসনে গোড়ায় গলদ, বৈকুণ্ঠের খাতা এবং কিছু কিছু সাহিত্য-বিষয়ক, রাজনৈতিক ও শিক্ষা-বিষয়ক প্রবন্ধ এসময় রচিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই রবীন্দ্র-প্রতিভা স্থির দীপ্ত হয়েছে। রবীন্দ্র-সাহিত্যের মধ্যে যে সন্নিবেশ লক্ষিত হয় তার শুরু এখান থেকেই। যদিও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিহারীলাল এবং তারও আগে বৈষ্ণব পদাবলী প্রভৃতির দ্বারা কবি কিছুটা প্রভাবিত হয়েছিলেন, তবুও তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য রচনার প্রতি ছত্রে প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে তিনি শুধু রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রসাহিত্যের কোনো একটি বিশেষ ধারাকেই শুধু শ্রেষ্ঠ বলে মেনে নিয়ে অপর ধারাগুলির আলোচনার বিচার করা দুঃসাধ্য। তবুও একথা স্বীকার করতে হবে যে, কবিতায়, গানে, ছোটগল্পে তিনি বৈচিত্র্যের যে রূপ-রেখা অঙ্কন করেছেন তার আর তুলনা নেই। বাঙ্‌লা-সাহিত্যে যথার্থ ছোটগল্প রবীন্দ্রনাথ থেকেই শুরু। সঙ্গীতক্ষেত্রেও তাঁর সঙ্গীত রচনার মৌলিকতা অনস্বীকার্য। তাল, ভাষা ও সুরের বিদেশী-প্রভাব তাঁর সাঙ্গীতিক অপূর্ব মাধুর্যে পরিপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ প্রায় দু'হাজারের মতো গান রচনা করেছেন। বাঙ্‌লাদেশে নজরুল ইস্‌লাম ছাড়া আর কেউ একজনে গান রচনা করতে পেরেছেন বলে আমরা জানি না। এই গানগুলিতে প্রণয়গীতি, মানবপ্রীতি, প্রকৃতিপ্রীতি সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আশ্চর্য রূপমাধুরী ও তারই নিত্য আকৃতি তাঁর গানের সুর ও তালের মধ্যে সার্থক হয়ে উঠেছে।

রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রথম পরিচয় পেলাম 'বনফুল', 'কবি-কাহিনী', 'ভগ্নহৃদয়ে'। তারপরে বিদ্যাপতি, গোবিন্দ দাসের অনুসরণে 'ভানু সিংহ' ছদ্মনামে পদাবলী রচনা করেন। 'বাল্মীকি-প্রতিভাও' এই সময়ে রচিত হয়। এরপর থেকে শুরু হ'ল কাব্য রচনার পালা। আর সেইসঙ্গে উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প প্রভৃতি ত আছেই। সন্ধ্যাসঙ্গীত (১৮৮২), প্রভাতসঙ্গীত (১৮৮৩), কড়ি ও কোমল (১৮৮৬), মানসী (১৮৯০), সোনার তরী (১৮৯৪), চিত্রা (১৮৯৬), চৈতালী (১৮৯৬), কথা (১৯০০), কল্পনা (১৯০০), ক্ষণিকা (১৯০০), নৈবেদ্য (১৯০১), শিশু (১৯০৩), খেয়া (১৯০৬), গীতাঞ্জলি (১৯১০), বলাকা (১৯১৬), পলাতকা (১৯১৮), শিশু ভোলানাথ (১৯২২), পুরবী (১৯২৫), মহুয়া (১৯২৯), কণিকা, পরিশেষ (১৯৩২), পুনশ্চ (১৯৩২), শেষ সপ্তক (১৯৩৫), পত্রপুট (১৯৩৬), শ্যামলী (১৯৩৬), ছবির ব্যাখ্যামূলক বিচিত্রিতা কাব্য (১৯৩৬), বীথিকা (১৯৩৫), প্রান্তিক (১৯৩৮), আকাশপ্রদীপ (১৯৩৮), সেঁজুতি (১৯৩৮), নবজাতক (১৯৪০), সানাই (১৯৪০), রোগশয্যায় (১৯৪০), ও আরোগ্য (১৯৪১), জন্মদিন (১৯৪১), শেষলেখা (১৯৪১), স্ফুলিঙ্গ প্রভৃতি বিরাট কাব্যের সমারোহ তাঁর অনুভূতিশীল বিচিত্র মনের পরিচয়ই জ্ঞাপন করে। শেষের দিকে পুনশ্চ, শেষ সপ্তক, পত্রপুট প্রভৃতি কয়েকটি গদ্য-কাব্য রচনা করেছিলেন। গীতাঞ্জলির ইংরাজীতে অনুবাদের পর রবীন্দ্রনাথ গদ্য-কবিতার রস সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠেন, তাঁর 'লিপিকার' রচনাগুলিকে গদ্য-কবিতা বলা যেতে পারে, যদিও তা দেখতে গদ্যের মতো। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, 'ছাপবার সময় বাক্যগুলিকে পদ্যের মতো খণ্ডিত করা হয়নি—বোধ করি ভীরুতাই তার কারণ।' গদ্যকবিতা সম্বন্ধে তিনি আরও বলেন, 'গদ্যকাব্যে অতি নিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটি সসজ্জ ও সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। অসংকুচিত গদ্য-রীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব, এই আমার বিশ্বাস…।' রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন যে এমন অনেক বিষয়বস্তু আছে যার ভাব গদ্যকবিতা ছাড়া অন্য কোনো রীতিতে প্রকাশ পেত না। বাঙলা সাহিত্যে গদ্যকবিতা বিংশ শতাব্দী থেকেই সার্থক ভাবে দেখা দিয়েছে।

জীবনধর্মী কবিতা গদ্য-রীতিতেই সার্থকভাবে প্রকাশ পেতে পারে। বাস্তব রসবোধ সঙ্গীতের ধারা বেয়ে ততটা আসতে পারে না—যতটা সে আসে পদ্যের পথ ধরে। গদ্যকবিতায় কোনো আকস্মিকতা নেই, বিস্ময় নেই। রবীন্দ্রনাথের মতে 'সে নাচেনা—সে চলে। সে সহজে চলে বলেই তার গতি সর্বত্র। সেই গতিভঙ্গী আবাঁধা। ভীড়ের ছোঁয়া বাঁচিয়ে পোশাকী শাড়ীর প্রান্ত তুলে ধরা আধ ঘোমটা-টানা সাবধান চাল তাঁর নয়।'

অন্যদিকে বউঠাকুরানীর হাট (১২৯০), রাজর্ষি (১২৯৩), চোখের বালি, নৌকাডুবি, গোরা, ঘরে বাইরে (১৯১৬), চতুরঙ্গ (১৯১৬), যোগাযোগ (১৯২৯), শেষের কবিতা (১৯২৯) প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করেছেন। এছাড়া রাজা ও রানী (১৮৮৯), বিসর্জন (১৮৯০), চিত্রাঙ্গদা (নাট্যকাব্য -১৮৯২), রাজা, অচলায়তন, মুক্তধারা, রক্ত করবী প্রভৃতি বহু নাটক, প্রবন্ধ সমষ্টির সংকলন প্রাচীন সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, সাহিত্য, সাহিত্যের পথে, এবং গান ত আছেই। তা ছাড়া তিনি দক্ষ চিত্রশিল্পীও ছিলেন।

প্রকৃতির কবি, শ্রেয়ের কবি ও মানবের কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে অজানা, অচেনার অভিসারে যাত্রা করেছেন। কখনও প্রকৃতির মাঝে, কখনও জীবনের মাঝে তিনি উপলব্ধি করেছেন তাঁর জীবনের অধিদেবতাকে। 'বনফুল' থেকে 'শেষলেখা' পর্যন্ত রবীন্দ্র-কাব্যের যে প্রবাহ কাব্যসমুদ্রে মিলিত হতে চলেছে তার মধ্যে আমরা একটি নিত্য-পরিবর্তনের ধারার ধারক ও বাহককে পাই। প্রতিদিনের প্রতিটি পরিবর্তনকে, তার বৈচিত্র্যকে সেই নিত্য-চঞ্চল সুদূরের পিয়াসী প্রাণ স্বীকার করে নিয়েছে। এই পরিবর্তন শুধু চেতনার রঙ্গমঞ্চে রঙীন পট-পরিবর্তন নয়—সমগ্র প্রকৃতি বিশ্ব ও মানবপ্রকৃতির পরিবর্তন—বিশ্ব ও জীবধর্মের পরিবর্তন। ইনিই আমাদের রবীন্দ্রনাথ। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের' কবি হঠাৎ অনুভব করেন—

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি,
জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

এই কবিরই বুকে বেদনা জেগে ওঠে কি এক নতুনের জন্য। সে বেদনা,

আকার প্রকার হীন তৃপ্তিহীন এক মহা আশা,
প্রমাণের অগোচর প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা।

সেই বেদনা এই পৃথিবীর জন্য,—শেষ পর্যন্ত মধুময় দ্যুলোক ভূলোকের জন্য। মাটির পৃথিবীর কবি মাটির মাঝেই আপনাকে খুঁজে পান—তাই তিনি বলেন 'ছুটিব না স্বর্গে আর মুক্তি খুঁজিবারে।'

চিত্রাপর্বে আমরা এক বিদ্রোহী কবিকে পেয়েছি। তিনি বলেন—

ঘূর্ণাচক্র জনতা সংঘ, বন্ধনহীন মহা-আসঙ্গ
তারি মাঝে আমি করিব ভঙ্গ, আপন গোপন স্বপনে।
ক্ষুদ্র শান্তি করিব তুচ্ছ, পড়িব নিম্নে, চড়িব উচ্চ,
ধরিব ধূম্রকেতুর পুচ্ছ, বাহু বাড়াইব তপনে।···
হাতে তুলি লব বিজয় বাদ্য, আমি অশান্ত, আমি অবাধ্য,
যাহা কিছু আছে অতি-অসাধ্য, তাহারে ধরিব সবলে।
আমি নির্মম, আমি নৃশংস, সবেতে বসাব নিজের অংশ,
পরমুখ হতে করিয়া ভ্রংশ, তুলিব আপন কবলে।

এই বিদ্রোহী 'আমিটি' পরের যুগের অনেক কবির মধ্যে আরও স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

কবি যখনই ভূমার মধ্যে প্রাণের আরামের সন্ধান খুঁজে পান তখনই মাটির উপরে থেকেও যে 'চিরদিন মোরে হাসাল কাঁদাল, চিরদিন দিল ফাঁকি' তাঁকেই খুঁজে বেড়ান। তখন মুক্তি-কামনাই বড়ো হয়ে ওঠে। কিন্তু নিত্য-কালের নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের স্বর্গলোক থেকে আবার মাটির বুকে নেমে আসতে হয়। বিশ্বপ্রকৃতির উন্মাদনার মাঝে নিজের খেয়ালখুসির মত্ততাকে, নৃত্যপাগল নটরাজের তাণ্ডবকে অনুভব করেন। জড়সংস্কারে আবদ্ধ জীবনের ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যেতে চান উদার বিশ্বের উন্মুক্ততার মাঝে। তখন তার শুধু একমন্ত্র—

চাবনা পশ্চাতে মোরা মানিব না বন্ধন ক্রন্দন
হেরিবনা দিক,
গণিবনা দিন ক্ষণ করিব না বিতর্ক বিচার
উদ্দাম পথিক।

স্বপ্নাবেশকে তবুও তাঁর কবিমন বারবার কামনা করেছে। কিন্তু এই কামনার ভিতরও উপনিষদের মন্ত্রটি ধ্বনিত হয়। কবি যখন বলেন—

মনেরে আজ কহ, যে
ভালোমন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে

তখন বুঝি জীবনে খণ্ডতায় আছে দুঃখ, একমাত্র অখণ্ড সত্যেই শান্তি।

আবার জীবাত্মা ও পরমাত্মা নিত্য আনাগোনায় বিশ্বের গতি-সত্য ধরা দিচ্ছে। কোথাও কিছুই যেন একেবারে থামছেনা—'ভাব হ'তে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা' চলছে। কিন্তু এমনি করে নিত্য-নতুনের পিয়াসীর জীবনেও অপ্রমেয়ের অনুসন্ধানের মাঝখানে নেমে এলো ক্লান্তি। কিন্তু এ ক্লান্তি অনেক খোঁজার ক্লান্তি নয়। শুধু পুরানোর ক্লান্তি নিয়ে কবি আগামীর সজীবতার, নিরলসতার আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। কারণ কার জন্য যে এই পথচলা তা কবি জেনেছেন—তাই আজ হঠাৎ কিছু পাবার আশা তিনি করেন না।

কবির কাব্যধারার পট পরিবর্তন হ'ল। আমরা জানি, কবি যুগধর্ম ও যুগ-চিত্ত-নিরপেক্ষ নন। মানুষের মাঝে থেকে মানুষের সুখদুঃখের জীবন বাদ দিয়ে সমাজ-নিরপেক্ষ হয়ে মানুষ থাকতে পারে না। যখন পৃথিবীময় অশান্তি, যখন সমাজ-জীবন-ক্ষেত্রে দুর্যোগ আসছে ঘনিয়ে, তাকে এড়িয়ে গিয়ে, পলাতক মনোবৃত্তি নিয়ে শুধু ভাবতন্ময়তায় আপনাকে বিলীন করে রাখা রবীন্দ্রনাথের ধর্ম নয়। কি জাতীয় ক্ষেত্রে, কি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বাস্তবকে অস্বীকার করেন নি। হয়ত তার সঙ্গে একেবারে একাত্ম হতে পারেন নি, কিন্তু যা সত্য, যা ধ্রুব, যা মানুষের ধরাছোঁয়ার ভেতর তাকে স্বীকার করা ও ব্যবধানের বেদনাকে অকুণ্ঠায় মেনে নেওয়া রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। ১৯১৪ সালের যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে পাপের যে বীভৎস রূপ তিনি দেখেছিলেন এবং তারও আগে পরাধীনতার যে বেদনা তাঁর অন্তরকে আঘাত করেছিল—তাদের সম্মিলিত শক্তির দুঃখ-আবেগময় প্রকাশ বলাকা এবং তার পরের কাব্যগুলিতে। ঝিমিয়ে পড়া মনকে, বিভ্রান্ত যুবশক্তিকে একদিকে তিনি আহ্বান করেছেন, আবার তাদের দেখিয়ে দিচ্ছেন জীবনের গতিষ্ণুতাকে। গতির অখণ্ড প্রবাহে যৌবনের উদ্দৃপ্ত জয়গান ধ্বনিত হয়েছে তাঁর বলাকা কাব্যে। বলাকা কাব্যের প্রধান তত্ত্ব গতিতত্ত্ব। ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় বলাকা কাব্যকে বলেছেন 'গতিরাগের কাব্য'। বলাকায় তত্ত্বজিজ্ঞাসাই বড়ো নয়—এখানে তত্ত্ব-সঙ্গীত মহিমা কাব্য-সৌন্দর্য লাভ করেছে। আবার

মহাযুদ্ধের হানাহানি কবিকে পীড়িত করেছে। এই দ্বন্দ্বময় আঘাত-সংঘাতময় জগতে আনন্দকে বহন করে আনতে হবে। কিন্তু তার জন্য দরকার প্রচণ্ড বিক্ষোভের। আগ্নেয়গিরি যদি না জেগে উঠে তাহলে জাতির কোনো আশাই নেই পুরাতন আবর্জনার সংস্কারের। 'বলাকা' কবিতাটিকে বলাকা কাব্যের কেন্দ্রীয় কবিতা বলা যেতে পারে। এছাড়া 'ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ', 'দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন', 'যাত্রী' প্রভৃতি কবিতাগুলিতে সমসাময়িক সামাজিক ও আন্তর্জাতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে জয়শঙ্খনাদ শোনা যায়।

'বলাকা' থেকে 'শেষ লেখা' পর্যন্ত কাব্যে ভাববৈচিত্র্যকে নানারূপে নানাভাবে দেখতে পেয়েছি। কোথাও শিশুমনের রহস্যের মধ্যে কবির দৃষ্টি, কোথাও শৃঙ্খলহীন যৌবনের দিনকে কবি জীবনের মাঝে আবার ফিরে পেতে চান, কোথাও নিছক রোমান্টিক গীতিউচ্ছ্বাস।

মাঝে মাঝে জীবনের অতৃপ্তি, অপূর্ণতা কবির মনকে আলোড়িত করলেও সে ক্ষোভ বেশীক্ষণ কবির থাকে না, তাই তিনি বলে ওঠেন—

ধন্য এ জীবন মোর—
এই বাণী গাব আমি, প্রভাতে প্রথম-জাগা-পাখী
যে স্বরে ঘোষণা করে—আপনাতে আনন্দ আপন।

কবির শেষ জীবনের কাব্যগুলি যেমন transcendental ও immanent-এর ভাব দেখা দিয়েছে তেমনি রাষ্ট্র ও সভ্যতার বীভৎস বর্বরতার বিরুদ্ধেও কবিচিত্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে।

উপর আকাশে সাজানো তড়িৎ আলো
নিম্নে নিবিড় অতি বর্বর কালো
ভূমি গর্ভের রাতে
ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের
নিদারুণ সংঘাতে
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন
সভ্যনামিক পাতালে যেথায়
জমছে লুটের ধন।

এই সভ্যতার বিরুদ্ধে কবির শুধু যে নালিশ তা নয়, কবি তাকে একেবারে মুছে দিতে চান ইতিহাসের পাতা থেকে। উনবিংশ ও বিংশ শতকের

এই বিস্ময়কর বিরাট কাব্য প্রবাহে যদিও আমরা নানা বৈচিত্র্যকে দেখতে পেলুম তবুও কবির মনে হয়—

আমার কবিতা জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।

তাই আগামী দিনের সর্বহারার কবির উদ্দেশ্যে কাব্যের সার্থক পরিণামের কামনা প্রকাশ করে তাঁর নমস্কার জানিয়েছেন। তাঁর কাব্যে বিরাট বৈচিত্র্যের এই বিপুল সমারোহ সত্ত্বেও তার সঙ্গে সঙ্গে এই আত্মসমালোচনা শুধু রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। রঙ্গমঞ্চের দিক থেকে এবং নাটকের আঙ্গিকের দিক থেকে তা ত্রুটিহীন না হলেও কবির বক্তব্য বিষয়ের অবতারণা ও তার বিশ্লেষণের মধুর ব্যঞ্জনা নাটকগুলিকে অপূর্বতা দান করেছে। তত্ত্ব যেখানে প্রধান হয়ে উঠেছে সেখানে নাটকের কাব্যময়তা হয়ত তার গতিকে ধীর স্থির করে এনেছে, কিন্তু সর্বত্র একটা হৃদয়াবেগ, কবিপ্রাণতা আমরা লক্ষ্য করি। 'রাজা ও রাণী' ও 'বিসর্জন' প্রভৃতি নাটকে প্রেমের দুর্বল আত্মকেন্দ্রিকতার বিষাদময় পরিণতি বা ট্রাজেডি এবং অন্যদিকে অন্ধ সংস্কার ও ভ্রান্ত কর্তব্যবোধের সঙ্গে হৃদয়বৃত্তির সংঘাতের ব্যর্থ করুণ দিক প্রকাশ পেয়েছে। পরের দিকে 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী' প্রভৃতি নাটকে যন্ত্রের দানবীয় শক্তি এবং মানবীয় সৌকুমার্যের, প্রেমের সংঘাতের রূপটি কবি সার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন। 'ডাকঘর' প্রভৃতিতে সংস্কারের গণ্ডীতে আবদ্ধ মনের মুক্তির কামনা ফুটে উঠেছে। শেষোক্ত নাটকগুলিকে সাংকেতিক নাটক বলা যায়। তবে 'রাজা' নাটকখানিকে রূপক নাটক বলাই শ্রেয়। ডাকঘরও প্রায় তাই। আদর্শের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব-সংঘাত রবীন্দ্র-নাটকের এক বিশেষ লক্ষণ। এই বৈশিষ্ট্য তাঁর উপন্যাসেও দেখা দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে হৃদয়াবেগই মুখ্য হয়ে উঠেছে, পরস্পর অনুভূতি-পার্থক্যে ট্রাজেডি অথবা বস্তু ও ভাবের দ্বন্দ্ব-সংঘাতোত্তর মিলন—অর্থাৎ মুখ্যত ভাবময়তা কবির উপন্যাসকে কাব্যময় ক'রে তুলেছে। রাজর্ষি, বউ-ঠাকুরাণীর হাট প্রভৃতি ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাসেও ব্যক্তিজীবনের অন্ত-র্বিক্ষোভই প্রাধান্য পেয়েছে। 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি', 'গোরা' প্রভৃতিতে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির দ্বন্দ্ব ভাব প্রকাশ পেয়েছে। 'ঘরে বাইরে' থেকে শেষের

কবিতা পর্যন্ত যদিও কিছুটা বাস্তব বিমুখী তবুও সেখানে সামাজিক মনের তাত্ত্বিক ও হৃদয়াবেগের জিজ্ঞাসাই প্রবল। রাজনীতির পটভূমিকায় 'চার অধ্যায়ে'ও অন্তু-এলার হৃদয়দ্বন্দ্ব ও ব্যর্থতার রূপ দেখতে পাই।

আত্মকথা, সমালোচনা, ভ্রমণ কাহিনী, ও অন্যান্য প্রবন্ধ সাহিত্যেও আমরা যে রবীন্দ্রনাথকে পাই তিনি সেই কবি রবীন্দ্রনাথই। তাঁর সূক্ষ্ম সমালোচকের দৃষ্টি, তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও দার্শনিকের মন কাব্যপথ বেয়ে চলেছে। তাঁর 'আধুনিক সাহিত্য', 'প্রাচীন সাহিত্য', 'সাহিত্যের স্বরূপ' প্রভৃতি সাহিত্য-আলোচনা,—'রাশিয়ার চিঠি', 'জীবন স্মৃতি' প্রভৃতি সহানুভূতিপূর্ণ দরদী রচনায়, হাস্য কৌতুকে, বিচিত্র প্রবন্ধের মতো খেয়ালখুসির রঙিন আলপনায়, 'লিপিকার' মতো গদ্য কাব্যে কবির কাব্যসৃষ্টি প্রেরণার মর্মানুভূতি—প্রতি পংক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে। উত্তর কালের সমালোচনা সাহিত্যে নানা সার্থক সমালোচনার নিদর্শন দেখা গেলেও ঠিক এ ধরণের সমালোচনা আর দেখা যায় নাই। চিঠিপত্রও যে সাহিত্য-রসসিক্ত হয়ে উঠতে পারে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তার 'ছিন্ন পত্র', 'ভানু সিংহের পত্রাবলী' প্রভৃতি।

'শিশু', 'শিশু ভোলানাথ' ছাড়া তিনি 'ছড়া', 'খাপছাড়া', 'প্রহাসিনী' প্রভৃতি লঘু হাস্যরসের কাব্য রচনা করেছিলেন। স্বতঃস্ফূর্ত এই কবিতাগুলি সহজেই শুধু শিশুমন নয়, বয়স্কদের মনও আকৃষ্ট করে।

তাই বলি কাব্য, সঙ্গীত, নাটক, উপন্যাস, ছোট গল্প, প্রবন্ধ, রস রচনায় রবীন্দ্রনাথের দান অপরিসীম। বিশ্ব সংস্কৃতির দরবারে বাঙ্‌লার তথা সমগ্র ভারতের পরিচয় রবীন্দ্রনাথই বহন করে নিয়ে গেছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভাবধারা শুধু ভাবতন্ময়তাপুষ্টই নয়—সেখানে মানুষের সুখ দুঃখ বেদনাবোধ, নিপীড়নের বিরুদ্ধে লাঞ্ছিত নিপীড়িত মানুষের বজ্রনাদ, নিষ্ক্রিয় ও নির্জীব প্রাণের মধ্যে চলার উজ্জ্বল ছন্দের সুরধ্বনিও শোনা যায়। সেখানে তিনি একান্তভাবে মাটির মানুষের কবি। কিন্তু যেখানে অতীন্দ্রিয়, অনির্বচনীয়, অপ্রমেয়ের জিজ্ঞাসা জেগে উঠেছে সেখানে তিনি সীমা থেকে অসীমের উদ্দেশ্যে ভাবের উর্ধ্বলোকে চলে গেছেন। 'শান্তিনিকেতনের' মধুর রচনাগুলির মধ্যে মানবচরিত্রের স্বরূপ-সন্ধানী দৃষ্টির পরিচয় পাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জগতের জীবন-দর্শনের স্বরূপ ও পার্থক্য তাঁর অনেক রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে তাঁর তিরোভাব কাল পর্যন্ত

রবীন্দ্র-সাহিত্য-ধারা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পটপরিবর্তনের ভেতর দিয়ে নব নব রূপে প্রকাশ পেয়েছে। পৃথিবীর কোন মানুষের কোনো দুঃখ তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। কোনো মহত্তম প্রচেষ্টাও তাঁর অভিনন্দন থেকে বঞ্চিত হয় নি। যুদ্ধের বীভৎসতা, অগণিত নরনারী শিশুদের মর্মন্তুদ আর্তনাদ—ঘরহারার ঘরবাঁধার ঐকান্তিক প্রয়াসের সার্থকতা কবির চিত্তকে দুঃখ বেদনায় ও আনন্দে উদ্বেলিত করেছে। 'ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের নিদারুণ সংঘাতে' নতুন জীবন ও নতুন আলো দেখা দেবে—কবির এই দৃঢ় বিশ্বাস আছে। বীরের রক্তস্রোত, মাতার অশ্রুধারা কখনও ব্যর্থ হবে না—এও কবি নিশ্চিতভাবে জানেন। আবার কবি নূতনের আভাস পান মৃত্যুঘাতী যুদ্ধের ভিতর—

দামামা ঐ বাজে
দিন বদলের পালা এলো
ঝোড়ো যুগের মাঝে।

১৯০২ সালে বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে একটা পরিবর্তনকে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন—

যুগান্ত এল বুঝিলাম অনুমানে
অশান্তি আজ উদ্যত বাজ কোথাও না বাধা মানে,

আর স্বপ্নবিধুর কবিমনের গীতি উচ্ছ্বাসত আছেই। কবি যখন বলেন—

আমি যে রূপের পদ্মে ক'রেছি অরূপ মধু পান।
দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান
অনন্ত মৌনের বাণী শুনেছি অন্তরে
দেখেছি জ্যোতির পথ শূন্যময় আঁধার প্রান্তরে...

অথবা,

চৈত্রের আকাশ তলে নীলিমার লাবণ্য মিলালো
আশ্বিনের আলো
বাজালো সোনার ধানে ছুটির সানাই
চলেছে মন্থর তরী নিরুদ্দেশ স্বপ্নেতে বোঝাই—

তখন অমৃতের পুত্র রবীন্দ্রনাথের সুদূর-প্রসারী, ব্যাপক ও মধুর দৃষ্টিভঙ্গীর অনির্বচনীয় মাধুর্যই আমাদের কাছে ধরা দেয়।

যথার্থ সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন 'মানুষ সামনের দিকে যেমন অগ্রসরণ করে তেমনি অনুসরণ করে পিছনের ; নইলে তার চলাই হয় না। পিছনহারা সাহিত্য বলে যদি কিছু থাকে সে কবন্ধ, সে অস্বাভাবিক।' সাহিত্য যদি কালকে অতিক্রম ক'রে কালজয়ী হতে পারে তবেই সে যথার্থ আধুনিক সাহিত্য। গতিধর্মপ্রধান রবীন্দ্রকাব্য কোথাও মজাপুকুরের ইতিহাস রচনা করেনি। রবীন্দ্র কাব্য গীতিধর্মী একথা অস্বীকার করব না—কিন্তু তার গতিধর্মও অনস্বীকার্য। কবির সাহিত্যে অতীতের মহিমা, বর্তমানের বাসনা এবং ভবিষ্যতের প্রত্যাশা একই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে।

রবীন্দ্র কাব্যে মানব জীবনের প্রাধান্যও আছে, আবার বিশ্বমানবতার অকুণ্ঠিত স্বীকৃতিও রয়েছে। মৃত্যু সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে মত তা প্রাচীন ভারতের উপনিষদের মত। কবি জীবন ও মৃত্যুকে স্বতন্ত্র করে দেখেন না। তাঁর মতে মৃত্যু জীবনের অবসান নয়—তার শেষ সার্থকপরিচয়। কবি মৃত্যুকে সম্বোধন করে বলছেন—

ওগো আমার জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা,
মরণ ওগো মরণ তুমি কও আমারে কথা।

রবীন্দ্র কাব্যে প্রেম দেহের সীমানা অতিক্রম বৈদেহীরূপ লাভ করেছে। প্রেমের মৃত্যুঞ্জয় বলিষ্ঠ রূপকে তিনি দেখেছেন এবং আমাদেরও 'মহুয়া' প্রভৃতি কাব্যের ভেতর দিয়ে সেই রূপকে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ শক্তির বীভৎসতাকে নিন্দা করেন। স্বার্থোদ্ধত অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি জানান প্রতিবাদ। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর কবি। মানুষকে ভালোবাসা তাঁর সাহিত্য-সাধনার মূল কথা। 'পরিশেষে' তিনি বললেন—

দূর করি সব কর্ম, সব তর্ক, সকল সন্দেহ,
সব খ্যাতি, সকল দুরাশা,
বলে যাবো, আমি যাই, রেখে যাই মোর ভালোবাসা।'

এই পৃথিবীতে এসে আমরা বার বার দুর্জ্ঞেয় যা, অপ্রমেয় যা তাকে খুঁজে বেরিয়েছি—কিন্তু যাবার দিন ঘনিয়ে আসে তবুও তার সন্ধান মেলে না—তাই প্রশ্ন শুধু জীবনে প্রশ্ন হয়েই রইল। এই বিরাট বিশ্বের অনেকখানিই আমাদের সামনে প্রকাশ পায় না। নিত্য যা—যা না-জানা—তা না-জানাই রয়ে গেল—কবি বলছেন—

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল সত্বার নূতন আবির্ভাবে
কে তুমি—
মেলেনি উত্তর।
... ...
দিবসের শেষ সূর্য প্রশ্ন করে
কে তুমি—
পেলনা উত্তর।

নিত্যকালের মানুষের প্রশ্ন—নিত্যকাল নিরুত্তরই কি থাকবে!

নিজের দেশ ও জাতিকে এতটা আপনার মনে করে ভালোবাসা—তার শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতির জন্য এমন করে ভাবা যে কতখানি—তার সার্থক পরিচয় পাই তখনই—যখন দেখি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ শিশুদের জন্য সহজপাঠ্য ছোট ছোট বই রচনা করেছেন। আজ বাঙালী বিশ্ব-দরবারে নিজের যে পরিচয় বহন করে নেবে, নিজের যে গৌরব প্রকাশ করবে সে পরিচয়ের গৌরব রবীন্দ্রনাথের। বাঙ্‌লার সংস্কৃতির যদি কোনো নামকরণ করা প্রয়োজন হয় ত তার উপযুক্ত নাম হচ্ছে 'রবীন্দ্রনাথ'।

দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা রবীন্দ্রনাথকে দেশ ও জাতি সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন করে রেখেছিল। তবে রাজনীতির নামে হট্টগোলকে তিনি পছন্দ করতেন না। দেশের দরিদ্র মানুষের দুঃখ তাঁর প্রাণে বড়ই বেজেছিল। তিনি এই দুঃখ দেখে বললেন—

বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা, সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ অন্ধকার।

তাই এদের জন্য—

অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট।

এই উদার ব্যথিত দৃষ্টিভঙ্গী কবি জীবনের সায়াহ্নেও তার প্রখরতা হারায়নি। সেদিনেও তিনি বলেছেন—

'অভ্রভেদি ঐশ্বর্যের চূর্ণীকৃত পতনের কালে,
দরিদ্রের জীর্ণদশা বাসা তার বাঁধিবে কঙ্কালে।

পৃথিবীময় যে অশান্তি যুদ্ধের বীভৎসতার ভিতর দিয়ে দেখা দিয়েছিল তার সম্বন্ধে মানুষকে সতর্ক করে দিয়ে পৃথিবীর কল্যাণ প্রার্থনা করে আগামী দিনের কবির জন্যে তিনি বললেন—

'আজ হেরো, পশ্চিম দিগন্তে হোথা
ঝঞ্ঝা মেঘে উঠে ওই বজ্রের ঝঞ্ঝনা—
ধূলিবাষ্প-আবর্তের আবিল আকাশে,
দিন বুঝি হ'ল অবসান।
পশুরা উঠিল গর্জি ছিল যারা গোপন গহ্বরে—
নখে নখে ছিন্ন করিতেছে তারা
অঙ্গনের বহুমূল্য আস্তরণ,
ধূলিরে করিছে অবারিত।
এসো তুমি যুগান্তের কবি,
আত্ম অবমাননার আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে
ওই চির নিপীড়িতা মানবীর কাছে,
ওই অবমানিতার দ্বারে
ক্ষমা ভিক্ষা করো।
হোক তাহা তব সভ্যতার
হিংস্র প্রলাপের মাঝে শেষ পুণ্যবাণী।'

তিনি জানতেন—

দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিহাসে শাশ্বত অধ্যায়।

এক সময়ে বলা হ'ত যে মহাযুদ্ধের পর থেকে যে নতুন ভাবাদর্শ মানুষের মাঝে দেখা দিয়েছে তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের যোগ কম। এই অভিযোগকারীরা যে হট্টগোলের আদর্শকে বড়ো ক'রে দেখতেন রবীন্দ্রনাথ তার সম্বন্ধে বলেছিলেন 'বাস্তবের সেই হট্টগোলের মধ্যে পড়লে কবির কাব্য হাটের কাব্য হবে।' আদর্শ সাহিত্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'বড়ো সাহিত্যের একটা গুণ হচ্ছে অপূর্বতা, ওরিজিন্যালিটি। সাহিত্য যখন অক্লান্ত

শক্তিমান থাকে তখন সে চিরন্তনকেই নূতন ক'রে প্রকাশ করতে পারে।' এই অক্লান্ত শক্তিমত্তা ও গতিবেগ রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

রবীন্দ্রযুগের পরবর্তী লেখকগণ

রবীন্দ্রনাথের শিষ্যকল্প ও সমসাময়িকদের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুধীন্দ্রনাথ 'সাধনার' সম্পাদক ছিলেন। 'বালক' পত্রিকায় তিনি প্রথম লেখা শুরু করেন। বলেন্দ্রনাথও 'বালক' পত্রিকায় প্রথম লিখতে থাকেন। গদ্যে ও পদ্যে বলেন্দ্রনাথের দান বেশি না হলেও এই ক্ষণজন্মা সাহিত্যিক অল্পদিনের মধ্যে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছিলেন। বলেন্দ্রনাথের গদ্যরীতির প্রাঞ্জলতা এবং ভাবপ্রকাশের সহজ ভঙ্গি সে-যুগের কম লেখকদের মধ্যেই পাওয়া যায়।

বাঙ্‌লা ছোট গল্প রবীন্দ্রনাথের লেখনীতেই প্রথম সার্থকভাবে প্রকাশ লাভ করে। তার আগে সার্থক এবং মৌলিক ছোট গল্প পাওয়া যায় না। জোর করে যতই যে নজির টেনে দেখান না কেন, রবীন্দ্রনাথকেই প্রথম ছোট গল্প রচয়িতা বলে স্বীকার করে নিতে হয়। এই ছোট গল্প রচনায় তাঁর পরই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রভাতকুমারের রচনার বৈশিষ্ট্য হল মধ্যবিত্ত জীবনের বাস্তব দিকের নানা সমস্যার রূপাঙ্কনে। তিনি কয়েকখানি উপন্যাসও রচনা করেছিলেন। অন্যান্য গল্প লেখকদের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, দীনেন্দ্রকুমার রায়, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, ইন্দিরা দেবী, অনুরূপা দেবী নিরুপমা দেবী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরের দিকে মণীন্দ্র লাল বসু, গোকুল নাগ, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, প্রবোধ সান্যাল, মনোজ বসু, সরোজ রায়চৌধুরী, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যার, সন্তোষ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, রমেশচন্দ্র সেন, সুশীল জানা প্রভৃতি সামাজিক, পারিবারিক এবং ব্যক্তি-জীবনের নানা সমস্যা নিয়ে বিশুদ্ধ রোমান্‌টিক্‌ অথবা বাস্তব-প্রধান ছোট গল্প রচনা করেছেন। উল্লিখিত

লেখকদের প্রায় প্রত্যেকেরই অন্ততঃ দু' চারটি গল্প বিখ্যাত গল্প হিসাবে ছোট গল্প সাহিত্যে নিজেদের দাবি প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। হাসির গল্পে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু (পরশুরাম), বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ছোট গল্পের মধ্যে একটি জীবন বা কয়েকটি জীবনের কোনো একটি ঘটনাকে ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে তুলে ধরার চেষ্টা লক্ষিত হয়। খুব বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে যাবার অবকাশ এখানে কম। মনের ওপর একটি ধাক্কা দিয়ে হঠাৎ যেন মাঝপথে থেমে যায়। বাঙ্‌লা ছোট গল্পে এই আকস্মিকতা খুব বেশি লক্ষিত হয় না। তবুও সার্থক ছোট গল্পেরও বাঙ্‌লায় আজ অভাব নেই।

রবীন্দ্র-যুগের আর একজন উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। ইনি 'বীরবল' এই ছদ্মনামে লিখতেন। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় শ্লেষাত্মক রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। সাহিত্যে মার্জিত কথ্য ভাষার প্রয়োগ, বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গি, বক্তব্য বিষয়ের সহজ ও সরস প্রকাশ ছিল তাঁর রচনার বিশেষত্ব। তাঁর রচনার ভাষারীতির ভেতর দিয়ে আমরা মার্জিত কথ্য ভাষাকে সাহিত্যের ভাষা হিসাবে পেয়েছি। তাঁর ভাষারীতি রবীন্দ্রনাথকে খুবই আকৃষ্ট করেছিল। চৌধুরী মহাশয়ের ভাবের প্রকাশভঙ্গি ছিল অনবদ্য। তিনি নিজেই বলেছেন, 'লোকে যাকে বীরবলী ঢঙ্‌ বলে, সে ক্রিয়াপদের হ্রস্বদীর্ঘতার উপর নির্ভর করে না। ও হচ্ছে রচনার একটি বিশেষ ভঙ্গি।' আমরা এখানে তাঁর রচনার কিছুটা উদ্ধৃত করছি—'বসন্ত, বঙ্কিমের রজনীর মত, ধীরে ধীরে অতি ধীরে ফুলের ডালা হাতে করে, দেশের হৃদয় মন্দিরে এসে প্রবেশ করে। তার চরণ-স্পর্শে ধরণীর মুখে, শব সাধকের ন্যায়, প্রথম বর্ণ দেখা দেয়। তার পরে ভ্রূ কম্পিত হয়, তারপরে চক্ষু উন্মিলিত হয়, তারপর তার নিঃশ্বাস পড়ে, তারপর তার সর্বাঙ্গ শিহরিত হয়ে ওঠে।...ইংরেজেরা বলেন কে কার সঙ্গ রাখে, তার থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। বসন্তের সখা মদন, আর বর্ষার সখা? পবন-নন্দন নন, কিন্তু তার বাবা। এক লম্ফে আমাদের অশোক বনে উত্তীর্ণ হ'য়ে ফুল ছোড়েন, ডাল ভাঙেন, গাছ ওপড়ান, আমাদের সোনার লঙ্কা একদিনে লণ্ডভণ্ড করে দেন এবং যে সূর্য আমাদের ঘরে বাঁধা রয়েছে তাকে বগলদাবা করেন।' বক্তব্য বিষয়কে কেমন লঘু করে তিনি বলতে চেষ্টা করতেন তা এই সামান্য অংশ থেকেই বোঝা যায়। 'সবুজ পত্র' পত্রিকাখানি

তাঁর অক্ষয় কীর্তি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্রিকাখানির ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। অন্যান্য যাঁরা সবুজপত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তাঁদের মধ্যে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, নলিনী গুপ্ত, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 'বীরবলী' রীতিতে সাহিত্য রচনা করে যাঁরা খ্যাতি লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে অতুলচন্দ্র গুপ্ত, এস. ওয়াজেদ আলী, অন্নদাশঙ্কর রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রধান।

প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের 'বীরবলের হালখাতা', 'চার ইয়ারী কথা', 'রায়তের কথা', সনেট কবিতাগুলি এবং সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধগুলি তাঁকে বাঙ্‌লা সাহিত্যে স্থায়ী আসন দান করেছে। তবে রচনার বুদ্ধিদীপ্ত প্রখরতা সবার পক্ষে সহজ হয়ে উঠতে পারেনি। শিক্ষিত মনের কাছেই তাঁর রচনার আবেদন সীমাবদ্ধ। কারণ তাঁর আপাত-বিরোধী বাক্য প্রয়োগ এবং শ্লেষের ব্যবহার সবার কাছে সহজবোধ্য নয়।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় বাঙ্‌লার সাহিত্যিক ও সাহিত্য-রসিক সমাজে তাঁর রচিত 'কাব্য জিজ্ঞাসার' জন্য সমধিক পরিচিত। তাঁর অনেক প্রবন্ধ এখনও নানা পত্রিকায় ছড়িয়ে থাকলেও ওই একখানি গ্রন্থই তাঁর সুগভীর রসজ্ঞানের পরিচিতি জ্ঞাপন করে। এস, ওয়াজেদ আলীসাহেবও সরস রচনার জন্য বাঙ্‌লা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। অন্নদাশঙ্কর ঔপন্যাসিক হিসাবেই বিশেষ পরিচিত। ধূর্জটিপ্রসাদ উপন্যাস ও প্রবন্ধ রচনা করে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছেন। সাহিত্য ও সঙ্গীত নিয়ে তাঁর অনেক মৌলিক রচনা প্রকাশিত হয়েছে।

বাঙ্‌লা প্রবন্ধ সাহিত্য

উপন্যাস, ছোট গল্প প্রভৃতির মতো বাঙ্‌লা প্রবন্ধ-সাহিত্যও উনবিংশ শতাব্দী থেকেই প্রকাশ পেতে থাকে। মহাত্মা রামমোহন রায় থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কাল পর্যন্ত অনেক প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর সংবাদপত্রগুলি এই সাহিত্যধারার উৎকর্ষের জন্য অনেকখানি দাবি করতে পারে। বাঙ্‌লা সাহিত্যে বিভিন্ন তত্ত্ববিষয় নিয়ে আলোচনা, পুস্তক সমালোচনা প্রভৃতিকে এই প্রবন্ধ-সাহিত্যের পর্যায়ে ফেলা যায়। ইংরেজী essay, treatise, dissertation, discourse, criticism প্রভৃতি শব্দগুলি

বাঙ্‌লা প্রবন্ধ সাহিত্যের রূপ ও রীতিবিরুদ্ধ নয়। বাঙ্‌লা-সাহিত্যে যে সব প্রবন্ধ, সমালোচনা প্রভৃতি পাচ্ছি তার একটা রূপ দেখেছি মহাত্মা রামমোহনের রচনায়। তারপর অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির রচনায় তা আরও সার্থক হয়ে ওঠে। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'বঙ্গ-দর্শন' প্রবন্ধ-সাহিত্যকে একটি বলিষ্ঠ রূপ দান করে। শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথে এসে আমরা মৌলিক প্রবন্ধ রচনার সার্থক নিদর্শন পেলাম। তাঁর 'সাহিত্য', 'সাহিত্যের পথে', 'প্রাচীন সাহিত্য', 'লোক-সাহিত্য', 'আধুনিক সাহিত্য', 'সাহিত্যের স্বরূপ' প্রভৃতি এ ধরণের রচনার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত।

রবীন্দ্রনাথের সময়ে এবং পরে যাঁরা সার্থক প্রবন্ধ সাহিত্য রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শশাঙ্কমোহন সেন প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পরের দিকে ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রভৃতির রচনার ভেতর দিয়ে প্রবন্ধ ও সমালোচনা সাহিত্যের সুষ্ঠু ও সাবলীল প্রকাশ লক্ষিত হয়। বর্তমান কালে নানাবিধ বিষয়ের আলোচনা ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে প্রবন্ধ-সাহিত্যের আরও উৎকর্ষ সাধিত হচ্ছে। তবে এটা ঠিক যে বাঙ্‌লা সাহিত্যে এখনও সার্থক প্রবন্ধ-সাহিত্য গড়ে ওঠার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

বাঙ্‌লা শিশু-সাহিত্য

রূপকথা ও উপকথার গল্প থেকে বুঝতে পারি যে প্রাচীন কাল থেকেই নানা দেশে শিশুমনের উপযোগী গল্প রচিত হচ্ছিল। শিশুমন স্বভাবতঃই কল্পনা-প্রবণ। সে সম্ভব অসম্ভব সীমানা ছাড়িয়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে স্বপ্নলোকের চাবি হাতে ছুটে যায় নিস্তব্ধ নিথর রাজপুরীতে ঘুমন্ত রাজকন্যার ঘুম ভাঙাতে। কল্পলোকের দৈত্যদানব রাক্ষসের সঙ্গে তার লড়াই। এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েই তার মনে জাগে বিস্ময়। এই পৃথিবীর আলো অন্ধকার তার নানা রহস্য তাকে অভিভূত করে। নানা প্রশ্ন ভিড় করে তার মনের আঙিনায়। এরই জবাব দেয় শিশু-সাহিত্য। শুধু যে শিশুমনের প্রশ্নের জবাব দেয় তা নয়, তাকে গড়ে তোলার ভারও নিতে হয় এই সাহিত্যকে। যে শিশুর মধ্যে আগামী দিনের নাগরিকের সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে তাকে ধীরে ধীরে উপযুক্ত

করে গ'ড়ে তোলার দায়িত্ব রয়েছে। এই দায়িত্বও শিশু-সাহিত্যকে পালন করতে হয়। কাজেই সার্থক শিশু-সাহিত্য গড়ে তোলা কঠিন ব্যাপার।

পাশ্চাত্ত্যদেশের ঈশপের গল্প, গ্রীম ও অ্যাণ্ডারসনের রূপকথা তাদের দেশের শিশুদের শুধু নয়, সারা বিশ্বের শিশুদের উপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। আমাদের দেশেও হিতোপদেশের গল্প, কথাসরিৎসাগর, বৌদ্ধ জাতকের গল্প, রূপকথার গল্পও শিশুমনের খোরাক জুটিয়েছে। আজও সে-সব গল্প পুরানো হয়নি।

বাঙ্‌লা দেশে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই শিশুমনের উপযোগী সাহিত্য প্রভৃতি রচনার ঝোঁক দেখা দিয়েছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছোট গল্প সংকলন (ছোটদের জন্য) সে-যুগের শিশুদের জন্যই রচিত। শিশুদের উপযোগী কবিতা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের রচনাতেও পাওয়া যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন লেখক শিশু-সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। সে-যুগে 'সখা' ও 'সাথী' নামে দুইটি পত্রিকাও শিশুদের জন্য প্রকাশ করা হ'ত।

রবীন্দ্রনাথের হাতে শিশুদের উপযোগী ছড়া, কাব্য এবং অন্যান্য সাহিত্য ধারা সার্থক রূপ লাভ করে। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয়ের 'ঠাকুরমার ঝুলি'কে বাঙ্‌লা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ বলা যায়। এ-ছাড়া, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, 'আবোল তাবোল', 'হ য ব র ল'র লেখক সুকুমার রায়, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সুবিমল রায় চৌধুরী, সুনির্মল বসু, হেমেন্দ্রকুমার রায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও 'রাজকাহিনী' 'ক্ষীরের পুতুল' প্রভৃতি বহু শিশুমনের উপযোগী সাহিত্য রচনা করেছিলেন।

শিশুদের উপযোগী মৌচাক, সন্দেশ, শিশুসাথী, রামধনু, শুকতারা প্রভৃতি অনেক মাসিক পত্র প্রকাশিত হয়েছে। বাঙ্‌লা সাহিত্যের অঙ্গ শিশু সাহিত্যের এখনও সার্থক হয়ে গড়ে ওঠার প্রচুর অবকাশ থাকলেও শিশু সাহিত্যের ধারাটি যে একেবারে উপেক্ষিত হয়নি বরং দ্রুত গতিতে উৎকর্ষের পথেই এগিয়ে চলেছে এটাই আমাদের আনন্দের বিষয়।

বাঙ্‌লার অন্যান্য কবিগণ

রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিদের মধ্যে সতীশচন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রমথ চৌধুরী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, শশাঙ্ক মোহন সেন, যতীন্দ্রমোহন বাগচী,

কুমুদরঞ্জন মল্লিক, জীবেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, কালিদাস রায়, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কান্তিচন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সতীশচন্দ্র রায় রবীন্দ্র-পরিবেশের প্রভাবে মানুষ হয়েও কবিতা রচনায় নিজের একটি বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে পেরেছিলেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথের ভাব, ভাষা, ছন্দের অভিনবত্ব তাঁর কাব্যকে অপূর্বতা দান করেছে। সূক্ষ্ম কবি-দৃষ্টি তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দেশী-বিদেশী ছন্দ আহরণ করে তিনি কবিতার 'লেবরেটরী' খুলে তাতে একটার পর একটা ছন্দ প্রয়োগ করে বাঙালী হৃদয়ের আকুল আবেগকে প্রকাশ করেছেন। তিনি বিভিন্ন ভাষায় রচিত অসংখ্য কবিতার অনুবাদ করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ রোমান্‌টিক্ কবি হলেও একেবারে বাস্তব-নিরপেক্ষ কবি নন। কবিতার জন্য বাছাই-শব্দ সংগ্রহ করা তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই শব্দাবলীর দ্বারা তিনি আধুনিক বিজ্ঞানী বুদ্ধি প্রণোদিত তথ্যবহুল কবিতা রচনা করেছেন। কবিতা রচনায় শ্বাসাঘাতপ্রধান ছড়ার ছন্দের দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল বেশি। কবি-সমালোচক মোহিতলালের মতে 'প্রকৃতিকে তিনি বিদ্যা ও বুদ্ধিমার্জিত চিত্তফলকে প্রতিফলিত করিয়া দেখিয়াছেন।'[১] প্রত্যেকটি বিষয়বস্তুকে যথাযথ-ভাবে প্রকাশের ঔৎসুক্য ও সাহস তাঁর ছিল। এই কারণেই তাঁর কবিতার ভাববস্তুর নিখুঁত প্রকাশ আমাদের মনকে সহজেই আকৃষ্ট করে। কবি 'সবিতা', 'সন্ধিক্ষণ', 'তীর্থ সলিল', 'কুহু ও কেকা', 'হসন্তিকা' 'বেণু ও বীণা', 'তীর্থ রেণু' প্রভৃতি কাব্য রচনা করেছেন।

করুণানিধান ও যতীন্দ্রমোহনের কাব্য রচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বিদ্যমান থাকলেও নিজস্ব emotion-এর সহজ ও সাবলীল প্রকাশ তাঁদের কবিতায় লক্ষিত হয়। এঁদের দৃষ্টিভঙ্গি স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে। শশাঙ্কমোহন সেন ছিলেন যুগপৎ কবি ও সমালোচক। শশাঙ্কমোহন 'বোধন' প্রভৃতি কাব্য, 'সাবিত্রী' ও আরও কয়েকখানি নাটক এবং 'বঙ্গবাণী', 'বাণীমন্দির', 'কবি মধুসূদন' প্রভৃতি সমালোচনা গ্রন্থ রচনা করেন।

মোহিতলালও ছিলেন যুগপৎ কবি ও সমালোচক। ইনি 'ভারতী'-গোষ্ঠীর লেখক ছিলেন। তাঁর 'হেমন্ত গোধূলী', 'বিস্মরণী', 'স্বর গরল', 'স্বপন পসারী' প্রভৃতি কাব্যে একটি রোমান্টিক্ অথচ বলিষ্ঠ ভোগবাদের পরিচয় পাওয়া ... জীবনের দুর্দমশক্তির প্রকাশের আকুলতা তাঁর বহু কবিতায় লক্ষিত

হয়। মানব দেহ আর সবকিছুর ওপরে বলেই কবির দৃঢ় বিশ্বাস। তাই তিনি বলেন—

'হায় দেহ! নাই তুমি ছাড়া কেহ, জানি তাহা প্রাণে প্রাণে,
মূরতি-পাগল মনের মমতা তাই ধায় তোমা পানে।
তোমারি সীমায় চেতনার শেষ,—
তুমি আছ, তাই আছে কাল দেশ।
দুঃখ সুখের মহাপরিবেশ! দেহ লীলা অবসানে
যা থাকে তাহার বৃথা ভাগাভাগি দর্শনে বিজ্ঞানে!'

এই দেহবাদ বলিষ্ঠ মনেরই চিন্তাপ্রসূত—এর ভেতর চিত্তের কোনো অসুস্থতার স্থান নেই। কবির কালাপাহাড়, নাদির শাহ, পান্থ প্রভৃতি অনেক কবিতা বাঙলা কাব্য-সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। সমালোচনা সাহিত্যে মোহিতলালের 'আধুনিক বাঙলা সাহিত্য', 'সাহিত্য কথা', 'কবি শ্রীমধুসূদন' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

কবিশেখর কালিদাস রায় বাঙলার তথা সমগ্র ভারতের প্রাচীন ঐশ্বর্য সম্পদের রসরূপ ও বাঙলার মধ্যযুগের বৈষ্ণব ভাবুকতাকে অবলম্বন করেই প্রধানত কাব্য রচনা শুরু করেন। জীবনের অভিজ্ঞতা রোমান্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে রসিক কবির মতো রূপায়িত করেছেন। কবিশেখরও বাঙলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা নিয়ে সমালোচনা গ্রন্থ রচনা করেছেন। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ছিলেন প্রধানত দুঃখবাদী এবং রোমান্টিক-ধর্মী কবি। তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র এবং ইঞ্জিনিয়ার। জীবনকে দুঃখ দুর্যোগের ভিতর দিয়েই উপলব্ধি করেছেন। মাটির কাছাকাছি এসে তার গূঢ়তত্ত্ব জানার চেয়ে যারা তার ওপর নির্ভর ক'রে দুঃখে কষ্টে বেঁচে আছে তাদেরই জীবনের সংবাদ সংগ্রহ করা এবং সে জীবনের যথার্থ পরিচয় জ্ঞাপন করা তাঁর জীবনের হ'ল সাধনা। সেই সাধনার সাহিত্যরূপ পাই তাঁর কবিতায়। কবি জানেন,—

মিথ্যা প্রকৃতি, মিছে আনন্দ, মিথ্যা রঙিন সুখ;
সত্য সত্য সহস্রগুণ সত্য জীবের দুখ!
সত্য দুখের আগুনে বন্ধু পরাণ যখন জ্বলে,
তোমার হাতের সুখ-দুখ-দান ফিরায়ে দিলেও চলে।

মেকির ওপর ছিল তাঁর অসম্ভব ক্রোধ। যেখানে শুধু বাইরের আড়ম্বর, চটক—প্রধান হয়ে উঠেছে যতীন্দ্রনাথ তখনই তার ওপর তীব্র কাব্য কশাঘাত হেনেছেন। তাঁর কাব্যে গীতিপ্রবণতারও অভাব নেই। সঙ্গে সঙ্গে মানব জীবনাস্থকৃতি অত্যন্ত সুন্দর ও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সংযত ছন্দোবন্ধন তাঁর কবিতাগুলিকে বিশিষ্টতা দান করেছে। ভাবুক কবি কুমুদরঞ্জনের কবিতায় বাঙালী জীবনের রসতৃষ্ণার মধুরও সার্থক রূপালেখ্য মূর্ত হয়ে উঠেছে। কবিতা সংখ্যায় বেশি না হলেও কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায় এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও প্যারীমোহন সেনগুপ্ত এই ধারার বিশেষ উল্লেখযোগ্য কবি। কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষ এবং নরেন্দ্র দেব ওমরখৈয়ামের রুবাইয়াতের অনুবাদ করেন। রাধারাণী দেবীর কবিতায় রবীন্দ্রপ্রভাব থাকা সত্ত্বেও মৌলিকতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। রাধারাণী দেবী শরৎচন্দ্রের অসমাপ্ত 'শেষের পরিচয়' উপন্যাসখানির শেষ অংশ নিজে লিখে সমাপ্ত করেন।

রবীন্দ্র-প্রভাবিত কাব্যধারার সঙ্গে সঙ্গেই আরও একটি কাব্যধারা বাঙ্‌লা সাহিত্যে দেখা দিল। রসবোধে ও সংস্কারে এই নতুন কাব্যধারার কবিরা বাঙ্‌লা কাব্য সাহিত্যে একটি পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেন। পূর্বোল্লিখিত মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথের মধ্যেও এই নতুন সুর শোনা যায়। এই যে পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টা এটা আকস্মিক কোনো একটা ঘটনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমাদের সমাজে যে ভাঙন দেখা দেয়—তারই ভেতর দিয়ে সমাজ-জীবনের ক্ষয়ে-আসা দিকটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের পরে যাঁরা কাব্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন তাঁদের চোখের সামনের এই ভাঙনের রূপ সুস্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। 'সোনার খাঁচায়' 'নানা রঙের দিনগুলি' যেন আর রইল না। বিংশ শতাব্দীর উপন্যাস ও ছোট গল্পেও এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। কাব্যে যে পরিবর্তন দেখা দিল তা শুধু ভাবে নয়, ভাবপ্রকাশের ভঙ্গিতে, ছন্দে—সর্বত্রই একটা বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন এসে পড়ল। এই পরিবর্তনের ধারাকে রবীন্দ্রনাথও মনে প্রাণে অনুভব করেছিলেন।

রবীন্দ্র-পরবর্তীকালের এই কাব্যধারায় যেমন আমাদের সমাজের অস্থির দিক বেশ কিছুটা দোলা লাগিয়েছিল তেমনই পাশ্চাত্যের হুইটম্যান, হপ্‌কিন্স্, এলিয়ট, অডেন প্রভৃতির কবিতাও অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল। অডেনের কথায়—

All the poet can do to-day is to warn,
That is why the true poet must be truthful.

আমাদের আধুনিক কবিরাও 'true poet' হিসাবে truthful হতে চেষ্টা করেছেন। হয়ত এই প্রচেষ্টায় অনেকে সফল হতে পারেন নি। কেউ কেউ সত্য বলতে বিকৃত ভাষণকেই মুখ্য করে তুলেছেন—কেউ বা অনেক সত্য কথা বলতে গিয়ে মূল সত্যকে এড়িয়ে গেছেন। তবুও এঁদের কবিতায় ভাঙনের রূপ ও আশার সুর প্রকাশ পায়নি এমন কথা বলা যায় না। বরং অনেক কবি সমাজ-সচেতন হয়ে উঠেছেন, তাঁরা যুগধর্মকে এড়িয়ে যাননি।

এই যুগের কবিদের মধ্যে কবি নজরুল ইসলাম, জীবনানন্দ দাশ, অমিয় চক্রবর্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, অরুণ মিত্র, বিষ্ণু দে, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য (কলেজ বয়), সমর সেন, বিমল ঘোষ, দীনেশ দাশ, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্র যুগে সবচেয়ে প্রতিভাশালী ও শক্তিশালী কবি হচ্ছেন কাজি নজরুল ইসলাম। বাঙ্‌লার নবীন কবি ও ভাবুকদের প্রচণ্ডতার মূর্তিমান অগ্রদূত তিনি। তাঁর কাব্যে এক দিকে ব্যথিতের বেদন, অন্যদিকে নিপীড়িত লাঞ্ছিতের বজ্রনাদ শোনা যায়। নতুনের আগমনী গানও তিনি গেয়েছেন। দারিদ্র্যের দুঃসহ জ্বালা তাঁকে বারবার আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করে তুলেছে। তবুও তারই কাঁটার ওপর বসে তিনি বলেন—

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর?—প্রলয় নূতন সৃজন-বেদন
আসছে নবীন জীবন-হারা অ-সুন্দরে করতে ছেদন!

অথবা

মহা-বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত—
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ-কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না—

অত্যাচারিতের প্রতিনিধিস্বরূপ তিনি 'ভাঙার গান', 'সর্বহারা' 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী' প্রভৃতি রচনা করেছেন। 'ধূমকেতু'র সম্পাদক হিসাবে তিনি

বলেছিলেন, 'দেশের যারা শত্রু, দেশের যা-কিছু মিথ্যা, ভণ্ডামী, মেকী তা সব দূর করতে 'ধূমকেতু' হবে আগুনের সম্মার্জনী।' এই পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, 'হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোন্‌খানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য।' এই মহৎ উদ্দেশ্য অনুভব করেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ধূমকেতুকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন—

আয় চলে আয়রে ধূমকেতু,
　　আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
　　উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা
জাগিয়ে দেরে চমক মেরে
　　আছে যারা অর্ধচেতন।

কবি ছিলেন সাম্প্রদায়িকতার অনেক ঊর্ধ্বে। হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও হানাহানিকে তিনি তীব্র ঘৃণাভরে দেখেছেন। এরই বিরুদ্ধে তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন—

হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোনজন?
কাণ্ডারী! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র।

কবি পুরাতনে অবিশ্বাসী। তাঁর একান্ত কামনা, এই পৃথিবীর অন্যায় আবর্জনা সব ধুয়ে মুছে যাক, আর সেখানে দেখা দিক নতুন মানুষ, নতুন সমাজ। রবীন্দ্রনাথে যে অনাগতের আকাঙ্ক্ষা, নজরুলে তারই বহ্নি। নজরুল কবিতা ছাড়া উপন্যাস এবং অসংখ্য গান রচনা করেছিলেন। তাঁর গানগুলি বাঙ্‌লা সঙ্গীত সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। ছন্দের দিক তাঁর রচিত অনেক গানের রাগিনী ও সুর তাঁর না থাকাতে তিনি এখন তার রচয়িতা বলে দাবি করতে পারেন না। তাঁর গানে একদিকে দেশাত্মবোধ, অপরদিকে মধুর রোমান্টিক উচ্ছ্বাস লক্ষিত হয়। বিদ্রোহী কবি নজরুল তাঁর কবিতা ও গানের জন্য বাঙালীর কাছে যে সমাদর পেয়েছিলেন এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারও ভাগ্যে তেমন সমাদর লাভের সুযোগ ঘটেনি। তাঁর 'বিদ্রোহী', 'প্রলয়োল্লাস', 'কামাল পাশা',

'কোরবাণী', 'মহর্‌রম', 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' প্রভৃতি কবিতা বাঙালীর কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। একদিকে 'দুর্গমগিরি কান্তার মরু', 'ঊর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল', 'জাতের নামে বজ্জাতি সব', 'কারার ঐ লৌহকপাট' প্রভৃতি গান অন্যদিকে 'মোর ঘুম ঘোরে এলে মনোহর', 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল', 'তুমি ত বধূ জান কাঁদিছে কেন আঁখি', 'ফুলকরবী ঘোমটা খোলো' প্রভৃতি গান বাঙ্‌লা গানের ধারায় উজ্জল স্বাক্ষর রেখে গেছে। কবি যে দুঃখ, দারিদ্র্যকে নিজের জীবন দিয়ে অনুভব করেছিলেন কবিতাতেও তাঁর সেই অনুভূতির নগ্ন প্রকাশ ঘটেছে। শ্রদ্ধেয় ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মতে, 'কবি নজরুল ইসলাম বাঙ্‌লার তথা সমগ্র নব-ভারতের আশা প্রদানকারী কবি। তিনি অনাগত কালের কবি।' আমাদের দুর্ভাগ্যবশত আজ কবির কণ্ঠ রুদ্ধ। অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী আর হয়ত বাজবে না।

এ যুগের কাব্যধারায় দুর্বোধ্যতা এবং অন্তর্মুখিনতা, সরলতা ও সহজতার জায়গা দখল করে বসল। ফলে অস্পষ্টতা যেন সাম্প্রতিককালের কাব্যধারার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সমগ্র পৃথিবীময় যে একটি কাল-বদলের ঝড় উঠেছিল—সেই ঝড় আমাদের চিত্তভূমিকেও প্রাচীন জীর্ণ পুঁথি আঁকড়ে থাকতে দেয়নি। অতুল তৃষ্ণা নিয়ে নবজীবনের পথে আমাদের বেরিয়ে পড়তে হ'ল। এই তৃষ্ণাকে সুস্পষ্ট করে তুলল পাশ্চাত্ত্য জীবনদর্শন ও সাহিত্য। আধুনিক বাঙ্‌লা কবিতাও তাই অনেক পরিমাণে ইংরেজি কবিতা দ্বারা প্রভাবান্বিত। বাস্তবনিষ্ঠা কোনো কোনো কবির রচনায় প্রকাশ পেলেও বেশির ভাগ কবির রচনায় রোমান্টিক মনোভাবের পরিচয়ই পাওয়া যায়।

'বনলতা সেন', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রভৃতির লেখক জীবনানন্দ দাশ এই রোমান্টিক প্রভাব মুক্ত নন, বরং অতিমাত্রায় জড়িত। কবি যখন বলেন—

> সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
> সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
> পৃথিবীর সব রঙ্‌ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
> তখন গল্পের তরে জোনাকীর রঙে ঝিলমিল;
> সব পাখী ঘরে আসে—সব নদী-ফুরায় এ জীবনের সব লেন দেন;
> থাকে শুধু অন্ধকার,—মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।—

তখন তাঁর ভাবোচ্ছ্বাস একটি স্বপ্নলোক সৃষ্টি করে তোলে।

বলেছিলেন, 'দেশের যারা শত্রু, দেশের যা-কিছু মিথ্যা, ভণ্ডামী, মেকী তা সব দূর করতে 'ধূমকেতু' হবে আগুনের সম্মার্জনী।' এই পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, 'হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় বা ফাঁকি কোন্‌খানে তা দেখিয়ে দিয়ে এর গলদ দূর করা এর অন্যতম উদ্দেশ্য।' এই মহৎ উদ্দেশ্য অনুভব করেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ধূমকেতুকে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন—

আয় চলে আয়রে ধূমকেতু,
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা
জাগিয়ে দেরে ডঙ্কা মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন।

কবি ছিলেন সাম্প্রদায়িকতার অনেক উর্ধ্বে। হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও হানাহানিকে তিনি তীব্র ঘৃণাভরে দেখেছেন। এরই বিরুদ্ধে তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন—

হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোনজন?
কাণ্ডারী! বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোরা মার।

কবি পুরাতনে অবিশ্বাসী। তাঁর একান্ত কামনা, এই পৃথিবীর অন্যায় আবর্জনা সব ধুয়ে মুছে যাক, আর সেখানে দেখা দিক নতুন মানুষ, নতুন সমাজ। রবীন্দ্রনাথে যে অনাগতের অভ্যর্থনা, নজরুলে তারই বরণ। নজরুল কবিতা ছাড়া উপন্যাস এবং অসংখ্য গানও রচনা করেছিলেন। তাঁর গানগুলি বাঙ্‌লা সঙ্গীত সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। দুঃখের বিষয় তাঁর রচিত অনেক গানের মালিকানা স্বত্ব তাঁর না থাকাতে তিনি এখন তার রচয়িতা বলে দাবিও করতে পারেন না। তাঁর গানে একদিকে দেশাত্মবোধ, অপরদিকে মধুর রোমান্টিক উচ্ছ্বাস লক্ষিত হয়। বিদ্রোহী কবি নজরুল তাঁর কবিতা ও গানের জন্য বাঙালীর কাছে যে সমাদর পেয়েছিলেন এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারও ভাগ্যে তেমন সমাদর লাভের সুযোগ ঘটেনি। তাঁর 'বিদ্রোহী', 'প্রলয়োল্লাস', 'কামাল পাশা',

'কোরবাণী', 'মহর্‌রম', 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' প্রভৃতি কবিতা বাঙালীর কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। একদিকে 'দুর্গমগিরি কান্তার মরু', 'ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল', 'জাতের নামে বজ্জাতি সব', 'কারার ঐ লৌহকপাট' প্রভৃতি গান অন্যদিকে 'মোর ঘুম ঘোরে এলে মনোহর', 'বাগিচায় বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিসনে আজি দোল', 'তুমি ত বধূ জান কাঁদিছে কেন আঁখি', 'ফুলকরবী ঘোমটা খোলো' প্রভৃতি গান বাঙ্‌লা গানের ধারায় উজ্জল স্বাক্ষর রেখে গেছে। কবি যে দুঃখ, দারিদ্র্যকে নিজের জীবন দিয়ে অনুভব করেছিলেন কবিতাতেও তাঁর সেই অনুভূতির নগ্ন প্রকাশ ঘটেছে। শ্রদ্ধেয় ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মতে, 'কবি নজরুল ইসলাম বাঙ্‌লার তথা সমগ্র নব-ভারতের আশা প্রদানকারী কবি। তিনি অনাগত কালের কবি।' আমাদের দুর্ভাগ্যবশত আজ কবির কণ্ঠ রুদ্ধ। অগ্নিবীণা, বিষের বাঁশী আর হয়ত বাজবে না।

এ যুগের কাব্যধারায় দুর্বোধতা এবং অন্তর্মুখিনতা, সরলতা ও সরসতার জায়গা দখল করে বসল। ফলে অস্পষ্টতা যেন সম্প্রতিকালের কাব্যধারার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সমগ্র পৃথিবীময় যে একটি কাল-বদলের ঝড় উঠেছিল—সেই বড় আমাদের চিত্তভূমিকেও প্রাচীন জীর্ণ খুঁটি আঁকড়ে থাকতে দেয়নি। অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিয়ে নবজীবনের পথে আমাদের বেরিয়ে পড়তে হ'ল। এই তৃষ্ণাকে সুস্পষ্ট করে তুলল পাশ্চাত্য জীবনদর্শন ও সাহিত্য। আধুনিক বাঙ্‌লা কবিতাও তাই অনেক পরিমাণে ইংরেজি কবিতা দ্বারা প্রভাবান্বিত। বাস্তবনিষ্ঠা কোনো কোনো কবির রচনায় প্রকাশ পেলেও বেশির ভাগ কবির রচনায় রোমান্‌টিক মনোভাবের পরিচয়ই পাওয়া যায়।

'বনলতা সেন', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রভৃতির লেখক জীবনানন্দ দাশ এই রোমান্‌টিক প্রভাব মুক্ত নন, বরং অতিমাত্রায় জড়িত। কবি যখন বলেন—

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে ; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল ;
পৃথিবীর সব রঙ্‌ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকীর রঙে ঝিলমিল ;
সব পাখী ঘরে আসে—সব নদী-ফুরায় এ জীবনের সব লেন দেন ;
থাকে শুধু অন্ধকার,—মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।—

তখন তাঁর ভাবোচ্ছ্বাস একটি স্বপ্নলোক সৃষ্টি করে তোলে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যে যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর সামাজিক জীবনের নানা জিজ্ঞাসা জেগে উঠেছে। তিনি নিঃসন্দিগ্ধভাবে জেনেছেন যে, আজকের দিনের কবিকে তীব্র ও স্পষ্ট কণ্ঠে জীবনের জয়গান গাইতে হবে। তাই যুগচিত্ত যুগধর্মকে অস্বীকার তিনিও করেননি। কবি বলেন—

অজেয় জগতে
নিজস্ব নরক মোর বাঁধ ভেঙে ছড়ায়েছে আজ ;
মানুষের মর্মে মর্মে করিছে বিরাজ
সংক্রমিত মড়কের কীট ;
শুকায়েছে কালস্রোত, কর্দমে মিলে না পাদপীঠ।
অতএব পরিত্রাণ নাই।

সুধীন্দ্রনাথের কাব্য-ভাবুকতা কিছুটা আত্মকেন্দ্রিকও বটে।

প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ও রোমান্টিক ধারার কবি। তাঁর কবিতায় রবীন্দ্র-প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষিত হয়। সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব, বিষ্ণু দের কবিতার সঙ্গে তাঁর কবিতার অমিলই বেশি। রস-তন্ময়তা তাঁর কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'হে পদ্মা' কবিতায় তিনি বলেন—

ধূমাঙ্কিত পল্লীপথে ঘণ্টা গোধূলীর
তালে তালে দাঁড় ফেলা ক্বচিৎ তরীর।
হঠাৎ শ্রবণে পশে কুলায়-অধীর
ধ্বনি বলাকার!
বালুস্তূপে মগ্ন দীর্ঘ মাস্তলের শিরে
দেখিনু জ্বলিছে দীপ্তি আসন্ন তিমিরে
সন্ধ্যা তারকার।
হে পদ্মা তোমার!

এখানে কবির ভাব-বিভোরতা অতি সুস্পষ্ট।

প্রেমেন্দ্র মিত্র এ যুগের একজন ক্ষমতাশালী কবি। তিনি শ্রেণীদ্বন্দ্ব, মানুষের জীবনের দুঃসহ দুর্যোগ ও তার অপমান সবই প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর কবিতায়ও এই বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়। অতি দীনতম মানুষের দুঃখেও কবির মন ব্যথিত হয়ে ওঠে। তাঁর 'প্রথমা' কাব্যের কবিতাগুলিতে দুঃখ নিপীড়িত মানবের প্রতি যথার্থ সহানুভূতিশীল এবং প্রতিকারে সচেষ্ট

বিদ্রোহী প্রেমেন্দ্র মিত্রের পরিচয় পাই। 'আমি কবি' কবিতায় তিনি বলেন—

আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর ছুতোরের,
মুটে মজুরের
—আমি কবি যত ইতরের!

আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের ;
বিলাস বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই
সময় যে হায় নাই!

'দেবতার জন্ম হল' কবিতায় নিপীড়িত লাঞ্ছিত মানুষের দুঃখে কবি গেয়ে ওঠেন—

আজ
বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে বন্দী মোর ভগবান কাঁদে
কাঁদে কোটি মার কোলে অন্নহীন ভগবান মোর ;

অচিন্ত্যকুমার ও বুদ্ধদেব বসুর কবিতার মধ্যে রোমান্টিক ধর্মই মুখ্য হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে যুগের হাওয়া যে তাদের মনকে দোলা দেয় নি তা নয়। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা এই যে, এঁরা ভাবুক কবি—তাই তাঁরা বর্তমানের আঙিনায় বসে উনবিংশ শতাব্দীর কবির স্বরটি বাজিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। 'কুসুমের মাসের' কবি অজিত দত্তও এই রোমান্টিক ধারার কবি। 'রাঙা সন্ধ্যা' কবিতায় কবি বলেন—

রাঙা সন্ধ্যার স্তব্ধ আকাশ কাঁপায়ে পাখার ঘায়
ডানা মেলে দূরে উড়ে' চ'লে যায় দু'টি কম্পিত কথা,
রাঙা সন্ধ্যার বহ্নির পানে দু'টি কথা উড়ে যায়।

বুদ্ধদেব বসুও স্বপ্নবিভোর কণ্ঠে বলেন—

জানালায় নীল আকাশ ঘরে
সারা দিনরাত ঢেউয়ের দোলা
সমুদ্র-জোড়া দিগন্ত থেকে দিগন্তরে
সারা দিনরাত জানালা খোলা।
দস্যু হাওয়ায় উচ্চ স্বরে
তপ্ত ঢেউয়ের মত্ত জোয়ার-জরে
কী যে তোলপাড় দাপাদাপি ঐ ছোট্ট ঘরে মনে কি পড়ে
সুরঙ্গমা ?

দুর্নিবারবেগে এই যুগের সাহিত্য। অক্ষয়কুমার মৈত্রের 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাসিম', সখারামের 'বাজীরাও', 'দেশের কথা' প্রভৃতি রচনার জোয়ার দিয়ে, ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর' প্রভৃতি নানা সংবাদপত্রের মাধ্যমে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'আমার বাংলা' প্রভৃতি রচনায় জনমনের দুর্গতিকে তাড়িয়ে আত্মশক্তি দিয়েছে। এঁরা কেউ দুর্বলকে স্বীকার করেননি। এছাড়া 'আনন্দমঠ' 'স্বদেশীর দুঃখ' ত ছিলই। স্বদেশী আন্দোলনের জন্যে এই চেতনা, এই উৎসাহ-উদ্দীপনা বাঙালীর একান্ত প্রয়োজন ছিল। বঙ্কিমের পুঞ্জীভূত দুঃখের মধ্যে যে মানব মন আপনার শক্তিবুদ্ধিকে হারিয়ে ফেলেছিল তাদের আবার দুঃখে ও আঘাতে যে মানুষের জাগল দুখ। নতুন এল দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ বলি দেবার, দেশের মুক্তিকামী দিকে নতুন কাহিনী শোনাবে। বাংলা বাঙালী তখন বুঝতে পেরেছে 'জিজ্ঞাসে প্রাণ যে করিতে পারে, তার নাই আর ভয় নাই।' কিন্তু এতাবৎ আমাদের দুঃখ বা সমাজের একটা বিরাট দুর্বলতার দিক ছিল, সে হচ্ছে সামাজিক বন্ধন, পারিবারিক সংকীর্ণ জীবনের জটিলতা।

তাই এল আবার পুনর্বিচারের কাল। বঙ্কিম, রমেশচন্দ্রের মানুষকে দিতে হবে তার উপযুক্ত মর্যাদা। মানব ইতিহাসে মানুষের উজ্জ্বল স্বাক্ষর থাকবে। জীর্ণ সংস্কারের ভেঙে-পড়া সমাজের দুখ দুঃখের ইতিকথা জানাতে হবে। তার আমূল সংস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু এই মানুষকে জানার, তার দুখ দুঃখ অনুভব করার দরদী বন্ধু কই।

এই যুগের এই দুঃখ পরিত্রাণের মধ্যে আবির্ভাব ঘটল শরৎচন্দ্রের।

শরৎ-চেতনা

বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব একটি বিস্ময়কর অথচ স্বাভাবিক ব্যাপার। বাংলা উপন্যাসক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের দান চিরস্মরণীয়। বঙ্কিম থেকে যে উপন্যাসের শুরু, রবীন্দ্রনাথে তার আধুনিক উৎকর্ষ, আর শরৎচন্দ্রে এসে তার সার্থক প্রকাশ। তাঁর আগের লেখকদের বিষয়বস্তু এবং তার প্রকাশের কলাকৌশলের জন্য তার বিশেষ-কিছুই জানতে হয়নি। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র—উপন্যাস ক্ষেত্রে তিনটি ধারার প্রতীক স্বরূপ। বঙ্কিম মানুষের উদার-মহত্ত্বকে লক্ষ্য করে একটি নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী

'নক্সী কাঁথার মাঠ', 'রাখালী' প্রভৃতি বাঙ্‌লার অমূল্য সম্পদ। এইগুলি বাঙ্‌লার লোক-সাহিত্য ধারার কাব্য। রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগে কাব্যে যে আধুনিকতা, যে পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল এঁরা তা থেকে দূরে থেকে পল্লী প্রকৃতির মধুর রূপটি আমাদের সামনে তুলে ধরতে প্রয়াস পেয়েছেন। এঁরা রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত নন, তবে বাঁশীটি বাজিয়েছেন মেঠো সুরে। কবি কুমুদরঞ্জনের কাব্যেও এই সুরটি মাঝে মাঝে ধরা পড়েছে।

আধুনিক কালের কাব্য অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এখন যে কাব্য-ধারা প্রবাহিত হচ্ছে তার সম্বন্ধে ফল কথা বলার এখনও সময় আসেনি। বর্তমান কালের কাব্যধারায় কোনো বিশেষ একজনের বৈশিষ্ট্য আলোচনার চেয়ে আধুনিক কবিদের সমগ্র কাব্যধারার আলোচনা করা প্রয়োজন। এঁদের এক একজনের মধ্যে এক একরকম বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। এই সব-কিছুর সমবায়ে আধুনিক কাব্যধারায় একটি বিশেষত্ব প্রকাশ পেয়েছে। এঁরা বুঝতে পেরেছেন, আজ আর বিদগ্ধজনের মনোরঞ্জনার্থ সাহিত্য সৃষ্টি করলে চলবে না ; পৃথিবীর নানা পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে আর্টেরও পরিবর্তন ঘটবে। বিগত ও আগতের সন্ধিক্ষণের কাব্যধারা আর যেন মোলায়েম সুরে বেজে উঠতে চায় না ; আর্থনীতিক, সামাজিক নানা দুর্যোগের মধ্যে আধুনিক কবিতার রূপও তাই স্বপ্নমেদুর হয়ে উঠতে পারেনি।

বিভিন্ন গদ্যসাহিত্য রচয়িতাগণ

এ সময়ের সার্থক গদ্য-সাহিত্য রচয়িতার মধ্যে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি। তিনি ছাড়া এযুগে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, উমেশচন্দ্র বটব্যাল, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সখারাম গনেশ দেউস্কর, নিখিলনাথ রায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এবং পরের দিকে প্রমথনাথ চৌধুরী, শরৎ চট্টোপাধ্যায়, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতির নাম বিশেভাবে উল্লেখযোগ্য। এই যুগে স্বাধীনতাকামী বাঙালীর আর শুধু দেশাত্ববোধ বা জাতি-প্রীতির উচ্ছ্বাস অনুভূতি নয়, একটি ভাবি বিপ্লবেরও আভাস পাচ্ছি। অনেকে দেশোদ্ধার কল্পে নিজের জীবন তুচ্ছ করে ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত হয়েছেন।

অন্যদিকে জাতীয় সংহতি গড়ে তোলার জন্য সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম রাজনীতি প্রভৃতির অনুশীলনও আরম্ভ হয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনে বিপ্লবী মনের রসদ

জুগিয়েছে এই যুগের সাহিত্য। অক্ষয়কুমার মৈত্রের 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাশিম', দেউস্করের 'বাজীরাও', 'দেশের কথা' প্রভৃতি রচনার ভেতর দিয়ে, ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর' প্রভৃতি নানা সংবাদপত্রের মাধ্যমে নিখিলনাথ রায়ের 'সোনার বাঙ্‌লা' প্রভৃতি রচনায় তখনকার যুগচিত্তের চাহিদা অনেকখানি মিটেছে। এঁরা কেউ যুগধর্মকে অস্বীকার করেননি। এছাড়া 'আনন্দ মঠ' 'পলাশীর যুদ্ধ' ত ছিলই। স্বদেশী আন্দোলনের শুরুতে এই প্রেরণা, এই উৎসাহ-উদ্দীপনা বাঙালীর একান্ত প্রয়োজন ছিল। বহুদিনের পুঞ্জীভূত দুঃখের মাঝে যে মানব মন আপনার পরিচয়টুকুও হারিয়ে ফেলেছিল আবার অনেক দুঃখে ও আঘাতে সে মানুষের ভাঙল ঘুম। সময় এল দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ বলি দেবার, দেশের যুবশক্তি ঝাঁপিয়ে পড়ল স্বাধীনতা সংগ্রামে। কারণ বাঙ্গালী তখন বুঝতে পেরেছে 'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।' কিন্তু এছাড়াও আমাদের ঘুণে ধরা সমাজের একটি বিরাট দুর্বলতার দিক ছিল; সে হচ্ছে সামাজিক দলাদলি, পারিবারিক সমষ্টিগত জীবনের অনৈক্য।

তাই এল আবার পুনর্গঠনের কাল। বঞ্চিত, অবহেলিত মানুষকে দিতে হবে তার উপযুক্ত মর্যাদা। মানব ইতিহাসে মানুষের উজ্জ্বল স্বাক্ষর থাকবে। জীর্ণ সংস্কারাচ্ছন্ন ভেঙে-পড়া সমাজের সুখ দুঃখের ইতিকথা শুনাতে হবে। তার আমূল সংস্কারের ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু এই মানুষকে জানার, তার সুখ দুঃখ অনুভব করার দরদী বন্ধু কই!

এই যুগের এই দ্বন্দ্ব পরিবেশের মাঝে আবির্ভাব ঘটল শরৎচন্দ্রের।

শরৎচন্দ্র

বাঙ্‌লা সাহিত্যক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব একটি বিস্ময়কর অথচ প্রত্যাশিত ব্যাপার। বাঙ্‌লা উপন্যাসক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের দান চিরস্মরণীয়। বঙ্কিম থেকে যে উপন্যাসের শুরু, রবীন্দ্রনাথে তার আরও উৎকর্ষ, আর শরৎচন্দ্রে এসে তার সার্থক প্রকাশ। তাঁর পরের লেখকদের বিষয়বস্তু এবং ভাব-প্রকাশের কলাকৌশলের জন্য আর বিশেষ-কিছুই ভাবতে হয়নি। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র—উপন্যাস ক্ষেত্রে তিনটি ধারার প্রতীক স্বরূপ। বঙ্কিম মানুষের উত্থান-পতনকে লক্ষ্য করে একটি নৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী

হয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে সমাজের সর্বোচ্চতলার সংবাদ তিনি আমাদের দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তা থেকে কিছুটা নেমে এসে ধনতান্ত্রিক সমাজের উচ্চ-মধ্যবিত্ত মনের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন। এঁরা একেবারে সমাজ-নিরপেক্ষ নন। তাঁদের যুগে তাঁদের চোখে সামাজিক জীবন যেভাবে ধরা দিয়েছে তারই স্বরূপ প্রকাশ এবং সে জীবনের সমস্যার সমাধানের একটি ইঙ্গিত তাঁদের রচনায় আছে। বঙ্কিমে রোমান্সের আতিশয্য লক্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ত নিজেই বলেন তিনি জন্ম-রোমান্টিক। কিন্তু তিনিও নরনারী জীবনের হাসিকান্নার, সুখ দুঃখের সংবাদ উপন্যাসের মাধ্যমে পরিবেশন করেছেন। বাস্তবকে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেন নি।

শরৎচন্দ্রে আমরা মধ্যবিত্ত ও বিত্তহীন সাধারণ মানুষের জীবনবেদ রচনার প্রয়াস লক্ষ্য করি। রবীন্দ্রনাথে বাস্তবের যে স্বীকৃতি রয়েছে, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে তাই প্রধান উপজীব্য হয়ে দেখা দিয়েছে। বাঙ্‌লার যে সমাজ কেবল পুরানো সংস্কারের জীর্ণ খুঁটি আঁকড়ে ধুঁকছিল শরৎচন্দ্র তার দুর্বল রূপটি আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। সমাজের এই বাস্তব দিকটাকে তিনি সততার সঙ্গে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেন। তথাকথিত সামাজিক নীতি ও আদর্শ যে মানব জীবনের অগ্রগতির পরিপন্থী তা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। জীবনে যা অপ্রকাশিত থেকে যায়, যা কেবল অনুভূতির রসেই রসায়িত শরৎচন্দ্র তাকে এমন সহজ ও অনাড়ম্বরভাবে প্রকাশ করেছেন যে পাঠকের মনে তা গভীর রেখাপাত করে। পাতিত্যের প্রতি সহানুভূতি তাঁর প্রায় প্রতিটি উপন্যাসেই লক্ষিত হয়। শরৎচন্দ্রের বেশির ভাগ উপন্যাসে একটি ট্রাজেডির সুর ধ্বনিত হয়েছে, এই ট্রাজেডি মুখ্যত মানবজীবনের ব্যর্থতার ট্রাজেডি। নির্মম সমাজ ও তার কুসংস্কার কি ভাবে আমাদের সামাজিক জীবনকে—হৃদয়ের সহজ আবেগকে পিষ্ট করছিল তাঁর উপন্যাসে তারই ছবি প্রকাশ পেয়েছে। শরৎচন্দ্র এখানে কিন্তু সংস্কারক হিসাবে দেখা দেননি—দক্ষ শিল্পী বা রূপকার হিসাবেই আত্মপ্রকাশ করেছেন।

আমাদের পারিবারিক অনৈক্য, সমাজের নানা অনাচার অবিচার সার্থক মনুষ্যত্ব প্রকাশের পথে বাধাস্বরূপ ছিল, শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে সেই দ্বন্দ্ব-সংঘাতকে রূপায়িত করতে যথার্থ চেষ্টা করেছেন। এই প্রতিকূল অবস্থা

কাটিয়ে উঠতে পারলে জীবন যে কতো মধুময় হয়ে ওঠে তারও আলেখ্য তাঁর উপন্যাসে রয়েছে। এর জন্য তিনি বিমাতা, জ্যেঠিমা, বৈমাত্রেয় ভাই, কাকীমা, প্রভৃতি চরিত্র সৃষ্টি একটি বিপরীতমুখী স্নেহের সম্পর্ক তাঁর গল্প উপন্যাসে গড়ে তুলেছেন। গল্প বলার সহজ ভঙ্গি শরৎচন্দ্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিশেষ করে প্রসাদগুণমণ্ডিত ভাষায় গল্পের এই সহজ প্রকাশ আমাদের মনকে বেশ অভিভূত করে।

বাঙ্‌লা চরিত্র সাহিত্যে সৃষ্টির দিক থেকে শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। বিশেষ করে শরৎসাহিত্যে নারীচরিত্রগুলি একটি প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। নারীচরিত্র সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র সশ্রদ্ধ মনোভাব পোষণ করতেন। বাঙ্‌লাদেশের পথে ঘাটে যে মা বোন তাদের অবহেলার মনোবৃত্তি বা সাধ্য তাঁর ছিল না। তিনি জানতেন নারীর বিরাট হৃদয় শুধু স্নেহ আর ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। নারী চিরদিন ক্ষমাশীলা। অসহ্য দুঃখের দুঃসহ দাহনেও তার মুখের হাসি অম্লান দীপশিখার অনির্বাণ আলোর মতো চির-উজ্জ্বল থাকে। শরৎসাহিত্যে এই নারী নানাভাবে দেখা দিয়েছে। 'পল্লী সমাজের' বিশ্বেশ্বরী জেঠাইমা, 'বিন্দুর ছেলের' বিন্দু, 'রামের সুমতির' নারায়ণী, 'নিষ্কৃতির' জেঠাইমা, 'চরিত্রহীনের' সাবিত্রী, কিরণময়ী, 'দেবদাসের' চন্দ্রমুখী, 'বিরাজবৌ'র বিরাজ, 'দেনাপাওনার' ষোড়শী, 'গৃহদাহের' মৃণাল, 'শ্রীকান্তের' রাজলক্ষ্মী, অভয়া, কমললতা, 'দত্তার' বিজয়া, 'মেজদিদির' হেমাঙ্গিনী, 'বড়দিদি'র মাধবী—এঁরা ত আছেনই, আর আছেন 'শ্রীকান্তের' অন্নদাদিদি এবং 'শেষপ্রশ্নের' কমল। মুখ বুজে সয়ে যাবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কমলেই স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছিল। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত দ্বিধাগ্রস্ত, বিভ্রান্ত, অচলা চরিত্রটি তার স্ববিরোধিতার জন্য আমাদের বিস্মিত করে। 'পণ্ডিত মশাই'র কুসুম চরিত্রটিও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের জন্য জটিল হয়ে উঠেছে। উল্লিখিত চরিত্রগুলি ত আছেই তা ছাড়া ভালো-মন্দ-মাঝারী চেহারার রাসবিহারী, বেণী ঘোষাল, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, এককড়ি, সুরেশ, মাসি, সতীশ, বৃন্দাবন প্রভৃতি চরিত্রগুলি বাঙালীর চিরদিন মনে থাকবে। ইন্দ্রনাথ চরিত্রটি শরৎচন্দ্রের অসামান্য প্রতিভার পরিচায়ক। বাঙ্‌লা সাহিত্যে এই ধরণের চরিত্র আর গড়ে ওঠেনি বললে সত্যের অপলাপ করা হয় না। তাঁর উপন্যাসের পিতা বা পিতৃস্থানীয়দের স্নেহপ্রবণতা এবং ভৃত্যচরিত্রগুলির মধ্যে বিশেষ করে বিহারী ও রতন বাঙ্‌লা সাহিত্যের মর্যাদা

বৃদ্ধি করেছে। মানুষের মনের খবর, সমাজের কুশ্রীতার, কুটিলতার স্বরূপ এমন সহজ সরল ও স্পষ্টভাবে তাঁর আগে আর কেউ প্রকাশ করতে পারেননি। মানুষের হৃদয়ের কথা তিনি সাহিত্যে প্রকাশ করেছেন আপন মর্মানুভূতি দিয়ে। বামুনের মেয়ে, অরক্ষণীয়া, পল্লীসমাজ প্রভৃতির বক্তব্যের মধ্যে কোনো নাগরিক বৈদগ্ধ নেই ; যে পরিবেশ থেকে এই উপন্যাসগুলির রসদ যোগাড় করেছেন—তাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে হলে কৃত্রিমতার আবরণে চলেনা। শরৎচন্দ্রের মধ্যে এই কৃত্রিমতা ছিল না। তাঁর দত্তা, পল্লীসমাজ, দেবদাস, চরিত্রহীন, পথের দাবী, কাশীনাথ, চন্দ্রনাথ বিন্দুরছেলে, বড়দিদি, পণ্ডিতমশাই, বামুনের মেয়ে, বিরাজবৌ, দেনা পাওনা, শ্রীকান্ত, শুভদা, শেষপ্রশ্ন, বিপ্রদাস প্রভৃতি এখনও বাঙালী চিত্তের রস পিপাসা মিটিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে 'শ্রীকান্ত' অবিসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। একটি মানুষের বাল্যজীবন থেকে প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত নানা অভিজ্ঞতার দিনপঞ্জীই তাকে বলা যেতে পারে। শিক্ষার প্রখরতা, সূক্ষ্মতা যতোই থাক না কেন মানুষের হৃদয়বৃত্তি যে সবার ওপরে বিজয়া, বন্দনা প্রভৃতি চরিত্রের ভেতর শরৎচন্দ্র তা দেখাতে চেয়েছেন। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা সহজভাবে গ্রহণ করতে না পারলে দুর্বল চিত্তের উপর তার কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে অচলা চরিত্রে তার আভাস রয়েছে; আর কল্যাণময়ী নারীর রূপ প্রকাশ পেয়েছে অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্মী, কমললতা, বিরাজ, বিশ্বেশ্বরী প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে পুরুষচরিত্র অপেক্ষা নারী চরিত্রগুলিই সাধারণত সজীব ; বাঙ্‌লার সমাজের জীর্ণতার স্বরূপ তাঁর চোখে ধরা পড়ে ছিল। তাকে তিনি উপন্যাসেও চিত্রিত করেছেন। কিন্তু কি করে এই দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা যায় তার বিশেষ কোনো উপায় দেখিয়ে দেননি।

উপন্যাস ছাড়া শরৎচন্দ্র কয়েকটি ছোট গল্পও রচনা করেছিলেন। বাঙ্‌লা ছোট গল্পে তাঁর 'মহেশ' গল্পটি কয়েকটি শ্রেষ্ঠ গল্পের মধ্যে অন্যতম বলা যেতে পারে। শরৎচন্দ্র থেকে বাঙ্‌লা উপন্যাস সাহিত্যের যে নতুন ভাব ও ভঙ্গি দেখা দিল পরবর্তী লেখকদের রচনায়ও তার যথেষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়।

এসময় রোমাঞ্চকর রহস্য সিরিজের লেখক দীনেন্দ্রকুমার রায়, জলধর সেন, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতিও গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী লিখেছেন। মণিলাল 'ভারতীর' সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি মহুয়া, পাপড়ি প্রভৃতি উপন্যাস

রচনা করেন। জলধর সেনের ছোট গল্পের চেয়ে 'হিমালয়' প্রভৃতি ভ্রমণ কাহিনীই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শশাঙ্ক, ধর্মপাল প্রভৃতি কয়েকখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন। প্রাচীন পটভূমিকায় ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে একেবারে ব্যর্থ হননি।

শরৎচন্দ্রের সময়ে 'অগ্নি সংস্কার', 'বিপর্যয়', 'পাপের ছাপ' প্রভৃতি উপন্যাসের রচয়িতা নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, 'হেরফের', 'হাইফেন' প্রভৃতি উপন্যাসের রচয়িতা চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, 'অমলা', 'দিকশূল' প্রভৃতির রচয়িতা উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, 'রমলার' লেখক মণীন্দ্রলাল বসু, 'পথিক' রচয়িতা গোকুল নাগ, হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা শুধু উপন্যাস নয়—ছোট গল্পও রচনা করেছেন। এই সঙ্গে অনুরূপা দেবী, ইন্দিরা দেবী, নিরুপমা দেবী প্রভৃতি মহিলা ঔপন্যাসিকদের নামও উল্লেখ করতে হয়। অনুরূপা দেবীর 'পোষ্যপুত্র', 'মা', 'মন্ত্রশক্তি', 'মহানিশা', 'গরীবের মেয়ে' প্রভৃতি উপন্যাস যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। নিরুপমা দেবীর 'অন্নপূর্ণার মন্দির', 'দিদি', 'বিধিলিপি', 'শ্যামলী' প্রভৃতি উপন্যাস বাঙালীর অপরিচিত নয়। পরের দিকের মহিলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, শৈলবালা ঘোষজায়া, সীতাদেবী, শান্তা দেবী, আশালতা সিংহ, আশাপূর্ণা দেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। মহিলা উপন্যাসিকদের অধিকাংশই বাঙালীর গার্হস্থ্য জীবনের, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যজনিত ভেদ ও তার দুঃখময় পরিণাম, নারীত্বের আদর্শ, প্রেমের স্বর্গীয় মহিমা প্রভৃতি নিয়ে উপন্যাস ও ছোট গল্প রচনা করেছেন।

শরৎচন্দ্রের সময়ে যাঁদের কথা উল্লেখ করা হ'ল তাঁরা প্রত্যেকেই সুখ দুঃখময়, ঘাত-প্রতিঘাত জটিল মধ্যবিত্তজীবনের আলেখ্য অঙ্কন করেছেন। এই ধারার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্‌লা উপন্যাস ও ছোট গল্প একটি নতুন পর্যায়ে এসে পড়ল। অবশ্য এ পর্যায়েও রোমান্টিক্ উচ্ছ্বাস যথেষ্ট পরিমাণে লক্ষিত হয়। গোকুল নাগের 'পথিক' উপন্যাসে এই কাব্যময়তা যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান, তাঁর 'পথিক' উপন্যাসখানি এক সময় বঙ্গ-সাহিত্যে যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। উপন্যাসের গল্পটি গতানুগতিকতা-মুক্ত একটি অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেখক উপন্যাসখানি রচনা করেছিলেন। গল্পের ঘটনার জটিলতা শেষ

পর্যন্ত উপন্যাসখানিকে বেশ ঘোরালো করে তুলেছে। কাহিনী প্রতিষ্ঠিত করার নতুন পদ্ধতি প্রয়োগ করা সত্ত্বেও রোমান্‌টিক ভাবোচ্ছ্বাস প্রচুর পরিমাণে লক্ষিত হয়। কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-জীবনকে আরও একটু গভীর ও নিবিড় করে দেখবার ও বুঝবার সহৃদয় চেষ্টাও এযুগে দেখা দেয়। পূর্বের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকখানি বদলে গেল। জীবনকে দেখার চোখের স্বপ্নাবেশ আর রইল না। এঁরা কেউ কেউ 'শহুরে' জীবনের ভালোমন্দ নিয়ে, কেউবা গ্রামীন সমাজ নিয়ে গল্প, উপন্যাস রচনা করেছেন। কেউ কেউ কুলী, মজুর, কৃষকদের জীবনধারা নিয়েও লিখেছেন। যাঁরা বাঙ্‌লার গ্রাম্য-পরিবেশের রূপটি উপন্যাস ও ছোট গল্পে তুলে ধরেছেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' বাঙ্‌লা সাহিত্যের এক বিশেষ সম্পদ। অপু-দুর্গার মতো এ রকম জীবন্ত চরিত্র বাঙ্‌লা উপন্যাসে খুব কমই দেখা যায়। শরৎচন্দ্রের ইন্দ্রনাথের মধ্যে যে উদ্দামতা আছে, অপু ও দুর্গার মধ্যে তা নেই বটে—তবে এরকম জীবন্ত, সরল ও মধুর চরিত্র বাঙ্‌লা সাহিত্যে দুর্লভ। বাঙ্‌লা উপন্যাস সাহিত্যে 'পথের পাঁচালী' এক নতুন অধ্যায় সূচনা করল। বিভূতিভূষণের লেখনীতে প্রকৃতি যেভাবে ধরা দিয়েছে তা এক রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারও রচনায় তেমন সার্থকভাবে ধরা দেয়নি। তাঁর উপন্যাস ও ছোট গল্পের চরিত্রগুলো আমাদের সমাজের বিশেষ করে বাঙ্‌লার গ্রাম্য সমাজের। যারা একান্ত দরিদ্র, বিত্তহীন তাদেরই জীবনের ট্রাজেডির করুণ ভৈরবী সুর তাঁর রচনায় শোনা যায়। এখানে তিনি কবি। রূঢ় বাস্তবকেও বিভূতিভূষণ যেন স্বপ্ন-বিজড়িত দৃষ্টিতে দেখেছেন। তার কারণ বাঙ্‌লার শ্যামল প্রকৃতি তাঁর দৃষ্টিকে এতই বিভোর করেছিল যে এই প্রকৃতির কোলের নিঃস্ব সন্তানের করুণ ক্রন্দন, করুণ সঙ্গীত মাধুর্য লাভ করেছে। পথের পাঁচালী ছাড়া তাঁর অপরাজিত, দৃষ্টিপ্রদীপ, আরণ্যক, আদর্শ হিন্দু হোটেল, বিপিনের সংসার, অনুবর্তন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। মৌরীফুল, মেঘমল্লার, কিন্নরদল প্রভৃতি ছোট গল্পের সংকলনে তাঁর অনেক উৎকৃষ্ট ছোট গল্পের উজ্জ্বল সাক্ষর রয়েছে; বাঙ্‌লা ছোট গল্পে বিভূতিভূষণের 'পুঁইমাচা' গল্পটি কয়েকটি বিখ্যাত গল্পের মধ্যে অন্যতম।

বিভূতিভূষণের সমসাময়িক আর একজন খ্যাতনামা লেখক ছিলেন রবীন্দ্র

নাথ মৈত্র। ইনি ত্রিলোচন কবিরাজ, থার্ড ক্লাস, উদাসীর মাঠ, মানময়ী গার্ল্‌স্ স্কুল প্রভৃতি উপন্যাস, ছোট গল্প ও নাটক রচনা করেন। লঘু হাস্য পরিবেশনে ইনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অবশ্যি তার পূর্বে কোষ্ঠীর ফলাফল, আই হ্যাজ, ভাদুড়ী মশাই প্রভৃতির রচয়িতা কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং বয়োজ্যেষ্ঠ হয়েও কাছাকাছি সময়ে রাজশেখর বসুমহাশয় বাঙ্‌লা সাহিত্যে হাস্যরসাত্মক রচনা লিখে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। প্রমথ চৌধুরী মহাশয় কৌতুক রসের অবতারণা ঘটালেও তাঁর রচনা ছিল একটু Satire ঘেঁষা। রাজশেখর বসু মহাশয় পরশুরাম ছদ্মনামে লেখেন। তাঁর কজ্জলী, গড্ডলিকা, হনুমানের স্বপ্ন প্রভৃতিকে বাঙ্‌লা ব্যঙ্গ রচনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত বলা যেতে পারে। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ও অনেক হাস্যরসাত্মক ছোট গল্প রচনা করেছেন। রাণুর প্রথম ভাগ, রাণুর দ্বিতীয় ভাগ, রাণুর তৃতীয় ভাগ, বসন্তে প্রভৃতি গল্প সংগ্রহে এই ধরণের গল্পের সার্থক পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর 'নীলাঙ্গুরীয়' উপন্যাসখানি একটু গম্ভীর ধরণের। কিন্তু বাঙ্‌লা সাহিত্যে হাস্যরসের লেখক হিসাবেই বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

উল্লিখিত লেখকরা ছাড়া বাঙ্‌লা সাহিত্যের বর্তমান কালে উপন্যাস ও ছোট গল্পে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, দিলীপকুমার রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রমথনাথ বিশী, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধ সান্যাল, বনফুল, গোপাল হালদার, মনোজ বসু, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র সেন, সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, গজেন্দ্র মিত্র, সতীনাথ ভাদুরী, বিমল মিত্র, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সুবোধ বসু, অমরেন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, বারীন্দ্রনাথ দাস, সন্তোষকুমার ঘোষ, সুধীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সুশীল জানা, বরেন বসু, সুশীল রায় প্রভৃতি, অনুবাদ সাহিত্যে পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, অশোক গুহ, বিমল সেন প্রভৃতি এবং নাটক রচনায় শচীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত, মন্মথনাথ রায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, মহেন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্যে যে সমাজ চেতনা, জীবনের যে বেদনা-বোধের বীজ অঙ্কুরিত হচ্ছিল তারাশঙ্করের উপন্যাস ও ছোট গল্পে তার প্রকাশ লক্ষিত

হয়। বিশেষত বাঙ্‌লার অবসিতপ্রায় জমিদার শ্রেণীর জীর্ণতা, দীনতা সত্ত্বেও তাদের আভিজাত্যবোধকে জোর করে বাঁচিয়ে রাখার যে ব্যর্থ প্রয়াস ছিল তাঁর উপন্যাস ও ছোট গল্পে সেই ভগ্নাবশেষ জমিদার গোষ্ঠীর একটি রূপ প্রকাশ পেয়েছে। আবার বস্তুপ্রাধান্যের যুগে সমাজে যে নতুন পরিবর্তনের ধারা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তারও একটি প্রতিকৃতি তাঁর রচনায় পেয়েছি। ছোট গল্পের মধ্যে জলসা ঘর, মধুমাষ্টার, পদ্মবউ, ডাকহরকরা, অগ্রদানী, হুটু মোক্তারের সওয়াল প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উপন্যাস ক্ষেত্রেই তারাশঙ্করের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বাঙ্‌লার সামাজিক, পারিবারিক দুরবস্থা তাঁর আর্থনীতিক দুর্যোগ প্রভৃতি তাঁর রচনায় সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। তারাশঙ্করের 'নীলকণ্ঠ', 'আগুন', 'ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'মন্বন্তর', 'কবি', 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা', 'সন্দীপন পাঠশালা', 'আরোগ্য নিকেতন' প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করেছেন। বাঙ্‌লার গ্রাম্য সমাজের নানা ঘাত-প্রতিঘাত, কুটিল পরিবেশের সুন্দর রূপালেখ্য তাঁর উপন্যাসে পাই। বিংশ শতাব্দীর নানা রাজনৈতিক আলোড়ন আন্দোলন যে বাঙলার সুদূর পল্লী অঞ্চলকেও স্পন্দিত করেছিল তারাশঙ্কর তাঁর উপন্যাসগুলিতে রূপাঙ্কিত করার চেষ্টা করেছেন। বিত্তহীন দরিদ্র গ্রামবাসীর জীবনধারার ক্ষীণতম বৈচিত্র্যেরও একটি সুন্দর ও সহজ রূপ তাঁর উপন্যাসে ধরা পড়েছে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাস ও গল্পগুলিতে কুলিমজুরদের জীবন-যাত্রার সজীব চিত্র অঙ্কিত করেছেন। বর্তমানে যাঁরা সমাজের অতি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ে গল্প উপন্যাস লিখছেন শৈলজানন্দ তাঁদের অগ্রবর্তী বললে অত্যুক্তি হবে না। শৈলজানন্দের নারীমেধ প্রভৃতি ছোটগল্পগুলি বাঙ্‌লার শ্রেষ্ঠ ছোট গল্পের পর্যায়ভুক্ত।

অন্নদাশঙ্কর ছোট গল্প ও উপন্যাসে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁর রচনা অপেক্ষাকৃত বিশ্লেষণাত্মক। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রকাশ যেন বেশি পরিমাণেই ঘটেছে। তাঁর আগুন নিয়ে খেলা, পুতুল নিয়ে খেলা, সত্যাসত্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। অন্নদাশঙ্কর কয়েকটি চমকপ্রদ ছড়াও রচনা করেছেন। দিলীপকুমার রায়ও প্রধানতঃ মানবজীবনের গভীর সমস্যামূলক উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর রঙের পরশ, বহুবল্লভ, দুধারা প্রভৃতি সার্থক বিশ্লেষণাত্মক উপন্যাস। ধূর্জটিপ্রসাদও অন্তঃশীলা, আবর্ত প্রভৃতি উপন্যাসে একই রকম

বিশ্লেষণী বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। দিলীপকুমার ও ধূর্জটিপ্রসাদ বাঙ্‌লা সাহিত্যে সাহিত্য ও সঙ্গীত প্রভৃতির নানা ধারার সমালোচনার জন্যই সমধিক প্রসিদ্ধ। এঁদের রচনা মুখ্যত বুদ্ধিদীপ্ত, তাই সর্বসাধারণের পক্ষে রসগ্রহণ সম্ভবপর হয়ে ওঠেনা।

বুদ্ধদেব বসু একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, ছোট গল্প লেখক ও সমালোচক হিসাবে বাঙ্‌লা সাহিত্যে পরিচিত। তবে কবি বুদ্ধদেবের প্রাধান্যই তাঁর অন্যান্য রচনাতে প্রকট হয়ে উঠেছে। তাঁর উপন্যাস এমন কি আলোচনাগুলিও কাব্যধর্মী হয়ে উঠেছে। বুদ্ধদেবের 'একদা তুমি প্রিয়ে', 'বাসর ঘর', 'যেদিন ফুটলো কমল', 'রডোডেনড্রন গুচ্ছ', 'সানন্দা', 'কালো হাওয়া', 'তিথি ডোর', 'শেষ পাণ্ডুলিপি' প্রভৃতি বাঙ্‌লা সাহিত্যে আপন বৈশিষ্ট্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। রোমান্‌টিক্ ভাবোচ্ছ্বাস থাকা সত্বেও তিনি যুগধর্মকে একেবারে উপেক্ষা করেননি। অবশ্যি মাঝে মাঝে বাস্তবসমস্যা-নিরপেক্ষ নরনারী জীবনের প্রণয়োচ্ছ্বাস-প্রধান রচনাও দেখা দিয়েছে। তাঁর 'শেষ পাণ্ডুলিপি' উপন্যাসখানি বর্তমান কালের সার্থক উপন্যাসের পর্যায়ে পড়ে। বাঙ্‌লা সাহিত্যে decadenceএর সার্থক রূপচিত্র তেমন বেশি পাওয়া যায়না। 'শেষ পাণ্ডুলিপিকে' ক্ষয়ে-আসা সমাজের সার্থক প্রতিকৃতি বলা যেতে পারে। তাঁর 'কালের পুতুল', 'রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য আলোচনার বই। বুদ্ধদেব-পত্নী প্রতিভা বসুও ছোট গল্প ও উপন্যাস রচনায় প্রতিষ্ঠালাভ করছেন।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের উপন্যাসেও কবিত্বের আমেজ রয়েছে। জীবনের নানাদিকের গূঢ় রহস্যের দ্বারোদ্ঘাটন করতে গিয়ে এ যুগের ঔপন্যাসিকরা মাঝে মাঝে এত বেশী স্পষ্ট হয়ে উঠতে চেয়েছেন যে তাতে অনেক সময় একটি দুর্বল মনোভাবের প্রকাশও ঘটেছে। অচিন্ত্যকুমারের বেদে প্রভৃতিতে এই ভাবটি লক্ষিত হয়। 'আসমুদ্র' উপন্যাসে কবি অচিন্ত্য-কুমারের রোমান্‌টিক উচ্ছ্বাস বেশি প্রকাশ পেয়েছে। 'উর্ণনাভ' তাঁর সার্থক উপন্যাস বলা যেতে পারে। 'আকস্মিক', 'কাক-জ্যোৎস্না', 'প্রচ্ছদপট' প্রভৃতিও বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ছোট গল্প রচয়িতা হিসাবেও অচিন্ত্যকুমারের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। বর্তমানে 'পরমপুরুষ' (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব) পর্বে তাঁর আসন বাঙ্‌লা সাহিত্যে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বুদ্ধদেব ও

অচিন্ত্যকুমারের ভাষার লালিত্য এবং ভাবপ্রকাশের ভঙ্গী তাঁদের নিজস্বই বলা যায়। এক প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গেই এঁদের কিছুটা সাদৃশ্য আছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র উপন্যাস অপেক্ষা ছোট গল্প রচনাতেই বেশি খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর 'বেনামী বন্দর', 'পুতুল ও প্রতিমা', 'মহানগর' প্রভৃতি ছোট গল্পের সংকলন গ্রন্থে সার্থক ছোট গল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। 'পুন্নাম', 'বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে', 'একটি রাত্রি', 'কম্বশেষ', 'শৃঙ্খল', 'মহানগর', প্রভৃতিকে নিঃসন্দেহে বাংলা শ্রেষ্ঠ গল্পের পর্যায় ভুক্ত করা যায়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের রচনায় ভাবোচ্ছ্বাসের উগ্রতা কম। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে 'কুয়াশা', 'আগামীকাল', 'যোগাযোগ', প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

প্রমথনাথ বিশী ছোট গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, রচনা করেছেন। বর্তমান দিনে তিনি সাহিত্য আলোচনার জন্য সমধিক খ্যাতি লাভ করেছেন। প্রমথনাথের রচনা কখনও কখনও satire ঘেঁষা হয়ে উঠেছে। কিন্তু কবিতায় ও উপন্যাসে তিনি রোমান্টিক। তাঁর উপন্যাসে যে অনুভূতির প্রকাশ লক্ষিত হয়, তাতে কবির সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রমথনাথ বিশীর পদ্মা, জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার প্রভৃতি উপন্যাস হিসাবে সার্থক হয়ে উঠেছে। পরের বিয়ের মহামতি রাম ফাঁসুড়ে, নীলবর্ণ শৃগাল প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য রচনা। তাঁর ঋণং কৃত্বা, ঘৃতং পিবেৎ, পরিহাসবিজল্পিতম্, মৌচাকে ঢিল, ডিনামাইট প্রভৃতি নাটকগুলিতে তির্যক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের প্রকাশ ঘটেছে।

বাংলার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি বিশেষ স্থান আছে। তাঁর দিবারাত্রির কাব্য, পুতুলনাচের ইতিকথা প্রভৃতি পূর্বোল্লিখিত ঔপন্যাসিকদের রচনা অপেক্ষা অনেক বেশি বাস্তব ঘেঁষা হয়ে উঠেছে। সমাজের যথাযথ রূপনির্ণয়, এবং মানবজীবনের নানারকম সমস্যার অবতারণা, নরনারী জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত জীবনের ইতিকথা রচনা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস ও ছোট গল্পের প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। তাঁর পদ্মানদীর মাঝি, জননী, সহরতলী, চতুষ্কোণ, প্রতিবিম্ব প্রভৃতি উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের বিশেষ সম্পদ। শুধু উপন্যাস নয়, ছোট গল্পেও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। তাঁর সরীসৃপ, বিষাক্ত প্রেম, ফাঁসি, কেরানী, রোমান্স প্রভৃতি ছোট গল্প হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

গল্প ও উপন্যাস একদিকে নরনারীর জীবনের প্রেম আবার বিকৃত যৌনাসক্তির স্পষ্টপ্রকাশ অন্যদিকে কোনো কোনো রচনায় বিশেষ রাজনীতিক মতাদর্শের প্রতিফলন লক্ষিত হয়। শেষোক্ত আদর্শের ছকে ফেলে যখন তিনি গল্প বা উপন্যাস রচনা করতে গেছেন তখনই তাঁর আগেকার রচনার স্বতস্ফূর্ততা, সহজতা অনেকখানি যেন শিথিল হয়ে এসেছে। যেখানে তিনি সচেতনভাবে একটি বিশেষ মতকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন সেখানেই যেন কিছুটা রসশৈথিল্য ঘটেছে। অথচ তাঁর আগেকার উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদের সাধারণ মানুষ হিসাবেই পেয়েছি। তাদের জীবনের নানা সুখদুঃখ ঘাতপ্রতিঘাতের রূপটি তিনি সুন্দরভাবেই এঁকেছেন। পরের দিকে মানব মনের বিশ্লেষাত্মক মনোভাবটির সুস্পষ্ট চিত্র আঁকতে গিয়ে তিনি যেন নিজের রসাশ্রয়ী মনকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। তবুও একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে বাঙালী নরনারী জীবনের নানা মহলার বিচিত্রাসক্তির সার্থক পরিচয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় পাওয়া গেছে।

প্রবোধ সান্যালের রচনায় কাব্যময়তা যেমন লক্ষিত হয় ঠিক তেমনই সমাজের সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদও শোনা যায়। তাঁর রচিত উপন্যাসের মধ্যে 'প্রিয় বান্ধবী', 'অগ্রগামী' 'বনহংসী', 'হাসুবানু' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস বলা যেতে পারে। ভ্রমণ কাহিনীকেও যে সরসভাবে প্রকাশ করা যায় তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ তাঁর 'মহাপ্রস্থানের পথে', 'দেবতাত্মা হিমালয়' প্রভৃতি রচনা। প্রবোধকুমার 'অবৈধ', 'অঙ্গার' প্রভৃতি কয়েকটি সার্থক ছোট গল্পও রচনা করেছেন। তাঁর ভাষার প্রাঞ্জলতা ও সরসতা তাঁর রচনাকে সাবলীল গতিদান করেছে। নরনারী জীবনের সূক্ষ্ম আলোচনা করতে গিয়েও তিনি রোমান্টিক হয়ে গেছেন।

'বনফুলের' (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) রচনাও বুদ্ধিপ্রধান এবং বিশ্লেষণাত্মক, তাঁর রাত্রি, জঙ্গম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রচনা। বনফুল অনেক কবিতা ও ছোট গল্প লিখেছেন।

রাজনীতির পটভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ থেকেই উপন্যাস রচনা শুরু হয়েছিল। পরাধীনতার বেদনা ও গ্লানি জাতীয় জীবনের ওপর কি যে দুঃখের কালো ছায়া বিস্তার করেছিল এবং তা থেকে মুক্তি পেতে গেলে সমগ্র জাতিকে কোন্ পথ ধরে চলতে হবে—এই আদর্শ অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র নানাভাবে

আসন্ন সমাজ বিপ্লবের আভাস দেবার চেষ্টা করেছেন। মানব জীবনের সৌন্দর্যানুভূতি, তার আত্মপ্রকাশের ব্যাকুলতা, ব্যক্তি জীবনের সার্থক প্রকাশের জন্য দুর্নিবার সংগ্রাম, প্রেমের দ্বন্দ্ব ও তার শুভ বা অশুভ পরিণাম—এসব নিয়ে নানা উপন্যাস রচিত হয়েছে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ-নিপীড়িত জাতীয় জীবনে ভাবীকালের বিপ্লবের যে আয়োজন চলছিল সাহিত্যেও তার প্রকাশ ঘটতে থাকে। গোপাল হালদারের 'একদা', 'উনপঞ্চাশী', 'পঞ্চাশের মন্বন্তর' প্রভৃতি এই ভাবাশ্রয়ী রচনা। গোপাল হালদার, তারাশঙ্কর প্রভৃতির বেশির ভাগ উপন্যাসে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব বিদ্যমান। জনগণের জন্য বাঙ্‌লায় কি ধরণের উপন্যাস রচিত হওয়া প্রয়োজন গোপাল হালদারের উপন্যাসে তার দৃষ্টান্ত মেলে। গল্পের বিষয়বস্তু ও শিল্পভঙ্গীর দিক থেকে বামপন্থী সাহিত্যিকদের শুধু নয় সকল পন্থী সাহিত্যিকদের এই আদর্শ গ্রহণ করা অবাঞ্ছনীয় হবেনা। চিন্তা ও বুদ্ধির প্রাখর্য তার রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উপন্যাস ছাড়া তিনি সাহিত্য-আলোচনা মূলক প্রবন্ধ রচনা করেছেন। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী', মনোজ বসুর 'ভুলি নাই', জরাসন্ধের 'লৌহ কপাট' প্রভৃতিকে এই পর্যায়ভুক্ত করা যায়। 'জাগরী' উপন্যাসখানি এককালে বাঙ্‌লা দেশের পাঠকসাধারণের মনে অপূর্ব সাড়া জাগিয়েছিল। মনোজ বসুর 'বনমর্মর', 'নরবাঁধ' প্রভৃতি গল্প সংকলনের ছোটগল্পগুলি বাঙ্‌লা ছোটগল্পের আসরে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। গোপাল হালদারের ভাষায় যেমন যুক্তি-নিয়ন্ত্রিত কিছুটা রুক্ষতা আছে—মনোজ বসুর ভাষায় আবার তার উল্টো অতিরিক্ত সরলতা ও তারল্য লক্ষিত হয়।

এই নতুন ধারায় উপন্যাস ও ছোটগল্প লিখিয়ে হিসাবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিশেষ স্থান আছে। তাঁর 'উপনিবেশ' পর্বগুলিতে, 'স্বর্ণ সীতা', 'মন্ত্রমুখর' প্রভৃতি রচনায় যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় পাই। বর্তমান দিনে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় উপন্যাস রচনার যে ঝোঁক বিমল মিত্র, প্রাণতোষ ঘটক প্রভৃতির রচনায় দেখা দিয়েছে নারায়ণের 'পদসঞ্চারে'ও তারই ধ্বনি শোনা যায়। চমকপ্রদ ঘটনা অবলম্বনে সবাইকে হতবাক্ ক'রে দিয়ে 'সস্তা জনপ্রিয়তা' লাভ করার ঝোঁক তাঁর রচনায় তেমন দেখা যায় না। নারায়ণ ছোটদের জন্য গল্প রচনা ক'রেও বেশ সুনাম অর্জন করেছেন। সুবোধ ঘোষ ও গজেন্দ্র মিত্রের গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে সামাজিক জীবনের বৈচিত্র্যের আলেখ্য অঙ্কনের

প্রয়াস লক্ষিত হয়। এক সময় সুবোধ ঘোষের 'ফসিল', 'পরশুরামের কুঠার' 'একতীর্থা' প্রভৃতি গল্প বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। 'তিলাঞ্জলি' উপন্যাসে সেই খ্যাতি কিছুটা ম্লান হয়েছে। কিন্তু তাঁর ভাষার সরলতা ও তীক্ষ্ণতা তাঁর রচনাকে সার্থক করে তুলেছে।

রমেশচন্দ্র সেনের কাজল, কুরপালা, গৌরীগ্রাম, শতাব্দী, পূব থেকে পশ্চিম, চক্রবাক প্রভৃতি উপন্যাসে লেখকের যথেষ্ট মননশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ছোট গল্পেও তাঁর দান কম নয়। তাঁর উপন্যাস বাঙালীর সামাজিক, রাষ্ট্রনীতিক, জীবনের পরিচয় বহন করে। কাজল, কুরপালা, শতাব্দী প্রভৃতি উপন্যাসে তাঁর প্রগতিশীল মনের প্রকাশ ঘটেছে। তবে তাঁর রচনা একেবারে রোমান্টিক উচ্ছ্বাস বর্জিত নয়। রমেশচন্দ্র সেনের অধিকাংশ গল্পের ঘটনার কেন্দ্রস্থল পূর্ববঙ্গ।

সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'বৃত্ত' উপন্যাসখানিকে আধুনিক কালের যৌনবিকৃতির সমস্যামূলক উপন্যাস বলা যেতে পারে। সুবোধ বসুর 'পদ্মাপ্রমত্তা নদী' 'বন্দিনী' 'মানবের শত্রু নারী', 'পুনর্নব' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রচনা। বিমল মিত্রের অন্যান্য উপন্যাস ও ছোটগল্পের চেয়ে 'সাহেবের বিবি গোলাম' উপন্যাসখানিই বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। 'পদ্মদীঘির বেদিনী', 'চক্রকাসেম', 'দক্ষিণের বিল', 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে', 'কনকপুরের কবি', 'অরণ্যকন্যা' প্রভৃতি উপন্যাসের রচয়িতা অমরেন্দ্র ঘোষের বাঙ্‌লা সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভাব খুব বেশিদিনের নয়। রমেশ চন্দ্র সেনের মতো তিনিও বাঙ্‌লা সাহিত্যের নানা মহলের সঙ্গে বহুদিন থেকে জড়িত থাকলেও নিজের রচনা নিয়ে অল্প কিছুদিন আগে বাঙ্‌লা সাহিত্য ক্ষেত্রে পরিচিত হয়েছেন। কিন্তু এই অল্পদিনের মধ্যেই বেশ জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছেন। তাঁরা গল্পের ঘটনার কেন্দ্রস্থল পূর্ববঙ্গ। সামাজিক পরিবেশটিও অধিকাংশ উপন্যাসে পূর্ববঙ্গের। তাই তারা প্রয়োগেও কয়েকটি পূর্ববঙ্গের ভাষাকেই গ্রহণ করেছেন। রমেশচন্দ্র সেন এবং আরও কয়েকজন ঔপন্যাসিকও এই রীতি অবলম্বন করেছেন। অমরেন্দ্র ঘোষ কয়েকটি ভালো ছোটগল্পও রচনা করেছেন। অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে সন্তোষকুমার ঘোষের 'কিনু গোয়ালার গলি', সুধীরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অন্ত নগর', সুশীল জানার 'বেলাভূমির গান', হরেনবসুর 'রাজবট' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। এঁদের মধ্যে অনেকে সার্থক ছোটগল্পও রচনা করেছেন। সন্তোষকুমার ঘোষের ছোটগল্পে, সুশীল

জানার 'ঘরের ঠিকানা' গল্প সংকলনের গল্পগুলিতে যথেষ্ট মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এ ছাড়া বর্তমানে নরেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, বারীন্দ্রনাথ দাশ, ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়, সুশীল রায়, বাণী রায়, 'সৃজন', 'ত্রিস্রোতা', 'মালশ্রী', 'পাকাধানের গান' প্রভৃতির লেখিকা সাবিত্রী রায় প্রভৃতি এবং আরও অনেক উদীয়মান লেখক ও লেখিকা উপন্যাস রচনা করছেন। কিন্তু বর্তমানকালের উপন্যাসগুলির বিষয়বস্তুর ভাবগৌরব যেন পূর্বাপেক্ষা কমে এসেছে। তাই এখন উপন্যাসের চেয়ে যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত', সৈয়দ মুজতবা আলীর 'চাচা কাহিনী', রঞ্জনের 'শীতে উপেক্ষিতা' প্রভৃতির মতো এক ধরণের রম্যরচনার দিকে পাঠক সম্প্রদায় যেন বেশি ঝুঁকে পড়েছে।

বাঙ্‌লা অনুবাদ সাহিত্য

অনুবাদ সাহিত্যের জন্মকাল ঊনবিংশ শতাব্দী। বর্তমান দিনেও তার অভাব ঘটেনি। শুধু অভাব দেখা দিয়েছে সার্থক অনুবাদ সাহিত্যের। বর্তমান যুগে যাঁরা অনুবাদ সাহিত্যে খ্যাতি লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে 'বুভুক্ষা', 'লে মিজরেবল্, নীলপাখী প্রভৃতির অনুবাদক পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম সর্বাগ্রে করতে হয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর সাক্ষাৎ গুরু। তার 'চলমান জীবন' পর্বগুলিতে বাঙ্‌লার সাহিত্য ও সাহিত্যিক এবং সুধী সমাজের সুন্দর প্রতিকৃতি প্রকাশ পেয়েছে। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ও অনুবাদ সাহিত্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। তাঁর ভাবপ্রকাশের ভঙ্গীতে এবং ভাষায় কাব্যময়তা বেশি পরিমাণে লক্ষিত হয়। গর্কির 'মা'র অনুবাদ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অশোক গুহও গর্কির 'মা', ইলিয়া এরেনবুর্গের 'ঝড়', পার্লবাকের 'দুধারা', এমিল জোলার 'সম্ভাবনার পথে' প্রভৃতি আরও অনেক বিদেশী গ্রন্থের অনুবাদ করেছেন। বিমল সেনও গর্কির 'মা'র অনুবাদ করেছেন। এছাড়া আরও অনেকে বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ করছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনুবাদ সাহিত্য পাঠক সমাজের মনোযোগ তেমন আকর্ষণ করতে পারছে না। অথচ বাঙ্‌লা সাহিত্য এই ধারার সার্থক প্রতিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজন আছে। কিন্তু মুষ্টিমেয় কয়েকজন লেখকের অনুবাদ ছাড়া সার্থক অনুবাদ সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার এখনও তেমন হয় নি।

পরিশেষ

বর্তমান যুগে সার্থক নাটকের বড়ো অভাব। শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মন্মথ রায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, মহেন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি দুচারজনের কয়েকখানি নাটক ছাড়া বাঙ্‌লা রঙ্গমঞ্চ এখনও গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতির নাটকের ওপরই অনেকখানি নির্ভর করে। বেশির ভাগই দেখা যায় যে উপন্যাসকে নাট্যরূপ দান করে আরই অভিনয় চলছে। গৈরিকপতাকা, কারাগার, মাটির ঘর বিশবছর আগে, টিপু স্থলতান, মহারাজ নন্দকুমার, সিরাজদ্দৌলা প্রভৃতি কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য নাটক ছাড়া বর্তমান যুগের নাট্য সাহিত্যে সার্থক ও বলিষ্ঠ নাটক তেমন বেশি পাওয়া যায় না। একথা সত্য যে জাতীয় জীবনের বৈচিত্র্যের বা সংগ্রামের এমন কোনো মন্থরতা দেখা দেয়নি অথবা ব্যক্তি জীবনের স্থখ দুঃখের, আঘাত সংঘাতের এমন কিছু রসহীনতা দেখা দেয়নি যে নাটকের বিষয়বস্তুর অভাব ঘটবে। আমাদের মনে হয় এসব দেখার সূক্ষ্ম চোখ এবং অনুভব করার দরদী হৃদয়েরই অত্যন্ত অভাব হেতু বাঙ্‌লা নাটকের এই অসদ্ভাব দেখা দিয়েছে।

শরৎ-পরবর্তী সাহিত্যধারাকে আমরা বর্তমান কালের অর্থাৎ আমরা এখনো যার মাঝামাঝি আছি তার সাহিত্যধারা বলে আখ্যা দিতে পারি। অনেক সময় এই কালকে অতি আধুনিক বা সাম্প্রতিক কাল (কোনোটাই বলা সমীচীন বলে মনে হয় না) বলা হয়। এযুগের সাহিত্যের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বস্তুনিষ্ঠা। সব লেখকদের মধ্যেই যে বস্তুনিষ্ঠা দেখা দিয়েছে তা নয়, তবে দেশের রাষ্ট্রনীতিক, সামাজিক নানা ঘটনা-দুর্ঘটনার ভেতর দিয়ে যে নতুন চেতনাবোধ সাহিত্যে ও সমাজে দেখা দিয়েছিল তার প্রভাব এঁদের প্রায় সবার রচনাতেই পাওয়া যায়। মধ্যবিত্ত, বিত্তহীন, দরিদ্র, বেকার, শ্রমিক, মজুর, চাষী প্রভৃতি সমাজের সাধারণ মানুষের জীবনের স্থখ-দুঃখ, সৌন্দর্যানুভূতি, উচ্ছ্বাসমুখরতা নিয়ে শৈলজানন্দ, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্য কুমার, প্রেমেন্দ্র মিত্র, গোপাল হালদার, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র সেন, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, স্থশীল জানা প্রভৃতি নানা ছোট গল্প ও উপন্যাস রচনা করেছেন! এতদিন ধরে যারা উপেক্ষিত ছিল—তারাই এবং তাদের জীবন-বৈচিত্র্যই এযুগে সাহিত্যের বিষয়-

বস্তু হ'ল। সমাজের একপাশে যারা মুখ বুজে পড়েছিল তাদের জীবনরহস্যই হ'ল সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। এদিকে ক্রমবর্ধমান আর্থনীতিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত ও তিক্ত সমাজ-জীবন চাইছে মুক্তি। আজ পরিবর্তন দেখা দিয়েছে মানুষের সমাজে—মানুষের চিত্তপটে। তাই সাহিত্যের ধর্মও পরিবর্তিত হ'ল। কারণ 'সমাজ পরিবর্তিত হয়, সংস্কৃতি পরিবর্তিত হয়, আর শিল্প সাহিত্যও নতুন রূপ লাভ করে। (সংস্কৃতির রূপান্তর-গোপাল হালদার) রবীন্দ্রনাথ থেকেই যে যুগ পরিবর্তন স্পষ্টভাবে শুরু হয়েছিল তার রোমান্‌টিক্ রূপের সঙ্গে সঙ্গে রূঢ় সত্যের রূপও দেখা দিয়েছিল। বর্তমান কালের লেখকদের রচনায় তা আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। এযুগের সাহিত্যে বাঙালীর সমাজ-জীবনের সমস্যাগুলোর অবতারণা ঘটেছে। সঙ্গে সঙ্গে সমাজনিরপেক্ষ শুদ্ধ রোমান্‌টিক উপন্যাস, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য ধারার—বিশেষ করে যুদ্ধোত্তর কালের বিকৃতির অন্ধ অনুকরণেও অনেক উপন্যাস রচিত হয়েছে। সাহিত্যে তাদের নিত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট কারণও রয়েছে। বাস্তব সমস্যা-নিরপেক্ষ নরনারী জীবনের শুদ্ধ প্রণয়োচ্ছ্বাস-প্রধান উপন্যাস ও ছোট গল্প বর্তমানকাল ততটা সহজে মেনে নিতে চায় না।

এই যুগের কোনো কোনো রচনায় 'ইডিপুস কমপ্লেক্সের' এতো প্রাবল্য দেখা দিয়েছিল যে উক্তভাব পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য থেকে ধার করে এনে আমাদের সাহিত্যিকরা যেন পাশ্চাত্ত্যেরও সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিলেন। এই স্পষ্টবাদিতায় 'সস্তা বাহাদুরী' থাকতে পারে বটে, কিন্তু সাহিত্য রসের পরিচয় তাতে কিছুই থাকে না। এই ধরণের মনোভাবকে ঠিক আধুনিকতা বলা চলে না। পুরাতনের পুনরাবৃত্তি করতে করতে যখন আর নতুনের কোনো আভাসও পাওয়া যায় না, তখন সেখানে দুর্বলতার নালা বেয়ে যে বিকৃতির প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে, এই যুগের সাহিত্যে সেই বিকৃতির একটা অবাঞ্ছিত প্রকাশ ঘটেছে। তবে এও সত্যি কথা যে, এই ধরণের রচনাকে বা সাহিত্যিকদের 'একেবারে কিছু নয়' বলে উড়িয়েও দেওয়া সম্ভব নয়। বাঙ্‌লা সাহিত্যের এই শ্রেণীর সাহিত্যিকরা সমাজের একটা পঙ্কিল স্রোতের ধারা নির্দেশ করেছেন। কিন্তু সাহিত্যে যে সমস্যাগুলো যে কারণে সর্বজনীন আখ্যা পেতে পারে—সেই যুগধর্মের ও যুগচিত্রের দিকটা এঁরা উপন্যাসে যথা সম্ভব এড়িয়ে গেছেন। সাহিত্য শুধু জীবনের গীতোচ্ছ্বাসের মধুর বা উন্মত্ত

প্রকাশই নয়—কারণ তাতে একটা চমক বা বিস্ময় থাকতে পারে বটে, কিন্তু সেখানে যথার্থ রূপসৃষ্টির নিষ্ঠা ও সহানুভূতিশীলতার অভাব থেকে যায়। এই যুগের অনেক সাহিত্যিক সৃষ্টি করেছেন মায়ালোকের রহস্যঘন কুহেলী। আবার এই যুগেরই কোনো কোনো লেখক যে যুক্তিনিষ্ঠা সাহিত্যে প্রকাশ করতে চেয়েছেন তাতে মধ্যবিত্ত জীবনের অসচ্ছন্দ গতি ও যৌনাকাঙ্ক্ষাই বেশী প্রকাশ পেয়েছে। এটাই যেন তখন পূর্বতন সাহিত্য ধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার প্রথম স্তর। কিন্তু এই বিদ্রোহ যদি সমাজে কল্যাণকে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারে—তাহলে সাহিত্যে তার প্রকাশ ঘটিয়ে তার মাধ্যমে সমাজেরও কোনো কল্যাণ স্থায়ী হতে পারে না।

আর একশ্রেণীর লেখকরা চাইলেন এই মোহবিকার থেকে—সমাজের জীর্ণতা, জড়তা ও কুসংস্কার থেকে মুক্তি। এই ভাবাদর্শ নিয়ে এই যুগে নানা গল্প উপন্যাস প্রভৃতি রচিত হয়েছে। সবই যে সার্থক হয়েছে তা নয়। কিন্তু এই কুণ্ঠাহীন নিরন্তর প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়। তবে এই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সতর্ক বাণীও মনে রাখা আমাদের কর্তব্য। আমাদের আধুনিক দিনের সাহিত্যে পুরানোর প্রতি যে স্পর্ধিত বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে তাকে তিনি সম্পূর্ণ স্বীকার করেন না। তাঁর মতে 'নতুনের বিদ্রোহ অনেক সময় স্পর্ধামাত্র।' বিদ্রোহ যদি শুধু স্পর্ধা হয়েই প্রকাশ পায় তাতে মানব কল্যাণের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। সাহিত্যে বাস্তব নিষ্ঠার ধুয়া তুলে শুধু বাঁধানো রাস্তার ওপর দিয়ে চোখ রাঙিয়ে চলাতে কখনও আর্টের চরম প্রকাশ ঘটেনা। নিঃস্ব, দরিদ্র জীবনের চিত্র আঁকতে গিয়ে শুধু মরুভূমির চিত্র আঁকলেই চলবে না। আমরা সাহিত্যে চাই—মানব জীবনের সার্থক ও যথার্থ প্রতিকৃতি। সেখানে নকলের স্থান নেই। সত্যের যথার্থ প্রকাশ ঘটবে সাহিত্যে। উপন্যাসে, ছোট গল্পে জীবনের যথার্থ রূপটি আর্টের সম্পূর্ণতা নিয়েই বিকশিত হয়ে ওঠা দরকার। রবীন্দ্রনাথের মতে 'নভেলে কোনো একজন মানুষকে ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল প্রমাণ করতে হবে অথবা ইন্‌টেলেকচুয়েলের মনোরঞ্জন করতে হবে বলেই বইখানাকে এম, এ, পরীক্ষার প্রশ্নোত্তরপত্র করে তোলা চাই, এমন কোনো কথা নেই। গল্পের বইয়ে যাঁদের থীসিস পড়ার রোগ আছে, আমি বলব, সাহিত্যের পদ্মবনে তাঁরা মত্ত হস্তী।' তাঁর মতে পাশ্চাত্ত্য উপন্যাসগুলি কেবল বুদ্ধির কসরতই বেশী দেখাচ্ছে 'তাতে রূপ নেই, আছে প্রচুর বাক্যের পিণ্ড।'

এটা সবাই স্বীকার করবে যে কেবল কথার মারপ্যাঁচ আর শুষ্ক তত্ত্বের অবতারণাতেই উপন্যাস, ছোট গল্প বা কবিতা যথার্থ আর্ট হয়ে উঠতে পারে না। বাস্তব ও কল্পনার যুগপৎ মিলনেই রসমাধুর্য অনুভূত হয়। বর্তমানে দিনের অনেক উপন্যাস, গল্প, কবিতাই এই রসমাধুর্য থেকে বঞ্চিত।

যাহোক, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পর থেকে সাহিত্যে যে সামাজিক ধারার গতি বিভ্রান্ত হয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারছিল না—অর্থাৎ কেবলই সমাজের শব-দেহের আবর্জনা নিয়েই পড়েছিল—তার একটি বেরিয়ে পড়ার পথ যাঁরা আবিষ্কার ক'রে সে পথ ধরে চলতে ও সমাজকে চালাতে চেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে নজরুল, যতীন্দ্রনাথ, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আজ আমরা যাকে প্রগতিশীলতা বলি একদিন এঁদের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার ভেতরে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু এখনও বাঙ্‌লা সাহিত্যে এই নতুন চেতনাবোধের পরীক্ষা-নিরীক্ষাই চলেছে। এখনও তার শেষ হয়নি। তাই এই যুগের সাহিত্য-সৃষ্টি সম্বন্ধে কোনো ফলকথা বলবারও সময় আসেনি। বাঙ্‌লা সাহিত্য এখনও একটি স্থির জাতীয়-সংজ্ঞাপ্রাপ্ত জাতির জীবনের বর্তমান ও ভবিষ্যত নির্ধারণ করতে সম্পূর্ণ সক্ষম হয়নি। এখনও আমাদের সামাজিক জীবনে যে আর্থ-নীতিক দৈন্যের ঝড়-ঝাপটা চলেছে এবং প্রতিনিয়ত জীবনে যে ঝড়-ঝাপটা সইতে হচ্ছে, তাতে দুর্যোগপূর্ণ জীবনের সংগ্রাম শেষ হতে এখনও অনেক বাকি। কাজেই সাহিত্যের ভেতর দিয়ে সংগ্রামের কালকে অতিক্রম করাও সম্ভবপর নয়। একটা ভবিষ্যতের নির্দেশ বা আভাস ছাড়া তাতে আর বেশী কি থাকতে পারে? রবীন্দ্রনাথের কথায় যা কিছু আমাদের সুখদুঃখ বেদনার স্বাক্ষরে চিহ্নিত, যা আমাদের কল্পনার দৃষ্টিতে সুপ্রত্যক্ষ, আমাদের কাছে তাই বাস্তব।…আমরা যাকে বাস্তব বলে গ্রহণ করি সেইটেতেই আমাদের যথার্থ পরিচয়। এই বাস্তবের জগৎ কারো প্রশস্ত, কারো সংকীর্ণ। কারো দৃষ্টিতে এমন একটা সচেতন সজীবতা আছে বিশ্বের ছোট বড়ো অনেক কিছুই তার অন্তরে সহজে প্রবেশ করে। বিধাতা তার চোখে লাগিয়ে রেখেছেন বেদনার স্বাভাবিক দূরবীক্ষণ অণুবিক্ষণ শক্তি।' (বাঙ্‌লা ভাষা পরিচয়) বাস্তবের এই সংজ্ঞা নন্দনবাদীদের কাছেও অস্বীকৃত হবে না আবার একেবারে

পরিবর্তনে বিশ্বসীদের কাছেও অগ্রাহ্য হবে না। এই মতে প্রগতিপন্থীদেরও কোনো আপত্তির কারণ থাকবে না। রবীন্দ্রনাথের এই মতে স্থিতিকে নয় গতিকেই স্বীকার করা হয়েছে।

বাঙ্‌লা সাহিত্যের প্রাচীন কাল থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত, ঊনবিংশ শতাব্দী এবং রবীন্দ্র-প্রভাবিত এই বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সাহিত্য ধারার যে বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় তাতে প্রত্যেক যুগের যুগধর্ম, সামাজিক মনের সুখদুঃখ, বেদনাবোধ, এবং যুগচিত্তের চেতনা অনুযায়ী আমাদের জাতীয় সাহিত্যের প্রকাশ ঘটেছে। প্রাচীনকালের মানুষের জীবনধারা তার অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত—সেকালের সাহিত্যে ধর্মভাবের প্রাধান্য সত্ত্বেও বেশ কিছুটা প্রকাশ পেয়েছে। চর্যার যুগ থেকে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব কালের পূর্ব পর্যন্ত বাঙ্‌লার সমাজের নানা রূপবৈচিত্র্য যুগের সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এ যুগে ধর্মভাব, অলৌকিকত্ব প্রভৃতি প্রবল হয়ে দেখা দিলেও সামাজিক মানুষের মনোভাব, তার প্রতিদিনের সুখদুঃখের স্বাভাবিক রূপটি তৎকালীন সাহিত্য ধারায় রূপ লাভ করেছে। তারপর ইতিহাসের পথ বেয়ে বাঙালী ও তার সাহিত্য পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সম্মুখীন হওয়ার মুখে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল। পলাশীর বিপর্যয় বাঙালী-জীবনে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তনের আভাস জাগিয়ে তুলল। ইংরেজ আগমনের পর থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত বিভ্রান্ত বাঙালী-জীবনে আবার যে চেতনাবোধ দেখা দিল—সেও সেই প্রাচীন দিনের বাঙালীরই নিরন্তর সংগ্রামশীলতার এক ঐতিহাসিক পরিণতি নয় কি? কৈবর্ত বিদ্রোহ থেকে শুরু করে সাঁওতাল, নীল, কৃষক বিদ্রোহের ভেতর এবং মধ্যবিত্ত নামে ইংরেজ শাসকশ্রেণী-সৃষ্ট সমাজেও এই বিক্ষোভ, এই পরাধীনতার বেদনা এবং আত্মধিকার সুস্পষ্ট হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। যে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি ভেঙে যাচ্ছিল, তাকে গড়ে তোলার জন্যই ঊনবিংশ শতাব্দীতে শুরু হ'ল বিপুল আয়োজন। সাহিত্যে ও সমাজে এই নবলব্ধ চেতনাবোধের ক্রমোৎকর্ষ দেখা দিল। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের সময়ে সভ্যতা ও সংস্কৃতির বাহন সাহিত্য-সূর্য বাঙ্‌লার মধ্যগগনে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সেই আকাশে ক্ষণিকের জন্য মেঘ জমে উঠেছিল। সেই মেঘ কেটে যেতে না যেতেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আবার আকাশ ছেয়ে ফেলে। আজ মেঘমুক্ত আকাশে আবার

সম্ভাবনা জেগে উঠেছে। নতুন দিনের নতুন মানুষ জীবনের রসদ সংগ্রহ করবে তার সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে। এই সাহিত্যধারার পথহারাবার ভয় নেই। প্রাচীন ভারতের জীবনাদর্শ ও সাহিত্যাদর্শ, পাশ্চাত্ত্য জীবন ও সাহিত্যের বলিষ্ঠ আবেদন বাঙ্‌লা সাহিত্য-মন্দাকিনীর গতিকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে। তাই ক্ষণিক মোহাবেশ কখনও কখনও বাঙ্‌লা সাহিত্যের গতি মন্থর করে তুললেও কবির কথায় আশঙ্কামুক্ত হয়ে আমরা তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে পারি—

মানবের শিশু বারে বারে আনে
চির আশ্বাস বাণী,
নূতন প্রভাতে মুক্তির আলো
বুঝিবা দিতেছে আনি।

যে সব বই থেকে সাহায্য পেয়েছি

১। বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব—রামগতি ন্যায়রত্ন

২। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—দীনেশচন্দ্র সেন

৩। বঙ্গসাহিত্য পরিচয়— „

৪। প্রাচীন বাঙ্‌লা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান—দীনেশচন্দ্র সেন

৫। আরাকান রাজসভায় বাঙ্‌লা সাহিত্য—মৌলবী আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ ও ডাঃ এনামুল হক

৬। শূন্যপুরাণ—

৭। বঙ্গবাণী—শশাঙ্কমোহন সেন

৮। বাঙ্‌লা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড)—ডাঃ সুকুমার সেন

৯। ছিন্নপত্র—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১০। চারিত্র পূজা— „

১১। জীবন স্মৃতি— „

১২। সাহিত্য— „

১৩। সাহিত্যের স্বরূপ— „

১৪। সাহিত্যের পথে— „

১৫। আধুনিক সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৬। আত্মপরিচয়— „

১৭। বাঙ্‌লা ভাষার পরিচয়— „

১৮। রবীন্দ্রনাথ—অজিতকুমার চক্রবর্তী

১৯। আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্য—মোহিতলাল মজুমদার

২০। বাঙালীর ইতিহাস—ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়

২১। ভারতীয় সাধনার ঐক্য—ডাঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত

২২। সাহিত্যে প্রগতি—ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

২৩। বাঙ্‌লা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

২৪। বাঙ্‌লা ভাষা তত্ত্বের ভূমিকা—ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

২৫। বাঙ্‌লা নাটকের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ—শ্রীমন্মথমোহন বসু

২৬। গিরিশচন্দ্র ও বাঙ্‌লা নাট্য সাহিত্য—কুমুদবন্ধু সেন

২৭। নাট্য সাহিত্যের আলোচনা ও নাটক বিচার—শ্রীসাধনকুমার ভট্টাচার্য

২৮। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
২৯। সংস্কৃতির রূপান্তর—শ্রীগোপাল হালদার
৩০। ষোড়শ শতকের বাঙ্‌লা সাহিত্য—শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন
৩১। History of Bengal Vol I and II --D. U. Publications
৩২। Origin & Development of Bengali Language—Dr. Suniti Kumar Chatterjee
৩৩। History of Brajabuli Literature—Dr. Sukumar Sen
৩৪। History of Sahajiya Cult—Prof. Manindra Mohan Bose
৩৫। Early History of the Vaishnava Faith & Movement in Bengal—Dr. S. K. De
৩৬। Obscure Religious Cult—Dr. S. B. Das Gupta
৩৭। Western Influence in Bengali Literature—Prof Priya Ranjan Sen
৩৮। Bengali Literature—J. C. Ghosh (Oxford 1956)
৩৯। ইসলামী বাঙ্‌লা সাহিত্য—ডাঃ সুকুমার সেন
৪০। প্রাচীনযুগের বাঙ্‌লা ও বাঙালী— "
৪১। মধ্যযুগের বাঙ্‌লা ও বাঙালী— "
৪২। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী
৪৩। আত্মজীবনী— "
৪৪। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৪৫। সংবাদপত্রে সেকালের কথা— "
৪৬। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত—যোগীন্দ্রনাথ বসু
৪৭। মধুস্মৃতি—নগেন্দ্রনাথ সোম
৪৮। সাহিত্যসাধক চরিতমালা—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত
৪৯। The Study of English Literature—Hudson
৫০। বাঙ্‌লার সাধনা—ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী

অনুক্রমণিকা

[প্রান্তলিখিত সংখ্যাগুলি পৃষ্ঠা সংখ্যা নির্দেশ করছে]

২৮। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
২৯। সংস্কৃতির রূপান্তর—শ্রীগোপাল হালদার
৩০। ষোড়শ শতকের বাঙ্‌লা সাহিত্য—শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন
৩১। History of Bengal Vol I and II --D. U. Publications
৩২। Origin & Development of Bengali Language—Dr. Suniti Kumar Chatterjee
৩৩। History of Brajabuli Literature—Dr. Sukumar Sen
৩৪। History of Sahajiya Cult—Prof. Manindra Mohan Bose
৩৫। Early History of the Vaishnava Faith & Movement in Bengal—Dr. S. K. De
৩৬। Obscure Religious Cult -Dr. S. B. Das Gupta
৩৭। Western Influence in Bengali Literature—Prof Priya Ranjan Sen
৩৮। Bengali Literature—J. C. Ghosh (Oxford 1956)
৩৯। ইসলামী বাঙ্‌লা সাহিত্য—ডাঃ সুকুমার সেন
৪০। প্রাচীনযুগের বাঙ্‌লা ও বাঙালী— "
৪১। মধ্যযুগের বাঙ্‌লা ও বাঙালী— "
৪২। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী
৪৩। আত্মজীবনী— "
৪৪। বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৪৫। সংবাদপত্রে সেকালের কথা— "
৪৬। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত—যোগীন্দ্রনাথ বসু
৪৭। মধুস্মৃতি—নগেন্দ্রনাথ সোম
৪৮। সাহিত্যসাধক চরিতমালা—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত
৪৯। The Study of English Literature—Hudson
৫০। বাঙ্‌লার সাধনা—ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী

অনুক্রমণিকা

[প্রান্তলিখিত সংখ্যাগুলি পৃষ্ঠা সংখ্যা নির্দেশ করছে]

অ

আ

য

র

স

হ